গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১ } ১৩৭৬, বৈশাখ

॥ সম্পাদকীয় ॥

দিন বদল ও আমাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৪শ বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৮ই জুন অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সভায় বার্ষিক বিবরণী পেশ করার মধ্য দিয়ে বিগত বৎসরের কাজকর্মের হিসেব-নিকেশ করার রীতি আছে। বার্ষিক আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাবও এই সভাতেই পেশ করা হবে। তাছাড়া নতুন বছরের জন্য কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্যগণ এই সভা থেকেই নির্বাচিত হন। সুতরাং পরিষদের জীবনে এই বার্ষিক সাধারণ সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার এই সংখ্যাটি যখন সদস্যদের কাছে পৌঁছবে তার আগেই এই বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে বলে অনুমান করছি। স্বভাবতই এই বার্ষিক সাধারণ সভার নির্বাচনানুষ্ঠানে পরিষদের কর্মকর্তা ও পরিচালকমণ্ডলীতে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। কোন কোন কর্মকর্তা হয়তো 'কর্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে' দিয়ে যাবেন। আশার কথা, এখন পরিষদে কিছু কিছু নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। পুরাতনের অভিজ্ঞতা হয়তো তাঁদের নেই, কিন্তু যথোপযুক্ত সুযোগ এবং শিক্ষণ পেলে এঁরা যে দায়িত্বভার নিতে পারবেন না একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। নুতনের মধ্যে আছে অপরিমিত উৎসাহ ও কাজ করার আগ্রহ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই ৪৩ বছরের জীবনে এমনি করেই তো নতুন কর্মীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিভাবান নুতন কর্মী বারে বারে এমন করেই পরিষদে এসেছেন এবং পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, এবারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরিষদের নিজস্ব ভবনে। বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন এভাবে এত শীঘ্রই এই রকম একটি নিজস্ব ভবনে করতে পারব একথা কি আমরা মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলাম? পরিষদের বর্তমান অবস্থায় কাজটি সহজসাধ্য ছিলনা।

অবশ্য একথা আমরা ভাবতে না পারলেও এই সাফল্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল অনেককাল আগেই। আমাদের পূর্ববর্তীগণ, যাঁরা এই পরিষদ গঠন করেছিলেন এবং আমাদের পূর্বে

এর পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সুকর্মের ফলেই আজ আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। তাঁরা যদি নিঃস্বার্থভাবে পরিষদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে না যেতেন তাহলে হয়তো আজ সাফল্যের মুখ দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। আর আমরা বর্তমানে যারা পরিষদের পরিচালনার দায়িত্বে আছি তারা যদি সাফল্যের মুখ দেখেই শ্রমবিমুখ ও আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে যাই তাহলে আমরাও আমাদের পরবর্তীদের জন্য নিশ্চয়ই কিছু দিয়ে যেতে পারব। পরিষদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার মধ্যে গৌরব আছে। উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, সেখানে সেই মহান উদ্দেশ্য সফল করার প্রচেষ্টা অতি পবিত্র কর্তব্য। এ যেন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই সংগ্রামের উত্তরাধিকার আমরা পূর্ব-বর্তীদের কাছ থেকে লাভ করি পরবর্তীদের দিয়ে যাবার জন্য। এটা যেন একই আগুনের শিখা যা পূর্ববর্তীদের হাত থেকে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই আগুনে পুড়েই আমরা খাঁটি হই—আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে।

'আশা-আকাঙ্ক্ষা' এবং 'সংগ্রাম' এই দুটি কথা মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করে মানুষ। আর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিও নেই। তাহলে পৃথিবীর সমস্ত অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যেত—নতুন কোন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যেত না। কেননা নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রতিভার বিকাশ হয়। আর সংগ্রাম না থাকলেই প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে।

সুতরাং অগ্নি আমাদের প্রজ্জ্বলিত রাখতেই হবে। আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে। গ্রন্থাগারবৃত্তির মান উন্নয়নে আমাদের যার যথাসাধ্য করতে হবে। সাফল্যের গর্বে আমরা যেন আত্মহারা না হয়ে পড়ি। ব্যর্থতায় আমরা যেন ভেঙ্গে না পড়ি। প্রতিটি ব্যর্থতার গ্লানি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমরা যেন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হতে পারি।

আর নিঃস্বার্থ কর্মের পরিবর্তে আমাদের কর্ম যদি স্বার্থগন্ধী হয়ে ওঠে, অথবা আমরা যদি একে অন্যের প্রতি কর্দম নিক্ষেপে এবং কলহে প্রবৃত্ত হই তবে আমাদের ধ্বংসও কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আমাদের পূর্ববর্তীরা আমাদের কাছে এক মহান আদর্শ তুলে ধরেছেন এবং সংগ্রামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁরা যেন বলেছেন—সংগ্রাম করে যাও—এগিয়ে যাও—দিগন্ত থেকে নবদিগন্তে অমিত বিক্রমে এগিয়ে চলো।

"চরৈবেতি" "চরৈবেতি!"

The new order and our heritage for struggle.

সূচীকরণ প্রবেশিকা (৫)

তপন সেনগুপ্ত

সূচীর গঠন (Construction of a Catalogue)

ভূমিকা: গ্রন্থাগারের যাবতীয় সংগ্রহ পাঠকের কাছে সমস্ত সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হল সূচীর কাজ। সুতরাং গ্রন্থাগারে সূচী হল গ্রন্থাগারের যাবতীয় সংগ্রহের কোনও নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী যুক্তিপূর্ণভাবে সজ্জিত তালিকা যা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও তালিকাভুক্ত যে কোনও সামগ্রীকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে, পূর্ণ বিবরণ জানায় ও গ্রন্থাগারে তার অবস্থান নির্দেশ করে।

সূচীকে পাঠকের চাহিদা মেটাতে হলে পাঠকের প্রয়োজন ও প্রকাশনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিটী গ্রন্থের (গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরণের সংগ্রহ বোঝাতে গ্রন্থ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ধরা হবে) জন্য একাধিক সংলেখ প্রস্তুত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সংগে গ্রন্থকার বা লেখকের সংযোগ হল সব চাইতে বেশী। কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য বহু ব্যক্তি (যেমন যুগ্ম গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক, চিত্রকর ইত্যাদি), বা সংস্থা (যেমন প্রকাশক, উদ্যোগী সংস্থা), বা আখ্যা, (title) বিষয়, কিম্বা মালা (series) একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সাথে জড়িত থাকে এবং বিভিন্ন পাঠক ঐ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বইখানি সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন। সুতরাং পাঠকের সুবিধা ও বইখানির ব্যবহার বাড়ানো—এই উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে সূচীতে গ্রন্থখানির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র অনুযায়ী সংলেখ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

সংলেখ প্রস্তুত করতে গিয়ে সর্বপ্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সংলেখগুলি সঙ্গতিপূর্ণ হয়, প্রতিটি সংলেখ যুক্তিপূর্ণ হয় ও বিভিন্ন সংলেখের মধ্যে যোগসূত্র থাকে। অন্যথায় পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। প্রয়োজনমত সংযোজক সংলেখ (Reference entry) প্রস্তুত করে সূচীর সংলেখগুলির মধ্যে যোগসূত্র বজায় না রাখলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ পাঠকের সামনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হবে না, কিম্বা অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপযুক্ত নিশানা না পেয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় গ্রন্থ খুঁজে পাবেন না। তাই যুক্তিগ্রাহ্য সঙ্গতিপূর্ণ সংলেখ প্রস্তুত করতে হলে সূচীকরণ সংহিতার (Cataloguing Code) ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। গ্রন্থাগারের ক্রমবর্দ্ধমান সংগ্রহকে সূচীভুক্ত করতে গিয়ে সর্বদাই সংহিতার অনুশাসনগুলি মেনে চলা উচিত। নতুবা সংলেখগুলির মধ্যে সংগতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার সংহিতার বিধানগুলিও এমন হওয়া প্রয়োজন যেন পরিবর্তনশীল প্রকাশনের জটিলতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। সেই সাথে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনুযায়ী সূত্রগুলির ব্যবহারের তারতম্য হতে পারে। গ্রন্থাগারের চরিত্র অনুযায়ী সূচীর রূপ বদলায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গবেষণা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন

এক নয়। সুতরাং সূচীর গঠনও ভিন্ন ধরণের হবে। কিন্তু একই গ্রন্থাগারের সূচীর সংলেখগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই সামঞ্জস্য থাকা উচিত। পাঠকের প্রয়োজন মেটাতে হলে ও সময় বাঁচাতে হলে সংলেখগুলির মধ্যে সংগতি বিধান একান্ত প্রয়োজন। কোন সংহিতাই চিরস্থিতিশীল নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নব প্রকাশ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগের সামনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরে। তাই প্রতিদিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারাগুলির বিচার ও পুনর্বিচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সূচীকরণের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। সর্বাধুনিক সূচীকরণ সংহিতা Anglo American Cataloguing Rules গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের বহু বছরের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল। প্রকাশন ব্যবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে গঠিত এই সংহিতার বিধানগুলি যথেষ্ট বাস্তবানুগ। সূচীকারকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্জন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সূচীকে সজীব ও আধুনিক রাখতে হবে।

সূচীর গঠন আলোচনা করতে হলে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত সংলেখগুলি সম্পর্কে সামান্য ভূমিকা প্রয়োজন। সংলেখ প্রস্তুতের জন্য Anglo American Cataloguing Rules, 1967 এর বিধানগুলি অনুসৃত হবে।

মুখ্য সংলেখ (Main entry) : একখানি গ্রন্থের জন্য একাধিক সংলেখ প্রস্তুত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, ঐ সমস্ত সংলেখ একই ধরণের হতে পারে না। গ্রন্থকার নির্বাচন সম্ভব হলে মুখ্য সংলেখ গ্রন্থকারের নামেই হবে। সূচীকরণে গ্রন্থকার শব্দটি ব্যাপক অর্থ দ্যোতক। সাধারণতঃ গ্রন্থকার অর্থে কোন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা। সূচীকরণে গ্রন্থকার অর্থে রচয়িতা ছাড়াও আরও অন্যান্য ব্যক্তি বা সংস্থাকে বোঝাতে পারে। যেমন, বহু লেখকের রচনা থেকে নির্বাচন করে কোন ব্যক্তি হয়ত একখানি সংকলন প্রকাশ করতে পারেন। (অবন্তী সান্যাল সম্পাদিত 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতা' নিদর্শন স্বরূপ বলা যেতে পারে)। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঐ গ্রন্থের সম্পাদক বা সংকলক, লেখক নন। তাঁর নিজের রচনা থাকতে পারে—না ও থাকতে পারে। কিন্তু যদিও লেখক নন তাহলেও ঐ বইখানির অস্তিত্বের জন্য সম্পাদকই দায়ী—যে লেখকদের রচনা সংকলিত হয়েছে তাঁরা নন, কেননা তাঁরা এই বইয়ের জন্য লেখেন নি। রচনাগুলিও হয়ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন সংস্থার প্রকাশিত গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে (দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রন্থকার রূপে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। এ সব ক্ষেত্রে ঐ সংস্থাই গ্রন্থগুলির অস্তিত্বের জন্য দায়ী। তাই সূচীকরণে গ্রন্থকার বলতে গ্রন্থের অস্তিত্বের জন্য দায়ী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি বা সংস্থা বোঝায়।

সুতরাং একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের জন্য যে ব্যক্তি বা সংস্থা মূলতঃ দায়ী, বা যে আখ্যায় গ্রন্থখানি সমধিক পরিচিত সেই ব্যক্তি, বা সংস্থা, বা আখ্যাকে শিরোনাম করে যে সংলেখ প্রস্তুত করা হয় তাকে মুখ্য সংলেখ বলে। একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের জন্য

কোন ব্যক্তি (যেমন A Farewell to arms, by Ernest Hemingway), কিম্বা একাধিক ব্যক্তি (যেমন Classified catalogue code……, by S. R. Ranganathan, assisted by A. Neelameghan) বা কোনও সংস্থা (যেমন Manual of photographic interpretation, published by the American Society of Photogrammetry) দায়ী হতে পারেন কিন্তু অভিধান, বিশ্বকোষ, জীবনী কোষ, সাময়িকী, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রকাশনগুলির ক্ষেত্রে সম্পাদক বা প্রকাশক ইত্যাদি কেউই দায়ী নন। এই ধরণের প্রকাশনের ক্ষেত্রে আখ্যাকে শিরোনাম করে মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত হয়। আবার বাইবেল, কোরান, বেদ, উপনিষদ জাতীয় গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে গ্রন্থকার নির্বাচন সম্ভব নয়। তেমনি আরব্য উপন্যাস, রোল্যাণ্ড গীতিকা, ঈশপের গল্প প্রভৃতি ধ্রুপদী সাহিত্যের মূল জাতির জীবনের স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্যের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। এ সব ক্ষেত্রেও গ্রন্থকার নির্বাচন সম্ভব নয়। একটি আখ্যা নির্দিষ্ট করে ঐ শিরোনামে ঐ জাতীয় সমস্ত প্রকাশনগুলির জন্য সংলেখ প্রস্তুত করতে হয়।

সুতরাং গ্রন্থকার বা সংস্থার যে নাম, কিম্বা আখ্যার যে রূপ গ্রন্থখানিকে সনাক্তকরণের পক্ষে সব চাইতে সহায়ক সেই নামে বা আখ্যার সেই রূপে মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করা হয়। মুখ্য সংলেখে গ্রন্থখানি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দেওয়া থাকে এবং সেই সাথে অনুপূরক সংলেখগুলির শিরোনাম দেওয়া থাকে।

অনুপূরক সংলেখ (Added entry): পাঠকের চাহিদা মেটাবার পক্ষে শুধুমাত্র মুখ্য সংলেখ যথেষ্ট নয়; কারণ মুখ্য সংলেখ গ্রন্থখানির একটি বৈশিষ্ট্যকে শিরোনাম করে প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্ত পাঠক মুখ্য সংলেখের শিরোনাম জানবেন এ আশা করা চলে না। বিশেষ করে গবেষক পাঠক গ্রন্থকার কিম্বা আখ্যার দিকে না গিয়ে বরং জানতে চান তাঁর গবেষণার বিষয়ের উপর কি কি বই বা অন্যান্য প্রকাশন পাওয়া যেতে পারে। তাই গবেষণা গ্রন্থাগারে বিষয় সূচী একান্ত প্রয়োজন। এইভাবে দেখা যাবে যে একখানি গ্রন্থের জন্য বিভিন্ন ধরণের পাঠক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করছেন, আগ্রহ প্রকাশ করছেন। তাই গ্রন্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে পাঠকের সম্ভাব্য চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে শিরোনাম করে অনুপূরক সংলেখ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সুতরাং অনুপূরক সংলেখগুলি মুখ্য সংলেখের সাথে মিলে গ্রন্থখানিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। একখানি গ্রন্থের গ্রন্থকার ছাড়া যুগ্ম গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক, আখ্যা, বিষয়, মালা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিকে শিরোনাম করে অনুপূরক সংলেখ প্রস্তুত হতে পারে। সুতরাং কোনও পাঠক এই বৈশিষ্ট্যগুলির যে কোন একটি অনুযায়ী অনুসন্ধান করলে সূচীতে গ্রন্থখানিকে সনাক্ত করতে পারবেন।

ইউনিট কার্ড প্রথায় মুখ্য সংলেখটিকে মূল ধরে নিয়ে প্রয়োজনীয় অনুপূরক সংলেখগুলির জন্য মুখ্য সংলেখটির নকল করে নেওয়া হয় এবং তারপর অনুপূরক

সংলেখগুলির প্রতিটির জন্য পৃথক কার্ডে প্রয়োজনীয় শিরোনামটী লিখে বা টাইপ করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া বহু গ্রন্থাগারে অনুপূরক সংলেখের জন্য মুখ্য সংলেখটির নকল না করে সংলেখটিকে সংক্ষেপ করা হয়। বিভিন্ন অনুপূরক সংলেখের রূপ ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে।

এই উভয় ব্যবস্থারই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। ইউনিট কার্ডের সুবিধা হল এই যে যেহেতু মুখ্য সংলেখের নকল, তাই প্রতিটি অনুপূরক সংলেখেও মুখ্য সংলেখে প্রদত্ত সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় অর্থাৎ যে কোন সংলেখ থেকেই পাঠক গ্রন্থখানি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ জানতে পারেন। অন্যথায় অনুপূরক সংলেখ সংক্ষেপ করার সুবিধা হল এই যে সূচীকরণের সময় বেঁচে যায়, শ্রম কম লাগে, অতএব খরচ কমে। কিন্তু অসুবিধা হল এই যে অনুপূরক সংলেখে পূর্ণ বিবরণ না থাকায় পাঠকের বহু সময়েই পূর্ণ বিবরণের জন্য আবার মুখ্য সংলেখে দেখতে হয়। সুতরাং পাঠকের সময় নষ্ট হয়।

আমেরিকায় লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস আমেরিকায় প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের জন্য মুদ্রিত কার্ড প্রকাশ করেন। তেমনি গ্রেট বৃটেনে বৃটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফী তাদের গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বইএর জন্য মুদ্রিত কার্ড প্রকাশ করেন। এই ধরণের কার্ডগুলি ইউনিট কার্ডের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কার্ডগুলি কিনতে পাওয়া যায়। ফলে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এই কার্ডগুলির বহুল প্রচলন দেখা যায়। এই ধরণের মুদ্রিত কার্ড সহজলভ্য হলে সূচীগুলি সঙ্গতিপূর্ণ হয়। সূচীকরণের জন্য খুব বেশী দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয় না। দু' একজন দক্ষ কর্মী টাইপিষ্টদের সাহায্য নিয়ে মাঝারী ধরণের গ্রন্থাগারগুলিতে অনায়াসে সূচীকরণের কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। অবশ্য যদি মুদ্রিত কার্ড সহজলভ্য হয় তাহলেই এই সুবিধাগুলি ভোগ করা যায়। অন্যথায় হাতে লিখে বা টাইপ করে ইউনিট কার্ড প্রথা অনুসরণ করলে সূচীকরণে সময় যথেষ্ট বেশী লাগবে। সুতরাং দক্ষ কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে- অর্থাৎ খরচ বেশী পড়বে। আবার খরচ বেশী পড়লেও বেশ কিছু দক্ষ কর্মীর কর্ম সংস্থান হবে। অন্যথায় মুদ্রিত কার্ড কিনতে পাওয়া গেলে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন কমে আসবে—সুতরাং বেকারী বাড়বে। আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

গ্রন্থকার সংলেখ (Author entry) : যে সকল গ্রন্থের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার নির্বাচন সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে মুখ্য সংলেখ গ্রন্থকারের নামে হয়ে থাকে। সুতরাং যে গ্রন্থের অস্তিত্বের জন্য গ্রন্থকার মূলতঃ দায়ী সেক্ষেত্রে গ্রন্থকার সংলেখই হল মুখ্য সংলেখ। কিন্তু যে কোনও গ্রন্থকার সংলেখই মুখ্য সংলেখ নয়। একখানি গ্রন্থ একাধিক ব্যক্তির যৌথ দায়িত্বে প্রস্তুত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির দায়ীত্ব মুখ্য বা প্রধান (অন্যথায় আখ্যাপত্রে যে ব্যক্তির নাম প্রথমে পাওয়া যাবে) তার নামে মুখ্য সংলেখ হবে। কিন্তু সেই সাথে অন্যান্য যুগ্ম গ্রন্থকারদের নামেও সংলেখ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যুগ্ম গ্রন্থকারদের নামে যে সংলেখগুলি হবে যদিও সেগুলি গ্রন্থকার সংলেখ কিন্তু মুখ্য সংলেখ

র্ণয়। এগুলিকে বলা হয় অনুপূরক সংলেখ। এই ভাবে অনুবাদক, সম্পাদক ইত্যাদির নামে কখনও মুখ্য সংলেখ হতে পারে, আবার কখনও অনুপূরক সংলেখ হতে পারে। নির্দিষ্ট গ্রন্থের অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংযোগ বিশ্লেষণ করে সংলেখে তার স্থান নির্দ্ধারণ করতে হবে।

আখ্যা সংলেখ (Title entry) : মুখ্য সংলেখ আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু প্রকাশনের ক্ষেত্রে আখ্যা গ্রন্থের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি (যেমন সম্পাদক, প্রকাশক, ইত্যাদি) অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ সব ক্ষেত্রে আখ্যাকে শিরোনাম করে মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত প্রকাশনগুলির ক্ষেত্রে আখ্যা অনুযায়ী (কিম্বা নির্দিষ্ট আখ্যা নির্দ্ধারণ করে) মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করা হয় :

১　সাময়িকী—যেমন, সাপ্তাহিক পত্র, মাসিক পত্র, দৈনিক সংবাদ পত্র, পঞ্জিকা, বর্ষপঞ্জী, সংক্ষেপ পত্রিকা (যেমন Library Science abstract), জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (যেমন B. N. B. ; I. N. B.) বা অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জী বা নির্ঘণ্ট যেগুলির আখ্যা বেশী পরিচিত (যেমন, Cumulative book index, Books in print, ইত্যাদি) ;

২　বিশ্বকোষ, জ্ঞানকোষ, জীবনীকোষ, অভিধান, গেজেট, চলচ্চিত্র, ইত্যাদি ;

৩　ধর্মগ্রন্থ—যেমন বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, কোরান, আবেস্তা, ত্রিপিটক, ইত্যাদি ;

৪　আরব্য উপন্যাস (Arabian nights), রোল্যাণ্ড গীতিকা, ঈশপের গল্প ইত্যাদি বেনামী ধ্রুপদী সাহিত্য (Anonymous classics)। এগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আখ্যা নির্দ্ধারণ করে নিতে হয় ;

৫　যদি তিনজনের বেশী যুগ্ম গ্রন্থকার থাকেন এবং মুখ্য গ্রন্থকার নির্বাচন সম্ভব না হয় ;

৬　সংগত গ্রন্থে (Composite work) যদি কোনও একজন গ্রন্থকারকে গ্রন্থখানির অস্তিত্বের জন্য দায়ী করা না যায় ;

৭　বেনামী গ্রন্থ (Anonymous works) (যদি গ্রন্থের সাথে জড়িত কোন ব্যক্তিকে গ্রন্থখানির অস্তিত্বের জন্য দায়ী করা না যায়)।

উপরোক্ত প্রকাশনগুলির ক্ষেত্রে আখ্যা অনুযায়ী মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনগুলির ক্ষেত্রেও (যেখানে গ্রন্থকারের নামে মুখ্য সংলেখ করা হয়ে থাকে) আখ্যা অনুযায়ী সংলেখ প্রস্তুত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে কেননা পাঠকেরা আখ্যা উল্লেখ করে বইখানি চাইতে পারেন। কিন্তু এই প্রকাশনগুলির ক্ষেত্রে যেহেতু গ্রন্থকারের নামে মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই আখ্যা অনুযায়ী অনুপূরক সংলেখ করা হয়। নিম্নলিখিত প্রকাশনগুলির ক্ষেত্রে আখ্যা অনুযায়ী অনুপূরক সংলেখ প্রস্তুত করা যেতে পারে :

১ নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ভ্রমণ কাহিনী জাতীয় সাহিত্য কীর্তি—যেমন, গিরীশ চন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'The Heart of the matter', by Graham Greene, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'Tale of Troy', by John Masefied, যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', অন্নদাশংকর রায়ের 'পথে প্রবাসে', ইত্যাদি।

২ বেনামী গ্রন্থের সংগে জড়িত কোন সম্পাদক বা অন্য কোন ব্যক্তিকে যদি গ্রন্থের অস্তিত্বের জন্য দায়ী করা যায়।

৩ সংকলন (Collection) ও সমগ্র রচনাবলী (Complete Works)।

৪ সংস্থা গ্রন্থকারের (Corporate author) নামে সূচীভুক্ত প্রকাশনগুলি (কিন্তু রিপোর্ট বা সম্মেলনের ধারা বিবরণী জাতীয় কিছু নয়)।

৫ অন্য যে কোনও আখ্যা যদি উল্লেখযোগ্য হয় বা ঐ আখ্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬ অনেক সময় দেখা যায় যে আখ্যার অংশ বিশেষ খুব পরিচিত হয়ে পড়ে। বিশ্ব সাহিত্যের অনেক উল্লেখযোগ্য বই এই দলে পড়ে। যেমন 'The Personal history of David Copperfield', 'Adventure of Robinson Crusoe' ইত্যাদি David Copperfield এবং Robinson Crusoe নামে সমধিক পরিচিত। আবার ১৬০৩ খৃঃ প্রকাশিত সেক্সপীয়রের Hamlet এর আখ্যা ছিল 'The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke'। ১৬০৩ খৃঃ ইংরেজী ভাষার সাথে আজকের ইংরেজীর তফাত অনেক। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 'The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark' এবং 'Hamlet, Prince of Denmark' 'বা শুধু' Hamlet আখ্যা দেখতে পাই। কিন্তু পাঠক মহলে Hamlet নামই যথেষ্ট এবং তাঁরা সাধারণতঃ Hamlet, Macbeth, Othello ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আখ্যা উল্লেখ করে বইখানি সম্পর্কে খোঁজ করেন—সম্পূর্ণ আখ্যার উল্লেখ অনেকেই করেন না। এ সব ক্ষেত্রে আখ্যার এই অতি পরিচিত অংশ বিশেষকে শিরোনাম করে সংলেখ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

৭ উপাখ্যা (Sub title) যদি বিশেষ অর্থবহ হয়, কিম্বা খুব পরিচিত হয়ে পড়ে তাহলে উপাখ্যা অনুযায়ী সংলেখ প্রস্তুত প্রয়োজন, যেমন—'The Bab ballads ; songs of a savoyard', by Sir W. S. Gilbert। এক্ষেত্রে উপাখ্যা 'Songs of a savoyard'কে শিরোনাম করে অনুপূরক সংলেখ প্রয়োজন।

৮ বিকল্প আখ্যা (Alternative title) যেমন, 'War ; or, What happens when one loves one's enemies', by John Luther Long। এক্ষেত্রে বিকল্প আখ্যায় 'What happens when one loves one's enemies' অনুপূরক সংলেখ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

মুখ্য সংলেখ—বিশদ বিবরণঃ সংলেখ প্রস্তুত করতে হলে সর্বপ্রথম শিরোনাম নির্বাচন (Choice of heading) করা প্রয়োজন। কিন্তু শুধু শিরোনামই ত সব নয়।

গ্রন্থ সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিও মুখ্য সংলেখে থাকা দরকার। বস্তুতঃ মুখ্য সংলেখে গ্রন্থ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য অনুপূরক সংলেখগুলি মুখ্য সংলেখের নকল হতে পারে, কিম্বা অন্য কোন সংক্ষিপ্ত রূপেও অনুপূরক সংলেখ প্রস্তুত করা যেতে পারে। মুখ্য সংলেখে শিরোনাম, আখ্যা, গ্রন্থকার সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য (যদি প্রয়োজন হয়), সংস্করণ, প্রকাশন বিবরণী, অংগবর্ণনা, মালা ও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বিস্তারিত সূচী (Contents) ও টীকার মধ্য দিয়ে গ্রন্থখানি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নির্দিষ্ট নিয়মে সাজিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। বলা বাহুল্য, গ্রন্থখানি সম্পর্কে এই বিভিন্ন তথ্যগুলি একটি লেখা প্রয়োজন এবং প্রতিটি সংলেখের জন্যই নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। তাহলে পাঠকেরা সূচীর সংগে খুব সহজেই অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন ও গ্রন্থাগার সূচীকে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে পারবেন। মুখ্য সংলেখের তথ্যগুলি নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী সাজান যেতে পারে :

Call No. Heading (Author's name—Personal/Corporate/Title)

Title ; Sub title and/or Alternative title, Author statement. (3) Edition. (5) Place, Publisher, Date.

Pagination (or no. of vols.) (2) Statement of illus. (2) Size. (5) (Series note.)

Contents (if necessary).

Notes (if necessary), each note forming a new paragraph.

স্থানাঙ্ক শিরোনাম (গ্রন্থকারের নাম—ব্যক্তি/সংস্থা/আখ্যা)

আখ্যা ; উপাখ্যা এবং/অথবা বিকল্প আখ্যা, গ্রন্থকার বিবরণী, ইত্যাদি। (৩) সংস্করণ। (৫) স্থান, প্রকাশক, তারিখ (প্রকাশন বৎসর)।

পৃষ্ঠা সংখ্যা (অথবা খণ্ড সংখ্যা)। (২) চিত্র বিবরণী। (২) মাপ। (৫) মালা বিবরণী।

সূচী (প্রয়োজনানুসারে)।

টীকা (প্রয়োজনানুসারে), প্রতিটি টীকা ভিন্ন স্তবকে আরম্ভ হবে।

(ছকে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি ঐ সংখ্যক অক্ষরের স্থান বোঝায়। কার্ডের উপর প্রতিটি বিবরণকে স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিবরণের পর কিছুটা স্থান ছেড়ে পরবর্তী বিবরণ শুরু করতে হয়।

মুখ্য সংলেখ যদি আখ্যা অনুযায়ী হয় অর্থাৎ মুখ্য সংলেখে যদি আখ্যা শিরোনাম হয় তাহলে উপরোক্ত ছকের সামান্য পরিবর্তন প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

মুখ্য সংলেখের বিভিন্ন অংশ—শিরোনাম (Heading) : গ্রন্থকার নির্বাচন সম্ভব হলে মুখ্য সংলেখ গ্রন্থকারের নামেই হবে—অর্থাৎ শিরোনামে গ্রন্থাকারের নাম লেখা হবে। অন্যথায় আখ্যা অনুযায়ী যখন মুখ্য সংলেখ হবে তখন শিরোনামে আখ্যা স্থান পাবে।

গ্রন্থকার কোন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারেন, কিম্বা কোন সংস্থা (Corporate body) হতে পারে।

ব্যক্তি গ্রন্থকার : ব্যক্তি গ্রন্থকারের নামে সংলেখ প্রস্তুত করতে হলে সূচীকারকে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় :

১) কোন্ ব্যক্তির নামে (যখন গ্রন্থের সাথে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকেন) শিরোনাম হবে

২) নামের কোন্ অংশকে সংলেখ পদ (Entry element, or, "Starter Word") রূপে গণ্য করা হবে

এবং

৩) নামের কোন্ রূপে শিরোনাম হবে।

কোন্ ব্যক্তির নামে শিরোনাম হবে এই প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সাথে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকেন, যেমন যুগ্ম গ্রন্থকার, সম্পাদক, অনুবাদক, পরিমার্জক (Reviser) ইত্যাদি এ ছাড়া একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে লিখতে পারেন, যেমন ছদ্মনাম বা আসল নাম।

দ্বিতীয় সমস্যা হল সংলেখ পদ নির্বাচন। আদ্যনাম বা মূলনাম (Forename), পদবী (Surname), যৌগিক নাম (Compound name), নামের সাথে যুক্ত পদবী, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পুরোহিতদের নাম এবং সর্বোপরি ভারতীয় নাম বৈচিত্র্য প্রভৃতি এই পর্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু। (বিশদ আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

বিভিন্ন নাম আবার বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন ভারতীয় পদবীর দু'টি রূপ দেখা যায়। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পর উদ্ভূত রূপ আর আদি দেশীয় রূপ, মুখার্জী ও মুখোপাধ্যায়, বোস ও বসু ইত্যাদি। আবার প্রচলিত রূপ ও আদি ব্যুৎপত্তিগত রূপের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়—যেমন দুবে ও দ্বিবেদী, চৌবে ও

চতুর্বেদী, ওঝা ও উপাধ্যায়। সূচীকরণের সময় এই উভয় রূপের কোনটিকে গ্রহণ করা হবে বা উভয় রূপই ব্যবহৃত হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

শিরোনাম সর্বদাই প্রথম লম্ব থেকে আরম্ভ হবে। কিন্তু যদি এক লাইনে শেষ না হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশটুকু আনুমানিক তৃতীয় লম্ব থেকে শুরু হবে।

আখ্যা : আখ্যা গ্রন্থের আখ্যাপত্রে যেমন আছে ঠিক তেমনই নকল করতে হবে। তবে যতি চিহ্ন বা অক্ষরের মাপ (বড় হাতের বা ছোট হাতের) সূচীকরণের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। উপাখ্যা থাকলে আখ্যার পর "সেমি কোলন" (;) দিয়ে লেখা হয় (কখনও কখনও কোলন ব্যবহার চলে)। বিকল্প আখ্যার ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যবস্থা, কিন্তু বিকল্প আখ্যা নিয়ে অনুপূরক সংলেখ করতে হবে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলে উপাখ্যার জন্য অনুপূরক সংলেখের প্রয়োজন নেই। আখ্যা কিম্বা উপাখ্যা যদি খুব দীর্ঘ হয় এবং অর্থের তারতম্য না ঘটিয়ে তাদের যদি ছোট করা বা পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে সেইমত করে নিয়ে বাড়তি অংশটুকু বা উপাখ্যা সব শেষে টীকা হিসেবে লেখা চলে।

আখ্যা দ্বিতীয় লম্ব থেকে শুরু হবে এবং লাইন শেষ হলে প্রথম লম্বে ফিরে আসবে। আখ্যা থেকে শুরু করে প্রকাশনের তারিখ পর্যন্ত একটি স্তবক হবে।

গ্রন্থকার বিবরণী : শিরোনামে শুধু গ্রন্থকারের নাম থাকে। কিন্তু গ্রন্থকার সম্পর্কে যদি আরও কোন তথ্য সরবরাহ করার প্রয়োজন হয় তাহলে আখ্যার পর কমা (,) চিহ্ন ব্যবহার করে গ্রন্থকারের নাম পুনরাবৃত্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ করা চলে। এ ছাড়া গ্রন্থের সংগে গ্রন্থকার ব্যতীত আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারেন, যেমন. যুগ্ম গ্রন্থকার, অনুবাদক, পরিমার্জক, সম্পাদক ইত্যাদি। শিরোনামে শুধু একটি নাম থাকে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের নামও আখ্যার পর কমা চিহ্ন ব্যবহার করে উল্লেখ করা হয়। (গ্রন্থকারের নাম পুনরাবৃত্তি করা সম্পর্কে সংহিতায় নির্দিষ্ট বিধান আছে। Rule 134 দ্রষ্টব্য)।

সংস্করণ (Rule 135) : সংলেখে সংস্করণের উল্লেখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম সংস্করণ উল্লেখ করা হয় না। কোন সংলেখে সংস্করণের উল্লেখ না থাকলে গ্রন্থখানিকে প্রথম সংস্করণ রূপে গণ্য করা হবে।

যদি কোন গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড বিভিন্ন সংস্করণের হয় তাহলে সংস্করণের স্বাভাবিক স্থানে (আখ্যা ও গ্রন্থকার বিবরণীর পরে) ঐ বিশদ বিবরণ না লিখে সব শেষে সংস্করণের জন্য টীকা যোগ করা হয়।

প্রকাশন বিবরণী (Imprint : Rule 138) : গ্রন্থখানি প্রকাশের স্থান (অর্থাৎ প্রকাশকের অফিস যে শহরে অবস্থিত সেই শহরের নাম), প্রকাশকের নাম ও প্রকাশনের তারিখ (অর্থাৎ যে বছর বইখানি প্রকাশিত হয়েছে সেই বছর—দিন ও মাসের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন) এই তিনটি তথ্য একত্রে মিলে প্রকাশন বিবরণী সম্পূর্ণ হয়। সংস্করণের পর প্রকাশন বিবরণী লেখা হয়।

যদি কোন গ্রন্থের একাধিক প্রকাশক থাকে এবং প্রকাশ স্থানরূপে আখ্যাপত্রে প্রকাশকদের নামের সংগে একাধিক স্থানের (যে সমস্ত শহরে প্রকাশকের অফিস আছে) উল্লেখ থাকে তাহলে প্রকাশন বিবরণীর জন্য শুধুমাত্র প্রথমে উল্লিখিত প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট শহরের নাম গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি গ্রন্থের কোথাও প্রকাশের স্থান বা তারিখের উল্লেখ না থাকে তাহলে যথাক্রমে [n. p.] ও [n. d.] লিখে ঐ অসংগতি প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশকের নামের যে অংশটুকু প্রকাশককে সনাক্ত করার পথে যথেষ্ট শুধুমাত্র সেই অংশটুকুই সংলেখে লেখা হবে। Published by, published for, & Sons, incorporated ইত্যাদি বিবরণ অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, প্রকাশকের নাম যদি The World Press (P) Ltd. হয় তাহলে সংলেখে শুধু World Press লেখা হবে (Rule 140 C)।

সংস্থা গ্রন্থকারের প্রকাশনগুলির ক্ষেত্রে যদি গ্রন্থকার ও প্রকাশক সংস্থা একই হয় তাহলে প্রকাশন বিবরণে প্রকাশকের নামের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন কেননা শিরোনামে ঐ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকাশন বিবরণে সব শেষে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থখানির প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয়। সাধারণভাবে পুনর্মুদ্রণের তারিখ উল্লেখ করা হয় না যদি না তার কোন বিশেষ মূল্য থাকে। কোন তারিখ নিয়ে যদি সংশয় দেখা দেয় এবং সঠিক তারিখ যদি নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় তাহলে আখ্যাপত্রে প্রাপ্ত তারিখের পর অন্য তারিখটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন 1953 (i.e., 1954)।

একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের প্রকাশের তারিখ যদি বিভিন্ন হয় তাহলে প্রথম ও শেষ তারিখ পর্যন্ত সময়কে প্রকাশকাল বলে ধরা হয়। যেমন, 1908-13.

যদি আখ্যাপত্রে প্রাপ্ত তারিখ বা প্রকাশের তারিখের সংগে "কপিরাইট" তারিখের অমিল থাকে তাহলে ঐ উভয় তারিখই উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন 1967, C 1965। আবার "কপিরাইট" তারিখ যদি বিভিন্ন হয় তাহলে সর্বশেষ তারিখটিকে গ্রহণ করা হবে।

অংগ বর্ণন (Collation—Rule 142) : এই পর্যায়ে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা, চিত্র বা ঐ জাতীয় যা কিছু এবং বইয়ের মাপ লেখা হয়।

প্রতিটি গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পৃষ্ঠাগুলিকেই নজরে রাখতে হবে। প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাগুলি অর্থাৎ আখ্যাপত্র, ভূমিকা, সূচীপত্র ইত্যাদি সাধারণত: মূল বইয়ের পৃষ্ঠাগুলির সংগে ধরা হয় না। ইংরেজী বইয়ে এই পৃষ্ঠাগুলি হয় রোমান হরফে লেখা হয়, বা গণনা করা হয় না, আবার কখনও কখনও মূল বইয়ের সংগে একই সাথে গণনা করা থাকে। প্রারম্ভিক পাতাগুলি যদি রোমান অক্ষরে গণনা করা থাকে তাহলে সূচীতেও রোমান হরফে লিখতে হবে। যদি গণনা করা না হয়ে থাকে তাহলে গুনে নিয়ে বন্ধনীর মধ্যে রোমান হরফে লিখতে হবে, যেমন (vi) 392 p,

যদি কোন বই একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাহলে শুধুমাত্র খণ্ড সংখ্যা লিখলেই চলে, যেমন 7v. 1 কিন্তু যদি এই বিভিন্ন খণ্ডের পাতাগুলি একই সংগে গণনা হয়ে থাকে তাহলে বন্ধনীর মধ্যে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা লেখা চলে, যেমন 3v. (632 p.)

একখানি গ্রন্থে ছবি, ফটোগ্রাফ, নক্সা জাতীয় অনেক কিছু থাকতে পারে যা বইখানির বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে বা সুন্দর অলংকরণের মধ্য দিয়ে বইখানির অংগসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। পৃষ্ঠা সংখ্যার পরে এই চিত্র বিবরণী লিখতে হয়। এই পর্যায়ে ছোট হাতের অক্ষর ব্যবহার করতে হয় এবং সংহিতার বিধান অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত নামে সাজিয়ে লিখতে হয়। সাধারণতঃ আখ্যাপত্রের মুখোমুখি যদি কোন চিত্র থাকে (Frontispiece) সেটিকে সর্বপ্রথম লিখতে হয়। এ ছাড়া illus. শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই প্রথমে illus. লিখে অন্যান্য কিছু থাকলে সেগুলি বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজাতে হয়। যেমন,

front., illus., maps, plates, tables.

চিত্র বিবরণীর পরে সেন্টিমিটারে বইয়ের উচ্চতা লেখা হয়। শুধুমাত্র অতিকায় বা ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুইই লেখা প্রয়োজন, কেননা এই মাপ অনুযায়ী বিশেষ তাকের বন্দোবস্ত করতে হতে পারে।

মালা বিবরণী (Series note Rule 143); অংগবর্ণনের পর বন্ধনীর মধ্যে মালার বিবরণ লেখা হয়। মালার নামে অনুপূরক সংলেখ প্রস্তুত করা দরকার যেন একই মালার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থ এক জায়গায় পাওয়া যায় যেমন, Abridged classic series-এ বিশ্বসাহিত্যের বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কোন পাঠক এই মালার একখানি বই পড়ে এই মালায় অন্য কি বই আছে জানতে চাইতে পারেন। বাংলায় বিশ্বভারতী প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-আর একটি উল্লেখযোগ্য মালা যে মালায় বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে বিদগ্ধ মনীষীদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

যদি মালার নাম বইয়ে না থাকে এবং অন্য কোনও স্থান থেকে মালার নাম সংগ্রহ করা হয় তাহলে মালার নাম তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হয়। মালা বিবরণীতে মালার নাম ও সংখ্যা লিখতে হয়, যেমন, Bengal Library Association English series, no 3.

সূচী (Contents) সংকলন, সংগ্রহ নির্বাচিত কোন সংগ্রহের আখ্যা থেকে সাধারণতঃ ঐ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। তাই এ সব ক্ষেত্রে বিস্তারিত স্চী যোগ করা প্রয়োজন। এই স্চী নতুন স্তবকরূপে দ্বিতীয় লম্ব থেকে আরম্ভ হবে এবং প্রয়োজন হলে প্রথম লম্বে ফিরে আসবে। অংগবর্ণনের স্তবকের পর একটি লাইন বাদ দিয়ে এই স্তবক আরম্ভ হবে।

টীকা (Notes): উপরোক্ত বিভিন্ন তথ্যগুলি সরবরাহ করার পরেও অনেক সময় দেখা যায় যে গ্রন্থখানি সম্পর্কে আরও কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যা উপরোক্ত

বিভাগগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। যেমন, বইখানি যদি অন্য কোন ভাষা থেকে অনুবাদ হয় তাহলে মূল গ্রন্থখানি সম্পর্কে পাঠকের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে হলে টীকার প্রয়োজন। আবার কোন গ্রন্থ যদি কোন বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্য হয় এবং যদি আখ্যায় তার কোন ইংগিত না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও টীকা যোগ করা প্রয়োজন। যেমন শুধুমাত্র Economics আখ্যায় একাধিক বই আছে। এই আখ্যা থেকে বই এর মান সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। এক্ষেত্রে টীকা যোগ করা প্রয়োজন। আবার সাময়িক পত্র অনেক সময় আখ্যা পরিবর্তন করে। এ সব ক্ষেত্রেও টীকা যোগ করে পাঠকদের ঐ পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন টীকার ভাষা খুব সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়। কোন গ্রন্থের ভাল-মন্দ সম্পর্কে সূচীকারের মত প্রকাশ অনুচিত। এ বিষয়টি পাঠকদের বিবেচনার জন্যই রাখা শ্রেয়। সূচীকারের দায়িত্ব গ্রন্থাগার সংগ্রহকে সুন্দরভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা যেন তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনমত ও পছন্দমত বই খুঁজে পান।

টীকা অন্যান্য বিবরণের চাইতে স্বতন্ত্র ও টীকার জন্য উপযুক্ত শব্দ নির্ধারণ দায়িত্ব। এই অংশটুকু অন্যান্য বিবরণের পরে এক লাইন ছেড়ে নতুন স্তবক করে দ্বিতীয় লম্ব থেকে শুরু হবে এব প্রয়োজন হলে প্রথম লম্বে ফিরে আসবে। টীকায় একাধিক তথ্য সরবরাহের প্রয়োজন হলে প্রতিটি তথ্য নতুম স্তবক থেকে শুরু হবে।

A Primer of Cataloguing by Tapan Sen

প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ঃ মেদিনীপুর

কুণাল সিংহ

বাংলা দেশের এক অতি পুরাতন সহর এই মেদিনীপুর। এখানকার গ্রন্থাগার-গুলির ইতিহাসও বেশ পুরাতন। তাই বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম আছে সর্বাগ্রে। এই স্থানের রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার মেদিনীপুরের তথা বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাধারণ গ্রন্থাগার। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুকাল পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী (চুঁচুড়া) ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরের এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় মেদিনীপুরের জেলা কালেক্টর মিঃ হেনরী ভিনসেন্ট বেলীর সময়ে। তাঁর প্রচেষ্টায় তৎকালে মেদীনীপুরের ইতিহাস ও একটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর সহরে এই সাধারণ গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠার পিছনে ভিনসেন্ট বেলীর উৎসাহ অনেকাংশে কাজ করেছে। রাজনারায়ণ বসু এই সময়ে সংস্কৃত কলেজ থেকে মেদিনীপুর বদলী হন এবং সেখানকার জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁকে পাঠাগারটির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। জেলা কালেক্টর মিঃ বেলী তৎকালের মেদিনীপুরবাসী জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে ২৪০০ টাকা মত চাঁদা সংগ্রহ করেন। এই টাকা থেকে গ্রন্থাগারের জন্য গৃহ নির্মিত হয়; পুস্তক, পত্রপত্রিকা মানচিত্র ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। ভিনসেন্ট বেলীর প্রতি সম্মানার্থে গ্রন্থাগারটির নামকরণ করা হয় "বেলী হল পাবলিক লাইব্রেরী"।

সূচনায় বেলী সাহেবের উৎসাহ কাজ করলেও এই গ্রন্থাগারের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় তদানীন্তন কালের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ রাজনারায়ণ বসুর প্রচেষ্টায়। ১৮২৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসু ২৪ পরগণা জেলার বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে ও হিন্দু কলেজে তাঁর শিক্ষা। ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি আঠারো বৎসর কাজ করেন।

রাজনারয়েণ বসু বিদ্যালয়ের বাইরে জনসাধারণেরও শিক্ষক ছিলেন। তাদের উন্নতি ও মঙ্গলার্থে মেদিনীপুরে যত প্রকার প্রচেষ্টা হয়েছিল তার অধিকাংশরই মূলে ছিলেন তিনি। মেদিনীপুরের সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজে তাই তাঁর এত উৎসাহ ছিল। যে আঠারো বৎসর তিনি মেদিনীপুরে ছিলেন সেই সময়টুকুর মধ্যেই গ্রন্থাগারটির সম্প্রসারণ হয়।

Sir W. W. Hunter তাঁর Gazetteer-এ এই গ্রন্থালয়টির কথা উল্লেখ করে যান। তিনি লিখেছেন: "The (library) building is neat with a small

garden on one side and the tank on the others···· The number of volumes in the Library has increased from 1870 in 1853 to 3128 at the end of 1871, besides periodicals".

১৮৫৪ সালে এই গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করে মিঃ রিকেট সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি লিখেছেন, "I must not omit to make mention of the Midnapur Public Library, for I think it affords an example which might be followed with much advantage at all large stations" (Rickett's Report, para 232)। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই গ্রন্থাগারের সভ্যগণ দুই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন ; প্রথম শ্রেণী ১ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণী ।।০ আনা চাঁদা দিতেন। সে সময়ে ১৪ জন ইউরোপীয় এবং ৩১ জন দেশীয় ব্যক্তি এই গ্রন্থাগারের সভ্য ছিলেন। প্রথম অবস্থায় ১০ টাকা বেতনে একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা এই গ্রন্থাগারটির উপর দিয়ে বয়ে যায়। স্বদেশী যুগে সরকারের কুনজরে ছিল গ্রন্থাগারটি। সে সময়ে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বহু সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছে! তখন বিভিন্ন সময়ে অ্যানি বেশান্ট, সিষ্টার নিবেদিতা, বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে আসতেন। অপরদিকে তখন থেকেই গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারটি কোনক্রমে টিকে থাকে। তারপর স্বাধীনতা লাভের পর নতুন উদ্যমে এই গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে গ্রন্থাগারটির নামকরণ করা হয় 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার'।

১৯৫১ সালে গ্রন্থাগারের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সে সময়ে গ্রন্থাগারভবনটি ছিল একতল। শত বৎসরের পুরাতন এই গৃহটিতে, স্থানাভাব ছিল প্রচণ্ড রকম। শতাধিক বৎসরের ব্যবধানে বহু পুরাতন পুস্তকের যেমন হদিস মেলেনি তেমনি বহু নতুন পুস্তক এই গ্রন্থ সংগ্রহে এসে জমা হয়েছে। এখানকার বর্তমান সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু জনসাধারণের সাহায্যে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় বাড়ীটিকে দোতলা করিয়েছেন। শ্রীবসু রাজনারায়ণ বসুর মাধ্যম ভ্রাতা দুর্গানারায়ণ বসুর পৌত্র। চোখের পীড়ায় নিজে অসুস্থ বলে তাঁর পক্ষে বর্তমানে গ্রন্থালয়ের তত্ত্বাবধান সম্যকরূপে করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তাই গ্রন্থসামগ্রী এখন সম্পূর্ণ অগোছালো অবস্থায়। বর্তমান গ্রন্থাগারিকের নাম শ্রীতারাপদ সমাদ্দার। অতি অল্প বেতনের এই গ্রন্থাগারিকের পক্ষে স্বল্প অর্থ সাহায্যে গ্রন্থাগারের সম্যক যত্নসাধন করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রন্থাগারটি খোলা থাকে বিকেল ৫টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত। নিয়মিত পাঠক অল্প কয়েকজন। বর্তমান গ্রন্থসংখ্যা হাজার পাঁচ মত।

এই গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একটি নিজস্ব গ্রন্থ সংগ্রহ

আছে। সেখানে রাজনারায়ণ বসুর লেখা কয়েকটি পুস্তক (যেমন 'তাম্বুলোপহার' 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' ইত্যাদি ও মেদিনীপুর সম্বন্ধীয় কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ছিল। রাজনারায়ণ বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরীটিও শ্রীবসু সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনও এক মহিলা গবেষক এই প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলি নিজের গবেষণার কাজে সংগ্রহ করে আজ প্রায় তিন বৎসর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। রাজনারায়ণ বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরীটি শ্রীযুক্ত অমল হোম শ্রীবসুর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীহোম গ্রন্থটি শ্রীপুলিন বিহারী সেনকে দেন। বর্তমানে এই গ্রন্থটিও সেই মহিলা গবেষকের কাছে পড়ে আছে। গ্রন্থগুলি সাধারণের কোনও কাজে আসছে না।

কিছুকাল পূর্বে মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ বিনোদ চন্দ্র দাস তাঁর পিতামহ শ্রীভাগবত চন্দ্র দাসের গ্রন্থ-সংগ্রহটি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারে দান করেন। ভাগবত চন্দ্র গ্রন্থ-সংগ্রহে প্রায় ২৫০ টি পুস্তক আছে। এগুলির অধিকাংশ পুস্তকই সংস্কৃত ; বেদ, উপনিষদ, গীতা, বেদান্ত ইত্যাদি পুস্তকের সংখ্যাই এখানে বেশী।

নারাজোল গ্রন্থসংগ্রহের কিয়দংশ এই গ্রন্থাগার দান স্বরূপ লাভ করে। নিম্নলিখিত গ্রন্থতালিকায় নারাজোল সংগ্রহের কয়েকটি ও পুস্তক গ্রন্থাগারের অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হ'ল :—

Bailery, L. H.—Plant breeding. 1908.

Bengal Tenancy Act VIII of 1885.

Bentley, C. A,– Mahatma in Bengal. 1916.

Bose, Pramathanath—History of Hindoo civilization during British rule ; Vols I—III.

Buckland, C. E—Bengal under the Lieut. Governors 1901.

Cameron, J—Manual of gardening for India. 1904.

Chirol, V—1) Indian unrest. 1910.
2) India : Old and new. 1921.

Cotton, C. W. E—Commercial information for India. 1919.

Cunningham—Archaeological survey of India ; Vols. 1—XX ; 1897—1885.

(Marquies) Curzon—Government of India ; 2 Vols.

Deb, (Raja) Binay Krishna—Early history and growth of Calcutta. 1905.

Digby—Prosperous British India. 1901.

Edward, Herbert B—(A) Year on the Punjab frontier in 1848-49 ; Vols. I—II.

Edwards, Byson—Hisiory : Civil and Commercial of British Colonies ; 3 Vols. 1807.

(Major) Forbes—Eleven Years in Ceylon ; Vols. 1 & II.

Forsyth, W—History of captivity of Napoleon at St. Helena from letters and journals of Late Sir Hudson Lowe. 3 Vols.

Foster, Ellsworth D., *ed.*—New educator eneyclopaedia. 1938.

Garrett, J. H. E—Bengal district gazetteers. 1910.

Griffith, Willlam -Journal of proverbs. Bishop's College press, 1847.

Harmsworth—Harmsworth's history of the world ; 8 Vols. 1907-9.

Hedin, Sven—Transhimalaya discoveries and adventures in Tibet ; Vols. I & II.

Hooker, Joseph Dalton—Himalayan journals ; Vols. I & II. 1854.

Hunter, W. W., *ed.*—1) Rulers of India.
2) Statistical account of Bengal ; Vols. 1-20 ; 1875-77.
3) Imperial Gazetteer.

Hutchinson, Walter—Pictorial Encyclopaedia.

Kaye, John William—1) Administration of Eastern India. 1853.
2) History of the Sepoy war in India, 1857—1858, Vols. II & III, 1880
3) Lives of Indian officers, 1869.

Keer, James—Domestic life, character, customs of natives of India. 1865.

Mac Farlane, Charles - Our Indian Empire.

(Colonel) Malleson—1) (An) Historical sketch of the native states in India. 1875.
2) Indian mutiny.

Martin, Montgomery—1) Despatches, minutes and correspondence of Marquies Wellesley during his administration in India ; Vols. 1—V, 1837-1840.
2) History, antiquities, topography and statistics of Eastern India ; Vols. II & III.

Mitra, Nripendra Nath, *ed.*—Indian Annual Register (General Volumes present in the library).

Morley, S L—(The) Rise of the Dutch republic.

Nitisha Sultana—My harem life.

Orme, Robert—History of the military transactions of the British nation in Hindoostan from 1746 ; 4th ed., Vol. I. 1861.

Pemberton, R. B—Political mission to Bostan. 1865.

(Lord) Roberts—Forty years in India ; 2 Vols. 1897.

Roy, Krishna Chandra—Phrases and idioms. 1889.

Shelley, T. M—Indian Gardens. 1873.

Strachy, John—Coming Struggle for power 1932.

Thornton, Edward—History of the British Empire in India ; Vols. 1—V, 1841-43.

Williams, Benjamin Samuel—Select Foms and Lycopods, British and Exotic ; 1873.

Wright, Robert Patrick—Standard cyclopedia of modern agriculture and rural economy ; vols. I—XII.

এ ছাড়া এই গ্রন্থ সংগ্রহে আছে যতীন্দ্রমোহন রায়ের লেখা 'ঢাকার ইতিহাস' ১ম খণ্ড (১৩১০ বঙ্গাব্দ) ; কয়েকটি সঙ্গীতের পুস্তক, বেদ ও উপনিষদের কয়েকটি কপি, Bengal Legistative Council Debates-এর অনেকগুলি খণ্ড, Horticulture-এর বহু পুরাতন এবং কিছু নূতন পুস্তক।

উল্লেখযোগ্য আর কয়েকটি পুস্তক হ'ল ১৮২৯, ১৮৩১, ১৮৩২ সালে প্রকাশিত Scott-এর উপন্যাস, Life of Swami Vivekananda by his disciples (vols. 1—1V) ; F. J. Shores-এর লেখা Notes on Indian Affairs, vols. 1 & 2 (1837), People of Nations : World's library of best books, Samuel Johnson কর্তৃক সম্পাদিত Rambler (1857), Encyclopaedia Britannica (1911).

মেদিনীপুরের আজ একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হ'ল বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির। এটি নির্মাণ করার অর্থ দিয়েছিলেন মহিষাদলের রাজা ও অন্যান্য জমিদারগণ। এই ভবনের নিম্নতলে মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের অফিস ও গ্রন্থাগার। সাহিত্য পরিষদেব বর্তমান সম্পাদক হলেন শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষদ গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল :—

জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী রচিত 'ভুদেব নির্বাণ' (১৮৫১ সাল) যোগীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গমুকুর' (১৩২৭ সাল), 'শোলাঙ্ক বা শুঙ্কি জাতির আদি বৃত্তান্ত' (১৩১৪ সাল), যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' ও 'মেদিনীপুরের প্রথম যাহারা' এই দুটি গ্রন্থ, মহেন্দ্রনাথ করণ রচিত 'খেজুরী বন্দর', সেবানন্দ ভারত রচিত 'তমলুকের ইতিহাস' ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত রচিত 'তমলুক ইতিহাস' (১৯০২), জ্ঞানেন্দ্র কুমার সঙ্কলিত (জমিদারগণের) 'বংশ পরিচয়', ৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ (১৩২৫), টডের রাজস্থানের বাংলা অনুবাদ (১২৯০ সাল), রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' (অসম্পূর্ণ), 'রাজতরঙ্গিনী'।

কিছু প্রাচীন পত্রপত্রিকা এখানে আছে। এগুলির মধ্যে 'বিচিত্রা', 'নারায়ণ', 'পঞ্চপুষ্প', 'সাহিত্য', 'প্রভাতী', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী' (অনেক কটি খণ্ড), 'প্রবর্তক' প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু মূলতঃ অর্থাভাবে এগুলির সম্যক যত্ন নেওয়া গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যদিও এই পত্রপত্রিকাগুলির কয়েকটি সংখ্যা মাত্র গ্রন্থাগারে আছে বাংলাদেশের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থাগারেও এই পত্রিকাগুলির অসম্পূর্ণ

কয়েকটি খণ্ড পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতা ও নৈহাটী সাহিত্য পরিষদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দু'টি গ্রন্থাগারেও উল্লিখিত পত্রপত্রিকাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। কলিকাতার সাহিত্য পরিষদে এই পত্রপত্রিকাগুলির কয়েকটির সব কটি খণ্ড এবং কয়েকটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। পত্রপত্রিকাগুলিকে কলিকাতার গ্রন্থাগারে প্রয়োজনমত নিয়ে এলে পাঠকের পক্ষে ব্যবহার করা সুবিধে হবে বলে মনে হয়। এই ব্যবস্থায় অসম্পূর্ণ খণ্ডগুলি অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

''বিদ্যাসাগর হলের' দ্বিতলে সাহিত্য পরিষদের প্রত্নতত্ত্বশালা। এখানে ২০১টি প্রাচীন বাংলা পুঁথি আছে। আসামের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৬৬ সালে এগুলির এক তালিকা প্রস্তুত করে দেন। সেই পুঁথি সংগ্রহে নিম্নলিখিত কয়েকটি পুঁথি উল্লেখযোগ্য : মঙ্গলকাব্য, মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রিমা (ভারতচন্দ্র লিখিত), হংসদূত (কবি নৃসিংহদাস), চণ্ডীমঙ্গল, জানকীর দশমাস্যা (বিক্রমদাস) গয়ার শ্রাদ্ধ, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল (লোচন দাস), সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা (নরোত্তম দাস, ১২৫৮ বঙ্গাব্দ), চণ্ডীমঙ্গল (কবি কঙ্কণ ১২৩৬ বঙ্গাব্দ) কলঙ্কভঞ্জন (কবিচন্দ্র, ১২১৫ বঙ্গাব্দ) রামের বনবাস (কবিচন্দ্র), সীতাহরণ (কবিচন্দ্র), হরিশচন্দ্র (দ্বিজ কবিচন্দ্র), রামের বনবাস, ১২১৭ বঙ্গাব্দ) রামের বনবাস (কবিচন্দ্র, ১২১৭ বঙ্গাব্দ), চৈতন্য চরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ১২৪৭ বঙ্গাব্দ), চৈতন্যমঙ্গল (লোচন দাস, ১২৩৫), শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু), গঙ্গামাহাত্ম্য (বিপ্র জগন্নাথ), উষাহরণ (কবিচন্দ্র, ১২৫৫ বঙ্গাব্দ)। এ ছাড়া আরও বহু পুঁথির নামোল্লেখ করা যেত, কিন্তু তাতে তালিকা মূল প্রবন্ধ অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়ার আশংকা আছে।

মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের একটি নিজস্ব প্রত্নতত্ত্বশালা আছে। এখানে দেবদেবীর আটটি প্রাচীন মূর্তি এবং ৫৩টি প্রাচীন মুদ্রা সংরক্ষিত। মুদ্রা সংগ্রহের অনেকগুলি নেপালের প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রা। কয়েকটি বাদশাহী আমলের মুদ্রাও এখানে আছে।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এখানকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে রক্ষিত দু'টি তাম্রশাসন। ১৯৩৭ সালে মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়। তিনি মেদিনীপুরের দাঁতন থানার অন্তর্গত আঁতলা গ্রাম নিবাসী জনাব সুরত খাঁর কাছ থেকে ২খানি তাম্রশাসন সংগ্রহ করেন। শ্রী সেন সেটি পরে পরিষদ প্রত্নতত্ত্বশালায় প্রদান করেন। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এ দুটি রাজা শশাঙ্কের সামন্ত রাজাগণ কর্তৃক প্রদত্ত জমি বা ভূমি দানের রাজকীয় দানপত্র। এতে রাজা শশাঙ্কের দু'টি মোহর (Seal) দৃষ্ট হয় (Journal of the Asiatic Society of Bengal 1943-44)

মেদিনীপুর সহরের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের গ্রন্থাগারটি। নারাজোলের রাজা তাঁর গ্রন্থাগারের মূল অংশটা বর্তমানে এখানে দান করেছেন। স্কুল গ্রন্থাগার ছাড়াও মিশনের একটা সাধারণ গ্রন্থাগার আছে, 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রায় সব কয়টা খণ্ড এখানে পাওয়া যাবে।

রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের গ্রন্থাগারে নারাজোলের রাজার দান করা ৬৩৩টি পুস্তক ও বেশ কিছু পুঁথি সংরক্ষিত। এখানকার গ্রন্থাগারিক স্নাতক ও বৃত্তিকুশলী। তবে এখন পর্যন্ত নারাজোল গ্রন্থ সংগ্রহের সম্পূর্ণ তালিকা তাঁর পক্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই।

এই নারাজোল গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতা, বরাহ সংহিতা, বেদ ও উপনিষদ, ভেষজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীন সংস্করণ, পুরাণ, প্রতাপচন্দ্র রায়ের মহাভারত, গীতা, মন্মথনাথ দত্তের ইংরেজী রামায়ণ, James W. Furrell এর Tagore Family, সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বহু প্রাচীন পুস্তক, ভাস্করাচার্যের বীজগণিত, কালিদাস, ভবভূতি, হলায়ুধ প্রভৃতির লেখা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ, কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্য চরিতামৃত', বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ', প্রাচীন বৈয়াকরণদের ব্যাকরণ, যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের আর্যদর্শন এবং ভারতকোষ। এ ছাড়া এখানে বাংলা সাহিত্যের বহু প্রাচীন গ্রন্থ আছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি এখানে আছে—

৯ম কল্প,	দ্বিতীয় ভাগ,	১৭৯৮ শক।
	তৃতীয় ভাগ,	১৭৯৯ শক।
	চতুর্থ ভাগ,	১৮০০ শক।
১০ম কল্প,	১ম ভাগ,	১৮০১ শক।
	২য় ভাগ,	১৮০২ শক।
	৩য় ভাগ,	১৮০৩ শক।
	৪র্থ ভাগ,	১৮০৪ শক।
১১শ কল্প,	১ম থেকে ৪র্থ ভাগ,	১৮০৫—১৮০৮ শক।
১২শ কল্প,	৪র্থ ভাগ,	১৮১২ শক।
১৩শ কল্প,	১ম ভাগ,	১৮১৩ শক।

এ ছাড়া ১৮৮১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনে'এর কয়েকটি খণ্ড এখানে আছে।

নারাজোল গ্রন্থসংগ্রহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুঁথি আছে এই গ্রন্থাগারে। এগুলির মধ্যে যে কয়টির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তার তালিকা নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

	পুঁথির নাম	লেখক	তারিখ
(১)	শ্রীকৃষ্ণ চরিতং	শ্রীরামচাঁদ দেবশর্মা	১৭৬৫ শকাব্দ।
(২)	বরাহ পুরাণ	শ্রীশত্রুঘ্ন দেবশর্মা	১৭৩৪ ,,
(৩)	ভাগবৎ গীতা	,,	১৭৬৩ ,,
(৪)	রামায়ণ	,,	১৭৩০ ,,
(৫)	বৃহৎ নারদীয় পুরাণ	,,	১৭২৭ ,,
(৬)	রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড)	,,	১৭৩০ ,,
(৭)	বিষ্ণুপুরাণ	শ্রীরামচাঁদ দেবশর্মা	১৭৬৮ ,,
(৮)	পুরাণ	শ্রীরামজীবন দেবশর্মা	?

(৯)	ভাগবৎ গীতা কৃষ্ণার্জুন সংবাদ	শ্রীশম্ভুরাম দেবশর্মা	১৭৫৭ শকাব্দ।
(১০)	রামায়ণ	শ্রীদয়ারাম দেবশর্মা	১৭৩৮ ,,
(১১)	শ্রীকল্কি পুরাণ	শ্রীসন্ন্যাসী দেবশর্মা	১৭৪৯ ,,
(১২)	পদ্মপুরাণ		—
(১৩)	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ		১৭৪৮ শকাব্দ।
(১৪)	কৃষ্ণ চরিত্রম্	শ্রীরামমোহন দেবশর্মা	১৭১৫ শকাব্দ।

এই স্কুল গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা গ্রন্থ আছে যা গবেষকগণের প্রয়োজন হ'তে পারে। অন্যান্য অনেক গ্রন্থাগারের মতই এই গ্রন্থাগারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাঠকের কাছ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এখনও এখানে যে সকল গ্রন্থ আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব যদি মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার এগুলি সংগ্রহ করে কোনও একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা করেন। একটি গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তার কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

মেদিনীপুর সহরের আর একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান মেদিনীপুর কলেজ। ১৮৭৩ সালে এই কলেজটির প্রতিষ্ঠা। প্রথম অবস্থায় এখানে আইন পড়ানো হ'ত। এখানকার গ্রন্থাগারে তাই কিছু আইনের পুস্তক চোখে পড়ে। এ'ছাড়া কলেজ গ্রন্থাগারে বহু পুরাতন Education Records, General Report on Public Instruction in the Lower Provinces, General Report on Pnblic Instruction in Bengal, London Encyclopaedia, Archaeological Survey of India Report, ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

মেদিনীপুর কলেজ থেকে অল্প কিছু দূরে মেদিনীপুর Collectorate অফিস। তমলুক, হিজলী, পটাসপুর, বালাসোর, ফুলবন্দ ইত্যাদি স্থানের লবণ তৈয়ারী ও রাজস্ব সম্পর্কীয় বহু পুরাতন দলিল দস্তাবেজ এই দপ্তরে আছে। লাখেরাজ বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় দলিলের সন্ধানও গবেষকগণ এখানে পাবেন। Regional Records Survey Committee মেদিনীপুরের এই সমস্ত দলিল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ১৯৪৯-৫০ সালে। মেদিনীপুরের লবণ সম্বন্ধীয় দলিলপত্রের কিয়দাংশ (১৭৮১-১৮০৭) ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

মেদিনীপুর সহরের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বহু প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থ এবং পুঁথিপত্র বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। গবেষণার উপাদান হিসাবে এগুলি প্রয়োজনে লাগতে পারে বলে আশা করা যায়। কিন্তু অযত্ন এবং অব্যবহারে অনেকগুলি গ্রন্থ আজ জীর্ণ দশাগ্রস্ত। বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ গ্রন্থাগারগুলি থেকে অপসারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত কার্যোদ্ধারের জন্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থ কখনও কখনও অল্পমেয়াদী ঋণ হিসাবে নিয়ে আর ফেরৎ দেন না। পরে তাঁরা এ'গুলিকে নিয়ে কী করেন, জানার উপায় নেই।

দেশের মূল্যবান গ্রন্থসামগ্রী যাতে এই ভাবে নষ্ট না হয় সরকারের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এদেশের কয়েকটি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিদেশের গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে, এ ধরণের কথা প্রায়ই শুনতে পাই। বিদেশী গবেষকগণ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে এসে প্রাচীন গ্রন্থ ব্যবসায়ীগণের মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি ক্রয় করেন বলেও শোনা যায়। জেলা গ্রন্থাগার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই সংরক্ষণের দায়িত্ব না নিলে অনেক মূল্যবান গ্রন্থের অপসারণ অথবা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ বিনোদকুমার দাসের সহযোগিতা ছাড়া প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখা সম্ভব হ'ত না। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বসু নানাভাবে এই সঙ্কলনের কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি দেখার সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। এঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

Rare and valuable Collections of Midnapore
by Kunal Sinha

রবীন্দ্র পাঠাগার ঃ হাতিবেড়্যা মধ্যপল্লী (মেদিনীপুর)

আলোক কুমার মাইতি

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত আজ অহোরাত্র কর্মমুখর। বিশ্বকর্মার দলের কর্মকলরবে আজ হলদীয়ার আকাশ বাতাস অনুরণিত। এই কর্মযজ্ঞের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—এই কর্মচঞ্চল জনপদের অতীত ইতিহাস কি? অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্বে এতদঞ্চলের সামাজিক রূপই বা কি ছিল?

তাই সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—মাত্র দশ বৎসর পূর্বেকার হলদীয়া জনপদের একটি বৃহত্তম অংশ হাতিবেড়্যা গ্রামের অবস্থার দিকে। এই গ্রামটি হলদীয়া তথা সুতাহাটা থানার বৃহত্তম গ্রাম হিসাবে কোন সুদূর অতীত থেকে গর্ববোধ করে আসছে তা দরিয়া (দোরো) পরগণার আদিমতম বাসিন্দা হয়ত বলতে পারতেন। কিন্তু বৃহত্তম গ্রাম হলেও একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ছিল না ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। লোকসংখ্যার তুলনায় বিপুল পরিমাণ ধানীজমি নিয়ে এই গ্রামবাসীদের সুখে দুঃখে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি। পরচর্চা, ছোট খাট মামলা-মোকদ্দমা বা ঝগড়াঝাটির লেশ মাত্র যে এ গ্রামে ছিল না তাও জোর করে বলা যায় না।

এই পরিবেশে ১৯৫৮ সালের গোড়া থেকে এই গ্রামের গুটিকয়েক ছেলে, যারা তখন অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্র, স্বপ্ন দেখতে লাগলো কি করে একটি পাঠাগার গড়ে তুলে গ্রামের সবাইয়ের জন্য একটি সাধারণ মিলনকেন্দ্র তৈরী করা যায়। তাই পড়াশুনার ফাঁকে ছেলেগুলোকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কিসের আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তারই কথা উঠলো পাশের গাঁয়ে অবস্থিত তাদের শিক্ষালয় দেভোগ শ্যামাচরণ মিলন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক ঋষিতুল্য শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ মল্লিক মহাশয়ের কানে। তিনি ঐসব নিন্দুকের কথামত একদিন তাদের ডেকে ধমকিয়ে দিলেন। অবশ্য ঐ স্বপ্নবিভোর ছেলেরা তাদের আলোচ্য বিষয়ের কথা তখন তাঁর কাছে প্রকাশ করে নি। কারণ তাদের ধারণা "মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ" তারপর তারা ভিতরে ভিতরে পাঠাগার স্থাপনের কাজ একটু এগিয়ে নিয়ে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার কুইতি (যিনি সব সময়ে সকলের বন্ধু হিসাবে যে কোন সৎকাজে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেন না) মহাশয়কে ধরলো পাঠাগারের জন্য জায়গায় ব্যবস্থা করে দিতে। তিনিও তাঁর সাধ্যমত বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে সাময়িকভাবে পাঠাগারের জায়গার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপরই গঠিত হ'ল পাঠাগার পরিচালন কমিটি যার সভাপতি হলেন শ্রীসুশীল কুমার কুইতি আর সম্পাদক হলো ছাত্র শ্রীদুর্গাপদ শাসমল। ঐ গুটিকয়েক ছাত্র এবং স্থানীয় উৎসাহী যুবকদের বুক ফুলে উঠলো যখন কবিগুরুর শততম জন্মদিনে তাদের শ্রদ্ধেয় ঋষিতুল্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ মল্লিক মহাশয় "রবীন্দ্র পাঠাগার" এর উদ্বোধন

অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করলেন—"স্থানীয় যুবকদের এই বিষয়ে উত্তম ও উৎসাহ প্রশংসাজনক"। তারপর পাঠাগারের সভাপতি মহাশয়ের উৎসাহ ও পরামর্শে চললো পাঠাগারের নিজস্ব গৃহের জন্য জমি সংগ্রহের প্রচেষ্টা। ঐ আন্তরিক প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে হাওড়া জেলার যদুবেড়্যা গ্রামনিবাসী সদাশয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গ্রামে চার শতাংশ জমি দান করে অত্র গ্রামের মিলন কেন্দ্র গড়ে তোলবার পথে এক ধাপ এগিয়ে দিলেন, এরপর চললো গ্রামবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টা পাঠাগার ভবন নির্মাণের জন্য। এগিয়ে এলেন নিরক্ষর শ্রমিক ৺ঘনশ্যাম জানা মহাশয় তাঁর অমূল্য উপদেশ ও শ্রমের সাহায্য নিয়ে। পিছিয়ে রইলেন না গ্রামের নিরক্ষর থেকে শিক্ষিত, দরিদ্রতম থেকে স্বচ্ছল গৃহস্থ কেউই। তাঁদের তখন সমস্ত দলাদলি, ঝগড়াঝাটি, পরচর্চা সবই কোথায় চলে গেল। শুধু একমাত্র আলোচ্য বিষয় পাঠাগার ভবন নির্মাণ। বিধাতার আশীর্বাদে পাঠাগার ভবন গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের সাহায্য ও সদিচ্ছা নিয়ে গড়ে উঠল। এরপর এল পাঠাগারের পুস্তক ও আসবাবপত্র বাড়াবার উত্তম। পাঠাগারের সদস্যবৃন্দ গর্ববোধ করতে পারে যে, যে ব্যক্তি এতদঞ্চলে কৃপণ হিসাবে খ্যাত তাঁর কাছ থেকেও তারা মূল্যবান আসবাবপত্র স্বেচ্ছায় দান হিসাবে আদায় সক্ষম হয়েছে।

পাঠাগার স্থাপনের স্বপ্নবিভোর তখনকার ছাত্র আর আজকে শিক্ষাদান কার্যে রত বর্তমান পাঠাগার সম্পাদক শ্রীতারাপদ ভৌমিকের নিরলস প্রচেষ্টায় ও সুযোগ্য পরিচালনায় আজ রবীন্দ্র পাঠাগার এতদঞ্চলের পাঠাগারগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় হিসাবে গর্ববোধ করতে পারে। পাঠাগারের বহুবিধ কার্যের মধ্যে রয়েছে একটি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা, বিশেষ বিশেষ দিবস সাড়ম্বরে প্রতিপালন, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, খেলাধূলা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীর প্রচার, উচ্চ ফলনশীল ধানচাষে উৎসাহ দান ও আলোচনা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। বর্তমানে পাঠাগারের পাঠকপাঠিকার সংখ্যা ১০১, পুস্তক সংখ্যা ১০৪০। কি দারুণ শীতে বা বর্ষার তাণ্ডবলীলায় দিনে অন্ততঃ ২০।২৫ জন লোককে রাত্রি দশটা পর্যন্ত পাঠাগার ভবনে পড়াশুনায় রত অথবা অন্তর্বিভাগীয় ক্রীড়ায় রত দেখা যাবে। যদিও অধিকাংশ ঘরে আজ রেডিও রয়েছে, তবুও পাঠাগারের রেডিওর পাশে বসে অন্ততঃ খবরটি সবায়ের শোনা চাই। পাঠাগারটি আজকে আশপাশের ৯।১০টি গ্রামের পাঠকদের চাহিদা মেটাচ্ছে। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা আধিকারিক ও সমাজশিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক তাঁদের অমূল্য উপদেশ ও সম্ভাব্য সরকারী সাহায্য নিয়ে সর্বদা পাঠাগারের পাশেই রয়েছেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যাঁদের আশীর্বাদ ও পরামর্শ পাঠাগারটিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাঁরা হলেন—দেভোগ শ্যামাচরণ মিলন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিশ্র, কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কুমার দেবগোস্বামী, বি·এ, বি·টি, ৺ভুমুরেশ আদক ও সর্বশ্রী শরৎচন্দ্র দাস, অজিতকুমার বেরা, অরবিন্দ মাইতি, বামাপদ শাসমল, সুকেশচন্দ্র সামন্ত এবং হাতিবেড়্যা অরুণচন্দ্র জুনিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। আর পাঠাগারটিকে বুকের পাঁজরের মত সর্বদা আগলিয়ে রেখেছে পাঠাগারের আজন্ম সদস্য শ্রীছকুলাল দাস। পরিশেষে বাগদেবী ও কবিগুরুর নিকট পাঠাগারটির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রার্থনা করে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করি।

Rural Libraries in West Bengal March Ahead ;
Rabindra Pathagar : Hatiberya by Aloke Kumar Maity

পরিষদ কথা

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার

(ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক প্রতিনিধি দল গত ১৮ই মার্চ '৬৯, বাংলা কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুশীলচন্দ্র ধাড়ার সংগে তাঁর আমন্ত্রণে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য শ্রী ধাড়ার নিকট বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বক্তব্য শ্রবণের পর তিনি তাঁর দলের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করবার প্রচেষ্টা চলিয়ে যাবেন বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন। যুক্ত-ফ্রন্টের সভায় এবং মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে তাঁর দলের পক্ষ থেকে সমর্থন জানাবেন বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

(খ) নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীসন্তোষ মিত্র এম. এল. সি, পরিষদের প্রতিনিধি দলের সংগে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বিধান পরিষদে এ বিষয়ে তিনি আলোচনার সূত্রপাত করবেন।

ইউ. জি. সি বেতনক্রম সম্পর্কে সর্বশেষ অবস্থা

পরিষদের এক প্রতিনিধি দল গত ১১ই ডিসেম্বর '৬৮, শিক্ষা সচিবের সংগে এবিষয়ে সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে ১৬ই, মার্চ '৬৯ মহাকরণে শিক্ষাদপ্তরে বিভিন্ন খোঁজখবর নেন। শিক্ষা বিভাগের উপসচিব জানান যে, এপ্রিল '৬৯-এর মধ্যেই সরকারের সার্কুলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কলেজে প্রেরণ করা শুরু হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের কাছে এক পত্র প্রেরণ করা হয়। এই পত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অবহিত করবার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হয়েছে। গত ১৬ই মার্চ '৬৯ শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত সচিবের কাছে ঐ পত্রটি অর্পণ করা হয়।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীর বিড়ম্বনা

পশ্চিমবঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মিগণ যে সকল অব্যবস্থা, অনিয়ম এবং স্বেচ্ছাচারিতা তথা হৃদয়হীনতার মধ্য দিয়ে চলে আসছেন তা বোধ হয় তুলনারহিত। সম্প্রতি কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নন্দী সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সম্পাদক ও ডি, এস, ই, ও এর আদেশক্রমে আজ দুই বৎসর

তিনমাস যাবত সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় (suspended) থেকে, এইরূপ এক চরম অব্যবস্থার বলি হয়েছেন। মাত্র মাসিক ৬০ টাকা বেতনের পরিবর্তে যিনি সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কোন অজুহাতে তাঁকে দুই বৎসরের অধিককাল সময় পর্যন্ত কাজে যোগদান করতে না দেওয়ায় তাঁর সাংসারিক ও মানসিক দুরবস্থা আজ চরমে পৌঁছেছে। সংশ্লিষ্ট ডি, এস, ই, ও, কে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি এই অস্বস্তিকর অবস্থার আশু সমাধানের জন্য বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আজ পর্যন্তও এই অবস্থার কোন সুরাহা হয়নি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ইতিমধ্যেই শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নন্দী সংক্রান্ত ও অনুরূপ ঘটনাবলীর আশু প্রতিকারের দাবী জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছেন। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির এইরূপ খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সমগ্র গ্রন্থাগারকর্মী তথা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একযোগে এর প্রতিকার দাবী করে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা আশা করি।

গ্রন্থাগার কর্মীদের মহাকরণে গণ ডেপুটেশন :
৭ই এপ্রিল ১৯৬৯

ফটো : শ্রীমঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য্য (মালদহ)
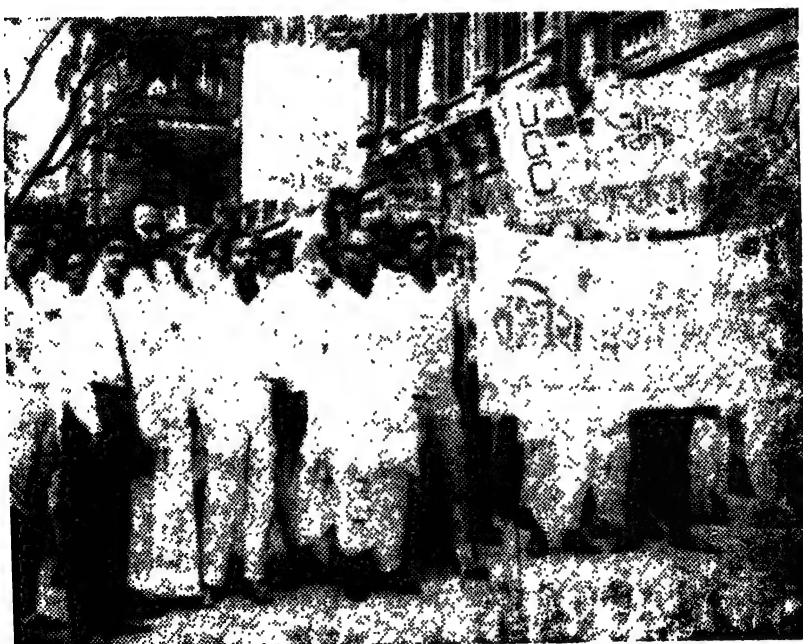
ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মেলনোত্তর সময়ে গৃহীত কার্যকরী ব্যবস্থা :

গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে

সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই গত ৭ই এপ্রিল '৬৯ গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকট মহাকরণে এক গণডেপুটেশন নিয়ে যাওয়া হয়। যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় সে সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে গ্রন্থাগার কর্মীরা স্থান ত্যাগ করেন। গত ২রা মে '৬৯ শিক্ষামন্ত্রীর সংগে আর একটি সাক্ষাৎকারে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী দাওয়ার বিষয় বিস্তৃতভাবে তাঁর সংগে আলোচনা করা হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বৃত্তিধারী সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকসহ একটি পূর্ণাংগ গ্রন্থাগারের দাবী জানিয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষামন্ত্রী, মধ্যশিক্ষা পর্ষতের সভাপতি, পঃ বঃ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার মুখ্য পরিদর্শকের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাছেও স্মারকলিপির অনুলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু অর্থনৈতিক দাবীসমূহ

গত ৭ই এপ্রিল ও ২রা মে '৬৯ পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবের নিকট যে ডেপুটেশন প্রেরণ করা হয় তার ফলাফলের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ইউ. জি. সি. বেতনক্রম সম্পর্কে সরকারী আদেশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিষদের পক্ষ থেকেও সরকারী আদেশের এক অনুলিপি সহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সর্বস্তরের বৃত্তিধারী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ইউ. জি. সি. বেতনক্রমের সুযোগ দেবার দাবী জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের অনুলিপি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির নিকটও প্রেরণ করা হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে সরকারী আদেশ প্রেরণে বিলম্বের জন্য ক্ষোভ জানিয়ে, যথোচিত কর্তব্য ত্বরান্বিত করবার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানানো হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের এ সম্পর্কে জানবার জন্য পরিষদের দপ্তরে যোগাযোগ করবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

(২) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সম্পর্কে সরকারের নীতি লিখিতভাবে জানানোর আশ্বাস দেন পঃ বঙ্গের শিক্ষাসচিব।

(৩) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য শিক্ষাসচিবের নিকট গত ১৪ই মে '৬৯ যে আলোচনা হবার কথা ছিল, সেটা অপ্রত্যাশিত কারণে স্থগিত থাকে। সরকারের সংগে এ বিষয়ে জরুরী যোগাযোগ করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হবার সাপেক্ষে, জেলা গ্রন্থাগারগুলোর পরিচালনাবিধি পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং সরকারের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

(৪) গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যান্য অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সংগে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

এম. লিব. ও বি. লিব. এস-সি সম্পর্কিত বিষয়

ইউ. জি. সির সভাপতি, কর্মসচিব ও গ্রন্থাগার কমিটির সভাপতির কাছে এক পত্রে অবিলম্বে এম. লিব. এস. সি কোর্স কলকাতার যে কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করবার দাবী জানানো হয়েছে। পত্রোত্তরে যথোচিত চেষ্টা করা হচ্ছে বলে ইউ. জি. সি পরিষদকে জানিয়েছেন। বি. লিব. এস. সি কোর্স চালু করবার জন্য ধন্যবাদ ও ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের এর সুযোগ দেবার দাবী জানিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্মারকলিপিতে দাবী জানানো হয়েছে।

পরিষদের পক্ষ থেকে ডিগ্রি ব্যবহারের সুযোগ দেবার দাবী জানিয়ে একটি স্বতন্ত্র স্মারকলিপি গ্রন্থাগার বিদ্যায় ডিপ্লোমা বৃত্তিপ্রাপ্ত কর্মীদের গণস্বাক্ষর সহ উপাচার্যের নিকট পেশ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীজিতেন নন্দীর সাসপেন্সন সম্পর্কিত বিষয়

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত উৎসাহী কুচবিহার গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীজিতেন নন্দীকে অন্যায়ভাবে সাসপেণ্ড করা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও অবিলম্বে সাসপেণ্ড আদেশ প্রত্যাহারের দাবী করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীজিতেন নন্দীকে যৎসামান্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার কর্মী, দরদী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে যুক্ত সর্বসাধারণের কাছে শ্রীজিতেন নন্দীকে উন্মুক্ত হস্তে সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। পরিষদের কর্মসচিবের নিকট এই সাহায্য প্রেরণ করা চলবে।

প্রতিবেদক : তুষারকান্তি সান্যাল

Association Notes

গ্রন্থাগার সংবাদ

বর্ধমান

ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার। ধাত্রীগ্রাম।

গত ২৩শে জানুয়ারী, '৬৯ ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগারে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস পালন করা হয়। ঐ দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন, নেতাজীর প্রতিচ্ছবিতে মাল্যদান করা হয়। ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী। মানকর।

মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর দ্বাবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন গত ৩০শে মার্চ, '৬৯ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমনোরঞ্জন বক্সীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বর্ধমান জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি শ্রীশরদিন্দুশেখর গুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী মাননীয় শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সজাগ ও দায়িত্বশীল হতে উপদেশ দেন। গ্রন্থাগারে পল্লীবেতার কেন্দ্র চালু থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সর্বশ্রী ফকিরচন্দ্র রায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোককুমার ঘোষ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলেচনা করেন। গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রীসাতকড়ি সরকাব মহাশয় অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান এবং বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল। বর্তমানে গ্রন্থাগারের মোট বই-এর সংখ্যা ৪৫২৩ এবং সদস্য সংখ্যা ২৬৯ জন। গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ বিভাগটি সুদূর গ্রামাঞ্চলে বই সরবরাহ করে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে আসছে।

বাঁকুড়া

বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার। ময়নাপুর।

গত ২রা মার্চ, '৬৯ বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগারের নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীশ্রদ্ধানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীভোলানাথ ঘোষাল মহাশয়। বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীমানিককুমার বিশ্বাস। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র পাল গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে জনসাধারণের সহযোগিতা সম্বন্ধে বলেন।

মেদিনীপুর

রবীন্দ্র পাঠাগার। মহিষাদল।

রবীন্দ্র পাঠাগার আয়োজিত শিশুমেলা (২৯শে ও ৩০শে মার্চ) স্থানীয় জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করে। পাঁচ শতাধিক শিশু প্রতিদিন এই মেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে শিশুমনের অকৃত্রিম পরিচয় এই মেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। মেলায় পঃ বঃ সরকারের উদ্যোগে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দপ্তরের একটি প্রদর্শনী ছিল। প্রচার বিভাগ কিশোর উপযোগী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

সংবাদ গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : কৃষ্ণা দত্ত

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থ : গ্রন্থাগার :: গ্রন্থাগারিক : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

বেলজিয়ামে আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী

গত ২১ শে মার্চ ১৯৬৯ বেলিজিয়াম পুস্তক প্রকাশন সমিতি ব্রুসেলস শহরে একটি আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। ২২শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এখানে দেশবিদেশের প্রকাশকদেরই শুধু নয় গ্রন্থ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কাগজ ব্যবসায়ী, গ্রন্থাগারিক, ফটোগ্রাফারস্ ইত্যাদি সমস্ত শ্রেণীর ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমিতিকে আহ্বান করা হয়েছিল। ২৬শে মার্চ বিশেষ সম্বর্ধনা সভায় পুস্তকবিক্রেতা; গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য যাঁরা গ্রন্থের প্রকাশন ও মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের আমন্ত্রণ জানান হয়। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রদর্শনীতে যোগদানের নিয়ম বহু পূর্বে জানিয়ে দেওয়া হয়। বিক্রীত পুস্তকের সঙ্গে বা বিনামূল্যে প্রদত্ত পুস্তক-পুস্তিকার সঙ্গে মূল্যবান গ্রন্থ যাতে চুরি না যায় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কোলন বর্গীকরণ সম্পর্কে আলোচনা-চক্র

কোলন বর্গীকরণের ৭ম সংস্করণ ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হতে চলেছে। এই নতুন সংস্করণের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে ডি. আর. টি. সি. তে (বাঙ্গালোর) একটি সদ্য সমাপ্ত আলোচনা-চক্রে প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন। প্রতিনিধিরা সকলেই এই ধরণের আলোচনা-চক্রের উপযোগীতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানভাণ্ডার ও জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকাশের জটিলতার সাথে বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলির সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। তাছাড়া বহু গ্রন্থাগারে এখনও কোলন বর্গীকরণের পুরানো সংস্করণ ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন। সুতরাং বছরে অন্তত: একবার এক সপ্তাহের জন্য জন দশেক প্রতিনিধি [বর্গীকরণের শিক্ষক ও বর্গীকারক] নিয়ে ডি. আর. টি. সি. তে সুবিধাজনক সময়ে আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তথ্যমূলক ভাষণ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক ও ডি. আর. টি সি.র অবৈতনিক অধ্যাপক ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন গত ২০-২৬ এপ্রিল "গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার সেবা" এই সম্পর্কে ছয়টি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। বাঙ্গালোরের প্রায় ৪০ জন গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক ও ছাত্র ঐ সভায় যোগদান করেন। গ্রন্থাগার সেবার সমস্ত দিকগুলি, এমন কি ডকুমেন্টেশন পর্যন্ত এই বক্তৃতামালায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

Notes & News

Granthagar

(*The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal*)

IN THIS ISSUE

Cover designed by—
Khaled Choudhury

VOLUME 19 : BAISAKH 1376 : NUMBER 1

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press 21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Nirmalendu Mukhopadhyay

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6·00

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২ } { ১৩৭৬, জ্যৈষ্ঠ

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থবিদ্বেষ

সংবাদে প্রকাশ যে শহর কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে দুটি বিবদমান রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষকালে এক পক্ষ অপর পক্ষের একটি গ্রন্থাগার তছনছ করে দিয়েছে। এধরণের ঘটনা নতুন কিছু নয়। সাতষট্টি সালের সাধারণ নির্বাচনের পর উত্তর কলকাতায় কোনো এক রাজনৈতিক দলের পরিচালনাধীনে একটি পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগারের সামগ্রী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বছর কয়েক আগে মাদ্রাজে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছেচল্লিশের দাঙ্গাতেও কলকাতার বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগারের মৃত্যু ঘটে।

সাধারণত আদর্শগত বিদ্বেষসূত্রে গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব ঘটে থাকে। যেমন দেখা গিয়েছিল বিংশ শতকের ত্রিশের কোঠায় স্পেন, জার্মানী, ইতালি ও পরবর্তীকালে অন্য আরও অনেক দেশে। কিন্তু প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার নষ্ট করার পেছনে পারস্পরিক আদর্শগত বিদ্বেষ কিছু ছিল না ; বিবদমান দল দুটির আদর্শবাদ মূলত এক ও অভিন্ন। রাধাকৃষ্ণণের গ্রন্থাগার নষ্ট করেছিল যারা তারা জাতে হিন্দুই ছিল।

উপরের ঘটনাটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বর্তমান সমাজমনের এক ভয়াবহ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ; রাজনীতি তার একটা উপলক্ষ মাত্র। বস্তুত গ্রন্থের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞান মনোভাব ছাড়াও শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি শিক্ষাহীন মানুষের অবচেতন মনের জাতক্রোধ ও বিদ্বেষ ফুটে ওঠে এই ধরণের ঘটনায়। শিক্ষানুরাগীদের আদরের (কিংবা বিলাসের) বস্তু গ্রন্থের ওপর দিয়ে পরোক্ষে আক্রোশ মিটিয়ে নেওয়া হয়। শিল্প ও সৌন্দর্যের বহু উপকরণ এই একই কারণে বিনষ্ট হতে দেখা যায়। ঐসব বিষয় সামগ্রী যদি বইপত্র না হয়ে অন্য কোনো সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস হত তাহলে সেগুলি নষ্ট না করে হয়তো লুণ্ঠন করা হত। ইতিহাসে দেখা যায় সাম্রাজ্যবিস্তারী শক্তি পদানত কোনো দেশকে ধ্বংস করার সময়ে সেখানকার গ্রন্থরাজি সযত্নে নিয়ে গেছে।

লুণ্ঠনকর্ম সমর্থনীয় নিশ্চয় নয়, কিন্তু রোষানলে নিক্ষেপের পরিবর্তে গ্রন্থের লুণ্ঠন হয়তো মন্দের ভালো ; কারণ গ্রন্থাগারে এমন অনেক বস্তুই থাকে যার ক্ষতি পূরণ করা যায় না।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ক্ষতি সাধনের মনোবৃত্তি কোনোক্রমেই সুস্থ লক্ষণ নয়। এমনকি আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের মতামত জানার জন্যেও তাদের গ্রন্থাদি পঠনপাঠনের প্রতি আগ্রহ লক্ষিত হয়। সেটাই গণতান্ত্রিক সহিষ্ণু মনের দাবি। তাছাড়া সংস্কৃতির বাহন গ্রন্থের মূল্য ভৌগোলিক সীমানা কিংবা কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যের বই নির্বিচারে সারা বিশ্বে ভাষান্তরিত হচ্ছে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই। কিন্তু গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসবে যারা আমোদিত হয় তারা যে কোনো পক্ষপুটের আশ্রয় নিক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা সভ্যতারই পরিপন্থী। শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত মানুষই স্বভাবত এইধরণের কাজে প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষার সম্প্রসারণের সাহায্যে গ্রন্থবিদ্বেষী মানুষকেও ক্রমে গ্রন্থানুরাগী করে তোলাই এর একমাত্র স্থায়ী সমাধান। প্রাচ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কলকাতায় গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব মহানগরীর অসুস্থ সমাজমনের পরিচয় দেয়। মানুষের মনে গ্রন্থপ্রীতি সঞ্চার ও বর্ধনের দায়িত্ব শিক্ষাব্রতী ব্যক্তি মাত্রেরই উপর বর্তায়। তার মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও যে এক বিশেষ ভূমিকা আছে সেটা আমাদের এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন।

সূচীকরণ প্রবেশিকা (৬)

তপন সেনগুপ্ত

সূচীর গঠন (Construction of a Catalogue)

শিরোনাম নির্বাচন (Choice of heading)

মূল নীতি : ১ গ্রন্থকার কিম্বা মুখ্য গ্রন্থকার নির্বাচন সম্ভব হলে গ্রন্থকারের নামেই সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে।

কোন গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়বস্তু রচনার জন্য দায়ী ব্যক্তি, বা ব্যক্তি সমষ্টি বা সংস্থাকে গ্রন্থকার বলা হয়। কোন গ্রন্থের রচয়িতাকে যেমন গ্রন্থকার বলা হয় তেমনি শিল্পী বা চিত্রকর তাদের সৃষ্ট শিল্পকর্মের জন্য দায়ী। সুতরাং কোন চিত্র সংকলন বা সংগীতের স্বরলিপির জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পীকে গ্রন্থকাররূপে গণ্য করা হবে। আবার কোনও গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে যদি বিষয়বস্তুর জন্য মুখ্য দায়ীত্বে সম্পাদক বা সংকলকের হয় তাহলে এসব ক্ষেত্রে "গ্রন্থকার" শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে ঐ জাতীয় গ্রন্থের জন্য সম্পাদক বা সংকলককেই গ্রন্থকাররূপে গণ্য করা হবে।

২ যে সকল গ্রন্থের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার বা মুখ্য গ্রন্থকার পাওয়া যায় না এবং গ্রন্থের অস্তিত্বের জন্য সম্পাদকই মুখ্যতঃ দায়ী সেক্ষেত্রে সম্পাদকের নামেই মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে।

৩ বহু লেখকের রচনা থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশিত সংকলনের ক্ষেত্রে আখ্যাপত্রে উল্লিখিত সংকলকের নামে সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে।

৪ যদি কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার নির্বাচন সম্ভব না হয়, কিম্বা গ্রন্থকার অজানা থাকে তাহলে আখ্যা অনুযায়ী সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে।

[কিছু কিছু প্রকাশনের ক্ষেত্রে অবশ্য এই মূলনীতিগুলির ব্যতিক্রম দেখা যাবে। স্থান বিশেষে সেগুলি আলোচিত হবে।]

নিম্নে ব্যক্তি গ্রন্থকার রচিত প্রকাশনগুলির কয়েকটি সম্পর্কে AACR এ বর্ণিত নীতিগুলির ভাবার্থ দেওয়া হল :

একক গ্রন্থকারের রচনা (Works of single authorship : Rule-1) কোনও একক গ্রন্থকারের রচনা (ব্যক্তি বা সংস্থা), বা নির্বাচিত সংগ্রহ, বা সমগ্র রচনা ঐ গ্রন্থকারের নামেই সূচীভুক্ত করা হবে—অর্থাৎ মুখ্য সংলেখ গ্রন্থকারের নামে হবে—গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থে উল্লিখিত থাক আর না-ই থাক। [গ্রন্থকারের নামের কোন রূপ সংলেখের জন্য ব্যবহার করা হবে তা সংহিতার নির্দেশ অনুযায়ী স্থির করে নিতে হবে। প্রতিটি গ্রন্থে নামের ঐ বিশেষ রূপ পাওয়া না-ও যেতে পারে।] উদাহরণ :

১ KARL MARX/THE POVERTY/OF/PHILOSOPHY/ANSWER TO THE "PHILOSOPHY OF POVERTY"/BY M. PROUDHON

মুখ্য সংলেখ—Marx, Karl

২ THE COMPLETE POETRY/AND SELECTED PROSE/OF/ JOHN KEATS

মুখ্য সংলেখ—Keats, John

৩ MANUAL/OF/PHOTOGRAPHIC/INTERPRETATION/AMERICAN SOCIETY OF/PHOTOGRAMMETRY

মুখ্য সংলেখ—American Society of Photogrammetry.

৪ THE WORKS OF GRAHAM SUTHERLAND/TEXT BY DOUGLAS COOPER—গ্রন্থখানি Graham Sutherland এর আঁকা ছবির সংকলন।

মুখ্য সংলেখ—Sutherland, Graham

যৌথ দায়ীত্বে রচিত গ্রন্থ (Works of shared authorship : Rule-3) কোন গ্রন্থ রচনার জন্য একাধিক ব্যক্তি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। সুতরাং একাধিক ব্যক্তির দ্বারা রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারগণের সকলেরই কম বেশী দায়িত্ব থাকে। কোন্ গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনায় কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বা গ্রন্থ রচনায় তাঁর অবদান কতটুকু এই বিষয়গুলি প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে। কোন গ্রন্থ রচনায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এমনভাবে জড়িত থাকতে পারেন যেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত অবদান পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব না-ও হতে পারে। আবার সংগত গ্রন্থে একাধিক গ্রন্থকারের প্রত্যেকে হয়ত পৃথকভাবে গ্রন্থের একটি অংশবিশেষ রচনা করে থাকতে পারেন। তেমনি বক্তৃতামালা বা আলোচনাচক্রে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকলেও তাঁদের প্রত্যেকের অবদান পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে। বিতর্ক কিম্বা চিঠিপত্রের আদান প্রদান সংক্রান্ত গ্রন্থেও গ্রন্থকারদের ব্যক্তিগত ভূমিকা বা অবদান সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

মুখ্য গ্রন্থকার নির্দেশিত (Principal author indicated : Rule 3A) যৌথ প্রয়াসে রচিত গ্রন্থের জন্য যে ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতি মুখ্য দায়ীত্ব আরোপিত হয়েছে সেই নামে মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। মুখ্য গ্রন্থকার নির্বাচনের জন্য আখ্যাপত্রের ভাষা বা হরফের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কোন গ্রন্থকারের নামের সংগে "in collaboration with", "with the collaboration of", বা "and associates" ইত্যাদি ধরণের phrase যুক্ত করে যখন অন্যান্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয় তখন স্বভাবতই "collaborators"দের থেকে মুখ্য গ্রন্থকারকে পৃথক করে নেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। আবারকখনও হয়ত আখ্যাপত্রে একাধিক গ্রন্থকারের নামের মধ্যে কোন একটি নামের জন্য অন্য নামগুলির

চাইতে মোটা হরফ ব্যবহার করতে দেখা যায়। স্বভাবতই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ গ্রন্থকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হরফের রকমফের অনুযায়ী মুখ্য গ্রন্থকার নির্বাচন করতে হবে।

মুখ্য গ্রন্থকার নির্বাচন করা হয়ে গেলে মুখ্য গ্রন্থকারের নামে সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। সেই সাথে অন্যান্য যুগ্ম গ্রন্থকারদের নামে (দু'য়ের বেশী নয়) অনুপূরক সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। আখ্যাপত্রে মুখ্য গ্রন্থকার ব্যতীত যে গ্রন্থকারের নাম প্রথমে পাওয়া যাবে তার নামে অবশ্যই অনুপূরক সংলেখ রাখতে হবে।

AACR-এ প্রদত্ত উদাহরণগুলি উদ্ধৃত হল :

১ The humanities and the library·····by Lester Asheim and associates.

মুখ্য সংলেখ—Asheim, Lester

২ Animal motivation ; experimental studies on the albino rat, by C. J. Warden with the collaboration of T. N. Jenkins, L. H. Warner, E. L. Hamilton and H. W. Nissen

মুখ্য সংলেখ—Warden, C. J.

৩ Faustus, a musical romance······composed by T. Cook. Charles E. Horn, and Henry R. Bishop. অন্যান্যদের তুলনায় Bishop-এর নাম মোটা হরফে ছাপান হয়েছে।

মুখ্য সংলেখ—Bishop, Henry R.

মুখ্য গ্রন্থকার অনির্দেশিত (Principal author not indicated : Rule-3B 1) যদি কোন একজন মুখ্য গ্রন্থকার রূপে নির্দেশিত না থাকেন এবং যদি গ্রন্থকারের সংখ্যা তিনজনের বেশী না হয় তাহলে আখ্যাপত্রে উল্লিখিত প্রথম নামে মুখ্য সংলেখ হবে ও অন্যদের নামে অনুপূরক সংলেখ হবে। যেমন :

১ THE SOUND STRUCTURES/OF/ENGLISH AND BENGALI/ MUHAMMAD ABDUL HAI/AND/W. J. BALL

মুখ্য সংলেখ—Hai, Muhammad Abdul

২ WORDS AND THEIR WAYS/IN ENGLISH SPEECH/BY/ JAMES BRADSTREET GREENOUGH/AND/G E O R G E LEYMAN KITTREDGE

মুখ্য সংলেখ—Greenough, James Bradstreet

(Rule 3B 2) যদি কোন একজন মুখ্য গ্রন্থকাররূপে নির্দেশিত না থাকেন এবং যদি গ্রন্থকারের সংখ্যা তিনজনের বেশী থাকে তাহলে আখ্যা অনুযায়ী মুখ্য সংলেখ প্রস্তুত করতে হবে। অবশ্য যদি গ্রন্থখানি আখ্যাপত্রে উল্লিখিত কোন সম্পাদকের নির্দেশনায় প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে সম্পাদকের নামে মুখ্য সংলেখ হবে। আখ্যাপত্রে উল্লিখিত

প্রথম গ্রন্থকারের নামে অনুপূরক সংলেখ হবে। যেমন :

HOSPITAL INFECTION/CAUSES AND PREVENTION/R.E O. WILLIAMS/R. BLOWERS/L. P. GARROD/R. A. SHOOTER

মুখ্য সংলেখ—Hospital infection……

অনুপূরক সংলেখ—Williams, R. E. O.

সম্পাদকের নির্দেশনায় প্রস্তুত গ্রন্থ (Works produced under editorial direction : Rule–4) সম্পাদকের নির্দেশনায় প্রস্তুত গ্রন্থকে সম্পাদকের নামে সূচীভুক্ত করা হবে যদি (১) আখ্যাপত্রে তাঁর নাম উল্লিখিত থাকে (২) আখ্যায় প্রকাশকের নাম না থাকে এবং (৩) গ্রন্থখানির অস্তিত্বের জন্য যদি সম্পাদক মুখ্যতঃ দায়ী হন। অন্যথায় আখ্যা অনুযায়ী সংলেখ প্রস্তুত করা হবে এবং যদি আখ্যাপত্রে সম্পাদকের নাম থাকে তাহলে তাঁর নামে অনুপূরক সংলেখ হবে। যদি আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারদের নাম থাকে তাহলে প্রথম গ্রন্থকারের নামে অনুপূরক সংলেখ করতে হবে। যেমন :

EIGHTEENTH CENTURY ENGLISH LITERATURE/ MODERN ESSAYS IN CRITICISM/EDITED BY/JAMES R. CLIFFORD

মুখ্য সংলেখ : Clifford, James L., *ed.*

সংকলন (Rule–5A) বিভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা থেকে সংগৃহীত বিশেষ আখ্যা সম্বলিত সংকলন গ্রন্থকে আখ্যাপত্রে উল্লিখিত সংকলক বা সম্পাদকের নামে সূচীভুক্ত করতে হবে। শিরোনামে 'সংকলক' বিশেষণ যোগ করা হবে। সংকলক, সম্পাদক বা আখ্যার যাকে শিরোনাম করা হয় নি তার নামে অনুপূরক সংলেখ হবে। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থকার ও আখ্যার সংখ্যা তিনের বেশী না হলে সকলের জন্য গ্রন্থকার ও আখ্যা অনুযায়ী অনুপূরক সংলেখ করতে হবে। উদাহরণ :

POETS' CHOICE/AN ANTHOLOGY OF ENGLISH POETRY FROM SPENSER TO THE PRESENT DAY/COMPILED BY PATRICK DICKINSON/AND/SHEILA SHANNAN.

মুখ্য সংলেখ : Dickinson, Patrick, *comp.*

প্রকারান্তর (Adapter or Original author : Rule—7A) : কোন গ্রন্থ যদি মূল গ্রন্থকে অবলম্বন করে নতুন ঢঙে, লেখা হয় (যেমন, শিশুপাঠ্য সংস্করণ, সরলীকৃত রূপ, ভাবার্থ, ইত্যাদি) বা ভিন্ন রূপে পরিবর্তিত করা হয় (যেমন নাট্যরূপ, চিত্রনাট্য, কাব্যরূপ ইত্যাদি) তাহলে যে ব্যক্তি এই প্রকারান্তরের জন্য দায়ী—অর্থাৎ প্রকারান্তর-কারীর নামে মুখ্য সংলেখ হবে। প্রকারান্তরকারীর নাম পাওয়া না গেলে আখ্যায় মুখ্য সংলেখ হবে ও-মূল গ্রন্থের জন্য যথাযোগ্য অনুপূরক সংলেখ রাখা হবে। যেমন :

১। A PASSAGE TO INDIA/A PLAY IN THREE ACES/BY/

SANTHA RAMA RAU/FROM THE NOVEL/BY/E.M. FORSTER

মুখ্য সংলেখ—Ramarau. Santha.

২। TALES FROM SHAKESPEARE/CHARLES LAMB/AND MARY LAMB

মুখ্য সংলেখ—Lamb, Charles.

৩। GORA/BY/RABINDRANATH TAGORE/CHARLES LAMB/ AND SIMPLIFIED BY E. F. DODD [শিশুপাঠ্য সংস্করণ]

মুখ্য সংলেখ—Dodd, E. F.

অনুবাদ (Translator or author Rule—15A) : কোন গ্রন্থের অনুবাদ ঐ গ্রন্থের নামে সূচীভুক্ত করা হবে। অনুবাদকের নামে অনুপূরক সংলেখ হবে। কিন্তু অনুবাদের কোন সংকলন হলে সংকলনের নিয়মানুযায়ী হবে। আবার অনুবাদে যদি প্রকারান্তর ঘটে তাহলে প্রকারান্তরের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। উদাহরণ :

১। THE DIARY/OF A/WESTWARD VOYAGE/BY/RABINDRA-NATH TAGORE/TRANSLATED BY INDU DUTT/FROM THE ORIGINAL BENGALI/PASCHIM YATRIR DIARY/

মুখ্য সংলেখ—Tagore, Rabindranath.

২। JEAN CHRISTOPHE/ROMAIN ROLLAND/TRANSLATED BY/GILBERT CANNAN

মুখ্য সংলেখ : Rolland, Romain

ছদ্মনাম (Pseudonyms : Rule—42A) : যদি কোন গ্রন্থকারের সমস্ত রচনা একটি ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ছদ্মনামেই মুখ্য সংলেখ রচনা করতে হবে। যেমন :

১। MAXIM GORKEY/MOTHER/A NOVEL IN TWO PARTS/ TRANSLATED BY/MAR GARET WETTLIN

মুখ্য সংলেখ : Gorky, Maxim

আসল নাম : Aleksei Maximovich Peshkov

২। GEORGE ELIOT/ADAMBEDE/INTRODUCTION BY/ROBERT SPEAIGHT

মুখ্য সংলেখ : Eliot, George

আসল নাম : Marian Evans

Rule 42B. যদি কোন গ্রন্থকারের রচনা একাধিক ছদ্মনামে বা আসল নাম এবং একাধিক ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে আধুনিক সংস্করণগুলিতে এবং রেফারেন্স সূত্রে তিনি যে নামে সমধিক পরিচিত সেই নামে সংলেখ রচনা করতে হবে। সন্দেহের অবকাশ থাকলে আসল নাম ব্যবহার করা শ্রেয়। যেমন :

CHARLOTTE BRONTE/JANE EYRE/ABRIDGED BY WINI-FRED W. DONALD/ILLUSTRATIONS BY PETER DAVIDSON

মুখ্য সংলেখ : Bronte, Charlotte

ছদ্মনাম—Currer Bell

Charlotte Bronte তিনখানি উপন্যাসের রচয়িতা Jane Eyre, Shirley এবং Villette। এই তিনখানি উপন্যাসেই তিনি আসল নাম ব্যবহার করেছেন এবং এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এছাড়া তিনি একাধিক ছদ্মনামে কিছু কবিতা রচনা করেছেন, Currer Bell তার মধ্যে একটি। এই ছদ্মনামগুলি মোটেই প্রসিদ্ধ নয়। Charlotte Bronte ১৮১৬ খৃঃ ২১ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খৃঃ তিনি Rev. A. B. Nicholls এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং ১৮৫৫ খৃঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। Bronte র সমস্ত রচনাই ১৮৫৪ র আগে। সুতরাং তাঁর কোন রচনায়ই স্বামীর নামের উল্লেখ নেই। তাই বিবাহিতা লেখিকাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নিয়ম Bronte-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৮)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুনর্গঠনের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ, (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ, (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত কোন সম্মেলন হয় নাই। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বাঙ্গলার শিক্ষা-মন্ত্রী খান বাহাদুর আজিজুল হক তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তাঁহার ভাষণে তিনি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ সকলের বিবেচনার্থ উপস্থিত করেন। কার্যনির্বাহক সমিতি পরিষদের সংবিধান পরিবর্তিত করিবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করিলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। অন্যান্য যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা এই :

১ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠক্রম যাহাতে স্থির করা যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে অচিরেই তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

২ প্রতি বৎসর শিক্ষাখাতের ব্যয়বরাদ্দ হইতে গ্রন্থাগারসমূহকে অনুদান দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য বাঙ্গলার জিলা বোর্ড-এর এবং পৌরসভাসমূহের সভাপতিদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৩ গ্রামবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিকিরণের জন্য প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে তাহাদের পরিচালনাধীনে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনার্থ অনুরোধ করা যাইতেছে।

৪ যথাসম্ভব শীঘ্র বাঙ্গলার বিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারিকদিগকে গ্রন্থাগার পরিচালন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রবর্তন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পূর্বে মাত্র ছয়টি জিলায় পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে অধিক জিলায় শাখা স্থাপনের জন্য পরিষদ সচেষ্ট হন। এই বৎসর পরিষদের পক্ষ হইতে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিচালন সম্পর্কিত তিনখানা পুস্তক প্রকাশ করা হয়, যথা কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় কর্তৃক প্রণীত 'গ্রন্থাগার' ও 'দেশবিদেশের গ্রন্থাগার' এবং শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রণীত 'গ্রন্থতালিকা'। ভবানীপুরের স্যার আশুতোষ মেমোরিয়্যাল ইনৃষ্টিটিউট-এ পরিষদের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর গ্রন্থাগারিকদিগকে গ্রন্থাগার পরিচালনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠক্রম নির্ধারণ করার জন্য ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত এবং শ্রীপ্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায়কে লইয়া একটি গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ

উপসমিতি গঠিত হয়। খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ ইহার সভাপতি এবং শ্রীপ্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার আহ্বায়ক ছিলেন। তাঁহাদের সুপারিশ অনুসারে গ্রীষ্মকালে এক মাস ব্যাপী গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। প্রথমতঃ কেবল গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রশিক্ষণ গ্রহণেচ্ছুদের ষাটখানা দরখাস্ত পাওয়া গেলেও মাত্র বিশ জনকে ভর্তি করা হয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ইহার অধিকর্তা ছিলেন। শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক, শ্রীঅনাথনাথ বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক, শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের গ্রন্থাগারিক, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী, আশুতোষ কলেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক, কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক এবং শ্রীওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, 'দি ষ্টেট্স্ম্যান পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে হইতে এই প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের কাজ আরম্ভ করা হয়। ৩০শে এপ্রিল শ্রীওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আশুতোষ কলেজে এই প্রশিক্ষণ চক্রের উদ্বোধন করেন। তাঁহাকে ইহার উদ্বোধন করিতে আহ্বান জানাইয়া কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় যে ভাষণ দিয়াছিলেন নীচে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

"এই অপূর্ব অনুষ্ঠান উপলক্ষে অর্থাৎ গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ চক্র উদ্বোধন উপলক্ষে আপনাকে সানন্দে আমি স্বাগত জানাইতেছি। বহু দিন যাবত এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীতা তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছিল বটে কিন্তু নানা কারণে আমাদের পরিষদ এই কাজ হাতে লইতে পারেন নাই। যাহা হউক অন্য কাহারও মারফত ইহা এই কাজ করাইবার চেষ্টা করিয়াছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রত্যেক অধিবেশনেই গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ চক্রের পত্তনের ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে কিন্তু কোন সুফল ফলে নাই।

যাহা হউক হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সমিতি এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের, (১৩৪১ বঙ্গাব্দে) জুন মাসে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারে পরীক্ষাধীন ব্যবস্থা হিসাবে একপক্ষ কালের জন্য গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করিয়া ইহার একটা বাস্তব রূপ দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ছিলেন ইহার শিক্ষক। বার জন গ্রন্থাগার কর্মীকে ভর্তি করা হইত। এই পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে শিবিরের কয়েকজন ছাত্র বাঙ্গলার কয়েকটি গ্রন্থাগারে বিশেষ করিয়া আসানসোল পূর্ব ভারত রেল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এবং চন্দননগর পুস্তকাগারে আধুনিক গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন। এই দুইটি গ্রন্থাগার ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে নিজদিগকে পুনর্গঠিত করিয়াছে।

এই বৎসর গ্রন্থাগারিকদের জন্য ডিপ্লোমা পাঠক্রম প্রবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। সমিতির সুপারিশসমূহ অনুমোদিত হইলেও কোন ফলোদয় হয় নাই।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪২ বঙ্গাব্দে) ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে বিশজন ছাত্র লইয়া ছয় মাসের একটি প্রশিক্ষণ চক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সাধারণ শ্রেণীর জন গ্রন্থাগার এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের ইহাতে ভর্তি হইবার সুযোগ খুব কমই ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দে) কোন চক্রের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় মাস পাঠক্রমের একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। এক বৎসর অন্তর ছয় মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আর মাদ্রাজে আছে প্রশস্তিপত্র দেওয়ার তিনমাসের পাঠক্রম এবং বড় দিনের ছুটির সময় শিক্ষকদের জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমের ব্যবস্থা। প্রদেশের ছাত্রদের জন্যই এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। অনুগ্রহ হিসাবেই বহিরাগত ছাত্রদিগকে প্রবল সুপারিশ থাকিলে কোন কোন সময় ভর্তি করা হয়।

আমাদের প্রদেশের গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য এরূপ কোন বিশেষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিরাট চাহিদা আছে বলিয়াই এই প্রশিক্ষণ চক্র প্রবর্তন ছাড়া পরিষদের কোন গত্যন্তর ছিল না। কাজেই ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লাহকে সভাপতি করিয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য একটি পাঠক্রম নির্ধারণ করেন। আমার যুবক বন্ধু এবং আমাদের প্রশিক্ষণ চক্রের উদ্যোগী অধিকর্তা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার বাস্তব রূপ দেয়। আপনারা বোধ হয় জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ বিভাগের অধিকর্তা আমার মাননীয় বন্ধু ডঃ কাউলির পরিচালনাধীনে তাহার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়াছে।

দেশের সকল স্থান হইতে আমাদের প্রশিক্ষণ চক্রে ভর্তি হওয়ার জন্য বহু দরখাস্ত আসিয়াছে কিন্তু প্রদেশের কতক জন গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয়, সরকারের বিভাগীয় ও বিশেষ গ্রন্থাগারসমূহে কার্যরত ব্যক্তিদের মধ্যেই আমাদিগকে ভর্তি সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ বিশজন ছাত্র ভর্তি করাই আমাদের ইচ্ছা ছিল, পরে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত সংখ্যা বাড়াইতে হইয়াছে।* আশা করা যায় এই প্রাথমিক পাঠক্রম গ্রন্থাগারিকদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে সহায়তা করিবে এবং ইহার উপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই প্রশিক্ষণ চক্রের সাফল্যের উপরই এই ধরনের বা উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণ চক্র গড়িয়া তোলার দিকে আমাদের পরিষদের ভবিষ্যৎ চেষ্টা নির্ভর করে।

---

* শেষ পর্যন্ত বিশজন ছাত্রই ভর্তি করা হইয়াছিল।

প্রশিক্ষণ চক্রের সাফল্যের জন্য অধিকর্তা ডঃ রায় এবং অন্যান্য যাঁহারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট পরিষদ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

পূর্বেই বলিয়াছি অধিকর্তা লণ্ডন হইতে প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকবর্গও গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তাঁহারা ভারতের কোন না কোন কেন্দ্র হইতে শিক্ষা পাইয়াছেন।

বাঙ্গলার জনশিক্ষার অধিকর্তা শ্রীবটমূলি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং স্যার আশুতোষ মেমোরিয়্যাল ইনষ্টিটিউট এর সভাপতি শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ কারণ তাঁহারা এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার রূপায়ণে আমাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

আমাদের প্রদেশে যে অভিনব পরীক্ষা চলিয়াছে সেই প্রশিক্ষণ চক্রের উদ্বোধন করার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক, আমাদের মাননীয় বন্ধু ও গত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সহযোগী সদস্য শ্রীয়ার্ডসওয়ার্থকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রশিক্ষণ চক্রের উদ্বোধনের ঘোষণা করিবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। ডঃ রায় অতঃপর তাঁহার সহকর্মীদের পরিচয় দিবেন এবং এই কার্যক্রম ও পাঠক্রম সম্বন্ধে আপনাদিগকে বলিবেন।

আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদের বিশ্বকবি ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বাণী পড়িয়া শুনাইতে ইচ্ছা করি। আশা করি ইহা আমাদের সকলকেই উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইবে। বাণীটি এই :

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বাঙ্গলা
২৮।৪।৩৭

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টা সফল হউক ইহাই কামনা করি। যোগ্য গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া পরিষদ দেশের এক বিরাট চাহিদা মিটাইবে।"

স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সময় যাহাতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করা যায় এবং সম্মেলনে কলিকাতায় এবং বাঙ্গলার পৌরসভাযুক্ত সহরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষা, গ্রামীণ ও ছোট সহরে গ্রন্থাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বিদ্যালয় ও বালকদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে গভীর ও সুনির্দিষ্ট আলোচনা চলে তাহার জন্য পরিষদ সচেষ্ট হন।

পারিভাষিক শব্দাবলী ঃ সামাজিক নৃ-বিদ্যা-(৫)

তুষারকান্তি নিয়োগী

বিবাহ—Marriage

জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ—এই তিনটি হ'ল মানবজীবনের প্রধান ঘটনা। এদের মধ্যে প্রথম দুটি জীবমাত্রের জীবনেই ঘটে, কিন্তু বিবাহ মানবভিন্ন অন্যকোন জীবের হয়না। জন্মের পূর্বে কী তা আমরা জানিনা আর মৃত্যুর পরেই বা কী আছে তাও আমাদের অজ্ঞাত কিন্তু বিবাহের পূর্ব ও পর অবস্থা আমরা জাগতিক জীবনচর্চার অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করতে পারি। বিবাহ জীবনমৃত্যুর ধারাবাহিকতা রক্ষাকরার একটি সংস্থা কারণ একমাত্র বিবাহের মাধ্যমেই জীবনমৃত্যুর ধারাবাহিকতার নিরবচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহ বজায় থাকে। তবে জীবসৃষ্টি যা নরনারীর দৈহিক মিলনে সম্ভব তার সঙ্গে বিবাহের কোন যোগ নাও থাকতে পারে, কিন্তু সন্তানজন্মে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও সন্তানের স্বীকৃতির জন্য বিবাহের আবশ্যকীয়তা গ্রাহ্য। প্রশ্ন হ'তে পারে কে এই স্বীকৃতি দেবে ? দেবে সমাজ তার সাংস্কৃতিক প্রকাশের মাধ্যমে। সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতির জন্যই বিবাহের প্রয়োজন· সমাজের স্বীকৃতির জন্যই নরনারীর যৌনসম্পর্ককে দাম্পত্যসম্পর্ক বলা হবে শুধুমাত্র দৈহিকসম্পর্ক না বলে। সমাজ মানুষ তার বাঁচবার তাগিদে সৃষ্টি করেছে—সমাজ কাঠামো সেই সৃষ্টিশীল সত্তার বিকশিত রূপমূর্তি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং সমাজবদ্ধজীব বলেই বিবাহ জীবনের পক্ষে, প্রজননের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, অপরিহার্যও। সমাজের সবথেকে মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় সংস্থা হ'ল বৈবাহিক সংস্থা।

বিবাহ কাকে বলে ? বিবাহ হ'ল নরনারীর সমাজ স্বীকৃত মিলন[১] এবং একত্রে জীবনযাপন করতে দেওয়ার একটি আনুষ্ঠানিক সংস্থা। বিবাহবিধির মধ্যেই এককপুরুষ বা এককস্ত্রীর নূতনভাবে সৃষ্টি হওয়া যৌথজীবন যাপনের দায়দায়িত্বের নির্দেশ থাকে। বিবাহ হ'ল পরিবার গঠনের একমাত্র সামাজিক উপায়। বিবাহের সঙ্গে নরনারীর সাধারণ মিলনের পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজের অনুমোদনের কোন প্রয়োজন হয়না, এরমধ্যে পরিবার সৃষ্টিরও কোন তাগিদ থাকে না—কারণ কেন্দ্রী পরিবার (Nuclear Family) বা সমাজ সংগঠনের ক্ষুদ্রতম এককসংস্থা নির্মিত হয় স্বামী স্ত্রী এবং সন্তান নিয়ে ; যৌন মিলনে নিছক ভোগাকাংক্ষার পরিতৃপ্তিটাই প্রধান[২], সৃজনশীল পরিবার রচনা বা সন্তানকামনার কোন ধারনা এর মধ্যে থাকতে পারে না।

---

(১) The Study of Man—R. Linton, Chap – XI P-172.

(২) Anthropology—Hoebel P-332.

বিবাহ হ'ল নরনারীর যৌনআবেগকে সুশৃংখল মিলনের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি দানের একটি পথ এবং এই মিলনের মধ্যথেকে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাধ্যমে জীবস্রোতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার একটি উপায়। তাই অনেক সমাজে দেখা যায় যে বিবাহের সার্থকতা খোঁজা হয় সন্তান জন্ম ও পালনের মধ্যে—সন্তান জন্ম নরনারীর বিবাহিত. জীবনের স্থায়ীত্ব ও মৌলিকত্ব রক্ষার উপায়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় সন্তানজন্ম না হ'লে বিবাহবন্ধন ভেঙ্গে যায়, আর বিবাহবিচ্ছেদ সন্তানহীন দম্পতির ক্ষেত্রে যত সহজ সন্তানসমৃদ্ধ পরিবারের ক্ষেত্রে তত সহজ নয়।

বিবাহের আদি ইতিহাস ধোঁয়াশাবৃত। আজকের বিবাহে যে অনুষ্ঠান অথবা প্রাক্‌প্রস্তুতি ইত্যাদি দেখা যায় তা হয়ত অতিপ্রাচীনকালে ছিল না। বিবাহের একটি প্রধান আকার "একবিবাহ" (monogamy) যাকে সাধারণভাবে বিবাহ বলে মনে করা হয় তা হয়ত অতিপ্রাচীনকালে প্রচলিত ছিলনা। আজকের বিবাহের সঙ্গে যে সমস্ত নৈতিকমূল্যবোধ জড়িয়ে আছে সেদিন হয়ত সেসব ছিল না—আর পরিবার সৃষ্টির পশ্চাতে যখন কেবলমাত্র গোষ্ঠী সংগঠন ছিল তখন বিবাহ এমনরূপে না থাকাই স্বাভাবিক। হয়ত আজ যাকে যৌন স্বেচ্ছাচার বলা হয় তাথেকেই আদিম বিবাহের যাত্রাশুরু। যৌন-স্বেচ্ছাচার (আধুনিক চিন্তাধারায়) রক্তসম্পর্কের পরিবার প্রথার আমলেও একান্ত সহজদৃষ্ট ছিল, তবে সে যুগের নৈতিক মান নিশ্চই আজকের মত ছিলনা, কারণ তখন—the sister was the wife and that was moral, Edda তে এই জাতীয় বিবাহের উল্লেখ আছে, এমনকি Goethe তাঁর Ballad of God and the Bayadere র মধ্যেও এমন ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন[৩]। তবে নারীর স্বাতন্ত্র্য তখন খর্ব হয়নি। তথাকথিত অবন্যতা ও বর্বরতার কালপর্যন্ত আমরা যে সব পরিবারের পরিচয় পাই, যেমন রক্তসম্পর্কের পরিবার, পুনালুয়া পরিবার এবং জোড়বাঁধা পরিবার ইত্যাদি, তাদের মধ্যেও তথাকথিত যৌনসংযমের কোন আদর্শরূপ বর্তমান ছিলনা। জোড়বাঁধা পরিবারের সময়থেকে আজকের যুগের একবিবাহের সূচনা হ'তে শুরু করেছে আর একই সঙ্গে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও খর্ব হ'তে শুরু করেছে। একবিবাহের কালে নারীত্ব একজাতীয় দাসত্বকে নিজের সুযোগমত ব্যবহার করে নারীত্বের উপর ধর্মীয় মহিমা আরোপ করতে শুরু করেছে। স্মরনীয়, একবিবাহের ক্ষেত্রে সমস্ত সুযোগ, অতিরিক্ত স্বভাব পরায়ণতা সবই পুরুষ ভোগ করত, স্ত্রীর কোন অধিকার ছিলনা। জোড়বাঁধা পরিবারের সময় নারীর যেটুকু যৌনঅধিকার ছিল একবিবাহে তাও খর্ব হ'ল। এই ভূমিকা মনে রেখে আজকের দিনে বিবা হর স্বরূপ বোঝা বা আলোচনা করা উচিত।

হিন্দুবিবাহের আদিপর্বের ইতিহাসও এই যৌনস্বেচ্ছাচারিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন

---

(৩) The origin of the Family, Private Property and the State F. Engels (Note by Engels to the Fourth Edition) PP. 58-59.

করে।* প্রাচীনভারতীয় সাহিত্যে শ্বেতকেতুকে বর্তমান বিবাহের স্রষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যৌনস্বেচ্ছাচারিতা থেকে মানুষকে প্রত্যাহত করবার জন্য তিনি বিবাহবিধির প্রবর্তন করেন। শোনা যায় যে একদিন তিনি যখন তাঁর পিতার সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন তখন তাঁর পিতার সমক্ষেই শ্বেতকেতুর মাকে একজন পরপুরুষ হাত ধরে নিয়ে যায়—এতে শ্বেতকেতু ক্ষুব্ধ হয়ে নিয়ম করেন যে, যে নারী তার ভর্তাকে অতিক্রম করবে সে পাতকী হবে। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখ আছে পুরাকালে স্ত্রীলোক অবারিত ছিল, তারা স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছানুযায়ী বিহার করে বেড়াত এবং এইভাবে কৌমার অবস্থা থেকে পতিকে উল্লংঘন করলেও কোন অধর্ম হ'ত না—কারণ পুরাকালের ধর্ম ছিল এইরকম :

অনাবৃতাঃ কিলপুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচার বিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি ॥
তা সাং ব্যচ্চমানানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্মোহভূদ্ ববারোহে স হি ধর্মঃ পুবাভবৎ ॥

—মহাভারত, আদিপর্ব ১২২/৪—৫

যাইহোক সমাজের অগ্রগতির যে স্তর থেকে তথাকথিত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে প্রায় তখন থেকেই যৌনস্বেচ্ছাচারিতা সাধারণভাবে বন্ধ হ'য়েছে, যুথবিবাহও লোপ পেয়েছে; এদিকে পুরুষতন্ত্রের বিকাশে এবং উদ্ধত পৌরুষের দুর্দমনীয় প্রতাপের কাছে নারীতন্ত্রের পতন হলে একবিবাহের সূচনা হয়। আদিম সাম্যবাদী সংগঠন বন্য ও বর্বরতার স্তরেই শেষ হয়ে নবযুগের সূচনা করে—এই যুগ একসঙ্গে অনেক জিনিস মানুষকে উপহার দেয়, সেগুলি হ'ল—সভ্যতা ও রাষ্ট্রযন্ত্র, একবিবাহ ও পরিবারতন্ত্র, অন্তত মর্গানীয় তথ্য বিশ্লেষণে মার্ক্সীয় ইতিহাস ব্যাখ্যা একথাই বলে। বিবাহ হ'ল একটি সামাজিক অনুষ্ঠান যা দুটি নরনারী তাদের আত্মীয়স্বজনদের দূরে থেকে নিকট এবং নিকট থেকে নিকটতর করে, (—দুটি ভিন্নগোষ্ঠীব মধ্যে বিবাহ হ'লে সম্পর্ক হয় দূর থেকে নিকট, একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হ'লে সম্পর্ক হয় নিকট থেকে নিকটতর) সন্তানসৃষ্টির সাহায্যে বংশধারা অব্যাহত রাখে এবং যৌনউচ্ছ্বাসকে পরিমিত ক'রে সমাজ কাঠামোর সম্পর্কধারাকে সুষ্ঠু রাখে।

বিবাহ নীতিও আইনগতভাবে নরনারীর যৌনপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে—কিন্তু প্রবৃত্তি নীত্যানুগ থাকেনা সবসময়, তাই সামাজিক অনুষ্ঠানের পূর্বেই অনেকক্ষেত্রে অবৈধ মিলন ঘটে। তবে "বৈধ" "অবৈধ" শব্দগুলির বিচার ও বোধ সর্বত্র একভাবে হয়না।

---

* ঋগ্বেদের ১০, ১০ সূক্তে যমী তার ভাই যমকে শয্যায় আহ্বান করার উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্যত্র ১০, ৬১/৫-৭ সূক্তে দেখি প্রজাপতি তাঁর কন্যা উষার সঙ্গে কামলীলায় লিপ্ত হয়েছেন। অথর্ববেদের ৮, ৬, ৭ সূক্তগুলিতে পিতা-কন্যা, ভ্রাতাভগ্নীর অজাচারের উল্লেখ পাওয়া যাবে।

Premarital mating—প্রাক বিবাহ মিলন ও যৌনসম্পর্ক

আদিবাসীদের বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কিত ধারনার সঙ্গে তথাকথিত সভ্য নরনারী একমত নাও হ তে পারেন। সভ্য সমাজে অবৈধ সন্তানের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই, পক্ষান্তরে বহু আদিবাসী সমাজসংগঠন অবৈধ সন্তানদের সমাজে স্বীকৃতি ও মানবিক মর্যাদা দিয়ে থাকে। সন্তানকে কোন সময় হেয় করা হয় না, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে অবৈধ সন্তানের অবৈধতার জন্য সন্তান নিজে দায়ী নয়—গোষ্ঠী তাই তার উপর কোন শাস্তিরও নির্দেশ দেয়না, যা কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অথবা প্রায়শ্চিত্তের কাজ সবই সন্তানের পিতামাতার বিরুদ্ধে নেওয়া হয় অথবা পিতামাতাকে প্রায়শ্চিত্তমূলক জরিমানা দিতে হয়। এখানে ১৯৫৬ সালে কারনিকোবরের একটি ঘটনার আমরা উল্লেখ করব।[৪] কারনিকোবরের তামালু গ্রামে পেৎসি নামে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। যৌবনের আবেগে তার সারল্যের সুযোগ নিয়ে সল নামে একজন বিবাহিত যুবক তার সঙ্গে যৌনসংসর্গ করে, ফলতঃ সে (পেৎসি) অন্তঃসত্ত্বা হ'য়ে পড়ে। ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে গেলে গ্রামসভার পক্ষ থেকে দুজনকেই উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে উভয়েই তাদের অপরাধ স্বীকার করে। বিচারে ছেলেটিকে ২০টি নারকেল গাছ এবং ৫টি শূকর জরিমানা দিতে বলা হয়। বিচারান্তে তিনটি শূকরকে হত্যা করা হয় এবং মেয়ে ও ছেলে দুপক্ষের আত্মীয়স্বজন ভোজে অংশ গ্রহণ করে। পরে অবশ্য মেয়েটির সঙ্গে অন্যগ্রামের একটি ছেলের বিবাহ হয় এবং তাদের মিলনে যে শিশু জন্মলাভ করে মেয়েটির স্বামীই তার পিতা বলে সামাজিক স্বীকৃতি পায়, নবজাতকেরও সামাজিক স্বীকৃতিতে কোন বাধা থাকে না। আদিবাসী সমাজ সংগঠনের এটা একটা মূল্যবান দিক ; আমাদের সভ্যসমাজে অবৈধসন্তানদের জীবনে যে মানসিক যন্ত্রনা ও সামাজিক গঞ্জনা সহ্য করতে হয় আদিবাসী সমাজ সংগঠনে প্রায়শই তেমন দেখা যায় না। বিখ্যাত নৃ-তত্ত্ববিদ্ Malinowski তাঁর সুচিন্তিত রচনায় প্রাক্ বিবাহ যৌনাচার সম্পর্কে লিখেছেন—"Chastity is an unknown virtue among the natives. At an incredibly early age they become initiated into sexual life, and many of the innocent looking plays of childhood are not so innocuous as they appear. As they grow up, they live in promiscuous free love, which gradually develops into more permanent attachments, one of which ends into marriage."[৫] নরনারীর প্রাক্-বিবাহ মিলনের একটা মূল্য আছে। পাশাপাশি বসবাসের মধ্য দিয়ে একজন আর

(৪) ঘটনাটি ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের শ্রীবিমল চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে শোনা। ইনি ১৯৫২-৬০ সাল পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে গবেষণা চালিয়েছিলেন।

(৫) The Argonants of the Western Pacific—Malinowski, B. P53.

একজনকে চিনবার, বোঝবার যথেষ্ঠ সুযোগ পায়—ভবিষ্যতের পারিবারিক কাঠামোকে ঋজু ও সুষ্ঠু করবার জন্য একে অপরের জন্য তৈরী হয়, বুঝতে পারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কে কেমনভাবে একে অপরকে সাহায্য করবে, যে সমস্ত সমাজে ছেলেমেয়েদের বিয়ে বেশ বেশী বয়সে হয় সেখানে যৌন পবিত্রতার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়না। মুণ্ডা আদিবাসীদের ছেলেমেয়েরা একত্রে মেলামেশা থেকে শুরু করে সহবাস পর্যন্ত করে থাকে প্রাক্-বিবাহকালে। অনেক আদিবাসীদের মধ্যে অবিবাহিত যুবকযুবতীর শয়নগৃহ একটি বিশেষস্থানে নির্দিষ্ট হয়। প্রসঙ্গত "গোণ্ড"দের গোটুলের উল্লেখ করা চলে। গোটুল হ'ল যুবকযুবতীদের একজাতীয় ডর্মিটরি—এখানে প্রাক্‌বিবাহ প্রেম, নায়কনায়িকা নির্বাচন থেকে শুরু করে যৌনাচার পর্যন্ত সবই হয়। যুবকযুবতীদের যৌনাচার সম্পর্কিত শিক্ষাও এখানে দেওয়া হয়—গোণ্ড যুবকযুবতী তাই প্রাক্-বিবাহকালেই যৌনরহস্যের অনেককিছুই অবগত হয়। অবশ্য পরে যখন তারা ঘর বাঁধে তখন স্বেচ্ছাচারিতা সংযমের বাঁধনে লোপ পায়।

অজাচার নিষেধ বিধি (Incest taboo)

অজাচার অথবা গোত্রগমন সম্পর্কে সভ্যসমাজ এবং আদিবাসী সমাজ সংগঠন, উভয় ক্ষেত্রেই নিষেধবিধি পালিত হয়। অজাচার হ'ল নিকট আত্মীয়, বিশেষ করে পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নীর যৌনসংযোগ। মানুষের চলার পথে আদিমপর্বে এ সম্পর্কে তেমন কোন নিষেধবিধি ছিল না, কারণ আমরা মরগ্যান কথিত রক্ত সম্পর্কের পরিবার এবং পুনালুয়া পরিবারের আলোচনায় দেখেছি [৬] যে তখন এটা চলত। কিন্তু পরে এ সম্পর্কে নিষেধ আরোপিত হয়। এই নিষেধের পশ্চাতে কতকগুলি কারণ রয়েছে; এর মধ্যে দৈহিক কারণও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ওয়েষ্টারমার্ক এবং লুই মরগ্যানের ধারণা এই যে অজাচারের ফলে জীনিয় হ্রাসমানতা (genetic deterioration) লক্ষ্য করা যায়। জীনিয় বিকাশের অন্তরায়কে রোধ করার জন্য গোত্রগমন বা অজাচারকে নিষেধ করা একান্ত কর্তব্য। কারণ এটাই মুখ্য কারণ নয়, কারণ হোবেল [৭] দেখিয়েছেন যে পার্বত্য "কেনটাচকি"দের মধ্যে অজাচার চালু থাকা সত্ত্বেও তাদের যুবক যুবতীদের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি বা বৈকল্য ঘটে না, পক্ষান্তরে নিকটবর্তী অন্য উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে অজাচার না থাকলেও স্বাস্থ্য তাদের তেমন উজ্জ্বল নয়। এ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ ম্যালিনস্কির মনঃস্তাত্বিক কার্যবাদীয় (Psychological functional theory) তত্ত্ব বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। মানুষের যৌন আবেগ এবং ক্ষুধা অস্বাভাবিক ভাবে প্রখর এবং তীব্র—সংযমের রাশে একে বাঁধতে না পারলে এর দ্বারা পারিবারিক অথবা সামাজিক শৃংখলা ও

---

(৬) পারিভাষিক শব্দাবলী : সামাজিক নৃ-বিদ্যা (৩)—তুষারকান্তি নিয়োগী পৃ-১৬৩

(৭) Anthropology—Hoebel (Chapter : marriage and mating)

শান্তি বিঘ্নিত হ'তে পারে। পারিবারিক কাঠামোয় প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়তার সূত্রে এবং দায়দায়িত্বের বন্ধনে জড়িত থাকে। এর মধ্যে যৌন আবেগ যদি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় তবে পারিবারিক ভিত্তিমূল ভগ্ন হ'তে পারে। একটি পরিবারে কেবলমাত্র পিতামাতার, যারা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় নয়, মধ্যে যৌনসম্পর্ক হয় এবং এটা সুষ্ঠু পরিবার রচনার অনুকূল—কিন্তু অন্য সম্পর্কের মধ্যে কোন রকম যৌন-শিথিলতা অবাঞ্ছনীয়। ঐ সম্পর্ক থাকলে দায়দায়িত্ববোধ, আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিঘ্নিত হয় এবং পরিবার সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই জন্য যৌন আবেগকে অজাচারের পথ থেকে অন্যমুখীন করতে হয়, প্রশমিত করতে হয়। অপরিণত যৌনবাসনা বা ক্ষুধা সর্বপ্রথম ঘর বা পরিবারের মধ্যে তার কামনানিবৃত্তির প্রচেষ্টা পায়—যেমন ভাই-বোনের যৌনসংসর্গ। পারিবারিক কাঠামোর যৌন আবেগের অবাধ বিস্তার থাকলে (যেমন, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন, শ্বশুর-পুত্রবধূ অথবা শ্বাশুড়ী-জামাই) স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি অথবা মধুর সম্পর্কগুলি লুপ্ত হয় এবং পারিবারিক সংহতি বিনষ্ট হয়। যৌন স্বেচ্ছাচার এবং পরিবার এককভাবে চলতে পারেনা—অবৈধ যৌনতা পারিবারিক স্থায়ীত্বে আঘাত হানে।[৮] পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক আদিবাসী সংগঠনেই আছে এই নিষেধ। কোন কোন স্থানে এর প্রতি বেশী কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় যে শ্বশুর-পুত্রবধূ এবং শ্বাশুড়ী-জামাইকে কখনও কোন অবস্থাতেই মেলামেশা করতে দেওয়া হয়না। মালয়ের সেমাংরা এই বিধিনিষেধ পালনে একান্ত তৎপর; এমনকি স্বামীস্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের পরও এই নিষেধবিধি কঠোরভাবে পালন করা হয়[৯]।

এবার আমরা কন্যাসংগ্রহের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব। কন্যাসংগ্রহের উপায়ের মধ্যে বিবাহের প্রকারভেদের আলোচনাও এসে পড়বে। হোবেলের (১৯৪৯) সূত্রঅনুযায়ী ৮ প্রকার বিবাহের কথা জানা যায়। সেই ৮ প্রকার যথাক্রমে হ'ল—(ক) কন্যাক্রয় (marriage by Purchase), (খ) শ্রমের পরিবর্তে কন্যা সংগ্রহ (marriage by suiters service) (গ) বিনিময় বিবাহ (marriage by exchange) (ঙ) পত্নীলাভের উত্তরাধিকার (in heritence of wives) (চ) ভাবী জামাতাকে দত্তকগ্রহণ (marriage by adoption), (ছ) নকল বিবাহ (fictive marriage) (জ) প্রেমিকসহকুলত্যাগ (Elopment)।

পারিভাষিক তালিকায় আমরা এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব। মনুসংহিতায় হিন্দুবিবাহের যে প্রকারভেদের আলোচনা পাওয়া যায় সেখানেও আমরা ৮টি প্রকারের উল্লেখ লক্ষ্য করি। মনুতে একটি শ্লোকে ঐ ৮ প্রকারের সুন্দর বর্ণনা আছে :

---

(৮) Culture—B, Malinowski. P—630.

(৯) মালয়ের সেমাং—শ্রীতুষারকান্তি নিয়োগী, প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৭৫ পৃ—৫৭২

চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহহিতাহিতান্‌ ।
অষ্টাবিমান্‌ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্‌ নিবোধত: ।।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ।।

(মনু ৩।২০।২১)

এখানে পাই ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই ৮ প্রকারের বিবাহ। মনু ৩।২৭-২৮ শ্লোকগুলিতে বিবাহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : বরকে উপযুক্ত অর্চনা করে কন্যাকে অলঙ্কারাদি দিয়ে আচ্ছাদিত করে কন্যাদান করলে হয় ব্রাহ্মবিবাহ; যজ্ঞে ঋত্বিককে অলঙ্কৃত কন্যাদানে দৈব বিবাহ; বরের কাছ থেকে গোমিথুন নিয়ে কন্যাদানে আর্যবিবাহ; "উভয়ের ধর্ম উভয়ে আচরণ কর" এইরূপ উপদেশ মাধ্যমে কন্যাসমর্পণ হ'লে প্রাজাপত্যবিবাহ; ধনসম্পত্তি গ্রহণ করে কন্যাদান আসুর বিবাহ; বর ও কন্যা পরস্পরের ইচ্ছায় মিলিত হ'লে হয় গান্ধর্ব বিবাহ; বলপ্রয়োগে কন্যাহরণ রাক্ষসবিবাহ; সুপ্তমত্ত ইত্যাদি অবস্থায় কন্যাঅধিকার করাতে হয় পৈশাচ বিবাহ। সমাজ পরিবর্তনশীল, যুগও কালের বিশেষ বিশেষ মনস্তত্ব সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও প্রকারগুলিকে বিশেষভাবে বিবর্তিত হতে সাহায্য করে। মনুর কালে হয়ত উপরোক্ত ৮ প্রকারের বিবাহেরই প্রচলন ছিল, কিন্তু আজ প্রকৃত প্রস্তাবে অতগুলি প্রকার চোখে পড়ে না। বাঙালী হিন্দুসমাজের দিকে চেয়ে দেখলে দেখব যে মোটামুটি ৩টি প্রকারই এখন বর্তমান আছে। এর মধ্যে সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয় ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতি তবে এর সঙ্গে বরপনের প্রসঙ্গ জড়িত থাকে—কুল ও বিত্তে যারা উচ্চ তাদের মধ্যে এই বিবাহের সমাজস্বীকৃত প্রচলন রয়েছে। এছাড়া আছে প্রাচীন গান্ধর্ব বিবাহের আধুনিক রূপ সিভিল ম্যারেজ বা রেজিস্ট্রী বিবাহ।

অসগোত্র বিবাহ (Exogamy)

সগোত্র বিবাহের বিধিনিষেধ আমাদের মধ্যে ঐতিহাসিক কাল থেকে চলে আসছে। মনু বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে ।। মনু ৩।৫

কন্যা যদি মতোর সপিণ্ডা না হয় এবং পিতার অসগোত্র হয় তবে সে কন্যাকে বিবাহ করা যেতে পারে। এই জাতীয় বিবাহ অনেকটা Mclenan এর দেওয়া Exogamy র অনুরূপ। ম্যাকলিনান লিখেছেন যে[১০] বহু অসভ্য বর্বর এমনকি প্রাচীন

১০ (Studies in Ancient History, 1886. Primitive marriage P 124—J F. Mclenan, quoted in The origin of the Family etc.—F. Engels. P. 17)

ও আধুনিক বহুসভ্যজাতি রয়েছে যাদের মধ্যে দেখা যায় যে বর নিজে অথবা কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে জোট হয়ে অন্যগোষ্ঠী থেকে জোর করে কন্যাকে অধিকার করে নিয়ে আসে। এই প্রথাটা বহুপূর্ববর্তী বলপূর্বক কন্যাহরণের পরিশিষ্টরূপমাত্র। ম্যাকলিনান এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যতদিন মানুষ নিজের গোষ্ঠী থেকে কন্যা পেত ততদিন কোন অসুবিধা ছিলনা কন্যাসংগ্রহের ব্যাপারে, কিন্তু পরে কন্যার সংখ্যা কমে যাওয়ায় অন্যগোষ্ঠীর দিকে নজর পড়ে এবং বলপূর্বক কন্যাপহরণ চলতে থাকে। অবশ্য এরমধ্যে একটা অর্থনৈতিক দিক ছিল, কারণ স্ত্রীধনকে একরকম সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হ'ত। অপর গোষ্ঠীথেকে কন্যাআনার পশ্চাতে জনবলবৃদ্ধিরও একটা প্রশ্নছিল যে জনবল গোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ সাহায্য করত। যাইহোক বলপ্রয়োগটা পরবর্তীকালে পরিমিত হ'য়ে একটি বৈবাহিত আচারে দাঁড়িয়ে যায়। তাই দেখা যায় যে কোন কোন গোষ্ঠীতে কন্যা অপরগোষ্ঠীথেকে আনা হয় নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় একে Exogamy বা বহিগোষ্ঠী বিবাহ বলা হয়; আর যেখানে গোষ্ঠীর ভিতর থেকে কন্যা সংগ্রহ করা হয় সেখানে বলা হয় Endogamy বা অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ। আমাদের মধ্যে যে বিবাহের চল রয়েছে তাকে অসগোত্র বললে ঠিক হয় কারণ আমাদের বিবাহ হয় অন্তর্গোষ্ঠীক অসগোত্র বিবাহ। বাঙ্গালীরা বিবাহে অন্তর্বর্ণ (caste endogamy) অসগোত্র (clan Exogamy) প্রথা অনুসরণ করে থাকে।

নরনারীর সামাজিক মিলন হ'ল বিবাহ। বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রশ্ন ওঠে বিবাহিত নরনারীর সংখ্যা কজন অর্থাৎ উভয়পক্ষে একজন করে না একাধিক। আমরা যাকে একবিবাহ বলি (monogamy) তাতে একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী মিলে পরিবার রচনা করে। যেখানে স্ত্রীর সংখ্যা একাধিক অথচ স্বামীর সংখ্যা এক সেখানে বিবাহের রূপকে বলা হয় Polygamy বা বহুবিবাহ। বহুবিবাহের আবার প্রকারভেদ আছে। যেমন কোথাও কোথাও স্বামীর সঙ্গে একই আবাসে সবকটি স্ত্রী বসবাস করে, আবার কোথাও দেখা যায় যে স্ত্রীরা স্বতন্ত্র আবাসে বসবাসের সুযোগ পায়। বহুবিবাহের প্রচলন খুব ব্যাপক নয়, এর সঙ্গে ব্যক্তির অর্থনৈতিক মানের প্রশ্নও জড়িত থাকে, কোথাও থাকে সামাজিক সম্মানের প্রশ্ন। বহুবিবাহের বিশেষ প্রচলন আছে আফ্রিকায়। রাজা ও উচ্চবিত্তের পুরুষেরা ১০০র বেশী স্ত্রী রাখত', স্ত্রীরা স্ব স্ব স্বতন্ত্র আবাসে বসবাস করত, সন্তানরাও প্রতিপালিত হ'ত। স্ত্রীর ভাইয়েরা তাদের দেখাশোনার ভার নিত। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গালাদেশে কৌলীন্যপ্রথার মধ্যে এইজাতীয় বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। মুসলমানদেরও মধ্যে এই প্রথার ব্যাপক প্রসার; ওসিয়ানা অঞ্চলের উচ্চবিত্তের পুরুষেরা, এডিষ্টোন দ্বীপের রাজপুরুষেরা বহুবিবাহের সুযোগ ভোগ করে বিশেষতঃ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের পক্ষে এই সুবিধালাভের সুযোগ বেশী। বহুবিবাহের অপররূপ হ'ল Polyandry বা দ্রৌপদীত্ব, এই জাতীয় বিবাহের প্রচলন খুব কম। এই জাতীয় বিবাহে একজন স্ত্রীর বহু স্বামী থাকে। দক্ষিণ ভারতের

নায়ারদের মধ্যে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল, নীলগিরি অঞ্চলের "টোডা"রাও দ্রৌপদীত্ব পছন্দ করে। উত্তরের তিব্বতীদের মধ্যেও দ্রৌপদীত্বের ব্যাপক প্রচলন। নায়ারদের স্ত্রীর পক্ষে বহুবিবাহ করার পশ্চাতে তাদের জাত্যাচারের প্রভাব ছিল। নাম্বুদ্রিব্রাহ্মণদের নিয়ম হ'ল বড়ভাইই কেবলমাত্র বিবাহ করবে, বাকিরা, রিভার্স সুন্দরভাবে বলেছেন : Consorting with nair women ; but as the Children of these unions are nayars, it is a question whether the practice should be regarded as marriage, at any rate, if we regard marriage is, in its essence, an institution by means of which children are assigned the people which they are to occupy in the social community into which they are born (social organisation : Rivers)

পৃথিবীর অন্যান্যস্থানেও এইজাতীয় বিবাহের প্রচলন রয়েছে। বাণ্টুরা কয়েকজন মিলে একটি স্ত্রীকে ভোগ করে। পলিনেশিয়ার মারকুইশদ্বীপে এই প্রথার প্রচলন রয়েছে। ষ্ট্রাবো এবং সীজার বলেছেন যে প্রাচীনকালে আরব এবং ব্রিটানিয়া অঞ্চলেও এই বিবাহের প্রচলনছিল। ক্যানারী দ্বীপের ওয়াঞ্চেসরাও দ্রৌপদীত্বে পক্ষপাতী। একবিবাহ বহুবিবাহ এবং দ্রৌপদীত্বের ভিতর একবিবাহের প্রচলন বিশ্বব্যাপী, তবে অন্যন্যপ্রকার বিবাহও কমবেশী চালু রয়েছে। সমাজের বিশেষ চাহিদা ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে বিবাহের প্রকার প্রচলিত হয়—তবে সামাজিক সম্মানের প্রশ্নও এরমধ্যে থাকে। তাই দেখা যায় যে, যে সমাজে দ্রৌপদীত্বের প্রচলন রয়েছে সেখানে কেউ যদি একবিবাহ করে তবে সে সবারমাঝে শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে ওঠে কারণ সে লোকটি অন্য পাঁচজনের কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে একা একটি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ চালাতে পারে সুতরাং সে সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে উঠবে। অনুরূপভাবে যে সমাজগুলি বহুবিবাহ পছন্দ করে সেখানে একবিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির সামাজিক সম্মান হানি হয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও সে নিম্নমানের মানুষ, কারণ একটির বেশী স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগ্যতা তার নেই। এ অবস্থায় লোকটির মানসিক ভারসাম্যে বিপর্যয় ঘটতে পারে—তাই প্রথমাস্ত্রী নিজেই সচেষ্ট হ'য়ে যে কোন উপায়ে লোকটিকে দ্বিতীয়স্ত্রী পোষণ করার যোগ্যতা আনতে সাহায্য করে, এতে করে প্রথমাস্ত্রীর প্রতিপক্ষ থাকলেও তার মনে এইচিন্তা থাকেনা যে বিবাহিত জীবন তার বিফল। সফল বিবাহিত জীবন প্রত্যেক সামাজিক নরনারীর একান্ত কাম্যধন। বিবাহের কোন বিশেষ প্রকারকেই নৃ-তত্ত্ববিদের পক্ষে ভাল বা মন্দ বলা উচিত নয়, কারণ প্রত্যেক প্রকার বিবাহের পশ্চাতেই রয়েছে সমাজসংগঠনের নিয়মকানুন, আচার আচরণবিধি এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবস্থার সবিশেষ প্রভাব। তবু শেষপর্যন্ত একথা অস্বীকার করা চলেনা যে একবিবাহ অর্থাৎ একপুরুষ ও একস্ত্রী প্রত্যেকের আন্তরিক বাসনাকে তৃপ্ত করে। বাইরের সমস্ত প্রভাব স্বীকার করেও মনঃস্তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর নজর ফেলে বলা চলে যে আহ্নত

মানুষ একবিবাহই পছন্দ করে অন্তত একজনের সঙ্গে একটু বিশেষ সম্পর্ক রাখতে চায়। তাই দেখা যায় যে বহুবিবাহ সমাজেও একবিবাহের চল থাকে—এস্কিমোদের মধ্যে, সাধারণভাবে যাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত, বহু ও একবিবাহের অনুপাত ১:২০। রাল্ফ লিণ্টন সুন্দরভাবে বলেছেন : When the partners find completes emotional satisfaction on each other, they prefers not to admit additional spouses even when there is social pressure for them to do so Such unions seem to provide the maximum of happiness to the parties involved. (১১)

দেবর বিবাহ এবং শ্যালিকা বিবাহ (Levirate & Sororate)

কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর ভাইকে বিয়ে করলে সেই বিয়েকে বলে দেবর বিবাহ (Levirate) [ল্যাটিন লেভী—দেবর] পৃথিবীর বহু জাতিউপজাতির মধ্যে এইজাতীয় বিবাহের প্রচলন হয়েছে। দেবরবিবাহের স্বীকৃতি রামায়ণ ও মহাভারতে পাওয়া যায়। রামের মৃত্যু হ'লে লক্ষ্মণ সীতাকে যে বিবাহ করতে পারে তার উল্লেখ আছে একটি শ্লোকে—

ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে।
লোভোত্তু বৎকৃতে নুনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্ ॥

(রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড ৪৫।৬)

মহাভারতে আছে—পত্যভাবে যথৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম—শান্তিপর্ব ৭১।১২ ; বৌদ্ধজাতকে আছে দেবর বিবাহের উল্লেখ। দেবর বিবাহ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। শ্যালিকাবিবাহের পশ্চাতে একটি অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। চিরিকাহুয়া (chiricahuas) সমাজের দেবর ও শ্যালিকাবিবাহের পশ্চাতে এই কারণ সুস্পষ্ট। ওদের সমাজসংগঠনে যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত অপরদিকে মাতৃস্থানিক আবাস প্রথাও তারা সমর্থন করে। অর্থাৎ বিবাহেরপর ছেলে মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে বসবাস করে, এতে ছেলের পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়—শ্যালিকাবিবাহ এবং দেবরবিবাহকে স্বীকৃতি দিয়ে ওরা অর্থনৈতিক দিকটার ভারসাম্য বজায় রাখে। বিবাহের পর স্বামী তার স্ত্রীর পরিবারের লোক হ'য়ে যায় এবং তাদের উৎপাদন কাঠামোর অংশগ্রহন করে। তখন তার স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে স্বাভাবিকভাবে সে আর তার নিজের পরিবারে ফিরে আসেনা কেননা ইতিমধ্যেই তার পরিবারে তার স্থান অধিকার করেছে তার বোনের স্বামী। যদি লোকটির স্ত্রী মারা যায় এবং তার বিবাহের যোগ্য বয়স যদি না পার হয়ে যায় তবে সে পুনরায় বিবাহ করতে পারে কেবলমাত্র তার শ্যালিদের—যদি তারা বয়স্ক না হয় তবে তাকে (লোকটিকে) অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না তারা

(১১) (The study of man—R. Linton. P 188.)

তাকে স্বামীত্বে বরণ করবার যোগ্য হবে। যদি বয়সের গোলযোগ না থাকে তবে সে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরই তার শ্যালিকে বিবাহ করতে পারে। তবে যদিকোন স্ত্রীলোক না পাওয়া যায় তাহলে সে অন্যপরিবারে কন্যাসন্ধান করতে পারে, কিন্তু এর জন্য তার মৃতাস্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে সম্মতির প্রয়োজন। অনেকসময় এই সম্মতি পেয়ে একবছর কি তার চেয়েও বেশী সময় লাগে কারণ মৃতার পরিবারে এটা শোককাল। তবে সবকিছু কেন্দ্রিত হয় যুবকটির কর্ম ও উৎপাদন ক্ষমতার উপর[১২]।

অনেক আদিবাসীদের মধ্যে জ্যাঠতুতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহআইনসিদ্ধ—অন্য সভ্যসমাজেও এই প্রথার প্রচলন আছে, যেমন মুসলমান সমাজে এই বিবাহ স্বীকৃত। তবে মামাতোপিসতুতো ভাইবোনের বিবাহের প্রচলন সমধিক পৃথিবীর বহু আদিমজাতি ও সভ্যসমাজের মধ্যে এই প্রথার ব্যাপক প্রসার। পারিভাষিক শব্দতালিকায় আমরা এসম্পর্কে আলোচনা করেছি।

কন্যাপন (Bride price) এবং বরপণ (dowry) বিবাহের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। আধুনিক চিন্তাধারায় এর স্থূলদিকটাই বেশী বিবেচনা করা হয়, কিন্তু এর অন্যান্যদিক যেমন সমাজসংগঠনের অর্থ নৈতিক ও নৈতিক বোধগুলির সম্পর্কেও ভেবে দেখা দরকার। সাধারণ বিচারে মনে হয় যে কন্যাবান নারীত্বের পক্ষে একান্ত হানিকর কারণ কণ্যাপণের মাধ্যমে মেয়েদের প্রায় পশুপক্ষীর স্তরে নামিয়ে আনা হয় অর্থাৎ কন্যাপন দিয়ে একভাবে কন্যাকে ক্রয় করা হয়; বরপনের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু সামাজিক সংগঠনের সার্বিক ধারনা, বিশেষতঃ আদিবাসীদের সামাজিক সংগঠনের ধারনা এই আধুনিক চিন্তাকে সমর্থন করেনা।

কন্যাপন (Bride Price)

কন্যাপন হ'ল পুত্র বা পুত্রের পরিবার থেকে দেয় অর্থ যার মাধ্যমে কন্যাকে অপর পরিবার থেকে সংগ্রহ করা হয়। এই অর্থদানের পশ্চাতে বিশেষ কারণ আছে। দুই পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'লে দুইপরিবারের মধ্যে কেবল আত্মীয় সম্পর্কই গড়ে ওঠেনা, সামাজিক অর্থ নৈতিক সম্পর্কও সৃষ্টি হয়। উভয়পক্ষ যত নিকটে আসে তত তারা উভয়ের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের কথা চিন্তা করে। যখন একটি মেয়ে বিবাহের পর তার পিতৃপক্ষীয় পরিবার ছেড়ে স্বামীপক্ষীয় পরিবারে ঘর করতে আসে তখনই পূর্বোক্ত পরিবারের অর্থ নৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়- কন্যাপন হ'ল সেই ভারসাম্যকে স্থায়ী রাখবার একটা প্রচেষ্টা। আধুনিককালে নারীরা যখন অর্থ নৈতিক উৎপাদনে বিশেষ অংশগ্রহন করছে তখম এপ্রশ্নটা বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন কোন মেয়ে একটি পরিবারের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে অটুট রাখতে বিশেষ সাহায্য করছে, তার বিবাহ হ'লে সে স্বাভাবিকভাবে অন্যপরিবারে চলে যায়

(১২) An Introduction to Anthropology—Beals and Hoijer (PP 426-27)

এবং তখন তার পিতৃপরিবার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় অর্থ নৈতিক দিক থেকে; এখানে কন্যাপনকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গ্রহন করা হয়। আদিবাসী সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে কন্যাপনের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা আমরা পূর্ব আফ্রিকার বাগাণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত কন্যাপন সম্বন্ধে আলোচনা করলে বুঝতে পারব। বাগাণ্ডাদের ছেলেরা ১৬ এবং মেয়েরা ১৪ বছর বয়সে বিবাহ করে। বিবাহ ইচ্ছুক ছেলেকে কন্যাপন ও বৈবাহিক আচারাদি পালনের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। অবশ্য অন্যভাবেও কন্যাসংগ্রহ করা চলে; যেমন মৃতভাইয়ের স্ত্রীকে ছেলেটি বিবাহ করতে পারে, অথবা সুকার্যের জন্য কর্তা তার মেয়েকে সেই যুবকের হাতে দান করতে পারেন অথবা অধঃস্তন ব্যক্তির কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে বিবাহযোগ্যা কন্যা সেই যুবক পেতে পারে অথবা কোনসময় লুটেরা সম্পত্তি হিসেবে কোনমেয়েকে সে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু প্রথমবার বিবাহের ব্যাপারে অথবা সবচেয়ে প্রচলিত নিয়মঅনুসারে বিবাহ করতে হ'লে কথাবার্তার মধ্যদিয়ে উপযুক্ত কন্যাপন দিয়ে বিবাহ করতে হয়।

যেহেতু কন্যাপনের জন্য একজন যুবককে বেশ পরিশ্রম করতে হয় এবং সমধিক ক্ষতিস্বীকার করতে হয় সেজন্য বাগাণ্ডা যুবক কন্যানির্বাচনের ব্যাপারেও বেশ যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করে কারণ কন্যাপনে সে যতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা তাকে পুষিয়ে নিতে হয় তা না হ'লে তার অর্থ নৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। কন্যা নির্বাচনের সময় বিশেষভাবে কন্যার স্বাস্থ্য, সন্তানধারণ ক্ষমতা ক্ষেতকরা ও ঘরসাজানোর ক্ষমতা, পরিশ্রম ও বিনয়স্বভাব ইত্যাদির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়—সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। কন্যা নির্বাচন সমাপ্ত হ'লে পর ছেলেটি মেয়ের বড়ভাই ও কাকার মারফৎ মেয়ের পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়—মেয়ের ভাই বা কাকার উপর বিবাহের দেখাশোনার ভার দেওয়া থাকে। সবকিছু ঠিক হ'লে বাগাণ্ডা যুবক "মদ" নিয়ে এসে তাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করে যে সে "ভাল স্বামী হবে"—এ সময় মেয়েটিও তাদের সন্তুষ্টি বিধান করে 'মদ" পরিবেশন করে—যদি সে তা না করে তবে বুঝতে হবে যে বিবাহে সে অনিচ্ছুক এবং স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হ'য়ে যায়। তখন ছেলেটি অন্যত্র কন্যাসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মেয়েটি যদি অনুমতি দেয় তবে বিবাহ স্থির হয় কন্যাপন আসে, গৃহপালিত পশু, মদ, কাপড় এবং অন্যান্য অনেক জিনিসপত্র আসতে থাকে। কন্যাপন যদি খুব কম হয় তবে তা কন্যার বংশমর্যাদার পক্ষে হানিকর আবার পাত্রের খুব কষ্ট হয় যদি তাকে সাধ্যাতীত কন্যাপন দিতে হয়, তাই এক্ষেত্রেও একটা ভারসাম্যের চেষ্টা হয়। কন্যাপন দেওয়া হ'লে বিবাহ হ'তে পারেনা—পন শোধ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত থাকে। গরীবের পক্ষে বিয়ে করতে তাই অনেক সময় লাগে ধনী হ'লে কথাবার্তা ও বিবাহের মধ্যে বেশীদিনের পার্থক্য থাকেনা। মধ্যবর্তী এইসময়ে মেয়েকে ভালভাবে খাওয়ানো পরানো হয় যাতে করে সে স্বামীর মনোমত হ'য়ে উঠতে পারে। পাত্রের বোনেরা কনের বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াত করে কনেকে

স্নান করায়, তার গতিবিধির উপর নজর রাখে, তার শারীরিক ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি তীক্ষ্ণভাবে খুঁটিয়ে দেখে।

কন্যাপনের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্বামীর পুরোপুরি অধিকার বর্তায়, বিবাহিত স্ত্রী স্বামীর ঘরের কর্তৃত্ব গ্রহন করে, তার কাজের সহায়িকা হয়। তার কাজের উপর তার বাপের বাড়ীর কোন ক্ষমতা থাকেনা। আগামী সন্তানরাও তার স্বামীর পরিবারকে শ্রমদিয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে ধনী করে তুলবে। বাগাণ্ডাদের প্রথম দুটি ছেলে পিতার গোত্রভুক্ত হয়, তৃতীয় সন্তানটি মাতৃগোত্র অনুসরণ করে পরে অবশ্য তাকে অর্থের বিনিময়ে পিতৃগোত্রে ফিরিয়ে আনা চলে। যদি কোন স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যায় তবে তার পরিবারের পক্ষ থেকে কন্যাপন ফেরৎ দিতে হয়। সাধারণতঃ কন্যাপন যা পাওয়া যায় তাদিয়ে ঘরে যে তরুণ বিবাহযোগ্য হয়েছে তাকে সাহায্য করা হয়। এইভাবে বৃত্তাকারে কন্যাপন ওদের জীবনকাঠামোয় কাজে লাগে।

বরপণ (Dowry)

কন্যাপনের মত বরপনও (অর্থাৎ বিবাহে বরকে যে অর্থ এবং সাক্ষী দেওয়া হয়) বিবাহের অঙ্গ। তবে আদিবাসী সমাজে বরপণের চেয়ে কন্যাপনের প্রচলন বেশী। পন প্রথার সঙ্গে আমরা হিন্দুরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর পরিচিত এবং এই প্রথার তিক্ত অভিজ্ঞতা কোন না কোন সময় সবপরিবারকেই লাভ করতে হ'য়েছে। তবে নিম্নশ্রেণীর (by caste) লোকদের মধ্যে আবার বরপণের চেয়ে কন্যাপনের চল ব্যাপক। বর্তমান-কালে পণপ্রথার প্রতি সরকারী ও বেসরকারী বিধিনিষেধ জারি হ'য়েছে তবু ভিতরে এ প্রথা এখনও চলছে এবং এ প্রথার ধারাবাহিকতা সমাজের ভিত্তিমূলে পৌঁছে গেছে। প্রাচীন হিন্দুসমাজে এ প্রথা কেবল উচ্চবর্গ ধনীমহলে ও রাজামহারাজাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরে এর প্রভাব খুববেশীপরিমানে বিস্তৃত হয়। পণ প্রথার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৩]

(ক) বাল্যবিবাহ-অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে বালকবালিকার বিবাহ হ'ত। ফলে এদের জীবনে নিরাপত্তার জন্য পাত্র পক্ষ থেকে বরপণ গ্রহণ করা হ'ত কারণ পাত্রকেই তার পরিবার লালন পালন করতে হ'ত। সুতরাং এখানে নিরাপত্তার জন্য পণ গ্রহণ করা হ'ত। (খ) উচ্চবর্ণে বা উচ্চবিত্তে কন্যা সম্প্রদানের যে ইচ্ছা কন্যাপক্ষের থাকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার পাত্রপক্ষ থেকে বরপণ গ্রহণের মাধ্যমে করা হয়। গ) অর্থগৃধ্নু পাত্রপক্ষ সবসময়ই কন্যাপক্ষ থেকে অর্থ ও সামগ্রী আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয় এবং যেহেতু কন্যার বিবাহ দিতে ধর্মত সব হিন্দু পরিবারই বাধ্য তাই তাদের পাত্রপক্ষের কাছে নতি স্বীকার করতেই হয়।

(১৩) ভারতীয় সামাজিক সংগঠন (হিন্দী)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখার্জী।
শ্রীগোপাল কৃষ্ণ অগ্রবাস। পৃ-৯৮-৯৯

ঘ) বরপণের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত—যাদের সামাজিক মর্যাদা যতবেশী তাদের ছেলের ক্ষেত্রে বরপণও ততবেশী, বরপণ না নিয়ে বিয়ে করলে সমাজে পাত্র ও পরিবারের সম্মান কমে যায় নাকি। পুত্রের ইচ্ছা না থাকলেও পরিবারের ধারাকে ত' অস্বীকার করা চলেনা। অনেক সময় সামাজিক আচার পালনের জন্য বরপক্ষকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু টাকা গ্রহণ করতে হয়। উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও আমাদের সামান্য বক্তব্য আছে। হিন্দুবিবাহে যে বরপণ প্রথা প্রচলিত আছে, আমাদের মনে হয়, তার কারণ হ'ল মেয়েদের সামাজিক সম্মান পুরুষের তুলনায় অনেক কম। এর পশ্চাতে হয়ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব থেকে থাকবে। সব থেকে প্রধান কথা হ'ল মেয়েদের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশ কম, অথবা নিতান্ত কম বলে তা বিবেচিত হয়। কন্যাপণ প্রসঙ্গে আমরা অর্থনৈতিক ভারসাম্যের কথা আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রেও দেখব যে অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে মেয়েরা সরাসরি জড়িত নয় বলে তাদের আমরা মোটামুটি বোঝা হিসেবে গ্রহণ করি—সাংসারিক অনেক কাজ তারা করলেও প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে ওরা জড়িত নয় বলেই হয়ত আমাদের মধ্যে এই ধারণাটা এসে থাকবে। প্রাচীন পরিবার ও ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে আর্যদের মধ্যে কীভাবে ধীরে ধীরে পুরুষতন্ত্র প্রবল হ'য়ে ওঠে ও নারীতন্ত্রের পতন ঘটে এবং অর্থনীতি কীভাবে পুরোপুরি পুরুষদের হাতে চলে যায় : The overthrow of mother right was the world historic defeat of the female sex. The man seized the reins in the house also, the woman was degraded, enthralled, the slave of man's lust, a mere instrument for bearing children.[১৪] নারী সম্পর্কে সমস্ত মধুর কল্পনা যতই থাক তাদের সন্তানধারক যন্ত্র হিসেবে দেখার ভাবটা আমাদের প্রবাদে ও সাহিত্যে দেখা গেছে,—পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যাং অথবা মনুতে পাই :—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রো ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ।। মনু ৯/৩

শ্লোকটির মধ্যে নারীর পরতন্ত্রতার কথা একেবারে স্পষ্ট এবং কারণ হ'ল এই যে অর্থনীতির সঙ্গে তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। যেখানে এই যোগটা আছে সেখানে নারীর অন্য অবস্থা এবং সেখানে বরপণের স্থানে কন্যাপণের প্রচলন। সমাজ পরিবর্তনশীল, অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে—নারী আজ আমাদের উৎপাদনে অংশ করতে পারছে এবং তাই অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বরপণের ক্ষেত্রে নিছক ট্রাডিশন ছাড়া অন্যকোন প্রশ্ন থাকবেনা। ইতিমধ্যেই তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। চাকুরীয়া মেয়ের ক্ষেত্রে বরপণ নিশ্চই কম হয়।

---

১৪ The origin of the Family etc—F, Engels P-92.

বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce)

বিবাহ যেমন আছে বিবাহবিচ্ছেদও তেমন প্রত্যেক গোষ্ঠী বা জাতির আইনকানুনে স্বীকৃত। তবে স্থান ও কাল অনুযায়ী বিষয়টির তারতম্য ঘটে। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে স্বামী বা স্ত্রী উভয়েরই প্রায় সমান অধিকার আছে। জি, পি, মার্ডক বলেছেন—৪০টি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে ৩০টির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর অধিকার প্রায় সমান। কেবল ৬টি সমাজে পুরুষের জোর প্রমাণিত, সেই ৬টি সমাজ হ'ল—ইরাকের কাউ মুসলিম, মিশরের সিওয়ান, জাপানী, বাগাণ্ডা, বোলিভিয়ার সিরিওনো, গ্রাণচেকো অঞ্চলের গুয়াকুরু ইণ্ডিয়ান। ৪টি সমাজে মেয়েদের অধিকার অনেক বেশী। সমাজগুলি হ'ল—নিউগিনির কোস্তমাস, পশ্চিম আফ্রিকার ডাহোমিয়ান, ক্যালিফোরনিয়ার ক্ল্যরোক ইণ্ডিয়ান এবং ব্রাজিলের উইটোটো। বিবাহ-বিচ্ছেদের পশ্চাতে দুষ্ট যৌনপ্রবৃত্তি, দুর্ব্যবহার ইত্যাদির কারণ থাকে। অস্ট্রেলিয়ার আরাণ্ডাদের মধ্যে দেখা যায় স্বামী স্ত্রীকে সামান্যতম সন্দেহের বশে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক তা পারেনা। যদি সে সব সময় স্বামীর কাছ থেকে কুব্যবহার পায়, তাড়িত পীড়িত এবং লাঞ্ছিত হয় তবে তার নিষ্কৃতির একপাত্র উপায় হ'ল পলায়ণ, কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিস্তার নেই—তাকে ধরে এনে আবার তার স্বামীর কাছে দেওয়া হয়। বাগাণ্ডাসমাজেও অনেকটা এই রকম জিনিস দেখা যায়। স্ত্রীলোক যদি বন্ধ্যা হয় তবে তাকে আর পলায়ণ করতে হয়না, স্বামী নিজেই তাকে পাঠিয়ে দেয় আর ফেরৎ চায় কন্যাপন অথবা ঘরে রেখে তার সঙ্গে নিতান্ত দাসীর মত ব্যবহার করে। বন্ধ্যাত্ব নারীজীবনের একান্ত অপরাধ। উপরোক্ত দুটি সমাজে নারীর সামাজিক মান একেবারে নিম্নস্তরের কোনরকম সামাজিক মর্যাদাই তারা পায়না। নারী অর্থ নৈতিক উৎপাদনে সহায়িকা হ'লেও একান্নবর্তী পরিবারে পুরোপুরি পুরুষের কর্তৃত্বের কাছে নত হ'য়ে থাকে। মেয়েদের কোনরকম যৌন শৈথিল্য মার্জনা করা হয় না, তাদের কোনরকম সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও দেওয়া হয়না।

হিন্দুদের বিবাহবন্ধন জন্মজন্মান্তরের। তবে বর্তমানকালে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হ'য়েছে এবং এরফলে অনেকজীবন সময়মত রক্ষা পেয়েছে। সহবাস অসম্ভব হয় স্ত্রীপুরুষের স্বভাব ব্যবহারের জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে। মনুতে বিবাহ বিচ্ছেদের সূত্র না থাকলেও পত্নীত্যাগের কারণ উল্লেখ আছে—

বিধিবৎ প্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্।
ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনা চোপপাদিতাম্॥ (৯।৭২, মনু)

(ক্রমশঃ)

'সীসেমি অ্যাণ্ড লিলিজ'

উন্মাদ, কবি এবং প্রেমিককে সেকসপীয়র একই শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। মহাকবি মানবচরিত্র সম্পর্কে বহুদর্শী ; তাঁর নাটকের পাত্র পাত্রীর উক্তি এই সাক্ষ্যই দেয়। এই সকল উক্তির অভ্রান্ততার প্রমাণ আমাদের জীবনে অহরহই আমরা পাই। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই আমাদের আশেপাশে এরকম অনেক চরিত্রের কিছু কিছু নমুনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

সম্প্রতি কলকাতায় গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে অনেক কবি-প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—তাঁরা সেকসপীয়র বর্ণিত অপর দুটি শ্রেণীতেও পড়েন কিনা—অথবা সেই দুই শ্রেণীর গুণাবলীও তাঁদের মধ্যে রয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে যাঁদের আমরা কস্মিনকালেও কবি বলে সন্দেহ করিনি তাঁদের এই নতুন পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমরা অবাক হয়ে গেছি।

এতদিনে আমরা হয়তো জোরগলায় বলতে পারব—"মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।"

অবশ্য গ্রন্থাগারিক শুধুই গ্রন্থাগারিক হবেন, শুধু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার বাইরে তাঁর জীবনে আর কিছুই থাকবে না—এমন কথা ভাবাই যায় না। একাধারে গ্রন্থাগারিক এবং অন্য কিছু হতে তাঁর কোন বাঁধা থাকবে এটা ঠিক নয়। অন্য দশজনের মত ক্রীড়া কৌতুক, 'হবি' বা বিচিত্র শখের চর্চা করা তার চলেনা একথা যে বলে তার মুখদর্শন করা উচিত নয়। আর গ্রন্থাগারিকের পক্ষে কাব্য চর্চাও নিশ্চয়ই অমার্জনীয় অপরাধ নয়। কবি-প্রতিভা হাজারে একটিও মেলে কিনা সন্দেহ।

অন্যান্য বিশিষ্ট বৃত্তিধারীদের মধ্যেও বিচিত্র শখের চর্চা প্রচলিত আছে দেখা যায়। বৃত্তিধারীদের সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নানা পত্র পত্রিকায় মোটরগাড়ী, ব্রিজখেলা, ভ্রমণ, উদ্যানরচনা, ফোটোগ্রাফী ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত কলাম থাকে। বহু সংখ্যক পাঠক যে এগুলি আগ্রহ সহকারে পাঠ করে থাকেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

কয়েক বছর আগে 'গ্রন্থাগার'—এর পাতায় কিছু কিছু রসাত্মক রচনা প্রকাশিত হতে থাকায় কিছুসংখ্যক সীরিয়াস গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী চিন্তিত, এমন কি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। চারদিকে 'গেল' 'গেল' রব শোনা গিয়েছিল। এখন তাঁরা নীরব হয়েছেন। হয়তো সময়ে সবই সয়ে যায়।

জটিল তত্ত্বালোচনার মাঝখানে একটু অন্যধরণের চিন্তা (diversion) হয়তো সত্যিই কিছু খারাপ নয়। সীরিয়াস ধরণের পত্রিকায়ও কখনো কখনো হাস্যকৌতুক এবং হালকা সুরে রস রচনা প্রকাশিত হ'তে দেখা যায় সম্ভবতঃ একটু প্রাণ সঞ্চারের জন্যই। হিউমার বর্জিত সীরিয়াসনেস কখনো কখনো মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। মাঝে মাঝে মনের খোলা জানালার ধারে বসা সকলের পক্ষেই স্বাস্থ্যকর এবং শিক্ষাপ্রদও বটে।

সম্প্রতি কলকাতায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত এক আলোচনা চক্রে জনৈক মধ্যবয়স্ক

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী নাকি একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন। কবিতার নাম: 'সীসেমি অ্যাণ্ড লিলিজ'। সম্ভবতঃ বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও সমালোচক John Ruskin এর 'Sesame and Lilies'—এর অনুসরণেই এই নামকরণ। কবিতাটিতে আধুনিক যুগের জীবন যন্ত্রণা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জটিল থেকে জটিলতর পরিণতির ফলে গ্রন্থাগারিকদের যে যাঁতা কলে পিষ্ট হতে হচ্ছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই কবিতা সম্পর্কে অবশ্য কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু 'এই প্রসঙ্গে যে কথাটি মনে পড়ে গেল তা বেদনা দায়ক।

কলকাতার গ্রন্থাগারিকদের উল্লিখিত আলোচনা চক্রে এক ভদ্রলোককে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায় তিনি কারণে অকারণে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে বক্তৃতা করছেন। এই বক্তৃতা মাঝে মাঝে অসংলগ্ন এবং আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। সীরিয়াস বিষয়ের আলোচনা এভাবে লঘু হয়ে যাওয়ায় অনেকে বিরক্ত হন কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হন কিন্তু কেউই তাকে ঘাটাতে সাহস করেন না।

কে এই ভদ্রলোক? খুব দূর অতীতের কথা নয়। আলোচনা চক্রের উল্লিখিত হাস্যাস্পদ ব্যক্তিটির নাকি এক সময়ে ভাল চাকুরী, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই হয়েছিল একজন ব্রীলিয়াণ্ট স্কলারও নাকি। এক সময়ে বাঙ্গালোরে ডঃ রঙ্গনাথন প্রতিষ্ঠিত গবেষণা কেন্দ্রে অধ্যাপনাও করেছেন। কিন্তু কী থেকে কী হয়ে গেল। এখন ডঃ রঙ্গনাথন ও তাঁর কোলন বর্গীকরণ সম্পর্কে প্রায়ই তাঁকে তিক্ত মন্তব্য করতে শোনা যায়। বাঙ্গালোরে অবস্থানকালেই তাঁর নাকি একটু একটু অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং কাজ লোকের চোখে ধরা পড়ে। এঁকে নাকি নিয়মিত দেখা যেত সমুদ্রতীর থেকে নুড়ি কুড়িয়ে ঝুলি ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে ডঃ রঙ্গনাথনের বাড়ীর পাশে হাজির হতে। একটি একটি করে নুড়ি বাড়ীর দিকে ছুড়তেন এবং অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলতেন, 'দিস ইজ ইয়োর ফ্যাসেট অ্যাণ্ড, দিস ইয়োর কোসি ··আইডিয়াল প্লেন···ভার্বাল প্লেন···অল ছাট।'
শোনা যায় কিছুদিন নাকি অ্যাসাইলামেও ছিলেন।

*　　*　　*

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পূর্ববর্তী সম্পাদকের পতন হয়েছে। এই পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'—এই সরল নীতি বাক্যটি থেকে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করলে হয়তো তাঁর বিদায় পর্বটি এমন হত না। কিন্তু দর্পনারায়ণ দেবের কি আর কিছুতেই শিক্ষা হয়!

ইতিমধ্যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল। এক সম্পাদক গেলেন তার জায়াগায় আর এক সম্পাদক এলেন।

'গ্রন্থাগার' দীর্ঘজীবি হউক! 'গ্রন্থাগার' জিন্দাবাদ!

নতুন সম্পাদককে আমরা 'হার্টি ওয়েলকাম (Hearty Welcome) জানাচ্ছি। কিন্তু পূর্বতন সম্পাদককে 'হার্টি ফেয়ারওয়েল' (Hearty Farewell) জানাতে পারছি না আমরা কেউই।

—ভণ্ডুলানন্দ শর্মা

পরিষদ কথা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে পরিষদের সর্বশেষ কার্যক্রম :—

বিভিন্ন কলেজ গ্রন্থাগারে ইউ. জি. সি বেতনক্রম চালু করা সম্পর্কিত সরকারী আদেশ প্রেরণে বিলম্ব ঘটায় পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ক্ষোভ জানান হয়। পরিষদের এক প্রতিনিধিদল শিক্ষাবিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী পি. সি. মুখার্জ্জী ও ডি. ডি. পি. আই শ্রী পি. বি. মুখার্জ্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রী পি. সি. মুখার্জ্জী, এ বিষয়ে যা করণীয় তা ত্বরান্বিত করবার আশ্বাস দেন।

প্রতাপ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগারের কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে ডি. এস. ই. ও সঙ্গে সাক্ষাৎকার :—

ডি. এস. ই. ও. শ্রীমতী তপতী রায় পরিষদের সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধিদলকে বলেন যে প্রতাপ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যথাযথ বেতনক্রম ও মহার্ঘভাতা সম্পর্কিত দাবী তিনি সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শকের নিকট পেশ করবেন।

অদ্বৈত আশ্রমের গ্রন্থাগারিকের মহার্ঘভাতা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা :—

পরিষদ উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে সরকারের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছেন, সে বিষয়ে শ্রীমতী তপতী রায় বলেন যে অদ্বৈত আশ্রমের গ্রন্থাগারিকের মহার্ঘভাতা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরিদর্শকের নিকট সুপারিশ করেছেন। ঐ বিষয়ে শ্রীমতী তপতী রায়ের পত্রের অনুলিপি পরিষদে এসেছে।

শিক্ষাসচিবের সঙ্গে পরিষদের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার :—

গত ১৭ই জুন '৬৯, পরিষদের এক প্রতিনিধিদল শিক্ষাসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চালু করা, কলেজ গ্রন্থাগারে ইউ. জি. সি. বেতনক্রম অবিলম্বে প্রবর্ত্তন করা, প্রতিটি বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী-গ্রন্থাগারিক সহ পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাকালীন সুযোগ-সুবিধা দান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাসচিবের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। শিক্ষাসচিব বিশেষ আগ্রহভরে এই সকল বিষয় আলোচনা করেন এবং আলোচনার ফলাফল লিখিতভাবে পরিষদকে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য পরিষদের প্রচার কার্য :—

সম্প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে যোগদান-কারী প্রতিনিধিরা 'গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তনের জন্য' গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ

করার জন্য আবেদন করেন। আড়িদহ পাবলিক লাইব্রেরী, বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী শ্রীগুরু গ্রন্থাশ্রম (খড়দহ), প্রভৃতি গ্রন্থাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, সত্যব্রত সেন, তুষার সান্যাল পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন। এই সকল জন সভায় পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবী জানান হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা, নির্বাচন ও প্রথম কাউন্সিল সভা।

গত ৮ই জুন, রবিবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পরিষদের, পি—১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম নং ৫২, কলিকাতা—১৪ এই ঠিকানার নবনির্মিত ভবনে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভার প্রারম্ভে ডঃ জাকির হোসেন, মীরা দেবী, সি, এন, আন্নাদুরাই, সরোজ আচার্য, প্রতিমা ঠাকুর, রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ফনিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, মনোরঞ্জন রায়, অমলেন্দু দেব, ললিতানন্দ গুপ্ত, (অমলা দেবী) ও জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের তিরোধানে একমিনিট নীরবে শোক পালন করা হয়।

এর পর গত ১৯৬৮ সালের বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। আলোচ্য বিবরণী সম্পর্কে শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষের এক লিখিত প্রশ্নে বার্ষিক বিবরণী বাংলায় প্রকাশ করার প্রসঙ্গের উত্তরে শ্রীফনিভূষণ রায়ের প্রস্তাব ক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি গ্রন্থাগারে সংক্ষিপ্তসারে প্রকাশ করা হবে, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষন বিভাগ ও পরিষদ প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনীর বিস্তারিত বিবরণ বার্ষিক বিবরণীতে দেওয়া হবে এই মর্মেও সভা প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরিষদ ভবন নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার এক বিবরণী পেশ করে সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় পরিষদের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। এই সমস্যাব আশু সমাধানে তিনি পরিষদ সদস্য ও বৃত্তিকুশলীদের নিকট মুক্তহস্তে পরিষদ তহবিলে দান করতে অনুরোধ জানান। পরিষদ সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পেশ করা ও তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়াব পর পরিষদের, ১৯৬৯ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। (নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম অন্যত্র প্রকাশিত)। নির্বাচন শেষে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুষ্ঠু সভাপতিত্বে পরিষদকে পরিচালনার জন্য এবং পরিষদের কর্মধারাকে কার্যকরী করার জন্য সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রসংশা করেন। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের

রজত জয়ন্তী উৎসব পালনের জন্য এক বিশেষ প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হোক, এবং এই সম্পর্কে কাউন্সিল সভা স্থির সিদ্ধান্ত নেবেন বলে ঠিক হয়। কেবলমাত্র বাগাড়ম্বরে নয়, প্রকৃত কার্যের মাধ্যমেই কোন পরিষদকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এই সম্পর্কে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বৃত্তিকুশলী প্রত্যেকের সহযোগিতা আহ্বান করেন পরিষদ পরিচালনার জন্য। ১৯৬৯ সালের মধ্যেই পশ্চিম-বঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে হবে এই সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় সকলকে একমত হয়ে পরিষদের অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে সহযোগিতার জন্য অহ্বান জানান শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল।

সভাপতির ভাষণে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন কেবলমাত্র গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হবে না। এজন্য প্রয়োজন প্রতিটি অধিবাসীকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করা। গ্রন্থাগার চেতনা বৃদ্ধির জন্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন বাঙলাদেশে এমন কোন গ্রন্থাগার নেই যা মানুষের মনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার সম্যক রূপকে তুলে ধরতে পারে। এজন্য তিনি প্রস্তাব করেন অবিলম্বে কলকাতায় একটি আদর্শ সার্বজনীন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হোক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে বলেন। শ্রীসরোজ কুমার হাজরা গ্রন্থাগারিক কে গ্রন্থাগার ব্যতীতও সমাজের প্রতি কর্তব্যশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। শ্রীফনিভূষণ রায় বলেন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। কারণ কোন উন্নতির কথা চিন্তা করতে গেলে গ্রন্থাগার আইনই হবে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বৃত্তিকুশলী গত যোগ্যতা এই দুইয়ের সমতা রক্ষার জন্যও শ্রীরায় প্রস্তাব করেন।

উপস্থিত সকলকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করে সভাস্থ প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে ৩৪ শ বার্ষিক সাধারণ সভাও নির্বাচন পর্ব শেষ হয়।

গত ৮ই জুনের সাধারণ সভায় নবনির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যগণ ২২ শে জুন, রবিবার, পরিষদের নবনির্মিত ভবনে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় প্রথম কাউন্সিল সভায় মিলিত হন। এই সভায় মোট ৩৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের নব নির্বাচিত সভাপতি শ্রী অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়: (ক) বিগত কাউন্সিল সভার ধারা বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়, (খ) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী পঠিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়, (গ) ১৯৬৯ সালের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ গৃহীত হয়, (ঘ) বর্তমান কর্মসচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৯৬৯ সালের কর্মসূচী গৃহীত হয় (এই কর্মসূচী অন্যত্র দেওয়া হয়েছে) (ঙ) কাউন্সিল সদস্য দিগের মধ্য হতে ৭ জনকে কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচন করা হয়, ৩জন সদস্যকে কাউন্সিলে 'কো অপ্ট' করা হয়, বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করা হয়, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, সহ গ্রন্থাগারিক, জন সংযোগ তথ্য প্রচার অধিকর্তা প্রভৃতি মনোনয়ন করা হয়। (নির্বাচনের সম্পূর্ণ তালিকা অন্যত্র দ্রষ্টব্য)

(চ) পরিষদের জন্য একজন হিসাবরক্ষক তথা টাইপিষ্ট নিয়োগের ভার কার্যনির্বাহক সমিতিকে দেওয়া হয়, (ছ) জনসাধারণের পাঠাভ্যাস সমীক্ষা সম্পর্কে এক পূর্ণ পরিকল্পনা কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট পেশ করতে শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে অনুরোধ করা হয়, (জ) পরিষদের শিক্ষণ ব্যবস্থায় ডেপুটেড প্রার্থীদের ভর্তির বর্তমান ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী পর্যালোচনা করে এক পূর্ণ বিবরণ কার্যনির্বাহক সমিতিকে পেশ করার জন্য উপসমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, (ঝ) ৬ই আগষ্ট ১৯৬৯ তারিখে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বিধান সভা অভিযানের এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সভান্তে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান পরিষদের পক্ষ হতে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, ও পরে সভা শেষ হয়।

: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৬৯ সনের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবিত কার্যাবলী :

১। কাউন্সিলের কর্তব্য।

অন্তত তিনটি কাউন্সিল সভার আয়োজন করে পরিষদের গৃহীত কার্যাবলীকে কার্যে রূপায়ন ও প্রত্যেক কাউন্সিল সদস্যের সক্রিয়ভাবে পরিষদের কর্মধারায় অংশ গ্রহণ।

২। কার্যনির্বাহক সমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২১। পরিষদ পরিচালনা ও দৈনন্দিন কার্যাবলী—

ক) পরিষদের কর্মচারীদের কার্যের তদারকি, যোগাযোগ, হিসাব রক্ষনাবেক্ষণ, সম্পদ ও নথিপত্রের দায়িত্ব গ্রহণ, প্রকাশনা, সভা সমিতি আহ্বান করা, বিভিন্ন উপসমিতি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের কার্যে রূপায়ন।

খ) গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন পথ ও উপায় নির্দেশ, যোগাযোগ, প্রদর্শনী, গণ অভিযান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা ও তদুপরি পরিষদ পরিচালনা।

২২। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা—

ক) গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, শিক্ষা খাতের অন্যূন ২·৫ অংশ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় বরাদ্দ, স্বতন্ত্র্য গ্রন্থাগার কৃত্যক, কলিকাতার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ও ১০০টি ওয়ার্ড গ্রন্থাগারের প্রবর্তন, শিক্ষা কমিশনের গ্রন্থাগার সম্পর্কীত সুপারিশ বলীর কার্যে রূপায়ন, মহাবিদ্যালয় ও কারীগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের অন্ততঃ ৬·৫ শতাংশ গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ, সাংস্কৃতিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারকে গবেষণা তথা সার্বজনীন গ্রন্থাগার হিসাবে পণ্য করা প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে কর্মপন্থা গ্রহণ।

খ) ২৩শ বার্ষিক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ সমূহের কার্যে রূপায়ন, ৬ই আগষ্ট বিধানসভা অভিযানকে সফল করে তুলতে পথসভা, যোগাযোগ প্রাচীরপত্র,

পুস্তিকা ও স্মারকলিপি প্রভৃতির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং এই সম্পর্কে এক তহবিল গড়ে তোলা।

৩। বিভিন্ন উপসমিতির কর্তব্য।

ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি—

শিক্ষণের বাৎসরিক মূল্যায়ন, কার্যাবলী পরিচালনা, স্পনসর্ড মহিলা কর্মিদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লওয়া, পরিষদ ভবনে শিক্ষণের ব্যবস্থা।

খ) বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি—

গ্রন্থাগার কর্মিদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নতির জন্য আন্দোলন, কর্মিদের উপর অবিচারের প্রতিকার, বিভিন্নসংস্থার সঙ্গে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক স্থাপন।

গ) সংগঠন ও সংযোগ উপসমিতি—

পরিষদের কার্যাবলীকে জনপ্রিয় করার ও প্রচারের ব্যবস্থা করা, বিভিন্নস্থানে পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা, অন্তত: ২৫০ জন নতুন সদস্য সংগ্রহ করা, গ্রন্থাগার দিবস পালন ও বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

ঘ) অর্থবিষয়ক উপসমিতি—

পরিষদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য উপায় নির্ধারণ, এবং বার্ষিক হিসাব রক্ষণ।

ঙ) গৃহনির্মাণ উপসমিতি—

১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পরিষদ ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলের কার্য সমাপণের ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যকীয় আসবাব পত্র ক্রয়, পরিষদ ভবন নির্মাণের জন্য বিভিন্নভাবে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা, সরকারের নিকট আরও অনুদানের জন্য অনুরোধ, প্রভৃতি।

চ) পরিষদের গ্রন্থাগার উপসমিতি—

আধুনিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা, ও গ্রন্থাগারের সমস্ত প্রকার দায়দায়িত্ব গ্রহণ।

ছ) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা উপসমিতি—

গ্রন্থাগার যথাসময়ে প্রকাশ, সম্পাদনা, বিক্রয়, প্রচার অধিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্যের আবেদন।

জ) প্রকাশনা উপসমিতি—

পরিষদের প্রকাশনার সমীক্ষা, শিশু গ্রন্থপঞ্জীর সংস্করণ প্রকাশ, 'গ্রন্থকার নামা', 'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা' 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরী' প্রভৃতির সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের পাঠস্পৃহার এক সমীক্ষার ব্যবস্থা করা।

ঝ) সংবিধান সংশোধনী উপসমিতি—

• বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনা করে নতুন সংশোধন বা সংযোজনের কথা উল্লেখ করে সাধারণ সভা আহুত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট পেশ করতে হবে।

৪। কাউন্সিল সদস্যদের বিশেষ কর্তব্য।

পরিষদের কার্যাবলীকে কার্যে রূপান্তরিত করতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ. গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য অন্ততঃ ১০ টাকা করে সংগ্রহ, অন্ততঃ একজন আজীবন সদস্য ও ৫ জন ব্যক্তিগত সদস্য বৃদ্ধি, গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য অন্ততঃ ২৫ টাকা সংগ্রহ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি, আই, টি স্কীম নং—৫২, কলি-১৪।

১৯৬৯ সনের কার্যনির্বাহক সমিতি, কাউন্সিল সদস্য এবং বিভিন্ন উপসমিতি সমূহ

১। কার্যনির্বাহক সমিতি :

(কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ও অন্যান্য কাউন্সিল সদস্য দ্বারা গঠিত)

সভাপতি : শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় (৮,৫৫ ফার্ণ রোড, কলি-১৯)

সহ-সভাপতি বৃন্দ : সর্বশ্রী অনাথবন্ধু দত্ত (২৬, পীতাম্বর ঘটক লেন, কলি-২৯), চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (৬ই/২, আকতাব মস্ক্ লেন, কলি-২৭), প্রমীল চন্দ্র বসু (বসুনগর, পোঃ মধ্যমগ্রাম, জিঃ ২৪ পরগণা), ফনিভূষণ রায় (১৪/এ, মহারাজা নন্দকুমার রোড, কলি-২৯), ও সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৯; ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কলি-৫৬)।

সম্পাদক : শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী (১৭, শহীদ দীনেশ গুপ্ত রোড, কলি-৩৪)।

যুগ্ম-সম্পাদক : শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২)।

সহ-সম্পাদক : শ্রীতুষার কান্তি সান্যাল (১৪ডি/১বি, দমদম রোড, কলি-৩০)।

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ('জিজ্ঞাসা,, ১এ, কলেজ রো, কলি-৯)।

সম্পাদক : গ্রন্থাগার : শ্রীবিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১০০০/১, ত্রিপুরা সুন্দরী রোড, পোঃ বোড়াল, জিঃ ২৪ পরগণা)।

গ্রন্থাগারিক : শ্রীঅরুণ কুমার রায় (বি/১, রামকৃষ্ণ উপনিবেশ, কলি-৩২)।

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী চঞ্চল কুমার সেন (৪, ঝিলপার, নিউ বারাকপুর, ২৪ পরগণা), তপন সেনগুপ্ত (৫৬, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলি-৩২), নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (৩/৫, মধুসূদন ব্যানার্জি রোড, কলি-৫৬), পূর্ণেন্দু প্রামানিক (৭৫, মনসাতলা লেন, কলি-২৭), বাণী বসু (৩/এ, করডাইস লেন, কলি-১৪), সত্যব্রত সেন, (৫৩, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলি-৯) এবং সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১০০/১, ভুপেন বসু এভিনিউ, কলি-৪)

১২। **কাউন্সিল সদস্যগণ :**

১২(১) **ব্যক্তিগত সদস্যগণ :** সর্বশ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত (জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর, ২৪ পরগণা), দ্বিজেন গুপ্ত (কো-অপ্টটেড) (১৭/১ কামিনী স্কুল লেন, পোঃ সালকিয়া, হাওড়া), প্রবীর দে (৪১, ঈশ্বর গুপ্ত রোড, দমদম, কলি-২৮), বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য (পোঃ গ্রাঃ মাকড়দহ, হাওড়া), রামকৃষ্ণ সাহা (৫৩, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলি ৯), শান্তিপদ ভট্টাচার্য (কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলি-১২), শুভ্রাংশু মিত্র (১৫, সুভাষ এভিনিউ, পোঃ শ্রীরামপুর, হুগলী), সুধীর ব্রহ্ম (কো-অপ্টটেড), (৫/বি, অক্রূর দত্ত লেন, কলি-১২), সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২/৯৬, নাকতলা, কলি-৪০) হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী (১০৮/৮, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা), হরেকৃষ্ণ দত্ত (কো অপ্টটেড) এবং হিরণকুমার দত্ত (৮/এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি-১২)।

১২(২) **প্রতিষ্ঠানগত সদস্য :**

কলিকাতা : (১) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি ১২)
(২) কানাই স্মৃতি পাঠাগার, (৩৪, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-২৩)
(৩) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, (১৭/১/২, মনসাতলা লেন, কলি-২৩)
(৪) শিশির স্মৃতি পাঠাগার, (৩২এ, হরিসভা ষ্ট্রীট, কলি-২৩)

চব্বিশ পরগণা :(১) নেহেরু স্মৃতি পাঠাগার, (সুভাষনগর, পোঃ বনগাঁ, ২৪ পরগণা)
(২) রবীন্দ্র পাঠাগার, (আগরপাড়া, ২৪ পরগণা)

জলপাইগুড়ি : (১) মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী, (পোঃ মেটেলী, জলপাইগুড়ি)

নদীয়া : (১) জেলাগ্রন্থাগার, (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

পুরুলিয়া : (১) বিবেকানন্দ পাঠাগার, (পোঃ কাটিকা, পুরুলিয়া)

বর্দ্ধমান : (১) জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (পোঃ জাড়গ্রাম, বর্দ্ধমান)
(২) জোতরাম বাণী মন্দির, (পোঃ জোতরাম, বর্দ্ধমান)

বাঁকুড়া : (১) ধ্রুব সংহতি, (পোঃ বালসী, বাঁকুড়া)

বীরভূম : (১) কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, (পোঃ কীর্ণাহার, বীরভূম)

মালদহ : (১) স্বজনী গ্রন্থাগার, (মুচিয়া, আইহো, মালদহ)

মেদিনীপুর : (১) জেলা গ্রন্থাগার, (পোঃ তমলুক, মেদিনীপুর)

মুর্শিদাবাদ : (১) কাগ্রাম নবারুণ সংঘ পাঠাগার, (পোঃ কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ)

হাওড়া (১) বিবেকানন্দ পাঠাগার, (৯৭/৩, নস্কর পাড়া রোড, ঘুসুরী, হাওড়া-৭)
(২) সবুজ গ্রন্থাগার, (পোঃ নিজবালিয়া, হাওড়া)

হুগলী : (১) মগরা সাধারণ পাঠাগার, (পোঃ মগরা, হুগলী)

(২) হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ, (পোঃ চুঁচড়া, হুগলী)

১২ (৩) **প্রতিষ্ঠানগত প্রতিনিধি :**

(১) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, (শিলিগুড়ি, জিঃ দার্জিলিং)

(২) কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান, (৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলি-১৩)

(৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, (কলেজ ষ্ট্রীট, কলি-১২)

(৪) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, (কল্যাণী, নদীয়া)

(৫) জাতীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার, (বেলভেডিয়ার, কলি-২৭)

(৬) পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন, (সি/৫৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২)

(৭) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ, (৭৭ পার্ক ষ্ট্রীট, কলি-১৬)

(৮) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা, (৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭)

(৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলি-৬)

(১০) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বর্ধমান।

(১১) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, (পোঃ সান্তিনিকেতন, বীরভূম)

(১২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, (যাদবপুর, কলি-৩২)

(১৩) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, (৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলি-৭)

(১৪) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, (৫৬, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা)

(১৫) শিক্ষা মন্ত্রক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, (রাইটার্স বিল্ডিংস, কলি-১)

২। **উপ-সমিতি সমূহ**

সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক পদাধিকারবলে প্রত্যেক উপসমিতির সভ্য।

২১। **গৃহনির্মাণ ও উন্নয়ণ উপ-সমিতি**

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কর্মসচিব : শ্রীচঞ্চল কুমার সেন

সদস্য : সর্বশ্রী গোবিন্দ মল্লিক, তপন কুমার সেনগুপ্ত, দিলীপ কুমার বসু, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, সরল বন্ধু দত্ত এবং সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

২২। **গ্রন্থাগার উপ-সমিতি**

সভাপতি : শ্রীমতি বাণী বসু

কর্মসচিব ও গ্রন্থাগারিক : শ্রীঅরুণ কুমার রায়

সহ-গ্রন্থাগারিক : শ্রীঅনবদ্য সান্যাল

সদস্য : সর্বশ্রী অশোককুমার বসু, গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায়, দীপক রঞ্জন চক্রবর্তী, দুলাল চক্রবর্তী এবং শীলা গুপ্ত।

২৩। **গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপ-সমিতি**

সভাপতি : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

কর্মসচিব : শ্রীতপন কুমার সেনগুপ্ত

সদস্য : সর্বশ্রী অরুণ কুমার রায়, অজিত কুমার ঘোষ, চঞ্চল কুমার সেন, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিজয় সেনগুপ্ত, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, সুনীল বিহারী ঘোষ এবং হিরণ কুমার দত্ত।

২৪। **'গ্রন্থাগার' পত্রিকা উপ-সমিতি**

সভাপতি : ড: আদিত্য ওহদেদার (মুখ্য গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-৩২)

সম্পাদক ও কর্মসচিব : শ্রীবিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদিকা : শ্রীমতী গীতা মিত্র

সদস্য : সর্বশ্রী অশ্বিনী সেন, কৃষ্ণা দত্ত, চঞ্চল কুমার সেন, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, বেনু দত্ত, মঞ্জুরী সাহা, শীলা গুপ্ত, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

২৫। **বেতন ও পদমর্যাদা উপ-সমিতি**

সভাপতি : শ্রীদ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত

কর্মসচিব : শ্রীতুষার কান্তি সান্যাল

সদস্য : সর্বশ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত, অরুণ কুমার রায়, কৃষ্ণা দত্ত, চঞ্চল কুমার সেন, নারায়ণ সাধু, প্রবীর দে, বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ কোলে, ভবরঞ্জন দাস চাকলাদার, রামকৃষ্ণ সাহা, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, শুভ্রাংশু মিত্র, সত্যব্রত সেন, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, হরিশ চক্রবর্তী এবং হরেকৃষ্ণ দত্ত।

২৬। **অর্থ উপ-সমিতি**

সভাপতি : শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত

কর্মসচিব : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্য : সর্বশ্রী পূর্ণেন্দু প্রামানিক, ফণিভূষণ রায় এবং সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

২৭। সংগঠন ও জনসংযোগ উপ-সমিতি

সভাপতি : শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য (জেলা গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, পোঃ তমলুক)

কর্মসচিব : শ্রীসত্যব্রত সেন　　　　মেদিনীপুর)

সদস্য : সর্বশ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত, অনিলকুমার দত্ত, অসীমকুসুম ঘোষ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দত্ত, তুষারকান্তি সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত, দীপেন চন্দ্র, ফণিভূষণ রায়, বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, শুভ্রাংশু মিত্র, সুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলভূষণ গুহ, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানগত কাউন্সিল সদস্য

২৮। প্রকাশনা উপ-সমিতি

সভাপতি : শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মসচিব : শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ (জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলভেডিয়ার, কলি-২৭)

সদস্য : সর্বশ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু, ফণিভূষণ রায়, এবং সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

২৮১। সংকলক মণ্ডলী : (নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা ও বাংলা বিষয় শীর্ষ তালিকা)

সর্বশ্রী সুনীল বিহারী ঘোষ (সম্পাদক), আশীষ নিয়োগী, অনিমা দাস, শান্তনু মুখোপাধ্যায় এবং হরিমাধুরী বিশ্বাস।

২৮২। সংকলক মণ্ডলী : (পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরী)

সর্বশ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত (সম্পাদক), অনিল কুমার দত্ত, বিনয় রায় ও রামকৃষ্ণ সাহা

২৮৩। পাঠাভ্যাস সমীক্ষাকরণ মণ্ডলী :

সর্বশ্রী সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক), কৃষ্ণা দত্ত এবং বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

২৯। সংবিধান পর্যালোচনা উপ-সমিতি

সভাপতি : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কর্মসচিব : শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সদস্য : সর্বশ্রী দ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত, ফণিভূষণ রয়ে, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং সত্যব্রত সেন।

৩। প্রচার ও জনসংযোগ অধিকর্তা

শ্রীসুখেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ সমালোচনা

অনুপ্রাস : উপন্যাস। লেখক—শ্রীঅদ্ভুত। প্রকাশক—টেকনিক্যাল পাবলিশার্স, ৬০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ মূল্য :—চার টাকা।

'অনুপ্রাস' একখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস। কাহিনীর গতি স্বচ্ছন্দ, ভাষা সাবলীল। ঘটনা বিন্যাসে মৌলিকতা ও চরিত্র চিত্রণে আদর্শ নিষ্ঠার জন্য লেখক অভিনন্দন যোগ্য।

নায়ক নৃপেন্দ্র নারায়ণের দাম্পত্য সংযম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদিও অবাস্তব তবুও আদর্শ চরিত্রের চিত্রকল্পরূপে তিনি প্রশংসনীয়। তবে রূপমার প্রায়শ্চিত্ত যথাযথ হ'লেও তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি শিল্প সমন্বিত হ'য়েছে বলে মনে হয় না। প্রথম যৌবনের কোন দুর্বল মুহূর্তে যে ভুল তিনি করেছিলেন তার মাশুল দিতে যতখানি কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী আত্মনিপীড়ন তিনি করেছেন। হাতের কাছে সাজানো থাকা সত্ত্বেও ভোগ সুখের কোন সামগ্রীই তিনি স্পর্শ করেননি। চিত্তশুদ্ধির মধ্যেই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে ; এর পরও তার আত্মহত্যা শুধু জীবনের দিক থেকে নয় আর্টের বিচারেও অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয়। অবৈধ সন্তানের আবির্ভাবের মুহূর্তেই তাঁর মানসিক অশান্তির 'ক্লাইম্যাক্স' এবং এখানেই তার 'নেমেসিস'। এর পরেও তাঁকে আরো শাস্তি দেওয়া শুধু তার প্রতি 'কবির অবিচারই' নয় তাঁর চরিত্রকেও অসংগত ভাবে দুর্বল প্রতিপন্ন করা।

সংক্ষেপে উপন্যাস খানির ট্র্যাজিক পরিণতির পরিবর্তে রূপমার জীবনের শেষ অধ্যায় যদি মিলনান্তক করা হ'তো তাহ'লে লেখকের আশাবাদী ও বলিষ্ঠ জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যেতো। তাছাড়াও একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যার সমাধানের নতুন পথ দেখাবার গৌরবও তিনি লাভ করতেন।

পরিশেষে সামগ্রিক ভাবে উপন্যাসখানি বিচার করলে নি:সন্দেহে বলা যায় লেখক শ্রীঅদ্ভুত একজন শক্তিমান সাহিত্যিক, তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে সু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রত্যাশা আমরা করতে পারি।

—**চকুসে**

ভ্রম সংশোধন

নিম্নোক্ত প্রমাদগুলি চৈত্র ১৩৭৫, সংখ্যায় ঘটায় আমরা দুঃখিত। —সঃ

পৃষ্ঠা		
৪৮০	'সজনী নারায়ণ' স্থলে	লক্ষ্মীনারায়ণ হইবে
৪৯৭	স্বামী ,,	সামসী ,,
৫০৩	'উত্তর পাড়ার ,,	উত্তর পাড়ায় ,,

২৩ বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইঁহারাও উপস্থিত ছিলেন।

৪৯৭—অবধূত কুমার সরকার, খয়রাশোল মিলন সংঘ, বীরভূম।

৪৯৮—হিমাংশুশেখর ভট্টাচার্য, সম্পাদক, মিলন পাঠাগার হাওড়া।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৩ | ১৩৭৬, আষাঢ়

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ পশ্চিমবঙ্গ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ॥

শিক্ষা ও গ্রন্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গ্রন্থ ব্যতীত যেরূপ শিক্ষা কল্পনা করা যায় না সেইরূপ গ্রন্থাগার ব্যতীতও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় না; কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে অসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই সংখ্যাধিক্য। সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখা গেছে শিক্ষায়তন থাকলেও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগারের কোন অস্তিত্ব নেই, যদিও শিক্ষায়তনের সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যকীয়। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অনেকে উদ্যোগী হলেও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার স্থাপনে এরূপ অনীহা কেন বোঝা দুষ্কর।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে আগ্রহী; সন্দেহ নেই এতে শিক্ষাভিলাষী জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনই থাকবে কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন সেই গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন কার্যক্রম না থাকায় অনেকেই হতাশ হয়েছেন। যে অর্থ বইগত শিক্ষাকে আমরা বর্জন করতে চলেছি, সেই শিক্ষাই বহাল থাকবে প্রকৃত গ্রন্থাগারের অভাবে। শিক্ষার সার্বিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন উন্নততর গ্রন্থের তথা গ্রন্থাগারের। শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যেমন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তদ্রূপ গ্রন্থাগারাভিমুখী করার জন্যও প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন। শিক্ষা লাভের অধিকার এক মৌল অধিকার কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদা দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা বা প্রত্যেক অঞ্চলের পক্ষেও সম্ভব নয় নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রত্যেক অঞ্চলে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা। এই সব অসুবিধার মোকাবিলা করতেই প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইনের। এর ফলে প্রত্যেকের থাকবে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকার। গড়ে উঠবে প্রত্যেক অঞ্চলে এক একটি জ্ঞান ভাণ্ডার। কেবলমাত্র

কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করলেই শিক্ষা ব্যাপক প্রসার লাভ করবে না। গ্রন্থাগার আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ এককালের পথপ্রদর্শক হলেও আজ তার স্থান অনেক পশ্চাতে।

সরকারের নিকট জনগণের দাবী আশু এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হোক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা একই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা হোক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আগামী ৬ই আগষ্ট এই সম্পর্কে এক বিরাট অভিযান করবেন বিধানসভা অভিমুখে। নীরব গ্রন্থাগার কর্মিদের করুণ বাস্তব চিত্রেরও কিছু পরিচয় থাকবে এই দাবী পত্রে। শিক্ষাগত ও বৃত্তিকুশলীগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগার কর্মি সেখানে অবহেলিত। গ্রামীণ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মিদের প্রতি অবহেলারও অন্ত নেই। কোলাঘাট গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অবলুপ্তির পরিকল্পনা, কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের কর্মি জীতেন নন্দীর চাকরী নিয়ে টালবাহানার ঘটনা প্রভৃতি অসংখ্য অবহেলার সামান্য নজীর মাত্র। এই অবস্থার আশু প্রতিকার যে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই দাবী করবেন। পরিষদের এই অভিযান সফল হোক, এই-ই কামনা।

West Bengal and its Library System Editorial.

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির জন্য শিক্ষা

(গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-চিন্তা। ৬)

এস, আর, রঙ্গনাথন,

ন্যাশন্যাল রিসার্চ প্রফেসর ইন লাইব্রেরী সায়েন্স এবং অনারারী প্রফেসর,
ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার, ব্যাঙ্গালোর—৩।

[অনুবাদ : মায়া ভট্টাচার্য, লাইব্রেরীয়ান, ডি আর টি সি, ব্যাঙ্গালোর—৩]

(*Training for the Calling of Librarians* with this title Shri S. R. Ranganathan, National Research Professor in Library Science and Honorary Professor, Documentation Research and Training Centre, Bangolore-3, throws light on the history of Training in Library Craft, Pioneer's School for Library Craft, Training in U.K. in Library Craft, Training in European Countries. First, Second and Third Library School in India.)

১ কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার সূত্রপাত

কারিগরী পেশাই হোক বা বৃত্তিই হোক, সব পেশার জন্যই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। সেইজন্যই এই সিরিজের দ্বিতীয় প্রবন্ধে (**গ্রন্থাগারিকতা কি বৃত্তি?** —পরিচ্ছেদ ২, বর্গ ৫) বিশেষ শিক্ষাকে কারিগরী পেশা বা বৃত্তির মধ্যে সাদৃশ্য সূচক ধর্ম বলা হয়েছে। অনেক বৃত্তিরই সূত্রপাত কারিগরী পেশা থেকে। গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। অতএব, আমাদের উচিত হবে সেই শিক্ষা থেকে শুরু করা যা কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা চর্চা করার জন্য প্রয়োজন। সত্যি কথা বলতে কি, কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতার আকারটি স্বীকৃতি পেয়েছে মাত্র প্রায় ১০০ বছর আগে। কিছু কিছু ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, তার আগে গ্রন্থাগার পরিচালনার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করতেন অন্য বৃত্তির লোকেরা; প্রকৃত প্রস্তাবে অবশ্য পরিচালিত হত কেরানীদের দ্বারা। আর কাজও ছিল অতি সাধারণ কিছু হিসেবপত্র রাখা। ব্যতিক্রম হিসেবে গ্রন্থাগারে যাঁরা কারিগরী বিদ্যার প্রবর্তন করেন তাদের যোগ্যতা ছিল অসাধারণ। পানিজ্জি ও মেলভিল ডিউই এই জাতীয় ব্যতিক্রমের উদাহরণ। যাঁরা প্রকৃতই ব্যতিক্রম তাঁদের কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাঁদেরকে কর্মে ব্রতী করতে অপরের ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। আসলে তাঁরাই কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতার স্রষ্টা। কর্মে ব্রতী করতে অপরের ভূমিকা বা বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন কেবল তাদেরই হয় যাদের যোগ্যতা সাধারণ স্তরের। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা গ্রন্থাগারিকতা গ্রহন করল কেবল কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থা-

গারিকতা সৃষ্টি হবার পর। সুতরাং তার পর থেকেই কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার সূত্রপাত হল।

২ প্রবর্তকদের জন্য কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার স্কুল

১৮৮৭ তে আমেরিকার য়্যালবনীতে মেলভিল ডিউই যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, সেটিকেই কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার প্রথম স্কুল বলা হয়ে থাকে। মেলভিল ডিউই ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যর্থতাই হবে সাধারণ তথা বিশেষ পাঠকের প্রতি গ্রন্থ-সেবার বৈশিষ্ট্য যদি না গ্রন্থাগারিকতায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের দ্বারা গ্রন্থ-সেবা সংগঠিত ও পরিবেশিত হয়। ডিউই যে শিক্ষা দিতেন তা বৃত্তির উপযোগী ছিল, না কারিগরী পেশার উপযোগী ছিল—বর্তমানে তা জানা খুবই কষ্টকর। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে কোন পরিষ্কার উত্তর আমি পাই নি। যাহোক, বৃদ্ধ বয়সেও গ্রন্থাগার সেবার প্রতি তাঁদের প্রবল আগ্রহ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, কুশলী কারিগরের দৃষ্টিভঙ্গীর উর্দ্ধে আরও কিছু তাঁরা ডিউইর কাছ থেকে বহন করে এনেছেন। একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির সাহচর্য জনিত প্রভাবই হয়তো তাঁদের এই বৈশিষ্টের কারণ। এ থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, য়্যালবনী স্কুল বৃত্তি শিক্ষার স্কুল ছিল এবং কারিগরী শিক্ষার স্কুল ছিল না। য়্যালবনী স্কুলকে কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার প্রবর্তক বলে গ্রহণ করাই নিরাপদ।

৩ যুক্তরাজ্যে কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতার শিক্ষা

কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতার শিক্ষা প্রবর্তনের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্য তার পুরোন প্রথাকেই অনুসরণ করে। ঐ প্রথা হচ্ছে—কিশোর বয়সের আগেই শিক্ষানবিশী হিসেবে কারিগরী পেশায় শিক্ষা দেওয়া। কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষাও ঐ নিয়মেই চলে। স্যাণ্ডারসন্ (Sanderson), সেয়ারস্ (Sayers) সিডনি (Sydney) প্রমুখ বহু সুপরিচিত বৃটিশ গ্রন্থাগারিক তাঁদের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা শেষ করার কিছু পরেই কিশোর বয়সের আগেই গ্রন্থাগারের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৮৫-র জুলাই থেকে শিক্ষানবিশীদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বৃটিশ লাইব্রেরী য়্যাসোসিয়েসন এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। শিক্ষানবিশী করার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারিকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহীরা যে শিক্ষা লাভ করত তার সম্পূরক হিসেবে য়্যাসোসিয়েসন, ১৯০৪ এ এক করেসপনডেন্স কোর্স চালু করে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। পরে কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত সব দেশেই এই করেসপনডেন্স কোর্সের সুযোগ গ্রহন করতে পারল। ১৯০৪ এর সিলেবাস, ১৯১০ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে কয়েকবারই পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৩১র

. সিলেবাস (যা ১৯৩৩ থেকে চালু হয়) তিন স্তরে পরীক্ষা চালু করে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত ;—এদের প্রত্যেকটিই স্বয়ং সম্পূর্ণ। ১৯৬৪ র সিলেবাস চালু না হওয়া পর্যন্ত পূর্বোক্ত ব্যবস্থাই চালু ছিল ; শেষপর্যন্ত ১৯৬৪-র সিলেবাস অনুযায়ী পূর্ণ সময়ের কোর্স পাকাপাকিভাবে চালু হল। লণ্ডন ইউনিভারসিটির স্কুল অফ লাইব্রেরীয়ানশিপই প্রথম পূর্ণসময়ের স্কুল ; লাইব্রেরী য়্যাসোসিয়েসনের সুপারিশে, কার্ণেগীর অর্থ সাহায্যে ১৯১৯এ এটি চালু হয়। গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার অন্যান্য স্কুলগুলি যুদ্ধোত্তর কালে স্থাপিত হয়েছে।

১৯২৪-২৫ এ আমি লণ্ডন স্কুলে শিক্ষা নেই। অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন কর্মরত গ্রন্থাগারিক ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন শিক্ষা তাঁদের ছিল না কোন কারিগরী পেশার বিষয় সমূহের মত। উচ্চস্তরের শিক্ষা যা পাওয়া যেত তা বর্গীকরনে। কোন শিক্ষানীতির কারণে নয় ; বিষয়টি যিনি শিক্ষা দিতেন সেই বারউইক সেয়ার্সের অসাধারণ দক্ষ ব্যক্তিত্বই এর কারণ বলে মনে করি। তিনিই অবশ্য প্রথম বর্গীকরণ বিজ্ঞানের উপর বই লেখেন। কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার জন্য এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও চালু ছিল।

৪ ইউরোপীয় দেশসমূহে শিক্ষা

কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, যুক্তরাজ্যের তুলনায় অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে বেশ অনুন্নত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও বেশ কয়েক বছর গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা কারিগরী পেশা হিসেবেই চালু ছিল।

৫ ভারতে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার প্রথম স্কুল

ভারতে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার স্কুল প্রথম চালু হয় বরোদায়, ১৯১১-য় ; চালু করেন ডবলিউ এ বোরডেন। ইনি একজন আমেরিকান গ্রন্থাগারিক ; বরোদার গায়েকোয়াড় তাঁকে রাজ্য গ্রন্থাগার বিভাগের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত করেছিলেন। ১৮৮৭ তে স্থাপিত মেলভিল ডিউই'র য়্যালবনী স্কুলের প্রথম দলের ছাত্র ছিলেন বোরডেন। এই স্কুলটি ছিল স্বল্প কালীন। অস্নাতকদেরই এখানে নেওয়া হোত। বোরডেন বরোদা ছেড়ে চলে যাবার পর এবং সম্ভবত তাঁর পদের উত্তরাধিকারী কুদলকরের অকাল মৃত্যুর পরই এই স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। কারিগরী পেশা হিসেবে গ্রন্থাগারিকতার শিক্ষাই প্রধানতঃ স্কুলে দেওয়া হোত।

৬ ভারতে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার দ্বিতীয় স্কুল

ভারতে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার দ্বিতীয় স্কুল লাহোর, ১৯১৫-য় ; চালু করেন আসা ডন ডিকিনসন। ইনি একজন আমেরিকান গ্রন্থাগারিক ; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্ত হওয়া পর্যন্ত এই স্কুলটি চালু ছিল। এই স্কুলটিও ছিল স্বল্পকালীন ; এবং অস্নাতকদেরই এখানে নেওয়া হোত। এখানেও

গ্রন্থাগারিকতার শিক্ষা প্রধানতঃ কারিগরী পেশা হিসেবেই দেওয়া হোত। ডিকিনসনের লেখা ছোট্ট বইটি—যা এই স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হত—এই তথ্যই প্রমাণ করে।

৭ ভারতে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার তৃতীয় স্কুল

৭১ পর্যায় ১

ভারতে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার তৃতীয় স্কুল চালু করে মাদ্রাজ লাইব্রেরী য়্যাসোসিয়েসন ১৯২৯-এ। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে এবং এই প্রতিষ্ঠানেরই সহযোগীতায় এই স্কুল চলত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। সেই স্কুলে আমিই ছিলাম একমাত্র শিক্ষক। এই কোর্সে বৃত্তি উপযোগী একটি ধারা প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল দুটি কারণে। প্রথমতঃ প্রথম দু বছরের প্রধান লক্ষ্য ছিল: গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যে একটি গবেষণা-ভিত্তিক পাণ্ডিত্য নির্ভর বিষয় শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি আদায় করা; এবং গ্রন্থাগারের দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত এমন শিক্ষকদের ও কিছু কিছু কলেজ গ্রন্থাগারিকদের প্রযুক্তি-বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া; এবং এটা প্রমাণ করে দেখান যে, গ্রন্থাগার-প্রযুক্তি-বিদ্যায় জ্ঞানসম্পন্ন, শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আরও বেশী দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের কাজ পরিচালনা করতে পারেন। যে সব শিক্ষক ভর্তি হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান। যে অল্প কয়েক জন গ্রন্থাগারিক ভর্তি হয়েছিলেন তারা ছিলেন অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল। বিষয়টির বিকাশ যে গবেষনা-ভিত্তিক এবং পাণ্ডিত্য নির্ভর এ তত্ত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। দ্বিতীয়তঃ ১৯২৮ এর মধ্যে আমার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র সূত্রবদ্ধ হয়ে গেছে; এবং এমনকি দক্ষিণ ভারত শিক্ষক সম্মেলনে উপস্থাপিতও করা হয়ে গেছে। মুলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বভিত্তিক অবরোহী প্রথা, প্রকৃত চর্চার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রয়োগ-ভিত্তিক আরোহী প্রথা, এবং এই দুই প্রথার সুসম মিলন ঘটিয়ে বিষয়টিকে, বিজ্ঞানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে এই সূত্রগুলির জন্য। কোর্স শেষ হবার পর দুটি প্রশ্নপত্র করা হয়েছিল—প্রথমটি তত্ত্বের উপর এবং দ্বিতীয়টি বর্গীকরণ ও সূচীকরণের প্রয়োগের উপর। ১৯২৯ এর পরীক্ষায় তত্ত্বের প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্নই সাক্ষ্য দেবে যে, বিষয়টির বিকাশ সাধনে বৃত্তি উপযোগী একটি ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল:

১ "পাঠকের সময় অমূল্য" (Save the time of the Reader) —বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করে সূত্রটির উপর মন্তব্য কর।

২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করে অবাধ অভিগম্য ব্যবস্থার সমর্থনে বিস্তারিত আলোচনা কর।

৩ গ্রন্থ বর্গীকরণের মুল অনুশাসনগুলি বিবৃত কর; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের বহুতা (multiplicity of relevant characteristics) জনিত জটিলতা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

.৭২ পর্যায় ২

১৯২৮ ও ১৯২৯-এ কোর্সটির পরিচালনা ফলপ্রসূ হয়েছিল। মাদ্রাজ লাইব্রেরী য়্যাসোসিয়েসনের স্কুলটির ভার মাদ্রাজ ইউনিভারসিটি নিজেই গ্রহণ করে। আরও দুজন শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন ; এঁরা সি সুন্দরম ও কে এম শিবরমন ; মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আমার সঙ্গে এঁরাও তখন আত্মোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিলেন। বিষয়টিকে বিজ্ঞান হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হোল। কোর্সটির মেয়াদ বছরে মাত্র তিন মাস হলেও, এটা সম্ভব হয়েছিল। কারণ, ছাত্রদের অধিকাংশই ছিল কলেজের বা স্কুলের শিক্ষক এবং অন্যান্যদের মধ্যেও অধিকাংশই ছিল স্নাতক। এইটিই একমাত্র স্কুল যেখানে বিষয়টিতে বৃত্তিগত সচেতনতা আরোপ করা হয়েছিল ; এবং তার ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকেও ছাত্র এসেছিল। উপরন্তু ছাত্ররা দীর্ঘ সময়,—দিনের মধ্যে প্রায় ১০ ঘণ্টা,—গ্রন্থাগারেই কাজ করত।

৭৩ পর্যায় ৩

বিষয়টিকে শিক্ষা দেওয়া হোত বিজ্ঞান হিসেবে, এবং তাও আবার বৃত্তি সচেতনতা আরোপ করে ; ঘটনাটি শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, বিষয়টি স্নাতকোত্তর ছাত্রদের উপযুক্ত ; এবং কোর্সটি এক বছরের পূর্ণ সময়ের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই অনুযায়ী ১৯৩৭-এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় আইন পাস করে কোর্সটিকে সার্টিফিকেটের স্তর থেকে একেবারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমার স্তরে উন্নীত করল। এরপর পাঁচ বছর পর্যন্ত এটাই ভারতের একমাত্র স্কুল ছিল যেখানে এক বছর ধরে পূর্ণ সময়ের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স পড়ান হোত। কাজেই অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগারিকরা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারিকরা এই কোর্সের সুযোগ গ্রহণ করেন।

৭৪ পর্যায় ৪

১৯৫৭-য় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এক অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য সারদা রঙ্গনাথন এনডাউমেণ্টের প্রস্তাব ও দান গ্রহণ করে। প্রথম সারদা রঙ্গনাথন অধ্যাপক নিয়োগ করার পর কোর্সটি এক বছরের পূর্ণ সময়ের স্নাতকোত্তর বি লিব এস সি ডিগ্রী-কোর্সে পরিবর্তিত হয়। এর ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে বৃত্তি শিক্ষার উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়ার যে রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল তার উপর আরও জোর পড়ল। সারদা রঙ্গনাথন অধ্যাপক ছাড়া আরও তিনজন পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত শিক্ষক এখন সেখানে আছেন।

৭৫ পর্যায় ৫

১৯৫৯-এ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম লিব এস সি-র জন্য আইন পাস করে ; বি লিব এস সি ডিগ্রী পরীক্ষার পর এক বছরের কোর্স। আশা করা যাচ্ছে আর দেরী না করে এই প্রস্তাব শীঘ্রই কার্যকরী করা হবে। ১৯১৬-য় যখন মাদ্রাজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই দানের প্রস্তাব করা হয়, তখন ভাইস-চ্যান্সেলর বিভাগটির উন্নতির জন্য আমাকে বিশদ নির্দেশ দিতে বলেন। আমি এ বিষয়ে অনেকগুলি স্মারকলিপি পাঠাই। তার মধ্যে একটিতে বিশেষ জোর দিয়েই বলা হয়েছে যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণাই হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগটির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম কয়েক বছর যে সব বিষয়ের উপর গবেষণা প্রয়োজন হবে তার একটা তালিকাও এই সঙ্গে দেই। গবেষণার কর্মসূচী যখন কার্যকরী হবে তখন বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা গ্রন্থাগারিকতা পেশাকে বৃত্তিতে পরিণত করার পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৮ পরবর্তী সম্প্রসার

৮১ স্বাধীনতার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য স্কুল

১৯৩৫-এ কে এম আসাদুল্লা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু ছিল। এর প্রশ্নপত্রগুলি দেখে এবং কিছু ছাত্রের কাছ থেকে যা শুনেছি তা থেকে মনে হয় গ্রন্থাগারে প্রযোজ্য ব্যবহারিক বিষয়গুলি এখানে বিচ্ছিন্নভাবে সেখান হত; মূল সূত্র বা নীতি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখান হত না। ১৯৪২, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৫-এ যথাক্রমে বেনারস, বোম্বাই ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। অস্নাতকরা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারত। বোম্বাই ও কলিকাতার কোর্স দুটি ছিল আংশিক সময়ের; ক্লাস হত সন্ধ্যায়। পাঠ্য বিষয়ের দিক থেকে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সই ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর ডিপ্লোমা কোর্সের মত ছিল। সুতরাং, এই কোর্সগুলি কারিগরী পেশা শিক্ষার স্তরের ছিল, না বৃত্তি শিক্ষার স্তরের ছিল--সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

৮২ স্বাধীনতার পরে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোর্সগুলি

১৯৪৭ এর স্বাধীনতার বছরের পর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে কোর্সগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় তারা দুই শ্রেণীতে পড়ে—সার্টিফিকেট কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কোর্স। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় রাজ্য গ্রন্থাগারগুলি চালায় সার্টিফিকেট কোর্সগুলি। এ রকম প্রায় কুড়িটি কোর্স আছে। বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত স্নাতকোত্তর কোর্সের তালিকা নীচে দেওয়া হল :

ক্রমিক সংখ্যা	বিশ্ববিদ্যালয়	স্থাপনার বছর	ক্রমিক সংখ্যা	বিশ্ববিদ্যালয়	স্থাপনার বছর
১	মাদ্রাজ	১৯২৯	১৪	রাজস্থান	১৯৬০
২	অন্ধ্র	১৯৩৫	১৫	কেরালা	১৯৬১
৩	বেনারস	১৯৪২	১৬	এস, এন, ডি,টি (মহিলাদের জন্য)	১৯৬১
৪	বোম্বাই	১৯৪৩			
৫	কলিকাতা	১৯৪৫	১৭	ডি আর টি সি	১৯৬২
৬	দিল্লী	১৯৪৭	১৮	কর্ণাটক	১৯৬২
৭	আলিগড়	১৯৫১	১৯	গোয়ালিয়ড়	১৯৬২
৮	নাগপুর	১৯৫৬	২০	লক্ষ্ণৌ	১৯৬৩
৯	বরোদা	১৯৫৭	২১	গুজরাত	১৯৬৪
১০	বিক্রম	১৯৫৭	২২	যাদবপুব	১৯৬৪
১১	পাঞ্জাব	১৯৫৭	২৩	বর্দ্ধমান	১৯৬৫
১২	পুনা	১৯৫৮	২৪	মহীশূর	১৯৬৫
১৩	ওসমানিয়া	১৯৫৯	২৫	শিবাজী	১৯৬৫
			২৬	গৌহাটী	১৯৬৬

এদের মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে কেবলমাত্র প্রযুক্তির সমষ্টি হিসেবে না শিখিয়ে একটি বুদ্ধিগত বিষয় বিচারে শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে সবগুলিতে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, এদের মধ্যে অনেকগুলিই বিষয়টিকে কারিগরী পেশা হিসেবেই শিক্ষা দিয়ে থাকে। যদিও ছাত্রদের প্রযুক্তির উপর বক্তৃতা শুনতে হয় কিন্তু হাতে কলমে কাজ করে শিক্ষাব যথেষ্ট সুযোগ পায় না। ব্যাঙ্গালোরের ডি আর টি সি (ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার) একটি নূতন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এটি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্সটিটিউট-এর একটি অঙ্গ। তত্ত্বগত আলোচনা, অনুশীলন, ও পর্য্যবেক্ষনের মাধ্যমে এখানে চৌদ্দমাস ধরে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই চৌদ্দ মাসের মধ্যে একটি বড় রকমের প্রজেক্ট (Project) শেষ করতে হয়; এবং এই কোর্সের শেষে প্রত্যেক ছাত্রকে তার নিজের গ্রন্থাগারে থেকে আরও ছ মাসের একটি প্রজেক্ট শেষ করতে হয়। শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৃত্তিমূলক। উপরন্তু, ছাত্রদের গবেষণা পদ্ধতিতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকরা সবসময়ের জন্য গবেষণায় লিপ্ত থাকে। গবেষক-ছাত্রও আছে এখানে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকদেরও পরিদর্শী গবেষক হিসেবে নেওয়া হয়। তারা এখানে আসেন এবং দু তিন মাস ধরে কাজ করেন; ঐ সময় তাঁরা, বিশেষ পরিচালনাধীনে, তাঁদের পূর্ব পরিকল্পিত প্রয়োজনীয় কোন কাজ সম্পন্ন করেন; এই কাজগুলি অবশ্যই তাঁদের নিজের নিজের

গ্রন্থাগারের কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়। বর্তমানে ডি আর টি সি সর্বোচ্চস্তরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিচ্ছে। এফ আই ডি/সি আর (FID/CR) ক্লাসিফিকেসন রিসার্চ কমিটি অফ দি ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ডকুমেণ্টেসন)-এর চেয়ারম্যানের ভাষায়: "ডকুমেণ্টেসন রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার (ডি আর টি সি) যেটি ১৯৬২-তে ব্যাঙ্গালোরে স্থাপিত হয়েছে বর্গীকরণ গবেষণার সেটি শুধু এশিয়ার নয়, সমস্ত পৃথিবীর কেন্দ্র। বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে; এগুলির কিছু বেরিয়েছে লাইব্রেরী সায়েন্স উইথ এ স্লাণ্ট টু ডকুমেণ্টেসন নামক সাময়িকীতে) যেটি ১৯৬৪ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে); আর কিছু বেরিয়েছে প্রসিডিংস অফ দি য়্যানুয়াল ডি আর টি সি সেমিনারে (যেটি ১৯৬৩ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে)"।

৮৩ ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস্ কমিশন

১৯৫৮ খ, ডঃ সি ডি দেশমুখের নেতৃত্বে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন গ্রন্থাগারিকতা পেশার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। ১৯৬৫ তে প্রকাশিত **লাইব্রেরী সায়েন্স ইন ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটিজ** নামক এর রিভিউ কমিটির (১৯৬১) রিপোর্টে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা বৃত্তিমূলক করার উপযোগীতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বি লিব এস সি এবং এম লিব এস সি ডিগ্রী কোর্সের জন্য সিলেবাসের একটি পরিকল্পনাও দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষনার ক্ষেত্রগুলিও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

৯ গ্রন্থের মাধ্যমে স্পষ্টিকরণ

প্রকৃত শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর লিখিত আমার বইগুলিতে স্পষ্ট করে দেখান হয়েছে যে, কিভাবে মূল সূত্রগুলিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন শাখা বিষয়গুলিকে গড়ে তোলা যায়; এবং এই পদ্ধতিতেই শিক্ষা শুধুমাত্র কারিগরী পেশার উপযোগী না হয়ে বৃত্তির উপযোগী হয়ে ওঠে।

Training for the calling of Librarians (Musings on Library Science, 6) : S. R. Ranganathan.
Translated in Bengali by Maya Bhattacherja.

পারিভাষিক শব্দাবলী ঃ সামাজিক নৃ-বিদ্যা-(৬)

তুষারকান্তি নিয়োগী

(In this continued article Shri Tushar Kanti Neogy explains the different related terms regarding Marriage.)

বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce)

মুসলমানদের বিবাহবিচ্ছেদ স্বাভাবিক ব্যাপার। কোরাণে স্বামীকে পত্নীত্যাগের ব্যাপারে একটু বেশী অধিকারই দেওয়া হয়েছে। অসন্তুষ্ট স্বামী যদি তিনবার "তালাক্, তালাক্, তালাক্" বলে তাহলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। সেইস্ত্রীকে সে আর ঘরে নিতে পারেনা, পারে যদি সেই স্ত্রী অন্যপুরুষের সঙ্গে বিবাহ করে তার সঙ্গেও বিবাহবন্ধন ছিন্না হয়। স্বামী যদি বলে "তুমি আমার কাছে মৃত" তাহলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। অনেক সময় অসন্তুষ্টা স্ত্রীকে, যে স্বাধীনতা চায়, স্বামী মুক্তি দেয় এই বলে "আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি আমায় এই ঘোড়া বা উট বা এই বস্ত্র (আকাঙ্ক্ষিত ধন) দাও"। তবে ডির্ভোস করে দিলে কন্যাকে বিবাহের সময় দেওয়া বরপণ ফেরৎ দিতে হয়।[১৫] সংক্ষেপে এই হ'ল বিবাহের ভূমিকা। এবার আমরা পরিভাষার আলোচনা করব।

296. Marriage, adoptive—ভাবী জামাতাকে দত্তক গ্রহণ।

কোথাও কোথাও ভাবী জামাতাকে পত্নীর পরিবারের পক্ষ থেকে দত্তক গ্রহণ করা হয়। ইন্দোনেশিয়া ও জাপানে এটার ব্যাপক প্রচলন। এর মাধ্যমে পারিবারিক পিতৃকুলধারা রক্ষা পায়। দত্তকগ্রহণের ফলে ছেলেটি ওই পরিবারের এবং গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং তার সন্তান তার গোত্র অবলম্বন করলেও মেয়ের পরিবারের পিতৃকুলধারা অব্যাহত থাকে। সূক্ষ্মভাবে দেখলে এর মধ্যে হয়ত অজাচারের ইঙ্গিৎ পাওয়া যাবে কিন্তু পারিবারিক ধারা বজায় রাখতে গেলে এ না করে উপায় নেই।

297. Marriage, avuncular—ভাগ্নীবিবাহ।

298. Marriage, by Capture—বলপ্রয়োগ বিবাহ।

বলপ্রয়োগ বিবাহ বিধি অতি প্রাচীন বলে মনে করা হয়। আজকাল পৃথিবীর প্রায় কোন আদিবাসী সংগঠনের মধ্যে এজাতীয় বিবাহের প্রচলন নেই বলপ্রয়োগ বিবাহ বলে যা মনে

---

(১৫) Strange Customs of Courtship and Marriage—Fielding, W. P. 300-301

করা হয় তা আসলে ছদ্ম বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্যকিছু নয়। বাইরে থেকে দ্বন্দ্বময় মনে হলেও আসলে তা সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনা। বলপ্রয়োগ বিবাহ পদ্ধতিকে সব থেকে প্রাচীন বলে ধরা যায় না। সর্বাদিম সময়ে নিজেদের গোষ্ঠীর ভিতর থেকেই কন্যা নির্বাচন করা হ'ত—পরে মেয়ের সংখ্যা কমে যাওয়ায়, পার্শ্ববর্তী বা ভিন্নগোষ্ঠী থেকে মেয়ে নিয়ে আসার রেওয়াজ হয়, এতে বলপ্রয়োগ হ'ত। যুদ্ধে লুটের সম্পত্তি হিসেবে পাওয়া কন্যাকেও বলপ্রয়োগে বিয়ে করা হ'ত। কিন্তু এটাকে আদি বা একমাত্র কন্যা সংগ্রহের উপায় বলে স্বীকার করা যায় না, বরং কন্যা সংগ্রহের কোন একটি উপায় বলাই শ্রেয়। কারণ বলপ্রয়োগের মধ্যে যে তিক্ততার ভাব থাকে তা দ্বারা সুষ্ঠু পরিবার গঠন আদৌ সম্ভবপর নয়। তবে দুটি ভিন্ন দল বা পরিবারের মধ্যে বিবাহে কিছুটা দ্বৈধতা, মন কষাকষির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়—এটাকেই দ্বন্দ্বময়রূপে কল্পনা করা হয়, এর পশ্চাতে আছে প্রত্যেক পরিবার ও পরিবারগত মানব মানবীর স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ. অহংভাব, অভিমান ও পারিবারিক ধারার প্রভাব ইত্যাদির ব্যাপার। বাঙ্গালী সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "পালামৌ" ভ্রমন কাহিনীতে "কোল" উপজাতিদের বিবাহে এই জাতীয় একটা ছদ্মবলপ্রয়োগ বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বিবাহের প্রারম্ভে হয় লড়াইয়ের প্রস্তাবনা এবং তা শেষ হয় আনন্দোৎসব ও ভোজের মাধ্যমে। "বুশম্যান" ছেলেমেয়ের বিবাহেও এমন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বিবাহ আসরে পাত্রপাত্রী ও বিবাহ উৎসবে অংশ গ্রহণকারীরা চারপাশ থেকে সমবেত হ'তে থাকে। ভোজের মধ্যে হঠাৎ পাত্র কন্যাকে অধিকার করে। পাত্রীপক্ষও তৎক্ষণাৎ হৈহৈ করে এসে ভাবী বরকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করে, দুএকটা চড়চাপড়ও পড়ে, ছোটখাট যুদ্ধের মহড়াও হয়। বর যদি কন্যাকে ধরে রাখতে সমর্থ হয় তবে তার জিত এবং সে কন্যার পাণি পায়, অন্যথায় বিবাহ ভেঙ্গে যায়।[১৬] বলপ্রয়োগ বিবাহে সুবিধা কিছুই নেই —যা আছে তা হ'ল কিছুটা রোমান্স এবং এ্যাডভেঞ্চার। বরং এতে অসুবিধা অনেক। বিবাহ হ'ল একটা রমনীয় এবং আনন্দময় অনুষ্ঠান. এর মধ্যে জোর জবরদস্তি, মারামারি ইত্যাদি

(১৬) The Native races of South Africa--G. W. Stow. P. 96.

শোভা পায়না কারণ এসব জিনিস কনের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে যা হয়ত তাকে বিশেষ বিচলিত করে। আর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে বিবাহ সেখানে দুপক্ষের সম্প্রীতিও বিঘ্নিত হয়। বিবাহ দুটি ভিন্ন পরিবারকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে দেয়—বলপ্রয়োগ দুপক্ষের সহযোগিতার ভাবকেও নষ্ট করতে পারে ; পত্নীর পক্ষের থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা পাওয়া যায় না অনেক সময়।

299. Marriage by exchange—বিনিময় বিবাহ।

300. Marriage by purchase—কন্যাক্রয়।

301. Marriage by Suitor Service—শ্রমের মাধ্যমে বিবাহ।

আদিবাসী সমাজ সংগঠনে কন্যা সংগ্রহের একটি প্রধান উপায়। বাইবেলোক্ত জ্যাকবকে ৭ বছর খেটে র‍্যাবেলের পাণি পেতে হ'য়েছিল। যেখানে কন্যাপণ দেবার সামর্থ্য থাকেনা সেখানে ছেলেকে মেয়ের বাড়ীতে একটা নির্দিষ্ট সময় খেটে দিতে হয়—সময় পার হলেই সে মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। শ্রমের মাধ্যমে সে কন্যার পারিবারে যে উৎপাদন করে তাই তার কন্যাপণ হয়।

302. Marriage, Civil—সিভিল ম্যারেজ, রেজিষ্ট্রী বিবাহ।

303. Marriage, Companionate—সহচর/সহচরী বিবাহ।

304. Marriage Cross-Cousin—মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ।
(বিপ্রতীপ ভাইবোনের বিবাহ)

মাতুলকন্যা বিবাহ অনেক আদিবাসী ও সভ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত। মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ প্রধানতঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত। বিপ্রতীপ ভাইবোনের বিবাহ দক্ষিণ এবং মধ্য অষ্ট্রেলিয়া, মেলানেশিয়া, আফ্রিকা (সুদান ছাড়া) অঞ্চলে প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির মধ্যে এবং দক্ষিণের কানিকর, মালাপণ্ডারম, উরালী ইত্যাদি উপজাতিরা এই বিবাহের পক্ষপাতী : নেফা অঞ্চলের "আকা"রা বিপ্রতীপ বিবাহ পছন্দ করে। মহাভারতে মাতুলকন্যা বিবাহের উল্লেখ আছে। অর্জুন, সহদেব, শিশুপাল এবং পরীক্ষিৎ সকলেই স্ব স্ব মাতুলকন্যাকে বিবাহ করেন।

305. Marriage, Endogamous—সগোত্র বিবাহ (অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ)

306. Marriage, Endogamous—অসগোত্র (বহির্গোষ্ঠী বিবাহ)

307. **Marriage, Fictive**—বিবাহ-অভিনয়।

অনেক সময় বিবাহের পূর্বে বিবাহমূলক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একে বিবাহের অভিনয় বলা যেতে পারে। আন্দামানের ওঙ্গীদের মধ্যে এই জাতীয় একটি বিবাহ-অভিনয় অনুষ্ঠান হয়। এই বিবাহে একটা মজার ব্যাপার হয়—বিয়ের কনে ছেলে বা মেয়ে দুইই হ'তে পারে। ছেলেটির পিতামাতা একজন বিবাহিত পুরুষ অথবা অবিবাহিত মেয়েকে পছন্দ করে ছেলেটির কনে হিসেবে। তারপর একটি নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় সাধারণ নিবাসগৃহে ছেলের পিতামাতা আত্মীয়বর্গ সমবেত হয়। কুঁড়ে আলোকিত হয় রেসিনল্যাম্পে। ছেলে ও মেয়েকে বিছানার ওপর বসতে দেওয়া হয়। পরে একজন বয়স্ক লোক ছেলেটিকে উঠে গিয়ে কনে-মেয়ে বা কনে-পুরুষের হাত ধরতে বলে। পরে মেয়ে বা কনে ছেলের কোলের উপর বসে তাকে আলিঙ্গন করে। রাত্রে বরকনে পরস্পর পরস্পরের বিছানায় ঘুমোয়। পরের দিন ছেলে বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছে যায়—আত্মীয়দের কোলের ওপর বসে তাদের আলিঙ্গন করে বিবাহিতা স্ত্রী। পরে ছেলেটিও আলিঙ্গন করে ওইভাবে। এই বিবাহ কেবল অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক—যৌন ব্যাপার এর মধ্যে কিছু নেই।[১৭]

308. Marriage, group—যূথবিবাহ।

309. Marriage, love—প্রেমবিবাহ।

310. Marriage, Primary—প্রথম বিবাহ।

311. Marriage, Secondary—দ্বিতীয় বিবাহ।

312. Marriage, Preferential—বৈবাহিক অগ্রাধিকার।

312. Marriage, tree—বৃক্ষবিবাহ।

একজাতীয় সাংকেতিক বিবাহ। কোন লোক যদি পরপর দু'-তিনবার পত্নীহারা হ'য়ে পুনর্বার বিবাহ করতে চায় তবে তাকে গাছের সঙ্গে বিবাহ করে নিতে হয়। বৈবাহিক আচার প্রায় সবই এতে পালন করতে হয়। উড়িষ্যায় এ জাতীয় বিবাহ প্রচলিত আছে—বিবাহ হয় স্যাওড়া গাছের সঙ্গে। বাংলা দেশেও এই জাতীয় বিবাহের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৭। ক্ষুদ্র আন্দামানের ওঙ্গী—তুষারকান্তি নিয়োগী ও বিমলচন্দ্র রায়। প্রবাসী, পৌষ, ১৩৭২, (পৃ-২৫৭-২৬০)

314. Marriage, beena—ঘরজামাই।

কোথাও কোথাও দেখা যায় যে বিবাহের পাত্র পিতামাতার পরিবার ত্যাগ করে পত্নীর পরিবারে বসবাস করতে থাকে। "ঘরজামাই" অর্থাৎ জামাতাকে ঘরে রাখা হয়। পাত্রী পক্ষের তরফে ঘরজামাই রাখার সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। পরিশ্রমী জামাই হ'লে সে ওই পরিবারের অর্থনীতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে—অলস হ'লে সে ওই পরিবারের বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে ঘরজামাইদের সংখ্যা অপ্রচুর নয়।

315. Mate— সঙ্গী।

316. Material culture—ভৌতসংস্কৃতি/বাস্তব-সংস্কৃতি।

317. Mating— সমাগম/মিলন।

318. Mating behaviour—মৈথুন ব্যবহার।

319. Mating instinct—সমাগমবৃত্তি।

320. Mating season—মিলন ঋতু।

321. Maternal uncle—মামা।

322. Matin— প্রভাত সংগীত।

323. Matriarchal Society—মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।

324. Matriarchy—মাতৃতন্ত্র।

325. Matricide—মাতৃহন্তা।

326. Matrilineal—মাতৃ গোত্রধারা।

327. Matrilineal descent—মাতৃগোত্রীর বংশধারা।

328. Matrilineal family – মাতৃগোত্রীয় পরিবার।

329. Matrilineal relationship—মাতৃগোত্রীয় আত্মীয়তা।

330. Matrilineage—মাতৃকুল।

331. Matrilocal residence - মাতৃস্থানিক বসবাস।

বিবাহের পর পাত্রকে স্বগৃহ পরিত্যাগ করে যদি পত্নীর পরিবারে বসবাস করতে হয় তবে তাকে "মাতৃস্থানিক বসবাস" বলা হয়। (Social Structure—G. P. Murdock)

332. Matronymic—মাতৃনামানুসারী।

333. Method of Investigation—অনুসন্ধান পদ্ধতি।

334. Migration— দেশত্যাগ।

335. Monogamy— একবিবাহ।

336. Moral— নৈতিক।

337. Morality— নীতি।
338. Morality, Pre-marital—প্রাক্‌-বিবাহ সংযম।
339. Motherhood—মাতৃত্ব।
340. Mother sib— মাতৃপক্ষীয় সহোদর।
341. Mutilation— অঙ্গচ্ছেদন।
342. Mystic Number—অতীন্দ্রিয় সংখ্যা/মিষ্টিক সংখ্যা।
343. Nascent stage—জায়মান অবস্থা।
344. Neolithic— নব্যপ্রস্তরযুগীয়।
345. Nomadism— যাযাবরবৃত্তি।
346. Nomenclature—নামমালা।
347. Nubility ceremony—বিবাহ উৎসব।

Terminology in Social Anthropology (5) :
Tushar Kanti Neogy

সূচীকরণ প্রবেশিকা (৭)

তপন সেনগুপ্ত

('*A Primer of Cataloguing*' the 7th No. of its series deals with the problem of Cataloguing on Indic names—suggestions of IASLIC and IFLA have been quoted Indic names are classified from the linguistic point of view rather than classifying them into Hindu names and Non-Hindu names.)

ভারতীয় নাম বৈচিত্র্য

প্রস্তাবনা : আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে ব্যক্তি গ্রন্থকারের নামে সংলেখ প্রস্তুত করতে হলে সূচীকারকে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় :

১ কোন্ ব্যক্তির নামে (যখন গ্রন্থের সাথে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকেন) শিরোনাম হবে।

২ নামের কোন্ অংশকে সংলেখ পদরূপে গণ্য করা হবে।

৩ নামের কোন্ রূপে শিরোনাম হবে।

সূচীকরণ সংহিতার নির্দেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির নামে শিরোনাম হবে স্থির করার পরেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যা থেকে যায়। অবশ্য সংহিতায় এ বিষয়েও বিধান আছে। কিন্তু সংহিতায় নীতি নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। তারপর ঐ আলোকে বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধান করা চলে। সূচীকরণে ভারতীয় নাম বৈচিত্র্য সূচীকরদের কাছে খুবই সমস্যা-সঙ্কুল। কারণ ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য। সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ আর নেই। সূচীকরণের ক্ষেত্রেও তাই ভারতীয় নাম সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, এবং সূচীকরণ সংহিতা-গুলিতেও ভারতীয় নাম সম্পর্কে বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট আছে যদিও বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী সেগুলি যথেষ্ঠ নয়।

পশ্চাৎপট : ভারত ভূমিতে কোন মানব উদ্ভূত হওয়ার প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বর্তমানে ভারতে যে বিভিন্ন জাতির মানুষের বসবাস তাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই বিভিন্ন যুগে ভারতের বাইরে থেকে এসে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। এদের দৈহিক আকৃতি, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ছিল বিভিন্ন ধরণের। তাই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কয়েকটি বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতির নিজ নিজ বিশিষ্ট সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফল। দৈহিক গঠন অনুযায়ী আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ভারতে ছ'টি বিভিন্ন জাতির মানুষ তাদের ন'টি শাখায় বিভিন্ন কালে ভারতে এসেছে এবং এদের মিশ্রণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণের উদ্ভব ঘটেছে। বর্তমানে ঐ সমস্ত জাতিগুলির বেশ কয়েকটির

অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলিকে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে প্রধাণতঃ চারটি ভাষাবংশে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, (১) অষ্ট্রিক (২) দ্রাবিড়ীয় (৩) ভারতীয় আর্য এবং (৪) ভোট চৈনিক। এই ভাষাগুলির আবার বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। শাখা প্রশাখা ও উপভাষাগুলিকে বাদ দিয়ে ভারতের প্রধান, মুখ্য বা সাহিত্যের ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় চোদ্দটি। এই চোদ্দটি ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভাষাগুলি হল (১) হিন্দী (এবং উর্দু) (২) বাংলা (৩) উড়িয়া (৪) অসমীয়া (৫) মারাঠী (৬) গুজরাটী (৭) সিন্ধী (৮) কাশ্মীরী (৯) পাঞ্জাবী (১০) নেপালী (১১) তেলেগু (১২) তামিল (১৩) কানাড়ী এবং (১৪) মালয়ালম। এ ছাড়া ইংরেজী ভাষা ভারতের জনজীবনে, পারস্পরিক ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম রূপে ও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার পথে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় লেখকের দান পরিমাণ ও গুণগত বিচারে মোটেই তুচ্ছ নয়। সুতরাং উপভাষা বাদ দিয়ে সূচীকারের কাছে প্রধান ভাষার সংখ্যা দাঁড়াল পনেরটি। এহেন অবস্থায় ভারতীয় লেখকের নাম সূচীকারের সামনে বহু সমস্যা নিয়ে দেখা দেবে এতো খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সময়ে মূলনাম (Personal name) ও পদবী (Surname বা family name) বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে পদবীর ক্রমবিবর্তন এবং বিভিন্ন ভাষায় পদবীর ভিন্নরূপ সূচীকরণে বহু জটিলতার সৃষ্টি করে। আবার অনেক সময় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মূলনাম ও পদবীর সংস্কৃত রূপ ও চলতি রূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়, যেমন— লক্ষণ ও লছমন, ব্রজভূষণ ও ব্রিজভিখেন কৃষ্ণলাল ও কিষেণলাল, উপাধ্যায় ও ওঝা, দ্বিবেদী ও দুবে, চতুর্বেদী ও চৌবে প্রভৃতি। এই ধরণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে ভারতীয় নাম বৈচিত্র্য সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমায় ব্যবহারের জন্য পদবীগুলির প্রমাণীকরণ করা হয়।

কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সূচীকরণে ভারতীয় নাম সম্পর্কে সর্বপ্রথম ১৯৩৪ খৃঃ ডঃ রঙ্গনাথন অনুবর্গ সূচী সংহিতায় (Classified cataloque code) আলোচনা আরম্ভ করেন। ১৯৫০ খৃঃ তিনি এই সমস্যাটির ভাবগত ও বস্তুগত দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলির নাম বৈচিত্র্য নিয়ে বিভিন্ন লেখক ও গ্রন্থাগারিক আলোকপাত করেন। অবশেষে IFLA-র উদ্যোগে এই সমস্যাটি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আলোচনা বন্দোবস্ত হয়। ১৯৫৭ খৃঃ IFLA সূচীকরণের কিছু মূল সমস্যা সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫৯ খৃঃ এর ১৯—২৫ জুলাই IFLA Working group on the Co-ordination of Cataloguing Principles সম্মেলনের খসড়া তৈরী করবার জন্য প্রাথমিক বৈঠকে মিলিত হয়। ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত এই বৈঠকে আলোচনার জন্য একটি প্রবন্ধ পেশ করেন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের সংকল্প নেওয়া হয় এবং সমস্যাসঙ্কুল বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করবার জন্য বিষয়গুলি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিকে রোমান হরপে অনুবর্ণ সূচীর পথে ভারতীয় নাম নিয়ে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় সে সম্পর্কে আগামী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আলোচনার জন্য ভারতের অন্যান্য গ্রন্থাগারিক ও বিশেষজ্ঞদের সাথে যতদূর সম্ভব আলোচনা করে প্রবন্ধ পেশ করতে বলা হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ও সেই সাথে জাতীয় প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে Indian Association of Special Libraries and Information Centres এই বিষয়ে বিভিন্ন ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত একত্রিত করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই বিষয়ে IASLIC এর প্রথম আলোচনা সভা বসে ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে। সেই সংগে বিভিন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির কাছে মতামত জানতে চাওয়া হয়। অতঃপর ১৯৬০ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত সূচীকরণের ভারতীয় নাম সম্পর্কে IASLIC এর অধিবেশন চলে। বিভিন্ন প্রদেশের গ্রন্থাগারিক ও বিশেষজ্ঞেরা এই সভায় যোগদান করেন, আলোচনার জন্য প্রবন্ধ পেশ করেন ও বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সূচীকরণের এই সমস্যাটি নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে আর কোথাও হয় নি। এই সম্মেলনের পরে IASLIC কর্তৃক প্রকাশিত Indic name : including proceedings of the seminar on the rendering of Indic names held at Calcutta, Dec. 30, 1960—Jan 1, 1961 গ্রন্থখানি সূচীকরণে ভারতীয় নাম সম্পর্কে জানবার পথে মূল্যবান দলিল। IASLIC এর এই সম্মেলনের পরে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত IFLA সম্মেলনে (প্যারিস ৯-১৮ অক্টোবর, ১৯৬১) যোগ দেন এবং আলোচনার জন্য প্রবন্ধ পেশ করেন। প্রবন্ধ উত্থাপন করে তিনি IASLIC সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করেন। শ্রী সেনগুপ্তর প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনার জন্য যে বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সকল সদস্য IASLIC সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। IASLIC সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মর্মার্থ হল :

১ গ্রন্থকার যে কোনরূপ বানানই ব্যবহার করুন না কেন রোমক লিপিতে অখণ্ড অনুবর্ণ সূচীতে একই গ্রন্থকারের রচনা বিভিন্ন গ্রন্থের সংলেখগুলি একই গ্রন্থকার শিরোনামায় একত্রিত করতে হবে।

২ ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য বিবেচনা করে সকলে এই মত প্রকাশ করেন যে গ্রন্থকার শিরোনামের জন্য একটি মাত্র সংগতিপূর্ণ নীতি নির্দ্ধারন করা কার্যকর হবে না। তাই স্থির হয় যে ভিন্ন ধরণের ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলির গ্রন্থকার শিরোনামের জন্য নামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা অংশগুলি মূলনাম বা পদবী নির্দ্ধারণ করবার স্বাধীনতা থাকবে।

৩ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যক্তি নামের বিভিন্ন রূপ একই ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হলেও অনুবর্ণ সূচীতে ঐ নামগুলিকে পৃথক নামরূপে গণ্য করা হবে।

৪ গ্রন্থকারের নামের একই সংলেখ পদের (entry word) জন্য রোমক লিপিতে বিভিন্ন বানান ব্যবহৃত হলে ঐ বানানগুলির প্রমাণীকরণ করে অনুবর্ণ সূচীতে ব্যবহার করা হবে।

৫ যথোচিত ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের নামের বানান প্রমাণীকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে এই আলোচনা সভা IASLIC কে অনুরোধ করছে যেন অবিলম্বে জাতীয় গ্রন্থাগার ও ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রতিনিধি এবং অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক ও এই বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে গ্রন্থকার-নামের বানান প্রমাণীকরণ সম্পর্কে পন্থা অনুসন্ধান করে ছয় মাসের মধ্যে IASLIC এর কাছে বিবরণ পেশ করে।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী IASLIC এর বিশেষ সমিতি হিন্দু ব্যক্তি নামের সংলেখ পদ (অন্ত্যনাম) গুলি তালিকাভুক্ত করে ও প্রমিত রূপ (standardized form) সুপারিশ করে। সেই সাথে ইংরেজী ভাবাপন্ন মারাঠী নামেরও অনুরূপ তালিকা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সূচীতে বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী এগুলি ব্যবহার করা হবে এই সর্তে IFLA সম্মেলনে পদবীর এই প্রমিত রূপগুলিও অনুমোদিত হয়।

ভারতীয় নামের বর্গীকরণ :

ভারতীয় নাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সমস্যাটিকে মূলতঃ ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যারূপে গণ্য করতে হবে কেননা নামের সংগে ধর্ম বা সংস্কৃতির যোগ যতই থাকুক না কেন ভাষার সম্পর্ক সব চাইতে বেশী। তাই ভারতীয় নামের বর্গীকরণ ভাষাভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়—সাম্প্রদায়িক নয়। সুতরাং ভারতীয় নামগুলিকে হিন্দু নাম ও অ-হিন্দু নামে ভাগ না করে ভাষাবর্গ অনুযায়ী ভাগ করা যেতে পারে। হিন্দুনাম ও অ-হিন্দু নামে ভাগ করলে দেখা যাবে যে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে আবার বিভিন্ন ভাষা অনুযায়ী ভাগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন, হিন্দুনামের মধ্যে আর্য ভাষা বংশের অন্তর্গত উত্তর ভারতের ভাষাগুলির নামের গঠনের সংগে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাবর্গের অন্তর্গত দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির নামের গঠনে যথেষ্ঠ তারতম্য দেখা যায়। আর্য জাতি ও দ্রাবিড় জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারাও ভিন্ন। একই ভূখণ্ডে বাস করার ফলে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে বহু বিষয়ে ঐক্য গড়ে উঠলেও উভয়ের ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। তাই ভারতীয় নাম বৈচিত্র্য আলোচনা করতে গেলে আর্যনাম ও দ্রাবিড়ীয় নামগুলির পৃথক আলোচনা প্রয়োজন। সেই সংগে মুসলমান নামগুলিরও (Muslim names) পৃথক আলোচনা প্রয়োজন—ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বলে নয়—এই নামগুলি উর্দু, ফারসী (কিম্বা আরবীয়) ভাষা অনুযায়ী গঠিত হওয়ায় অন্যান্য ভারতীয় নামের চাইতে এগুলি স্বতন্ত্র্য। যদিও ভারতের বহু মুসলমান আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে, যেমন বাংলাদেশের মুসলমানেরা বাংলা, আসামের মুসলমানেরা অসমীয়া ভাষা ব্যবহার

করে কিন্তু নামে ব্যবহৃত শব্দগুলির সংগে বাংলা বা অসমীয়ার কোন মিল নেই। আবার বর্তমানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা ও জাগরণের সাড়া পড়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসীরা (মূলতঃ অষ্ট্রীক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত) নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণায় এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও এদের লেখা বই-পত্র এখন গ্রন্থাগারে আসতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং এদের রচনাগুলির প্রতি সুবিচার করতে হলে এই সব নামগুলির জন্য পৃথক আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের রচনাগুলিকে সূচীভুক্ত করতে গেলেও দেখা যাবে যে সমস্যাটি ভাষাতাত্ত্বিক। বৌদ্ধ বা জৈনদের নামে পালি ভাষার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং ভারতীয় নামগুলিকে ভাষা বংশ অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে সমস্যাগুলির স্বরূপ প্রকাশ পাবে এবং তখন সমাধানের পথ খোঁজাও সহজ হয়ে পড়বে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলিকে মোটামুটি চারটি ভাষাবংশে ভাগ করা যেতে পারে।

১ **ভারতীয় আর্যভাষা** : ভারতীয় আর্যভাষা সুপ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্তর্গত। উত্তর ভারতের অধিকাংশ ভাষাই এই ভাষা বংশের অন্তর্ভুক্ত। আর্য ভাষায় রচিত সাহিত্য সমূহ ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্য পরিমাণগত ও গুণগত বিচারে অন্য সবার উর্দ্ধে। নিম্নে প্রদত্ত ছকে ভারত-ভূমিতে ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের রূপটি তুলে ধরা হোল :
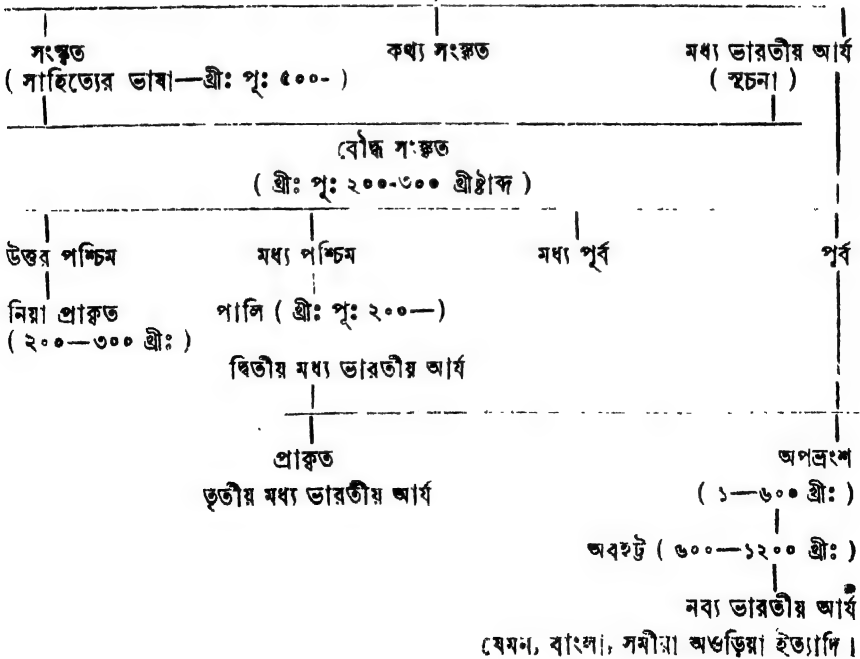
২ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা : দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর ভাষাগুলি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। এই ভাষায় রচিত সাহিত্য দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আর্য ও দ্রাবিড় ভাষা বিভিন্নরূপে একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। বেলুচিস্থানে কথিত ব্রাহুই ও বাংলাদেশের রাজমহল পাহাড়ে কথিত মাল্‌তো বা মালপাহাড়ী দ্রাবিড় ভাষা বংশের অন্তর্গত। নিম্নে প্রদত্ত ছকে দ্রাবিড় ভাষা বংশের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাগুলির নাম দেওয়া হোল :
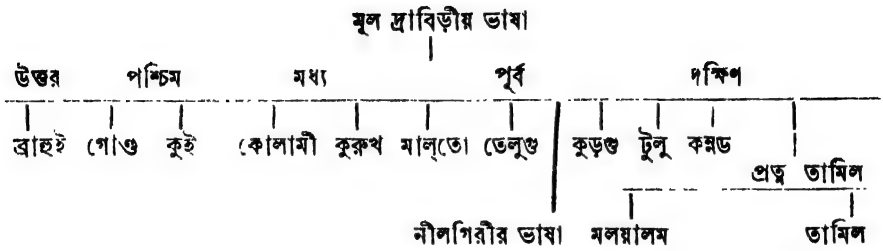
৩ অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা : ভারতে আর্যজাতির আগমণের বহু আগে থেকে এই গোষ্ঠীর লোকেরা ভারতে বসতি স্থাপন করে। সুতরাং একদা এই গোষ্ঠীর ভাষা সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে প্রচলিত ছিল। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় এই ভাষাগুলির প্রভাব অপরিসীম। নিম্নে এই ভাষা বংশের ছক দেওয়া হোল :
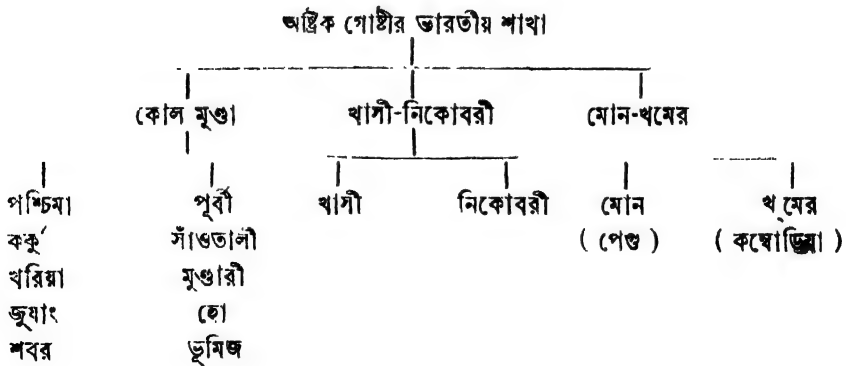
৪ ভোট-চীনিয় গোষ্ঠীর ভাষা : ভারতে এই গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরিমান খুব উল্লেখযোগ্য নয়। এই গোষ্ঠীর ভাষা হিমালয়ের পাদদেশে এবং আসাম-চীনা-বর্মা সীমান্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। নিম্নে প্রদত্ত ছকে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখান হোল :
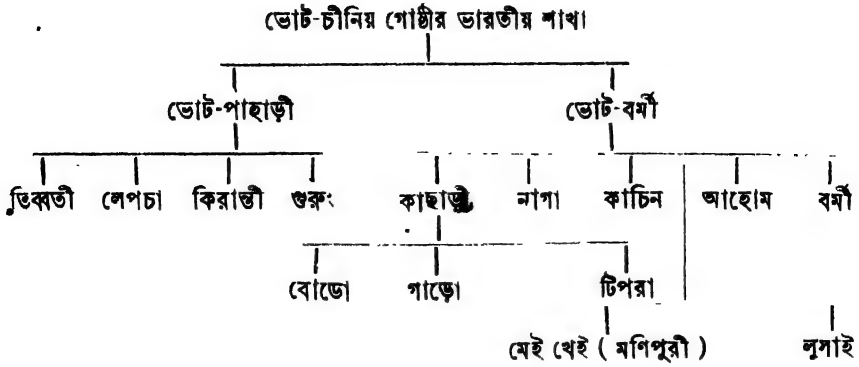
আর্য নাম ঃ আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নামগুলি আলোচনার প্রারম্ভে ভারতীয় নাম সম্পর্কে পাঠকের অন্বেষণের ধারা অনুধাবন করা প্রয়োজন। [প্রসংগত বলা যেতে পারে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের মধ্যে যারা পুরোপুরি খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করেছেন তাদের নামগুলি এই আলোচনার আওতায় পড়ে না, কেননা ঐ সব নামের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নাম সম্পর্কে সূচীকরণ সংহিতায় প্রদত্ত নীতি প্রযোজ্য।]

ব্যক্তি গ্রন্থকারের নামে সংলেখ প্রস্তুত করতে গিয়ে সূচীকারের পক্ষে সর্বপ্রথম কাজ হল নামের মধ্য থেকে সংলেখ পদটি বাছাই করে নেওয়া। নাম সাধারণত একটি মাত্র পদ বিশিষ্ট হয় না। একাধিক পদ একত্র হয়ে নামের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য নামগুলির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অন্ত্যনামকে সংলেখ পদ ধরা হয় কেননা অন্ত্যনাম পদবী বা পারিবারিক নাম বহন করে [অবশ্য দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়।] কিন্তু ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে এই সহজ মীমাংসা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ বহু প্রদেশে মূলনামের দ্বারা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভাষায় বহুদিনের রীতি-নীতি ও ব্যবহার অনুযায়ী এই ধরণের বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়ে যায়। ইংরেজী কবিতা খুঁজতে এসে পাঠক খুঁজবেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের সংকলন আছে কি না। কেউই তাঁর মূলনাম উইলিয়ম এর কবিতা আছে কি না জিগ্যেস করেন না। কিন্তু বাংলা কবিতার পাঠক এসে খুঁজবেন জীবনানন্দের কবিতা আছে কি না। অবশ্য ভারতীয় লেখকের ইংরেজী রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার জন্য অনুসৃত নীতি প্রযোজ্য। তখন আবার পদবীর প্রমানীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতে অনেকেই নামের সংগে পদবী লেখেন না—বা আদৌ তাদের মধ্যে পদবীর ব্যবহার নেই। যেমন, শিবরাম পার্থসারথি। এখানে আগুনামটি হল বাবার নাম, অন্ত্যনামটি হল মূলনাম বা ব্যক্তিনাম বা নিজের নাম। কাজেই ভারতীয় নাম সম্পর্কে কোন ঢালাও নিয়ম বেঁধে দেওয়া কার্যকর হবে না। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং ঐ নামগুলি সম্পর্কে পাঠকের ধারা অনুধাবন করে নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে।

ভারতের ইতিহাসের আদি যুগে শুধুমাত্র মূলনামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পদবীর ব্যবহার আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে। জাতিপ্রথা, বংশগত জীবিকা বা ব্যবসা কিম্বা জমিদারী প্রথা ইত্যাদি যেগুলি মূলতঃ পদবীর উৎপত্তির কারণ এর কোনটিই আদি যুগে বিকাশলাভ করেনি। তাই নাম অর্থে আদি যুগে একটিমাত্র পদের ব্যবহার ছিল। কিন্তু একই ব্যক্তি অনেক সময় বিভিন্ন নামে পরিচিত হত। হিন্দু দেব-দেবীর প্রায় প্রত্যেকেই বহু নামের উল্লেখ আছে—যেমন, দাশরথি, রাঘব, রঘুপতি, কমললোচন, ইত্যাদি। ভারতীয়দের নামকরণে এই ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতীয় নামগুলির গঠন বিশ্লেশণ করলে দেখা যাবে যে ধর্মীয় আচার বা চেতনা, পিতৃ পরিচয় বা বংশ পরিচয় রূপ (চন্দ্রকান্ত, কমলাক্ষ, রমনীমোহন), শৌর্য (বজ্রবাহু, ইন্দ্রজিৎ, শক্তি প্রসাদ, বীরেশ্বর), স্নেহ, মমতা বা সংস্কার (সুন্দরলাল, দুলাল, নয়নচাঁদ, সাতকড়ি, দুঃখীরাম, আর না কালী) কিম্বা বিশেষ কোন মানসিক উৎকর্ষ (সুমতি, মনীষা, মমতা, সুশীল) ইত্যাদি প্রকাশ করে এবং নাম গঠনের পিছনে এই বিশেষ মানসিক চেতনা বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে।

আর্য গোষ্ঠীর মধ্যে নামের বেশ একটি বড় অংশ ধর্মীয় চেতনা ও আচারের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বহু হিন্দু দেব দেবীর নাম কিম্বা কোন পৌরাণিক চরিত্র বা কোন ধর্মগুরুর নাম অনুযায়ী রাখা হয়। যেমন, লক্ষ্মণ, মুরলীধর, গোপীচাঁদ, জয়দেব, রামকৃষ্ণ, গৌতম, পরেশনাথ, শংকর, আশুতোষ, ইত্যাদি। আবার সন্তানের জন্য দেবতার কৃপাভিক্ষা করে অনেক পিতামাতা আরাধ্য দেবতার সেবকরূপে সন্তানের নামকরণ করেন। যেমন, রামদাস, কালিকিঙ্কর দেবাশীষ। বহুক্ষেত্রে হিন্দু দেব-দেবীর নাম সমাজবদ্ধ হয়ে হিন্দু ব্যক্তিনাম গঠিত হয়েছে। যেমন, গৌরীশংকর, সীতারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, ইত্যাদি। আদি যুগে নামের মধ্য দিয়ে বহুসময় পিতৃ-মাতৃ পরিচয় বা বংশ পরিচয় বা পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি প্রকাশ পেত। বর্তমানে ঐ ধরণের নাম আছে কিন্তু নামগুলি নেহাত নাম মাত্র—নামের অর্থ বিশ্লেষণ করে যোগসূত্র পাওয়া যাবে না। রামায়ণে সৌমিত্রি বললে সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে বোঝায়—তেমনি, দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের আর এক নাম দাশরথি—পার্থের সারথি শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম পার্থসারথি। কিন্তু পৌরাণিক যুগের পর আমরা অনেক দিন পেরিয়ে এসেছি। সমাজ ব্যবস্থার বহু আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এখন আমরা যে স্তরে এসেছি সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বংশ পরিচয় বোঝাতে পদবী ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই মূলনাম বা ব্যক্তিনাম এখন ব্যক্তিকে গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র করেই মুক্ত—গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ ব্যক্তির পারিবারিক পরিচয় জানাবার দায়ীত্ব মূলনামের নয়—পদবী সেই কাজটুকু করে দিচ্ছে। অবশ্য দক্ষিণ ভারতীয়দের (দ্রাবিড়ীয়) নামের মধ্যে পিতৃ পিতামহের নাম, আবাস ভূমির নাম ইত্যাদি মূলমনামের সাথে যুক্ত থাকে। দক্ষিণ ভারতীয়দের নাম সম্পর্কে আলোচনার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মূলনামের রূপ অসংখ্য, সংখ্যা অগণনীয়। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মিত্র, রুদ্র, সোম, অগ্নি, প্রহ্লাদ, ধনঞ্জয়, গার্গী, গায়ত্রী, অত্রি ইত্যাদি নাম যেমন পাওয়া যায় তেমনি

পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত অতি আধুনিক নাম আইভি, নীনা, পল, মোনা, বিউটি ইত্যাদিরও ছড়াছড়ি। বহু সময় দেখা যায় সংস্কৃত নামগুলি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এই ধরণের নামগুলিকে পৃথক নাম হিসেবে গণ্য করা শ্রেয়—ব্যুৎপত্তি খুঁজে বার করে সংস্কৃত রূপ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়। কৃষ্ণলাল ও কিষেণলাল ব্যুৎপত্তি রাও অর্থে একই নাম ; তেমনি ব্রজভূষণ ও ব্রিজভিখেন। কিন্তু তৎসম বা সংস্কৃত রূপটি ব্যহৃত হয় বাংলায় এবং সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভিন্ন রূপটি ব্যবহৃত হয় হিন্দীতে। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে কৃষ্ণলাল, কিষেণলাল, ব্রজভূষণ, ব্রিজভিখেন প্রত্যেকটিকে পৃথক নাম রূপে গণ্য করতে হবে।

স্বচীকরণে মূলনাম প্রমাণীকরণ নিষ্প্রয়োজন এবং অবাঞ্ছনীয় কেনন। মূলনাম ব্যক্তিকে গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র করে। পদবী প্রমাণীকরণ অপরিহার্য কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদবী পদটিকেই সংলেখ-পদ রূপে গণ্য করা হয়। তাই একই পদবীর জন্য বিভিন্ন বানানের ব্যবহার থাকলে প্রমাণীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুবা অনুবর্ণ স্বচীতে একই পদবী বানানের ভিন্নতার দরুণ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে।

[ক্রমশঃ]

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

Sen, Sukumar :
A Comparative grammar of middle Indo-Aryan, Poona, 1960.

Sengupta, Benoyendra :
Cataloguing ; its theory and practice. Calcutta, 1964.

A primer of cataloguing (7) : Tapan Sen

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা প্রত্যেক গ্রন্থাগারকর্মি ও শুভানুধ্যায়ীদের মুখপত্র। পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশার্থে নবীন ও প্রবীনদের নিকট সহযোগিতা আহ্বান করি।

সম্পাদক।

বার্তা-বিচিত্রা

গ্রন্থ : গ্রন্থকার :: সাহিত্য : সংস্কৃতি

এ বছর শিশু সাহিত্যে বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনার জন্য এক হাজার টাকা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন কৃষ্ণনগরের অধিবাসী শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী। 'আমাদের প্রতিবেশী কীটপতঙ্গ' নামক পুস্তকখানির জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন।

* * *

প্রখ্যাত সাহিত্যিক নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে "কালিদাস নাগ স্মৃতি" পদক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। চিন্তার মৌলিকতা ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষের জন্য তিনি এই পদকটী লাভ করেন। পদকটির একদিকে রৌপ্য পদ্মের উপর স্বর্ণ হস্তী উৎকীর্ণ আছে ও অপরদিকে ধর্ম্মপদের একটি বাণী আছে।

* * *

রবীন্দ্র-জীবনীকার ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দান করার প্রস্তাব বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। প্রস্তাবটি এখন কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন।

* * *

কবি নজরুল ইসলামের সপ্তবতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'উত্তররবি' নামে একটি দৈনিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অবশ্য পত্রিকাটি ঠিক ক'দিন বেরিয়েছে জানা নেই। কিছু শুভেচ্ছা ও টুকরো রচনা ছাড়া এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডঃ রমা চৌধুরীর সংস্কৃত ভাষায় নজরুল বন্দনা।

আর একটি বাংলা কবিতা পত্রিকা বেরিয়েছে,—নাম 'জীবনানন্দ'। সম্পাদক পলাশ মিত্র। বিষ্ণু দে, মনীষ ঘটক, বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র সমেত তরুণতম লেখকরাও আছেন এতে।

* * *

গত ২৮শে জুন নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটি শাখার উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবন, অলৌকিক প্রতিভা, অসামান্য ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপান্নালাল মাইতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটি শাখার সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে, পুরানরত্ন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋষি বঙ্কিমের নামে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তাব রাখেন।

লেনিনগ্রাদ্ বিশ্ববিদ্যালয় উনবিংশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর তিন খণ্ডে এক প্রবন্ধ (monograph) প্রকাশ করেছেন। লেখিকা অধ্যাপিকা ভেরা শেভিকোভা সাত বছরের পরিশ্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জীবন ও রচনা রাশিয়ান পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন।

*　　　*　　　*

গত ২৬শে মে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আনন্দবাজার, যুগান্তর, মৌচাক ও উল্টোরথ আয়োজিত বাৎসরিক সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী (মরণোত্তর) অলঙ্কার চন্দ্রিমা গ্রন্থের জন্য এবং মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শঙ্কর) বোধোদয় গ্রন্থের জন্য। শিশির ও মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল রায়। উল্টোরথ ও মৌচাক পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে সুনীল কুমার নন্দী ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র।

*　　　*　　　*

মহেন্দ্রনাথ দত্তর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে চিত্রে ও নিবন্ধে সমৃদ্ধ এবং অপ্রকাশিত তথ্যাবলী সম্বলিত মহেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। যাঁরা মহেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্যাবলী জ্ঞাত আছেন তাঁরা এ সম্পর্কে সম্পাদক, বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, ১৮/১ সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

*　　　*　　　*

পল্লীবাংলার কবি জসিমউদ্দীন সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন। তাঁর কয়েকটি বই বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। "নকশী কাঁথার মাঠ" ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন মিসেস মেরী মিলফোরড। জারমানে কানাই গাঙ্গুলী অনুবাদ করেছেন। 'মাটির কান্না' নব্বই হাজার কপি রাশিয়ানে বিক্রী হয়েছে। 'সোহন বাদিয়ার ঘাট' ইংরেজী করেছেন মিসেস ভারবারা পেনটার। এ বইটি এখনও প্রকাশিত হয় নি। সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনের পক্ষ থেকে ও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

*　　　*　　　*

অভিনেত্রী জুলিয়েট ড্রুক ৫০ বছরের বেশী সময় ধরে ভিকটর হিউগোকে যে সব অন্ধ এবং তীব্র আবেগপূর্ণ প্রেমপত্র লিখেছিলেন সেইসব প্রেমপত্রের ৫০টি তাড়ার জন্য ফরাসী সরকারকে ২,৫৫,৪১০ ফ্রাঁ মূল্য দিতে হয়েছে। তিনি ভিকটর হিউগোকে ১৮ হাজার প্রেমপত্র লিখেছিলেন। চিঠিগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য ভিকটর হিউগো এই ১৮ হাজার প্রেমপত্রই সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। এরমধ্যে সাড়ে ষোল হাজার পত্র নীলামে বিক্রি করা হয়। এই সাড়ে ষোল হাজার পত্রকে ফরাসী সাহিত্যের অমূল্য উত্তরাধিকার বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

*　　　*　　　*

তামিল ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ডে ১৫টি গল্প আছে। অনুবাদ করেন শ্রী টি. এন. কুমার স্বামী।

অসমীয়া লেখক হোলিরাম ডেকাইল ফুকানের "কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি" বাংলা হরফে প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থ। ১৮৩২ খৃঃ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। হোলিরাম ডেকাইল ফুকান বাংলা ভাষায় আসামের ইতিহাস রচনা করেন। ১৮৩২ খৃঃ তাহার মৃত্যু হয়। গৌহাটি বিশ্ব- বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বিদেশের এক গ্রন্থাগার থেকে ইহা আবিষ্কার করেন।

* * *

বিশিষ্ট তেলেগু কবি ও ছোটগল্প লেখক শ্রী কে ভেঙ্কটরাও ৭৭ বৎসর বয়সে গুণটুরে পরলোকগমন করেন। শ্রী ভেঙ্কটরাও পরলোকগত শ্রীঅসওয়াল্ড কাউলড্রের শিষ্য ছিলেন। তেলেগু কাব্যে শ্রী ভেঙ্কটরাও এক নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেন।

* * *

সম্প্রতি ইয়র্কশায়ারের যুবতী গৃহিণী শ্রীমতী জ্যাকুলিন নেলর গ্রন্থাগারের প্রাপ্য জরিমানা না দেওয়ার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীমতী তিন সন্তানের জননী। বইএর মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসেন ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়তে। গ্রন্থাগার থেকে কয়েকটা উপন্যাস নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ীতে। কখন বাচ্চারা ছিঁড়ে ফেলেছে সেগুলো! ছেঁড়া বই ফেরৎ দিয়ে আসার সাহস হ'ল না। ফলে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জরিমানা করলেন দশ পাউণ্ড পাঁচ শিলিং। শ্রীমতী পুরো জরিমানা না দিয়ে ছ পাউণ্ড পনেরো শিলিং বাকি রাখলেন। কোর্টে হাজির হতে হ'ল। সব শুনে বিচারপতি রায় দিলেন আসামীকে ৫ ঘণ্টা ঠাণ্ডা 'সেল'-এ কাটাতে হবে (অবশ্য কার্যতঃ ৪ ঘণ্টা পরে তিনি ছাড়া পেয়ে যান)। এবং মন্তব্য করেন, "You have been a complete nuisence to the library and the court."

* * *

রাজ্যসরকারের প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, মসজিদ এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ-গুলির এক পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ তৈরী করা স্থির করেছেন। ১৯৫৬ সালের ঐতিহাসিক স্মৃতিরক্ষা আইন অনুসারে এই ক্যাটালগ তৈরী হবে। ক্যাটালগ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

* * *

মেদিনীপুর শহরে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও গৃহস্থালীর একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তাঙ্গন যাদুঘর স্থাপনের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা শিল্প-দ্রব্য এখানে থাকবে। কাঁসাই নদীর অববাহিকায় পিরামিডকৃত অতিকায় দোতলা খড়ের ছাউনিযুক্ত মাটির বাড়িতে এটি স্থাপন করা হবে। যাদুঘরের নাম হবে বাংলার লোক-সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির পূর্বসাধক ৺দীনেশচন্দ্র সেনের নামানুসারে। তাঁর লেখা পুস্তক ও ব্যবহৃত ব্যক্তিগত দ্রব্যাদিও প্রদর্শিত হবে। শিল্পী ও মিউজিওলজিষ্ট শ্রীসুধাংশু কুমার রায় এই যাদুঘরের পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন।

* * *

গত ৫ই জুলাই রাজ্যের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় ২৪ পরগণার জয়নগর মজিলপুরের

পরলোকগত পুরাতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্তের সংগ্রহের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দরবন ও তার সংলগ্ন এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে সেখানে ছড়িয়ে থাকা পুরাতত্ত্বের যে সমস্ত নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান ও সুন্দরবনের ইতিহাসের অন্ধকার দিকগুলি আলোকিত করার উপকরণ হিসাবে একান্ত প্রয়োজনীয়।

*　　*　　*

সৃজনশীল সাহিত্যের পাঠক সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বোম্বাই-এর একটি বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এক অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এখানে নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন একজন করে লেখক থাকতেন এবং সেদিন যারা বই কিনতেন তাদের বই এ সেই লেখক অটোগ্রাফ দিতেন। সবচেয়ে ভীড় হয় মারাঠী সাহিত্যে সুবিখ্যাত ছদ্মনামা লেখক থল থন পাল যেদিন প্রদর্শনীতে আসেন। সাতদিনব্যাপী এই প্রদর্শনী পাঠকমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

*　　*　　*

পরলোকে শ্রীমতী সুখলতা রাও

গত ৯ই জুলাই শিশুসাহিত্যে বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী সুখলতা রাও পরলোকে গমন করেছেন। শ্রীমতী রাও তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ভ্রাতা সুকুমার রায়চৌধুরীর মতন শিশু পাঠক-পাঠিকার একান্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ অক্টোবর মাসে তাঁর জন্ম হয় এবং তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'সন্দেশে' ১৯১৩ সালে। বহু গল্প তিনি অনুবাদ করেছেন এবং তাঁর লিখিত অনেক কবিতা ও গান আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছে। "গল্প আরও গল্প" এই গ্রন্থের জন্য ১৯৫১ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, "নিজে পড়" ও "নিজে দেখ"র জন্য শিশু সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন। শিশু সাহিত্য প্রতিযোগিতায় তাঁর "নানা দেশের রূপকথা" শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে। ওড়িয়া সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী লেখিকা। তিনি অনেক উপন্যাস উড়িয়া ভাষায় লিখেছেন। উড়িষ্যায় বিভিন্ন সমাজহিতকর কাজের জন্য তাকে "কাজের-ই-হিন্দ" পুরস্কার দেওয়া হয়। "Lending lights" নামে তিনি একটি ইংরাজী কবিতার গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং বেহুলার কাহিনী তিনি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন, যার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। শ্রীমতী রাওর মৃত্যুতে শিশু সাহিত্য জগতে যে ক্ষতি হলো, তা পূরণ করা কোনদিনই সম্ভব হবে না।

*　　*　　*

পরলোকে আচার্য ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্

আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরতরে নিভে গেল।

সারা বাংলার পরমাত্মীয় ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আর নেই।

১৩ই জুলাই রবিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জ্ঞানতাপস মহম্মদ শহীদুল্লাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডঃ শহীদুল্লাহের জন্ম চব্বিশ পরগণা জিলার বসিরহাটে। সংস্কৃতে অনার্স সহ স্নাতক হবার পর তিনি ১৯১২ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্বে এম. এ. পাশ করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিভাগের সাথে ডঃ শহীদুল্লাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই বিভাগের প্রথম এম. এ. ডঃ শহীদুল্লাহ।

তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিভাগের প্রাচীন যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে শহীদুল্লাহ ছিলেন অগ্রজ প্রতিম। নবীনদের কাছে তিনি আচার্য শহীদুল্লাহ।

আজীবন জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কাজে ব্যাপৃত এই মানুষটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যে কঠিন সংগ্রাম করে গেছেন বাঙ্গালীমাত্রই সে কথা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবেন। বাংলা ভাষায় একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিধান ছিল শহীদুল্লাহের আমরণ স্বপ্ন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান রচনায় অগ্রণী হয়ে অনেকদূর এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি সে কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারলেন না। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা একাডেমির সাথে যুক্ত থেকে তিনি আরো বিভিন্ন দিকে গবেষণার সূত্রপাত করেন। দেশবিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে বসবাস করলেও শহীদুল্লাহ ছিলেন সারা বাংলার সুহৃদ, একান্ত আপনজন। বিভিন্ন সময় সাহিত্য সভায় তাঁর বক্তৃতা ও পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতির স্বাক্ষর বহন করছে। প্রাচীন বাংলার উপর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট লাভ করেন। বাংলা ব্যাকরণ (কলি : ১৩৪২), ভাষা ও সাহিত্য (ঢাকা, ১৩৩৮) বিদ্যাপতি শতক (কলি : ১৯৫৪) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ছাড়াও Munda affinities in Bengali ইত্যাদি রচনা তাঁর গবেষক দৃষ্টিভংগীর পরিচয় বহন করছে। ডঃ শহীদুল্লাহর তিরোধানে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অপুরণীয় ক্ষতি হল।

সংকলনে : বেণু দত্ত, গীতা মিত্র ও তপন সেনগুপ্ত

Notes & News

প্রশ্ন তাই...
জবাব চাই

স্বর্ণ সেন

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। স্থানে স্থানে মোটা হরফের ব্যবহার পত্র লেখকের ইচ্ছানুসারে করা হয়েছে—সম্পাদকের দায়ীত্বে নয়]

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

গভীর দুঃখের সাথে আপনার কাছে এই চিঠি পাঠাচ্ছি। গ্রন্থাগার জগতের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকলের সামনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। তাই গ্রন্থাগার জগতে সুপরিচিত 'গ্রন্থাগার' এর পাতায় এই পত্রখানি প্রকাশ করলে বাধিত হব। বলা বাহুল্য মতামতের জন্য দায়ীত্ব সম্পূর্ণ আমার।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Lib. Sc. কোর্সের সিলেক্‌শন্ লিষ্ট প্রকাশ করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বহু যোগ্য প্রার্থী সুযোগ পান নি। এঁদের মধ্যে এম. এ., বি. এ. (অনার্স) আছেন একাধিক। তদুপরি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সে সসম্মানে **উত্তীর্ণ হয়েছেন**, এম. এ. পাশ, কিম্বা পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা প্রায় সকলেই বঞ্চিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিভাগীয় প্রধান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে উত্তর পেয়েছেন তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। শোনা গেল—B. L. A-র সার্টিফিকেট কোর্সের পাশ, ডিস্টিংশন ইত্যাদি নাকি কোন কোয়ালিফিকেশনই নয়। তখন সংশ্লিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন করেন যে এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা B. A. আমরা এম. এ. পাশ করেছি—সুতরাং B. L. A. র সার্টিফিকেট বাদ দিলেও তো আমাদের অন্ততঃ একটা interview পাওয়া উচিৎ ছিল। পেলাম না কেন? তাহলে এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা আপনি কিভাবে নির্দ্ধারণ করলেন? মাননীয় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয় আলোচনা করতে অস্বীকার করেন।

[মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, প্রসংগত জানিয়ে রাখি—শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের আলোচনার যে রিপোর্ট প্রকাশ করলাম তার সমর্থনে প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীদের আপনার সামনে উপস্থিত করতে পারব। ঘটনার দিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলাম।]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের সিলেকশনের ব্যাপারে এ ধরণের দুঃখজনক ঘটনা এই নতুন নয়। ইতিপুর্বেও এমন হয়েছে। অন্ততঃ এক বছরের

ঘটনা বলি—১৯৬৪ সাল—শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের আমলের ঘটনা। সার্টি-ফিকেটে ভাল রেজাল্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্র ছাত্রী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে প্রবেশের সুযোগ পেলেন না। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ ভাববাচ্যে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে যে উত্তর দিয়েছিলেন তার কোন অর্থ হয় না। [কেউ যদি প্রতিবাদ করতে চান তো করতে পারেন—সাক্ষ্য-প্রমাণ হাতে নিয়েই কলম ধরেছি—সুতরাং প্রত্যুত্তর দিতে অসুবিধা হবে না।]

এই হোল অবস্থা। একজন সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে আমার মনে দু'একটি প্রশ্ন জেগেছে। আপনাদের সকলের কাছে নিবেদন করছি ও এই বিষয়ে চিন্তা করতে অনুরোধ করছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের শুরু ১৯৩৭ সালে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা শুরু হয় ১৯৪৫ সালে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ট্রেনিং এর সুনাম শুধু বাংলাদেশে নয়—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় এই পরিষদের কর্মসচিবের গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করে গেছেন। মাত্র দু'বছর আগেও তিনি এই পরিষদ পরিচালিত কোর্সে শিক্ষকতা করেছেন। পরিষদের ছাত্র ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছি। পরিষদের প্রথম যুগের ছাত্র হিসাবে গর্বভরে এগিয়ে গিয়ে মাইকের সামনে নিজের নাম ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ঘোষণা করতে দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের আরো অনেকের সম্পর্কেই এমন অনেক কিছু বলা চলে। কেউ মাত্র দু'বছর আগের পরিষদের ট্রেনিং কমিটির কর্মসচিব ছিলেন। শিক্ষকতা করা ছাড়াও পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্ম, সভা-সমিতিতে এদের দেখা যেত বা দু'চারজনকে এখনও দেখা যায়। খুব স্বাভাবিক কারণেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেয়ে আসছিল। নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন যে ডিগ্রী কোর্স পড়বার আগে প্রাথমিক সার্টিফিকেট কোর্স পড়া থাকলে তাদের পক্ষে পড়তে যেমন সুবিধা হয়—তেমনি শিক্ষকও পড়িয়ে আনন্দ পান। সে ছাড়া প্রাথমিক কোর্স পড়ার পর উচ্চতর শিক্ষা নেবার সুযোগ না পেলে তাদেরই বা ঐ প্রাথমিক পাঠ নিয়ে লাভ হল কি! কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষার ফলাফল বেরোলেই দেখা যায় প্রথম সারির অধিকাংশই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পরিষদের সুনাম ও ঐতিহ্য উজ্জলতর করেছেন। সুতরাং দলাবাজি করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষণের মান ছোট করা যাবে না। অবশ্য একথা কখনও বলছি না যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শুধুমাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আমরা যোগ্যতা অনুযায়ী সুবিচার আশা আশা করি। সিলেকশনের আদর্শ বা নীতি কি জানতে চাই। কোন্ যোগ্যতার মাপকাঠিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ বিচার করেন জান্‌তে চাই। এটুকু জানতে চাইবার অধিকার আমাদের আছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাবে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা জানতে চাই বিরোধ কোথায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য অনেকের চাইতে বেশী যোগ্যতা-সম্পন্ন হয়েও প্রবেশাধিকার পাচ্ছে না কেন? এমন কি তাদের ইন্টারভিউ পর্যন্ত নেওয়া হয় না কেন? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তাদের অযোগ্য প্রমাণ করা হল? আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই চিঠি শেষ করছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের একটি বিভাগের ক্লাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়। Classification Practice এর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গত বছর পর্যন্ত পরিষদকে Dewey Decimal Classification (16 ed). এর Schedule ও Index ব্যবহার করতে দিয়ে সাহায্য করছিলেন। এ বছর শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপত্তি তুলে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছেন। তার কারণ পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা নাকি Schedule ছিঁড়ে দেন! এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের একজন শিক্ষক ছিলেন। সুতরাং তাঁর নিজের বক্তব্যের সত্যতার যোগ্য বিচারক তিনি নিজেই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তকের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করলেন—গ্রন্থাগার জগতে এমন নজীর দ্বিতীয় আছে বলে শুনি নি। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জেনে রাখুন—আপনার এই কীর্তি ইতিহাস হয়ে রইল এবং এজন্য আপনি চিরদিন সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা ধিকৃত হবেন।

আবার প্রশ্ন করি—নতুন যে ছেলে-মেয়েরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়তে আসছে তাদের অপরাধ কোথায়? তারা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? এই নতুনদের সামনে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কি নজীর খাড়া করছেন? আজ যারা ছাত্র-ছাত্রী তারা আগামী দিনে আমাদের সহকর্মী হবেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় প্রবীণেরা গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় ভাষণ দিয়ে থাকেন। নিজেদের কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রবীনেরা নবীনদের সামনে আদর্শ রাখবেন বলে আশা করি। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষকেরা Inter Library Loan এর বিষয়ে পড়িয়ে থাকেন, বক্তৃতা করেন। অথচ পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের বই ব্যবহার করতে দিতে নারাজ। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে এই বিষয়গুলি তুলে ধরছি এবং আবেদন করছি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার জগতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখার কথা চিন্তা করে এগিয়ে আসুন, আলোচনা করুন।

আপনাদের জানতে হবে বিরোধ কোথায় এবং তারপর বিরোধ নিষ্পত্তির কথাও ভাবতে হবে। এখনও সময় আছে। সৌহার্দপূর্ণ আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান সম্ভব বলে বিশ্বাস রাখি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুমহান ঐতিহ্য ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সাথে পরিষদের নিবিড় সম্পর্ক সামান্য দু'একজনের খামখেয়ালীপনার জন্য ছিন্ন হবার নয়। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার দরদীরা গ্রন্থাগার জগতের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ সহ্য করবেন না—এই আশা নিয়ে এই চিঠি শেষ করছি।

Letters to the Editor : Swarna Sen

আমন্ত্রণ

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আগামী ১২ই আগষ্ট, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে পরিষদের (পি, ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম নং ৫২, কলি-১৪) নবনির্মিত ভবনে এক আলোচনা সভায় গ্রন্থাগার কর্মি ও অনুরাগীদের সবান্ধবে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

সম্পাদক—

পরিষদ কথা

কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ১৪ই জুলাই পরিষদ ভবনে কার্য্যনির্বাহক সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিগত সভার কার্য্যবিবরণী অনুমোদিত হয়। পরিষদের কর্মসচিব আগামী ৬ই আগষ্ট ১৯৬৯, পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারিকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে বিধান সভা অভিযানের কথা ঘোষণা করেন এবং এই অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যে সব কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সভায় স্থির হয় আগামী ২৩শে জুলাই পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করা হবে। পরিষদের পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি সরকারকে দেওয়া হবে সেটি এই সভায় আলোচিত ও অনুমোদিত হয়। এই স্মারকলিপির সারাংশ প্রেস কনফারেন্সের দিন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে সভায় স্থির হয়।

পরিষদের টাইপিষ্ট তথা হিসাবরক্ষক পদের জন্য যে ইণ্টারভিউ নেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে, সেই ইণ্টারভিউ কমিটিতে সর্বশ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায় থাকবেন এবং কার্য্যনির্বাহক সমিতির যে কোন সভ্য ইচ্ছা করলে থাকতে পারেন।

এই সভায় স্থির হয় যে ১২ই আগষ্ট ১৯৬৯, শ্রী এস, আর, রঙ্গনাথনের ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে পরিষদ ভবনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। এই জনসভা অনুষ্ঠানের সমস্ত রকম দায়িত্ব শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায়ের উপর দেওয়া হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিরক্ষতা দূরীকরণ সংস্থা থেকে আয়োজন করা হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য পরিষদকে আহ্বান করা হয়েছে বলে কর্মসচিব জানান। এই সভায় স্থির হয় যে পরিষদ গ্রন্থাগার পত্রিকার মাধ্যমে বা ঐ সংস্থার নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই জাতীয় দিনটি পালন করার জন্য এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

এই সভায় স্থির হয় যে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায় গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়া প্রস্তুত করেছেন তা ৫ কপি টাইপ করে কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। পরে এই খসড়া ৬ই আগষ্টে এর পূর্বে সাইক্লোষ্টাইল করে সরকার পক্ষকে দেবার পূর্বে আগামী ২১শে জুলাই সোমবার কার্য্যনির্বাহক সমিতির যে জরুরী সভা আহ্বান করা হবে সেই সভায় উক্ত খসড়া আলোচিত ও অনুমোদিত হবে।

প্রতিবেদক : গীতা মিত্র

Association Notes

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কাশীপুর ইন্সটিট্যুট, ৪৩ কাশীপুর রোড, কলিকাতা-৩৬

কাশীপুর ইন্সটিট্যুট কক্ষে সম্প্রতি রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়। বরাহনগর রামেশ্বর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমথুরেশ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। বিশিষ্ট শিল্পীগণের উপস্থিতিতে সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীতরুণ মজুমদার, চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ও সমর সেন।

চৈতন্য লাইব্রেরী, কলিকাতা।

শনিবার সন্ধ্যায় চৈতন্য লাইব্রেরী ভবনে এক মনোজ্ঞ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানে "আধুনিক বাংলা উপন্যাসের গতি-প্রকৃতির" উপর আলেচনা করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী। বেতারশিল্পী শ্রীচন্দন দাসের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর এই বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিত শ্রোতাদের সহিত পরিচয় করিয়ে দেন অধ্যাপক শ্রীসুজিত সেনগুপ্ত। আলোচনার সূত্রপাত করে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন যে, সাহিত্য আজ নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া চলছে এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রও আজ বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, উপন্যাস সামাজিক দর্পণ। সুস্থ সমাজ গঠন করতে পারলে উপন্যাসও সুস্থ পথ ধরবে। শ্রী গোস্বামী সকলকে কলুষমুক্ত সমাজ গঠনে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বাংলা উপন্যাসের আধুনিক রূপ ও শ্লীল-অশ্লীলের সীমা আলোচনা করেন। সভা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅরুণ দত্ত। সভার ঘোষণা কার্য পরিচালনা করেন শ্রীতপোব্রত ঘোষ। চৈতন্য লাইব্রেরীর তরফে এই সাহিত্য সভা পরিচালনা করেন শ্রীজয়দেব সিংহ ও শ্রীরূপাংশু দাস।

নজরুল পাঠাগার। ৪৭।১ সূর্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

গত ১১ই ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭০তম জন্মোৎসব ও পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১১ই জ্যৈষ্ঠ সকাল ৭-৩০ টায় পাঠাগারের পক্ষ থেকে কবিগৃহে গিয়ে কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। বৈকাল ৪ ঘটিকায় বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পাঠাগার কক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

* * *

১২ই জ্যৈষ্ঠ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে নজরুল জন্মোৎসব সভা অনুষ্ঠীত হয়। বক্তা ছিলেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা শিল্পিগণ নজরুলের গান ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে পাঠাগারের পক্ষ থেকে শ্রীসমীর ঘোষের সম্পাদনায় একটি স্মরণী প্রকাশিত হয়। এতে লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, ডঃ সুশীল গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, আয়নুল হক খাঁ, বাদল ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও নির্মল মুখোপাধ্যায়।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার, খিদিরপুর, কলিকাতা

গত ১লা মে খিদিরপুর মিতালী সংঘের কার্যকরী সমিতির সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রন্থগার সমিতি, ১৯৬৯-৭০ গঠিত হয়েছে। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীকলিমুদ্দিন শামস্ (এম, এল, এ) (সহ-সভাপতি), শ্রীসমর দত্ত (গ্রন্থাগার সম্পাদক) শ্রীপ্রনব দাস (সহ-সম্পাদক), শ্রীমানস বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক) শ্রীপাঁচুগোপাল দাস (কোষাধ্যক্ষ), সর্বশ্রী শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব ঘোষ ও কিরীটি গঙ্গোপাধ্যায় (সদস্যগণ)।

শৈলেশ্বর পাঠাগার, 4C প্রভুরাম সরকার লেন, কলিকাতা-১৫

শৈলেশ্বর পাঠাগারের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯৬৯-৭০, নির্বাচিত হয়েছেন।

সর্বশ্রী জিতেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণগোপাল বসু, নরসিং পাল ও মনোরঞ্জন রায় (পৃষ্ঠপোষকগণ), শ্রীঅমূল্যচরণ সরকার (সভাপতি), সর্বশ্রী তারাপদ দানা, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, শরৎচন্দ্র মণ্ডল ও জয়দেব কোঙার (সহ-সভাপতিগণ) শ্রীনিতাইচন্দ্র বসু, (সাধারণ সম্পাদক) শ্রীসুবলচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক) শ্রীমনোরঞ্জন সেন (গ্রন্থাগারিক) শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু ও কুবেরচন্দ্র কুণ্ডু (সহ-গ্রন্থাগারিকদ্বয়), শ্রীবলাইলাল দে (কোষাধ্যক্ষ)। সর্বশ্রী হৃষিকেশ ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র দেব, কেশবচন্দ্র পাল, হারাধন কুণ্ডু, খগেশ ভট্টাচার্য, দিলীপ বসু, দীপক ঘোষ, প্রতুলচন্দ্র কর, পরেশনাথ বণিক, বাদল সরখেল, পরিতোষ ঘোষ, সমরেন্দ্রনাথ বসু ও মিহির মুখার্জি (কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দ)।

*　　　　　*　　　　　*

গত ১৪ই জুন শৈলেশ্বর পাঠাগার রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী উৎসব একই সঙ্গে পালন করে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি শ্রীদুর্বাদাস সরকার ও কল্পতরু সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এর বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করেন। আবৃত্তি ও সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী মলয় মহান্তি, মাধবী কুণ্ডু, সতীশ বারিক, তপতী ঘোষাল, ঝর্ণা সিমলাই, সুকৃতি সেন, বিভুতি ধর, রতন রায়, মায়া সাহা প্রমুখ শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'চারুলতা' চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

চব্বিশ পরগণা

আড়িয়াদহ পাবলিক লাইব্রেরী, আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।

গত ১লা জুন আড়িয়াদহ পাবলিক লাইব্রেরীর শতবার্ষিকী উৎসবানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসমরনাথ ঘোষাল এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের দীর্ঘদিনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী তাঁর ভাষণে শতবর্ষের গ্রন্থাগারের প্রসংশনীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই ধরণের সার্বজনীন গ্রন্থাগারকে সরকারের সাহায্য করা প্রয়োজন। বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট সরকার শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী হলেও গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন আশু কার্যকরী প্রয়াস গ্রহণ করেন নি। তিনি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাতে প্রত্যেককে অনুরোধ করেন। সভান্তে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীসুবোধ রায়।

জলপাইগুড়ি

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী, মেটেলী, জলপাইগুড়ি।

মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরী কবিপক্ষে গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় লাইব্রেরীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রানুরাগীদের উপস্থিতিতে সম্পাদক শ্রীঅরুণোদয় সেনগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ দেবের পরিচালনায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীঅমূল্য সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। এই অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং একক নাটকের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে বহু স্থানীয় শিল্পী ও মেটেলীর মহিলা সমিতি অংশ গ্রহণ করেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বড়দের বিভাগে ১ম এবং ২য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে কামাখ্যা পণ্ডিত ও স্বপন সেনগুপ্ত এবং ছোটদের বিভাগে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ দেব ও কল্পনা ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ দেব কর্তৃক অভিনীত একক নাটক 'ছাত্রের পরীক্ষা' দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দানে সক্ষম হয়।

গত ২৫শে মে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লাইব্রেরীর হলে সম্পাদক মহাশয়ের পরিচালনায় এবং শ্রীসুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। নজরুল গীতি, আবৃত্তি এবং কবির জীবনী আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

নদীয়া

জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে ছোটদের বিভাগ কর্তৃক রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ২৪।৫।৬৯ তারিখে।

এই উৎসবে শিশুবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, জীবনী সম্পর্কে আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য-গীতি এবং কবি বিরচিত 'হাস্য-কৌতুক' 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' ও 'ছাত্রের পরীক্ষা' নাটক দু'টি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে প্রচুর জনসমাবেশ হয়।

বিবেকানন্দ পাঠাগার, কান্দোয়া, নদীয়া।

১৩৭৫ এর ৩রা ও ৪ঠা ফাল্গুন এই গ্রন্থাগারের পরিচালনায় কাঁদোয়া ফুটবল খেলার মাঠে ঊনবিংশ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর মহকুমা শাসক শ্রী পি কে সিংহ—পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী সিংহ। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

বর্ধমান

ধাত্রীগ্রাম সাধারণ পাঠাগার, ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান।

গত ১৭ই মে ধাত্রীগ্রাম নেতাজী সংঘ ও সাধারণ পাঠাগারের সভ্যগণ কর্তৃক রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় শ্রীযতীন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের সভাপতিত্বে। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত কবিতা আবৃত্তি ও বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়। ঐ পাঠাগার প্রাঙ্গণে গত ১লা জুন নজরুল কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীতের ও এক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় ও শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়, যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

সংকলয়িতা : শীলা গুপ্ত

News from Libraries

গ্রন্থাগার কর্মি সংবাদ

কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীজীতেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মামলা প্রত্যাহার

কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীজীতেন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রায় তিন বৎসর যাবৎ সাময়িক বরখাস্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশী মামলাও চলছিল। গত ৩রা জুলাই রাজ্য সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। শ্রী নন্দীর সমর্থনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন। তার এই জয় গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনে এক বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে।

Library workers in the News

Granthagar

(*The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal*)

IN THIS ISSUE

VOLUME 19 : NUMBER 4 : SRAVANA, 1376

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal.-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Paribesak Press 21, Hyat Khan Lane, Calcutta-9

Edited by : Bimal Chandra Chattopadhyay

Assistant Editor : Sm. Gita Mitra

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 6·00

গ্রন্থাগার কর্মীদের বিধানসভা অভিযান—৬ আগষ্ট ব্লক : দৈনিক বসুমতীর সৌজন্যে

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৪ | ১৩৭৬, শ্রাবণ

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার কর্মীদের বিধানসভা অভিযান

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মী গত ৬ই আগষ্ট শোভাযাত্রা সহকারে বিধানসভায় যান এবং এঁদের এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

এই স্মারকলিপির বক্তব্যকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ। এই সুপারিশের মূলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, আর রয়েছে গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। গ্রন্থাগার পরিষদ যে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী করেছেন তাও অযৌক্তিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের জন্য বাজেটের যে অংশ ব্যয় বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে তা না হলে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের জন্য শিক্ষা বাজেটের ১% এর বেশী ব্যয় করা হয়নি। আমাদের শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ ২.৫% গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রধান ব্যয়ের জন্য বাজেটের ১০% ব্যয় করা উচিত। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনা কালেও যদি অর্থাভাবের অজুহাতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়ানো না হয় তবে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ তো দূরের কথা, গ্রন্থাগারগুলিকে টিকিয়ে রাখাই সম্ভবপর হবে না।

স্মারকলিপির আর একটি প্রধান বক্তব্য হল গ্রন্থাগার কর্মীদের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। এই গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন স্তরের কর্মী আছেন। সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে অনাহার, অর্ধাহার ও নৈরাশ্য ঘিরে থাকে অধিকাংশ সময়েই। তাঁরা সরাসরি নিয়মিত বেতন পান না। এছাড়া আছে অবমাননা এবং চাকুরী জীবনের দুঃসহ বিড়ম্বনা। উপরের স্তরের কর্মী যাঁরা, তা তাঁরা জেলা গ্রন্থাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁদের মধ্যেও রয়েছে নানা অসন্তোষ—কেউ যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চতর পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না, কেউ

ওপরওলার খেয়াল-খুসী মতো বদলী হচ্ছেন বা অপমানজনক অবস্থা মেনে নিয়ে কাজ করছেন। আর এ দুয়ের মাঝামাঝি যাঁরা আছেন তাঁদের এক বৃহৎ অংশের কোন ভবিষ্যৎই নেই। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ না হলে উপযুক্ত সংখ্যক পদ সৃষ্টির তো আশাই করা যায় না বরং যে কোন সময়ে ছাঁটাই-এর সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সুতরাং এই সমস্বার্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মিগণ একত্রিত হয়ে আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে দীর্ঘকাল থেকে সকল স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে ধূমায়িত বিক্ষোভই তাঁদের প্রকাশ্য আন্দোলনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। আর দিন দিন এই আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে একযোগে এগিয়ে এসেছেন স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, এশিয়েটিক সোসাইটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, জাতীয় গ্রন্থাগার এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন প্রভৃতি। ক্রমে ক্রমে আরো অনেকে যে যোগ দেবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগার কর্মীরা যে তাদের চাকুরীর নিরাপত্তা ও অন্যান্য দাবী আদায়ে সাফল্যলাভ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেজন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৬ই আগষ্টের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। উল্লেখযোগ্য যে, এই দিনের শোভাযাত্রার জন্য সুদূর কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা থেকেও গ্রন্থাগার কর্মীরা এসেছিলেন।

পরিশেষে জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ৫ই আগষ্ট জাতীয় গ্রন্থাগারের ভেতর পুলিশ মোতায়েন ও ইউনিয়নের পোষ্টার অপসারণের ব্যাপারটির আমরা তীব্র নিন্দা করি। জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমরা কিছুদিন থেকেই নানা রকমের অভিযোগ পাচ্ছি। এখানকার গ্রন্থাগার কর্মীদের ধূমায়িত অসন্তোষকে নবনিযুক্ত গ্রন্থাগারিক শ্রীকালিয়া তাঁর কার্যকলাপের ফলে বহুগুণে বর্ধিত করতে সাহায্য করেছেন। শ্রীকালিয়া কোথা থেকে এমন আগুন নিয়ে খেলা করার উৎসাহ পাচ্ছেন আমরা জানিনা। কিন্তু শ্রীকালিয়াও পেশায় একজন গ্রন্থাগারিক। সে হিসেবে তিনি আমাদেরই একজন। ভাবতে অবাক লাগে এই শ্রীকালিয়াই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সারাভারত গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়ে এসে কর্মীদের সুখ-সুবিধার প্রতি তিনি দৃষ্টি দেবেন, তাদের হয়ে লড়াই করবেন এটাই আমরা তাঁর কাছ থেকে আশা করব। তার বদলে তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের পুলিশের হাতে তুলে দেবেন এতটা আমরা আশা করিনি। একজন বৃত্তিধারী হয়ে সহকর্মী ও সমধর্মীদের প্রতি তাঁর এই আচরণ নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। এইসব গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি নিজেদের কর্তব্য পালনে অবহেলা করতেন বা কাজ এড়িয়ে চলতেন তাহলে শ্রীকালিয়া গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিশ্চয়ই তার জন্য শাস্তিবিধান করতে পারতেন। কিন্তু অমূলক অভিযোগে তাঁরই গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি এই আচরণ তাঁর নিজের পক্ষেই মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে কি? দেশের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগারের সর্বোচ্চ পদে বসে শ্রীকালিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার বদলে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন কেন?

Demonstration by Library workers at the Assembly House.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৯)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

• ['Library movement in Bengal' the 19th No. of its series deals with the Annual General Meeting of Bengal Library Association in 1937, containing the light thrown by Wordsworth, the president of the Reception Committee, on the development of libraries in England, speeches delivered by Dr. Nihar Ranjan Roy, Shri Pulin Krishna Chattopadhyay. Shri Sanat Kumar Roy Chaudhuny, the Meyor of Calcutta, and Kumar Munindra Dev Roy Mahashay, the president of the Association.]

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের (১৩৪৪ বঙ্গাব্দের) বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সময় পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে ২৪শে জুলাই, ৯ শ্রাবণ, শনিবার ও ২৫শে জুলাই, ১০ই শ্রাবণ, রবিবার উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন বসে। ইহাতে বাঙ্গালার তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীফজলুল হক সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ইহার সম্পাদক। এই উপলক্ষে একটি গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কলিকাতা পৌরসভার তদানীন্তন পৌরপ্রধান শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

শ্রীওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে ইংরেজী ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল : ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে এক কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জনমতের ক্রমজাগৃতির ফলে ইংলণ্ডের যে কোন আকারের সহরের পক্ষে গ্রন্থাগার অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আর গ্রামের প্রয়োজন মিটান হইত ভ্রাম্যমান গ্রন্থশকট, মাঝে মাঝে প্রেরিত বাক্স বোঝাই বই ও অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে।

লণ্ডন সহরেও আধুনিককালের অনুপযোগী বহু গ্রন্থাগার আছে। তাহা হইলেও ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত ইলণ্ডের প্রথম জনগ্রন্থাগারসমূহ সরকারের মঞ্জুর করা পেনি শুল্ক হইতে আদায়ী টাকা বই র জন্য খরচ করিতে দিত না। এই টাকা অন্য কোন কাজে ব্যয় করা যাইত। নগরবাসীরা বই দান করিত।

বিংশ শতাব্দীতে পেনি শুল্ক না তুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত এই আইনের বহু পরিবর্তন হইয়াছিল। পৌরসভাসমূহ নিজের ইচ্ছামত কাজ চালাইতে পারিত। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডে জনগ্রন্থাগারসমূহ সরকারী শিক্ষা বিভাগের আগ্রহে গড়িয়া উঠে নাই স্থানীয়

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের তাগিদেই গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একদা বৃটিশ সংগ্রহালয়ের সহিত জড়িত এডওয়ার্ড এবং ক্লার্কেনওয়েল-এর গ্রন্থাগারিক ব্রাউন-এর দান অনস্বীকার্য। প্রথম আইন প্রবর্তনে এডওয়ার্ড সরকারকে সম্মত করাইবার কাজে অনেক কাঠখড় পোড়াইয়াছিলেন। আর ব্রাউন সেকেলে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী পদ্ধতিগুলি তুলিয়া দিয়া বইর যাহারা প্রকৃত মালিক সেই করদাতাদের অবাধ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য সাহসিকতার সহিত অগ্রণী হইয়াছিলেন।

জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারসমূহের সহযোগিতায় ইহা দেশের সর্বত্র পাঠকদের নিকট ষাট লক্ষ বই সুলভ করিয়া দিয়াছে।

বড় বড় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন সমীক্ষা করিতে হইলে কেম্‌ব্রিজ-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সুন্দর গ্রন্থাগার অক্সফোর্ড-এর সদ্য নির্মীয়মাণ বডলীয় গ্রন্থাগার, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য নামকরা জনগ্রন্থাগারের উল্লেখ করিতেই হয়। কেম্‌ব্রিজ গ্রন্থাগারের বারটি তলা, একশত সাতান্ন ফুট উচ্চ গ্রন্থাগারভবন, চল্লিশ মাইল ব্যাপী ইসপাতের পুস্তকাধার।

ভারত সবেমাত্র ভাল গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হইতে সুরু করিয়াছে। এই পরিষদ এই সচেতনা আরও বাড়াইয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।

তিনি শ্রোতৃবর্গকে এই কথা স্মরণ রাখিতে বলেন যে ব্যবহারের জন্যই গ্রন্থাগারে বই সংগৃহীত হয় এবং গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হইল তাহার বইগুলিকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলা। জনগণের জন্য তিনি যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার করিতে তাহাদিগকে উৎসাহ দিবেনও তিনি।

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় সম্মিলনের পরিকল্পনাসমূহ সভাস্থ সকলকে বুঝাইয়া দেন।

কলিকাতা ও অন্যান্য পৌরসভাযুক্ত সহরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমীক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিবেদন উপস্থিত করিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা সুরু করেন। তিনি তাঁহার সমীক্ষায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া বলেন যে কলিকাতা ও হাওড়ায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রচুর ও অসন্তোষজনক এবং স্থানীয় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার পরিচালনের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিও অনুসরণ করিয়া চলেন না। তিনি পরামর্শ দেন যে সর্বাগ্রে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার থাকা উচিত এবং কলিকাতাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া পৌরসভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনাধীনে চারটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা বিধেয়। তিনি ইহা দেখান যে সুনির্দিষ্ট গ্রন্থাগার নীতি অনুসরণ করিলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রদত্ত পৌরসভার অনুদান এবং ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দ্বারা উক্ত কাজ সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় চারটি শাখা গ্রন্থাগার সহ কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার প্রভূত কাজ করিতে পারে। তেমনিভাবে হাওড়াকে একটি জিলা কেন্দ্র ধরিয়া উহার পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনাধীনে একটি কেন্দ্রীভূত পৌরসভা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করেন।

শ্রীওয়ার্ডসওয়ার্থও সর্বাগ্রে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার স্থাপনার্থ কলিকাতা পৌসভার কর্তৃপক্ষ ও শ্রোতৃবর্গকে উদ্যোগী হইতে বলেন।

কলিকাতা পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী ভাষণদান প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে রাজধানীতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বাস্তবিকই অপ্রচুর এবং তিনি সম্মেলনকে আশ্বাস দেন যে তিনি পৌরপ্রধান হিসাবে কলিকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার স্থাপনের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তাঁহার মতে কলিকাতার অধিবাসীদের বর্তমানে তেমন চাহিদা নাই। কিন্তু তিনি এই আশ্বাস দেন যে পৌরসভা যদি মনে করে যে ইহার বেশ চাহিদা আছে তবে ইহা মিটাইবার জন্য পৌরসভা অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

এই সম্পর্কে সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশ করা সমীচীন মনে করে।

ক) সর্বাগ্রে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার এবং ক্রমশঃ চারটি এলাকায় চারটি গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য সংবাদপত্র ও জনসভার মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একটা চাহিদা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাউন্সিল প্রচার ও সংবাদপ্রকাশ সমিতিকে নির্দেশ দিতে পারেন।

খ) কলিকাতা এবং প্রদেশের পৌরসভাযুক্ত জিলা ও মহকুমা সহরের জন্য দুইটি পরিকল্পনা স্থির করা এবং উহাদিগকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় করিতে কাউন্সিল অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

গ) জিলার ও মহকুমার এলাকাধীন অঞ্চলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষা করিয়া তাহার বিবরণ সত্বর পরিষদের নিকটে পাঠাইবার জন্য কাউন্সিল পরিষদের জিলা শাখা-সমূহকে তৎপর হইতে বলিতে পারেন।

ঘ) গ্রন্থাগারসমূহের ন্যূনাধিক সম্পূর্ণ তালিকা এবং প্রত্যেক জিলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ সমন্বিত বিবরণ ও সাংখ্যিক তথ্য সহ প্রদেশের একটি গ্রন্থাগারপঞ্জী প্রণয়ন করিবার জন্যও কাউন্সিল তৎপর হইতে পারেন। ইতিপূর্বে জিলা কর্তৃপক্ষের এবং পরিষদের ব্যক্তিসভ্য ও প্রতিষ্ঠান সভ্যদের নিকট হইতে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার সাহায্যেই এই কাজ করা যাইতে পারে।

পৌরসভা প্রধান শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া বলেন যে নগরের প্রায় দুইশত জনগ্রন্থাগারে কলিকাতা পৌরসভা পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর বার্ষিক অনুদান বণ্টন করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা পাঁচ লক্ষের উপর এবং সভ্যসংখ্যা পঁচিশ হাজার। এই নগরে উন্নত এবং সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা উচিত তাহা তিনি স্বীকার করেন এবং এই ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পৌরসভাকে সহায়তা করিবেন এই আশাও তাঁহার আছে। কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন যে তাঁহার মতে বর্তমানে এরূপ কোন প্রবল চাহিদা

নাই তবে যখনই এই চাহিদা দেখা যাইবে তখনই পৌরসভার ইহাতে সাড়া দেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকিবে না।

পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় সম্মেলনের সভাপতি, সমাগত প্রতিনিধি, সভ্য ও দর্শকদিগকে স্বাগত জানাইয়া প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারসাধনে কি কি কাজ করা হইয়াছে তাহার এক বিস্তৃত বর্ণনা দেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষণের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

বন্ধুগণ,

বহু বৎসর পর এই সম্মেলন আহূত হইয়াছে। ইহাতে আপনাদিগকে সানন্দে স্বাগত জানাইতেছি। এই সম্মেলনটি সুপরিকল্পিত। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা চলিবে এবং সুপারিশ করা হইবে—যথা, (১) বিদ্যালয়ের এবং বালকদের গ্রন্থাগার, (২) মহাবিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, (৩) গ্রামীণ ও ছোট সহুরে গ্রন্থাগার। কলিকাতা ও হাওড়ার গ্রন্থাগারসমূহের সমীক্ষার বিবরণ ইহাতে বিবেচিত হইবে। কলিকাতা পৌরসভার পৌরপ্রধান আজ প্রাতে গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে এমন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ আপনারা দেখিয়াছেন। ভারতে এই ধরণের জিনিস সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হইল। বাল্‌টিমোর-এর ইনক প্রাট বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার কর্তৃক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৪১-'৪২ বঙ্গাব্দে) স্পেন-এ আহূত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জীর আন্তর্জাতিক মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে যে সকল জিনিস দেখান হইয়াছিল তাহা চিরতরে আমাদের হাতে সমর্পিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের পুনর্গঠন

আমরা বাঙ্গালার ১২৫০টি জনগ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠান-গ্রন্থাগারের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ চায় যে ইহারা বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় পুনর্গঠিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক দ্বারা পরিচালিত হউক। এছাড়া ভাল বই পড়ার স্পৃহা জাগাইয়া উপযোগী একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করাও পরিষদের কাম্য। এই উদ্দেশ্যে পরিষদের পুস্তকতালিকা প্রণয়ন সমিতি অনুমোদিত পুস্তকের তালিকা প্রণয়নের কাজে লিপ্ত রহিয়াছেন। পরিষদের সংবাদপত্রিকায় এই তালিকা প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের পরিচালনাধীনে গত মে মাসে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রবর্তন করা হইয়াছে। নয় জন শিক্ষক তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী আজ বিকালে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রশস্তিপত্র অর্পণ করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রদেশের গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নাম করা যাইতে পারে। পুস্তকসংখ্যায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান উচ্চে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত একাত্তর। ইহার পুনর্গঠনের জন্য বর্তমান উপাচার্য শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করিতেছেন তাহার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। আশুতোষ ভবনের উপরতলার বর্ধিত অংশে ঠাসাঠাসি করিয়া গ্রন্থাগার না রাখিয়া যদি ইহাকে আধুনিক ধরণের ভবনে স্থান দেওয়া সম্ভব হইত তবে আমার মনে হয় এই চেষ্টা সকলের সমর্থন পাইত। মাদ্রাসে আধুনিক সাজে সজ্জিত আধুনিক ধরণের গাঁথুনীতে সম্প্রতি কনেমারা গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হইয়াছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দই যে শুধু ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা নয় জনগণের জন্যও ইহা উন্মুক্ত। ১৯৩৪-'৩৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে আটাত্তর হাজার নয় শত আঠার। ইহার পরিসর বৃহত্তর এবং ইহার গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন রায় আধুনিক ধরণে ইহার প্রশাসনকার্য চালাইতেছেন। সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার সন্তোষজনকভাবে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত মনে হয় যে ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যে গ্রন্থাগারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাতে বাঙ্গালা গ্রন্থের সংখ্যা কম। আশা করি দেশের গ্রন্থকারগণ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের গ্রন্থ দিতে আগাইয়া আসিবেন।

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বাঙ্গালা দেশে প্রশিক্ষণ গ্রন্থাগারিকদের আজও সরকারী ও বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে কোন স্থান নাই। বর্তমান পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থাও ভাল ছিল না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রবৃন্দ যদি মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহের কর্ণধার হয় এবং আধুনিক প্রণালীতে ইহাদিগকে পরিচালন করে তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহ যে তাহারা গ্রন্থাগার পরিচালনায় পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৃতিত্ব দেখাইবে। আর গ্রন্থ ব্যবহারের অবাধ সুযোগ সর্বত্রই দেওয়া উচিত।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বাঙ্গালাদেশের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহ মোটেই আকর্ষণীয় নয়, বরঞ্চ পাঠককে ইহারা দূরেই সরাইয়া রাখে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য অক্লান্ত কর্মী মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) হইতে ষাটজন শিক্ষক লইয়া বড়দিনের ছুটিকালীন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রবর্তন করিয়াছেন। আমি দৈবক্রমে ইহার উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলাম। আমাদের এখানেও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য এরূপ কোন পাঠক্রম প্রবর্তনের চেষ্টা করা উচিত। এই প্রদেশে গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নতিকল্পে নূতন বই সংগ্রহের পক্ষে অর্থকৃচ্ছ্রতাই বড় বাধা। সমস্ত মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার আছে কিন্তু এইগুলি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ

করা হয় না। এই গুলিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইলে নূতন বই আমদানি করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার বিশেষ করিয়া আকরগ্রন্থ কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা ছাত্রদিগকে শিখান উচিত। পাশ্চাত্ত্যে স্থানীয় জনগ্রন্থাগার হইতে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ধারে বই সরবরাহ করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে অধিকতর উপযোগী ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারে ।

প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বাঙ্গালাদেশে খুব কম প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নাম করার মত গ্রন্থাগার আছে। এমন কি কলিকাতা পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়েও গ্রন্থাগারের কোন ব্যবস্থা নাই। কলিকাতা পৌরসভার শিক্ষা কর্মচারী এই দিকে কিছু কাজ করিতে পারেন। সচিত্র বালক সাহিত্য সহজেই বালক পাঠকদিগকে আকর্ষণ করে, পুস্তকের প্রতি অনুরাগ জন্মায় ও সুস্থ পাঠস্পৃহা জাগায়।

পুস্তকের বিনিময়

প্রতিষ্ঠানগত গ্রন্থাগারসমূহ পরস্পরের মধ্যে পুস্তকের আদানপ্রদান করিতে পারে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা হইলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে। নূতন পুস্তক সংগ্রহে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আরোগ্যসদনে গ্রন্থাগার

বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ আরোগ্যসদনেই গ্রন্থাগারের কোন ব্যবস্থা নাই। রোগীদিগকে বিশেষ করিয়া রোগোত্তর স্বাস্থ্যান্বেষীদিগকে বা মনোবিকারগ্রস্তদিগকে আরোগ্য করিয়া তুলিবার পক্ষে উপযুক্ত পুস্তকের প্রভাব আছে ইহা চিকিৎসাজগতে স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যে এমন আরোগ্যসদন কমই আছে যাহাতে রোগীদের জন্য গ্রন্থাগারের কোন ব্যবস্থা নাই। ভারতে মাদ্রাস এই বিষয়ে অগ্রণী এবং আরোগ্যসদনে উপযুক্ত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা সরবরাহের জন্য অনেকে স্বেচ্ছায় উদ্যোগী হইয়াছে। স্বয়ং-উৎসাহীরা লোকদের নিকট হইতে পুরান বই সংগ্রহ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে জমা দেয়। এই বইগুলি সেখান থেকে পুলিন্দা করিয়া নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আরোগ্যসদনে পাঠান হয়। নিরক্ষর রোগী থাকিলে স্বয়ং-উৎসাহীরা আরোগ্যসদনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দদায়ক বইগুলি তাহাকে পড়িয়া শোনান। কিছুদিন আগে আমাদের পরিষদে এই উদ্দেশ্যে ডাক্তার সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় একটি বক্তৃতাও দিয়াছেন। এই বিষয়টি হাতে লইবার জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতি গঠনের প্রস্তাব রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

Library movement in Bengal (19) : Gurudas Bandyopadhyay

গ্রন্থ বিনিময় প্রকল্প

মঞ্জরী সিংহ

[Sm. Manjari Sinha throws light on one of the vital aspects of library Science, the Books (all publications) Exchange Project. She furnishes some guidelines for the integrated International Books Exchange System.]

জ্ঞানের রাজ্যে দেশ, কাল, পাত্রের ভেদাভেদ নেই। ভৌগলিক সীমানার বাধা অতিক্রম করে সাহিত্য আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছে এনে দেয়। মনীষীদের লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বানী ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি দেশে। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষেরাই বিশ্বে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রত্যেক দেশের বিচিত্র ও পস্পরর বিরোধী, সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য আদর্শ ও সংস্কৃতিকে পরস্পরের নিকট পরিচিত করার জন্য প্রয়াস করেছেন। প্রতিটি দেশের সাহিত্যের ধারক ও সাংস্কৃতিক বাহক গ্রন্থাগারগুলিই এই মহান কর্তব্যে অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেক দেশের গ্রন্থাগারগুলি নিজেদের দেশের বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ও স্বল্পব্যয়ে পরস্পরের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে যেমন আন্তর্দেশীয় বিনিময় প্রকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রত্যেক দেশের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অন্য দেশের জনগণ সাহায্য গ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রবর্তন হয়েছে আন্তর্জাতিক বিনিময় প্রকল্প ব্যবস্থা। -

গ্রন্থ বিনিময় বলতে বোঝায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুবিধাজনক শর্তে গ্রন্থের আদান প্রদান। কোন দুটি গ্রন্থাগার একটি চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে পুস্তক বিনিময় করতে পারে। এই চুক্তি বিশেষ কোন নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নাও হতে পারে। তবে সবক্ষেত্রেই কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করাই শ্রেয়; যে নিয়ম উভয় গ্রন্থাগারে পক্ষেই সুবিধাজনক।

গ্রন্থ বিনিময় প্রকল্পটি অন্তদেশীয় বা বহির্দেশীয় ভিত্তিতে হয়ে থাকে। বিদেশে অনেক গ্রন্থাগারই আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গ্রন্থ বিনিময় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পটিকে বিশেষ কোন বাণিজ্যিক চুক্তি মনে না করাই উচিত। যদিও এর একটি বাণিজ্যিক মূল্যায়ন করা যায়। তবে সামান্য আর্থিক মূল্যায়নের দ্বারা এর মূল্যায়ণ করলে এটার অন্তর্নিহিত অর্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

গ্রন্থ না বলে এখানে 'মুদ্রিত প্রকাশন' (Printed publications) কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, গ্রন্থ বললে পত্রপত্রিকা বা অন্যান্য প্রকাশন বাদ থেকে যায়। প্রতিটি প্রকাশনের, তার শিক্ষাগত, নীতিগত বা শিল্পগত—যে কোন মূল্যই থাকুক না কেন, সবগুলিরই প্রয়োজন আছে বিভিন্ন পেশাগত ব্যক্তির কাছে। যেমন, যে আইন পত্রিকাটি

কোন ব্যবহারজীবীর প্রয়োজন আসবে, সেটি কোন চিকিৎসকের সাহায্যে নাও আসতে পারে। সুতরাং বিনিময় প্রকল্প দ্বারা সবধরণের প্রকাশন বিনিময় করা উচিত। কারণ, গ্রন্থাগার হল সর্বসাধারণের জন্য।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা যেতে পারে—যদি প্রকাশনগুলি কিনে সংগ্রহ করা যায় তবে বিনিময় করে সময় বা অর্থ নষ্ট করা কেন? বর্তমানের জগত ক্রমবর্ধনশীল উন্নয়নের জগত। সাহিত্য বা বিজ্ঞান প্রতিদিনই নূতন নূতন জ্ঞানসম্পদ উপস্থাপিত করছে। কোন একটি গ্রন্থাগারই সমস্ত প্রকাশন সংগ্রহ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ, তা ব্যয়সাপেক্ষ। সেইজন্য গ্রন্থাগারগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিনিময় প্রকল্পের দ্বারা তারা নিজেদের পুস্তকের অভাব দূর করতে পারে। এর সাহায্যেই এক দেশের বৈজ্ঞানিক অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষানিরীক্ষার সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন অনায়াসে। একজন রুশ গবেষক একজন জার্মান গবেষকের গবেষণাপ্রসূত প্রবন্ধ (রুশ ভাষায় অনুবাদ) পাঠ করতে পারেন।

এমন কতকগুলি প্রকাশন আছে যেগুলি কিনতে পাওয়া যায় না। যেমন, সরকারী দলিলপত্র, গবেষণাকারী গ্রন্থাগারের পুনর্মুদ্রন বা বিশেষ কোন উচ্চতর বিষয়ের উপর বিশেষাধিকার পত্র (Patent)। এগুলি সবই সংগ্রহ করা যায় বিনিময়ের সাহায্যে। বিনিময় ব্যবস্থা যথেষ্ট ব্যয়সংক্ষেপ ব্যবস্থা। কারণ, ক্রয় ও উপহারের মধ্যবর্তী উপায় হল এটি।

বিনিময় ব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় হয়, যোগসূত্র গভীর হয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক দেশই চায় সারা বিশ্বে নিজেদের চিন্তাভাবনার ব্যাপক প্রচার। সাহিত্য, সংস্কৃতির সমন্বয় হয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম গ্রন্থ। এই গ্রন্থবিনিময়ে দেশগুলি পরস্পরের মানসচেতনা সম্বন্ধে অবহিত হয় ও জ্ঞানের প্রসারে আগ্রহশীল হয়। বর্তমানের বহু উন্নতিশীল দেশই এই প্রকল্পটিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রক্ষার সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে গ্রন্থবিনিময় প্রকল্পটির একটি সার্বজনীন কল্যাণ সাধনের দিক আছে।

এই পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম স্বীকৃতি লাভ করে ব্রুসেলস্ অধিবেশনে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। এই অধিবেশনে বিনিময় ব্যবস্থার বিশদভাবে আলোচনা হয়। সরকারী দলিলপত্র, সংসদীয় চিঠিপত্র, মনোগ্রাফ এবং অন্যান্য সরকারী পুস্তিকা (Pamphlet) কিভাবে বিনিময় করা যায়—তার উল্লেখ করা হয় এই সভায়। গ্রন্থবিনিময়ের ইতিহাসে এই ব্রুসেলস্ অধিবেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরে আরও কয়েকটি অধিবেশন হয়। যেমন—মেক্সিকো (১৯০২), বুয়োনেস আয়রস (১৯৩৬), আরব লীগ (১৯৪৫), মাদ্রিদ (১৯৫৩), UNESCO (১৯৫৮)। এই অধিবেশন গুলিতে আলোচিত হওয়ার ফলে প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করে।

আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে এই প্রকল্প গ্রহণ করলে কিছুটা উদারনীতি অবলম্বন করা

প্রয়োজন। কারণ, যেখানে বহু ভাষা, ধর্ম বা সংস্কৃতির সমস্যা, সেখানে সংকোচন নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়। এক দেশের পক্ষে যা অনুকূল, অন্যদেশের পক্ষে তা সহায়ক নাও হতে পারে। সেইজন্য নীতিটি দুটি গ্রাহকদেশের পক্ষে উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থবিনিময়ের উপকরণগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশনগুলি (২) কারিগরী সংস্থার পত্রিকা (৩) পুস্তক প্রকাশকদের প্রণীত গ্রন্থতালিকা (৪) গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব প্রকাশন (৫) অফিসিয়াল ডকুমেণ্টস ইত্যাদি। যে প্রকাশনগুলি বিনিময়ের সাহায্যে আনয়ন করা হবে সেগুলি যাতে গ্রন্থাগারের উপযোগী হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন; যে দেশের গ্রন্থাগারে চীনাভাষার বই কেউ পাঠ করবে না সেখানে ঐ ভাষার বই না রাখাই যুক্তিযুক্ত। বিনিময় ব্যবস্থায় যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে তার যেন সদ্ব্যবহার হয়। অনেক সংখ্যক বিনিময় প্রকল্প গ্রহণ করার চেয়ে অর্থাৎ অনেক দেশের সঙ্গে বিনিময় ব্যবস্থা করা অপেক্ষা অল্প সংখ্যক করে পরিকল্পনাটিকে সার্থক ও সুষ্ঠু করে তোলা উচিত। গ্রন্থবিনিময় প্রকল্পকে সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক না করে কিছুটা মানবিক করে তোলা যায়। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক যদি মাঝে মাঝে অন্য গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে বিনিময় ব্যবস্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন তবে বিষয়টি অনেক ফলপ্রসূ হয়। আলোচিত বিষয়টি একটি সুষ্ঠুনীতির উপর গড়ে উঠতে পারে।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারে অনেক সংখ্যক গ্রন্থের প্রতিলিপি (Duplicate) আসে প্রায় রোজই। এই প্রতিলিপিগুলি অনেকেই বিক্রয় করেন বা বিতরণ করেন অন্যত্র। কিন্তু এইগুলিকে ব্যবহারে লাগান যায় এই বিনিময় প্রকল্পে। একটি গ্রন্থাগারের প্রতিলিপিগুলির পরিবর্তে অন্য গ্রন্থাগারের প্রতিলিপিও সংগ্রহ করা যায়। অথচ এতে গ্রন্থক্রয়ের কোন সমস্যা নাই। প্রথমে প্রতিলিপিগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন করে অন্য গ্রন্থাগারে প্রেরণ করা হয়, যাতে যারা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে তালিকা থেকে নির্বাচন করতে পারে। এই পদ্ধতি বিদেশের গ্রন্থাগারগুলি গ্রহণ করেছে।

গ্রন্থ বিনিময় প্রকল্পকে সর্বাঙ্গীণভাবে সার্থক করতে হলে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয়সংস্থা নির্মাণ করা প্রয়োজন। সেই সংস্থার মাধ্যমে বিনিময় ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বিনিময়ে আগ্রহী গ্রন্থাগারগুলি এই সংস্থার গ্রাহক হয় এবং নিজেদের মতামত সংস্থার নিকট পেশ করবে। কেন্দ্রীয় সংস্থা ধর্ম, ভাষা বা জাতিনিরপেক্ষ হবে এবং সমস্ত গ্রন্থাগার-গুলিকে উৎসাহ দান করবে। এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হল ওয়াশিংটনের United States Book exchange। অন্যটি হল 'ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ সেণ্টার'।

সমস্ত দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারগুলিও এই বিনিময় প্রকল্পে অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করে। জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি নিজেদের গ্রন্থাগারের পুস্তকের প্রতিলিপিগুলির তালিকা করে অন্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিতরণ করতে পারে। প্রতিলিপিগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহুল্য মনে করা হয়। কিন্তু এগুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বিনিময় ব্যবস্থায়।

জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি কোন দেশে কি ধরণের প্রকাশন সুলভে পাওয়া যায় বা কিভাবে ব্যবস্থা করলে বৈদেশিক মুদ্রার ভার লাঘব করা যায় তার সংবাদ অন্য গ্রন্থাগারগুলিকে দেয়।

প্রতিদেশেই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দ্রুত বিস্তৃতি হয়ে চলেছে। জ্ঞানের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলি নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে অধিক মাত্রায় আগ্রহী হচ্ছে। এইজন্য বিনিময় প্রকল্পটিকে সকল দেশই আজ সাদরে গ্রহণ করেছে এবং এর অন্তর্নিহিত রূপকে সার্থক করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠছে। আমাদের ভারতবর্ষে আর্থিক প্রতিকূলতার জন্যে গ্রন্থাগারের যেমন প্রসার লাভ হচ্ছে না, সেইরকম গ্রন্থাগারের সংগ্রহও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রন্থ বিনিময় প্রকল্প আমাদের দেশের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই ব্যবস্থায় আমরা গ্রন্থগারগুলিকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি। আমাদের চিন্তা-ভাবনার ধারাকে অন্যদেশে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের নিকট বন্ধু করে তুলতে পারি। যদিও আজ পর্যন্ত এই প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণ হয়ে ওঠেনি আমাদের দেশে। তবে আমরা আশা রাখব কালক্রমে এই ব্যবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি করে ভারত গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন ও আমরাও অন্যদেশের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাব।

Book exchange project
: Manjari Sinha

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন

(Homage to National Professor, Dr. S. R. Ranganathan on his 77th birth anniversary.)

শিক্ষাজীবন : ভারতের গ্রন্থবিদ্যা জগতের দিকপাল শ্রীযুক্ত শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন ১৮৯২ খৃঃ ৯ই আগষ্ট মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলায় শিয়ালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৭খৃঃ থেকে ১৯০৮খৃঃ এর মধ্যে তিনি তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষা জীবন শেষ করে ১৯০৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্বে ১৯০৭ সালে রুক্মিণী দেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৯১৩ সালে তিনি বি. এ. এবং ১৯১৬ সালে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন : ১৯১৬ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯২৪খৃঃ এ তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ১৯২৪-২৫খৃঃ তিনি লণ্ডনে গ্রন্থবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৯২৪ সালেই তিনি কোলন বর্গীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু করেন। ১৯২১ খৃঃ তাঁর প্রথম পত্নী পরলোকগত হওয়ায় তিনি শ্রীমতী সারদাকে বিবাহ করেন।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ ও রঙ্গনাথন : ১৯১৯ খৃঃ শ্রীরঙ্গনাথন মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করেন। ১৯৩১ খৃঃ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স সুরু হয়। ১৯৩৭ খৃঃ এ উহা ডিপ্লোমা ও ১৯৬১তে ডিগ্রী কোর্সে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪২ খৃঃ তিনি দিল্লীতে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার কার্যক্রম রচনা করেন। ১৯৪৫-৪৭ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিদ্যার অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭-৫৫ খৃঃ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

গ্রন্থাগার পরিষদ ও শ্রীরঙ্গনাথন : ১৯২৮ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী তিনি মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। ১৯৫৮ সালে পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ পরিষদের সংবিধান রচনা করেন। ১৯৪৪-৫৩খৃঃ পর্যন্ত ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৮খৃঃ তিনি মধ্য প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯-৫৩খৃঃ পর্যন্ত নিখিল ভারত বয়স্ক শিক্ষা সমিতির কর্মসচিব ছিলেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন ও আহুত বিভিন্ন সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ প্রতিটি গ্রন্থাগার পরিষদকে তাদের কার্যক্রম রচনা করতে সহয়তা করেছে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা ও শ্রীরঙ্গনাথন : ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনায় তিনি সহায়তা করেছেন এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করেছেন। ১৯৪৬খৃঃ এলাহাবাদ, নাগপুর, মধ্য প্রদেশ এবং ১৯৪৮খৃঃ বোম্বে প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির কার্যক্রম তিনি প্রস্তুত করেন।

গ্রন্থাগার আইন ও শ্রীরঙ্গনাথন : ভারতে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আমাদের সচেতন করে তোলেন শ্রীরঙ্গনাথন এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী তিনিই সর্বপ্রথম করেন। গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে সরকার প্রদত্ত অর্থ সমগ্র এলাকায় সমবণ্টণের জন্য এবং এর ব্যবস্থা কার্যনির্বাহকের খেয়াল খুসীর উপর যাতে নির্ভরশীল না হয় তার জন্য এই আইন কাম্য। ১৯৩০খৃঃ তিনি গ্রন্থাগার আইনের একটি মডেল তৈরী করেন। এবং ১৯৩১খৃঃ তিনি বাংলা দেশের জন্য একটি খসড়া আইন রচনা করেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ তিনি মাদ্রাজের জন্য খসড়া আইন রচনা করেন। পরবর্তী কালে এই আইনের ভিত্তিতে মাদ্রাজে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়। এ ছাড়া তিনি উত্তরপ্রদেশ, বেরার ত্রিবাঙ্কুর কোচিন প্রভৃতি রাজ্যের জন্যও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। মহীশূর, অন্ধ্র, কেরালা রাজ্যে খসড়া গ্রন্থাগার আইন তিনি তৈরী করেন এবং মহীশুর, অন্ধ্রে, বর্তমানে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথন : বিশ্বের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জগতে শ্রীরঙ্গনাথন আপন মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৪৮ খ্রীঃ তিনি ইউ. এন. ও'র গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন এবং ইউনেস্কোর গ্রন্থপঞ্জী রচনা সমিতির সভ্য হয়েছেন। IFLA সম্মেলনে ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে তিনি যোগদান করেছেন এবং আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করে সূচীকরণ সম্বন্ধে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি FID ও বৃটিশ গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য হন। ১৯৬৪ খ্রীঃ পিটার্স বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে অনারারি ডি. লিট উপাধি দেওয়া হয় এবং তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান জগতে শ্রীরঙ্গনাথনের বিশেষ অবদান : ১৯৪৯ খ্রীঃ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী ও ১৯৫০ এ দিল্লীতে INSDOC—প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৬৩ খ্রীঃ ডাইরেক্টর শ্রীরঙ্গনাথন বাঙ্গালোরের DRTC কে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গবেষণার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান রূপে রূপায়িত করেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীতে সারদা রঙ্গনাথনের নামে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে একটি সম্মানিত আসনের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরঙ্গনাথনের দ্বিতীয় মহত্তম অবদান সারদা রঙ্গনাথন এনডাউমেণ্ট। ১৯৬৩ খ্রীঃ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্ররা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের সম্প্রসার ও উন্নতিকল্পে ৪০০০ টাকা দিয়ে একটি ফাণ্ড সৃষ্টি করেন। শ্রীরঙ্গনাথন তাঁর সমস্ত

পুস্তক বিক্রীর রয়ালটি এই ফাণ্ডে দান করেন। এই এনডাউমেন্টের উদ্দেশ্য হলো গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান জনগণের মধ্যে বিতরণ করা। এই ফাণ্ড থেকে বর্তমানে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে "Herald of Library Science" এবং "Library Science with a slant to documentation".

গ্রন্থকার শ্রীরঙ্গনাথন : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সকল দিকেই শ্রীরঙ্গনাথন তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল লেখনী চালনা করেছেন। তার সমস্ত লেখা একত্র করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগার জগতের কোন দিকই তিনি অন্ধকারচ্ছন্ন রাখেন নি। তার জ্ঞানদীপ্ত মনীষার দ্বারা তিনি প্রতিটি অন্ধকার ক্ষেত্রকেই শুধু স্বদেশবাসী নয় বিদেশের নিকট আলোকিত করেছেন। তাঁর অবিস্মরণীয় নব আবিষ্কার কোলন ক্লাসিফিকেশন এবং ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ কোড যা আন্তর্জাতিক জগতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারবিদের সম্মানে সম্মানিত করেছে। ১৯৩১ খ্রীঃ তিনি গ্রন্থাগার দর্শনকে সর্বপ্রথম সার্বজনীন ব্যবহারিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করে তাঁর প্রথম গ্রন্থে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি মূলমন্ত্র লিপিবদ্ধ করে Five laws of Library Science প্রকাশ করেন।

১৯৩৮ খৃঃ 'Library administration' এবং ১৯৪০ খৃঃ 'Reference service' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত ৫০টির অধিক গ্রন্থ ও প্রায় ১৫০০টি প্রবন্ধ আছে। তিনি বহু শিক্ষাবিদ, গ্রন্থাগারিক ও বৈজ্ঞানিকের জীবনী লিখেছেন, তারমধ্যে 'রামানুদেব' জীবনী অন্যতম। বর্তমানে Lib Sc. with a slant to documentation পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করেন। শিক্ষা ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেটা তিনি তার গৌরবোজ্জ্বল কর্ম জীবনের মধ্যে দিয়ে সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন। একাধারে শিক্ষাবিদ অন্যদিকে গ্রন্থাগারিক রূপে তিনি শুধু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জড়িত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাহায্য ও পরামর্শে সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাবিদ গ্রন্থাগারিক শ্রীরঙ্গনাথনের সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁকে ১৯৫৮-৫৯ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও গ্রন্থাগার সমীক্ষা সমিতির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি তিনি Indian Standard Inst. ডকুমেন্টেশন কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও শ্রীরঙ্গনাথন : ১৯২৯ খৃঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, শ্রীরঙ্গনাথন, মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম সঙ্কলন গ্রন্থে তাহা পুর্ণমুদ্রিত করেন। কবিগুরুর মাধ্যমেই সেই প্রথম আমাদের পরিষদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং আজও সেই মৈত্রীবন্ধন আমাদের অচ্ছেদ্য। এরপর ১৯৩০ খৃঃ মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের সভায় ভাষণ দেন এবং তাঁরই অনুরোধে তিনি গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর "নির্ব্বাচনী ঢঙে" কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেব বহু সাধারণ গ্রন্থাগারে অজস্র বক্তৃতা

দেন। ১৯৩১ খৃঃ তিনি বাংলাদেশের জন্য গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনা করেন। ১৯৫৯খৃঃ তিনি নবদ্বীপে পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি হন এবং পুনরায় আর একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করেন। ১৯৬১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি তাঁর কয়েকটি কর্মব্যস্ত দিন কলিকাতায় অতিবাহিত করেন। সেই সময় পরিষদের পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা সভায় তাঁর ৭০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। ১৯৬৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীরঙ্গনাথন পরিষদের নিজস্ব বাসভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। একদিন তাঁর অভি-ভাষণে তিনি উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করে গ্রন্থাগার দর্শনের পাঁচটি মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন "অতিথি দেবো ভব, শ্রীয়া দেয়ম, শ্রদ্ধয়া দেয়ম, হ্রীয়া দেয়ম, ভীয়া দেয়ম।" পাঠককে দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে হবে এবং প্রতিটি বইকেই তার পাঠক যোগাড় করে দিতে হবে।

সম্মানিত শ্রীরঙ্গনাথন : শ্রীরঙ্গনাথনের অক্লান্ত কর্মকুশলতা ও অবিস্মরণীয় প্রতিভা ভারতের তথা বিশ্বের দরবারে উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেছে এবং পূর্বতন বৃটিশ সরকার তাঁকে 'রায়সাহেব' উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন এবং ১৯৫৭খৃঃ ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে অভিষিক্ত করেন। তাঁর বহুমুখী কর্ম প্রতিভার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন Sir Maurice Gwyer "He is the father of Library Science in India and has done more than any other man to make India, as saying goes, Library-conscious. His works cover every field of Library science and themselves constitute a library. His reputation as librarian, extends far beyond the borders of own country and his opinion and advice are followed in all lands where books and libraries are held in honour."

আমরা ও শ্রীরঙ্গনাথন : ভারতের গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির জনক শ্রীরঙ্গনাথনের ৭৭তম জন্মজয়ন্তী পালনের দিনে আমাদের শুধু আজ এই কথাই মনে হচ্ছে তিনি গ্রন্থা-গারিকতা বৃত্তি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে আন্তর্জাতিক জগতে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার খুব কম অংশই আমরা আমদের দেশে সার্থক করতে পেরেছি। আজও বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি, রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে চালু হয়নি, বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কোন আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়নি. আজও গ্রন্থাগার বৃত্তিকে উপযুক্ত মর্যাদায় স্বীকৃতি দানের দাবীতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগারিকদের বারংবার পথে নামতে হয়। অপর দিকে গ্রন্থাগার জগতে অনৈক্য ও অনগ্রসরতা, গতিহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার অশুভ কালোছায়া দেখা দিয়েছে। বিভেদপন্থী মনোভাব, স্বার্থান্বষী চক্র গ্রন্থমন্দিরের শান্তি ও পবিত্রতাকে নষ্ট করতে উদ্যত। তাই আজকে আমাদের আচার্য্যের সেই জ্ঞান বাণীটি স্মরণ করছি।

"Through harmony and a sense of brotherhood the members of the profession should overcome the "Devil" in man, which stirs the lower emotions of envy, intolerance and jealousy and make the librarians pull in different directions. To become a prey to this 'Devil' is virtually to bring down the efficiency and the status of the profession. While we cannot completely wipe out this danger in any profession in any country at any time, we should try to keep it within small limits ....In many Libraries there is evidence of tension and touch-me-not attitude among the staff. Unfortunately "Divide and rule" policy is often responsible for this" (১৯৬৭ খৃঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী)

আমাদের শিক্ষাগুরুর উপরি উক্ত সাবধান বাণী অনুসরণ করে আজকের দিনে আমরা যেন এই সঙ্কল্প গ্রহণ করি আমাদের গ্রন্থাগার থেকে বিভেদপন্থী মনোভাব বিতাড়িত করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ ও সার্থক গ্রন্থমন্দির রূপে গড়ে তুলতে পারি।

(শ্রীরঙ্গনাথনের ৭৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত)

সঙ্কলনে : শ্রীমতি গীতা মিত্র

গ্রন্থ সমালোচনা

পরিণাম। দিলীপকুমার সাহা ও অর্চনা চক্রবর্তী। অনন্ত প্রকাশ ভবন। ৩৭, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলিকাতা-৬। দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'পরিণাম' একখানি ঐতিহাসিক নাটক। নাটকের পরিবেশ চরিত্র এবং সংলাপ' সবকিছুই ঐতিহাসিক। প্রথম প্রচেষ্টা হলেও নাটক হিসেবে সার্থকতার দাবী রাখে। নাট্যকারদ্বয় ট্রাজেডীর নায়ক হিসেবে যথার্থভাবে এমন এক চরিত্রকে বেছে নিয়েছেন যাঁর মধ্যে বিবিধ দোষ-গুণের সমাবেশ ঘটেছে, যিনি মানবিক গুণের আকর বিশেষ হয়েও যে Error of frailty ট্রাজেডীর কারণ তার বলি হয়েছেন। মহম্মদ-বিন্-তোগলঘ্ এক ভাগ্যবিড়ম্বিত চরিত্র। নাট্যকারদ্বয় ইতিহাসের যথাযথ রেখানুসরণে তাঁর চরিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। মহম্মদের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে উপস্থাপিত ঘটনা নাটকীয় গতিকে তীব্রতর করেছে। অন্যত্রও এই সংঘাত বিদ্যমান। নাটকের শেষদৃশ্য পর্যন্ত সংঘাত এবং suspense রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বর্ষণমুখর পরিবেশে লতাবাঈ-এর গান ইংগিতবহ। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে প্রাসাদ- অভ্যন্তরে হংসপদিকার গান শুনে রাজা দুষ্মন্তের ভাবান্তরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য মেলে।

সামগ্রিকভাবে মহম্মদ-বিন্-তোগলঘের পরিচায়ক হলেও তাঁর কার্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই নাটকে অনুপস্থিত। নাটকে দু-একটি ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে বাকীগুলোকে সূত্রের আকারে রক্ষা করা হয়েছে। প্রজাদের করভারবৃদ্ধি, রাজ্যবিজয়াভিযান, দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে বিস্তৃত করার ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে নাটকের মুলধারাকে পুষ্ট করলে সংঘাত আরও হৃদয়গ্রাহী হোত এবং নায়ক চরিত্রও আরও দীপ্যমান হোত। যে ইতিহাসের আলোকবর্তিকার অনুসরণে নাট্যকারদ্বয় যেতে চেয়েছেন বলে মনে হয় তার নির্দেশও অক্ষুণ্ণ রাখা চলত। পক্ষান্তরে নাটকীয় ঘটনা আরও গভীরতা লাভ করত। দিল্লীর মসনদে মহম্মদের আরোহণও কিছুটা আকস্মিকভাবে দেখান হয়েছে।

নাটকের নামকরণ নাট্যকারদ্বয়ের নিজস্ব। এ বিষয়ে মন্তব্য অনধিকার চর্চা। তবুও না বলে পারছি না যে সাধারণভাবে না বলে বিশেষ চরিত্রের পরিচয়দ্যোতক কোন নামে অভিহিত করলে এর গুরুত্ব সমধিক হোতে পারে। সম্ভবতঃ দ্রুত প্রকাশের ফলে যে বর্ণাশুদ্ধিগুলি ঘটেছে সেগুলি দূরীভূত হবে আশা করে নাটকটির পরবর্তী সংস্করণের প্রতীক্ষায় রইলুম।

—ভোলানাথ ঘোষ

Books Review

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার, ২৯।১।৩, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলি-২৭।

গত ২৫শে মে ১৯৬৯ তারিখে শ্রীবিনোদ বিহারী বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগারের বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৮৯ ৭১ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে:

শ্রীবিনোদ বিহারী বসু (জে, পি) (সভাপতি), শ্রীঅরুণ বসু ও শ্রীমতী আভা ঘোষ (সহ-সভাপতিদ্বয়), শ্রীদেবকুমার ঘোষ (সম্পাদক), শ্রীমতী তৃপ্তি বসু (সহ-সম্পাদিকা), শ্রীঅমল কুমার গোস্বামী (গ্রন্থাগারিক ও সহ-সম্পাদক), শ্রীশান্তি কুমার ভট্টাচার্য (যুগ্ম-গ্রন্থাগারিক), শ্রীমতী মিনতি ভট্টাচার্য (সহঃ গ্রন্থাগারিক), শ্রীঅনাদি মোহন মুখোপাধ্যায় (হিসাব রক্ষক ', শ্রীজয়ন্ত দত্ত (সহ-হিসাব রক্ষক), সর্বশ্রী রমেশ চন্দ্র আঢ্য, দিলীপ কুমার নন্দী, শক্তি মজুমদার, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজন কুমার বসু, মণি সান্যাল, কাউন্সিলর (পৌরপ্রতিনিধি) ও বরুণ কান্তি রায়চৌধুরী (সরকারের প্রতিনিধি) (সদস্যবৃন্দ)।

মিলনী পাঠাগার, নরেন্দ্রনগর, কলি-৫৬।

১৯৬৯ এর ১৩ই এপ্রিল তারিখে মিলনী পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসবের সূচনা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে হয়। ১১ই মে'র কল্যাণ স্মৃতি আবৃত্তি সংগীত প্রতিযোগিতা ও পাঠাগারের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই ও ১৮ই মে সংগীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বর্ধমান

জোতরাম বাণী মন্দির, জোতরাম, বর্ধমান।

বিগত ২৯শে জুন জোতরাম বাণীমন্দির গ্রন্থাগারের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিগত সভার কার্যাবলী অনুমোদিত হয়, অডিট রিপোর্ট পঠন ও অনুমোদিত হয়। ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন যথাক্রমে সর্বশ্রী ডঃ গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ (সভাপতি), নিরাপদ মুখার্জী (সহ-সভাপতি), কাশীনাথ ব্যানার্জী (সম্পাদক), সনাতন মণ্ডল (গ্রন্থাগারিক ও সহ-সম্পাদক), সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ), ভূদেবচন্দ্র ঘোষ (সদস্য), সমীর কুমার সরকার (সদস্য), অমিয় কৃষ্ণ কর (সদস্য), রেখা চন্দ্র (সদস্য), মঞ্জুলা দাশগুপ্ত (সদস্য), এস, ই, ও বর্ধমান ব্লক (সদস্য)।

সভায় গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণ কার্য শীঘ্র সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যাহাতে এই গ্রন্থাগার সরকারী গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পরিণত হয় এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সমর্থ হয় তাহার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান।

গত ৬ই জুন মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর দ্বাবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্থানীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীগোপাল চন্দ্র কর মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী সুধীর কুমার চক্রবর্তী, অলোক নাথ ঘোষ, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, সাটিনন্দী, বর্ধমান।

গত ৬ই আষাঢ় যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের সপ্তদশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রীকামিনী কুমার রায়। পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ অধিকারিক শ্রীশ্যামল কুমার মুখার্জী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায় গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয়, বিভিন্ন উদ্দেশ্য-কার্যাবলী ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি গ্রন্থাগারের বহুমুখী কর্মধারায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

সুভাষ পাঠাগার, ফটকদ্বার, কালনা, বর্ধমান।

গত ২৯শে জুন '৬৯ সুভাষ পাঠাগারের দশম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী সম্পাদক পাঠাগারের ১৯৬৮-৬৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও কার্যবিবরণী পেশ করেন। কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে পাঠাগারে বর্তমানে প্রায় ২৫০০ পুস্তক আছে এবং সদস্য সংখ্যা ২৪৩ জন। পাঠকের গড় উপস্থিতি ৪০ জন। বাৎসরিক পুস্তক আদান প্রদান সংখ্যা ১৩০০০ হাজার। সম্পাদক মহাশয় পাঠাগারের সাহায্যকল্পে যে চ্যারিটী সিনেমা শো হইয়াছিল তাহার হিসাব পেশ করেন। জানা যায় যে উহা হইতে মোট ৭৬৮'০০ (সাতশত আটষট্টি) টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬৯-৭০ সালে পাঠাগারের কার্য পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা হয়। সর্বশ্রী সুধীর কুমার দাস (সভাপতি), দিলীপ কুমার মণ্ডল ও বিশ্বম্ভর গোস্বামী (সহঃ সভাপতিদ্বয়), শম্ভুনাথ লাহা (সম্পাদক), গোবিন্দ চন্দ্র রায় (সহঃ সম্পাদক), সাধন কুমার চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক ও সহঃ সম্পাদক), দীনবন্ধু সাহা (কোষাধ্যক্ষ), নিত্যানন্দ দাস, মধুসূদন কুণ্ডু, অরবিন্দ পাল, শ্যামল চক্রবর্তী, (সদস্যগণ), চিত্তরঞ্জন সিংহ (মনোনীত সদস্য)।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ী, বীরভূম।

গত ১৯শে মে সন্ধ্যায়, সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবনে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন ও মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন—পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ মহোদয়। সভার উদ্বোধন করেন বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারের প্রেসিডেণ্ট শ্রী জি ভেন্‌কাটারমনন্‌ (জেলা সমাহর্তা)। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী বিমলানন্দ ও কুমারী আভা নন্দী। মাননীয় রাজ্যপালের সহধর্মিণী, তাঁহার পুত্রবধূ, বর্দ্ধমান ডিভিশানের কমিশনার, রাজ্যপালের ডেপুটি সেক্রেটারী ও স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ১৩ই আষাঢ় সন্ধ্যায়, সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, রামরঞ্জন পৌরভবনে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূমের জেলা ও দায়রা জজ্‌ শ্রীসুধীন্দ্র মোহন গুহ মহোদয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী শ্রীশ চন্দ্র নন্দী। শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন বীরভূম জেলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও হেতমপুর কলেজের তরুণ অধ্যাপক শ্রীকিশোরী মোহন দাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারের সহ সভাপতি ডাঃ কালীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দেমাতরম্‌ প্রভৃতি সময়োপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী আভা নন্দী।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গী কিশোর সংঘ, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ।

বিগত ১১।৮।৬৮ তারিখে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া আগামী তিন বৎসরের জন্য পাঠাগারের নূতন কার্যকরী সমিতি হয়:

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখার্জী (সভাপতি), শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (সহ-সভাপতি), শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত (সম্পাদক), শ্রীপ্রণব কুমার কুণ্ডু (সহ-সম্পাদক-পদাধিকার বলে), শ্রীসন্তোষ কুমার সরকার, শ্রীকিরণচন্দ্র নন্দী, শ্রীশ্যামাদাস নন্দী, শ্রীঋষিপদ মিস্ত্রী, শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা, শ্রীরবিন কুমার ঘোষ, শ্রীসুনীল কুমার ধাড়া (প্রতিষ্ঠাতা), শ্রীঅবনী কুমার বিশ্বাস।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীগণকে যথারীতি "ব্রজেন্দ্র-স্মৃতি" পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মেদিনীপুর

আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

গত ১৬, ১৭ এবং ২৭শে মে আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় ঝাড়গ্রামে যথাক্রমে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সুখময় সেন, অধ্যাপক গোকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশক্তি সরকার, অবনী শতপতি, সুনীল দাশগুপ্ত প্রভৃতি কবিদ্বয়ের কাব্যরস সম্পর্কে আলোচনা করেন। সঙ্গীতে গোরা সর্বাধিকারী, ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত, সুভাষ সেন প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, মেদিনীপুর।

গত ২৮শে জুন, ১৯৬৯ শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন হ্যামিলটন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅলোকনাথ ত্রিপাঠী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীসত্যগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়। উদীয়মান কবি শ্রীবিমল কুমার বসু সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় দেশ হিতব্রতী ও মানব প্রেমিক, ঋষি, কবি, জনদরদী ও কল্যাণব্রতী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন আলেখ্য চিত্রণ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা, তথা কাঁথিতে সরকারী কর্মীরূপে আগমন ও কপালকুণ্ডলা রচনায় যশস্বী হইবার কথা আলোচনা করেন। সূর্য সাধনার সদস্যা কুমারী ছবি সেনগুপ্তা সুমধুর কণ্ঠে ২টি গান গাহিয়া শোনান। জেলা গ্রন্থাগারের অন্যতমা শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা মুখার্জী ও শ্রীতপন কুমার দাস তাঁহাদের সুললিত ও উদার কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ গাহিয়া শোনান।

* * *

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে ১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৬, সোমবার সন্ধ্যায় নাট্যামোদী সদস্য ও চারু শিল্পীদিগের এক সভায় নট সম্রাট শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের স্মৃতি চারণ করা হয়। উপস্থিতদিগের মধ্যে শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিশির বাবুর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সভাপতি ও প্রধান বক্তা জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শিশির বাবুর প্রতিভা, জীবন, বিরাট ব্যক্তিত্ব, শিল্প জগতে যুগান্তর আনয়ন, জাতীয় সরকার প্রদত্ত সম্মান প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বিষয়ে সরস আলোচনা করেন।

* * *

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে ১৬ই আষাঢ় (১লা জুলাই, ১৯৬৯) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্বের দরবারে প্রখ্যাত বাঙ্গালী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম জয়ন্তী একটি অনাড়ম্বর শুচি স্নিগ্ধ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের

পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী গোবিন্দপদ মাইতি, সুধীর অধিকারী ও বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ রায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা দক্ষ প্রশাসক হিসাবে কৃতিত্ব অর্জনের কথা আলোচনা করেন।

হাওড়া

জুজারসাহা শক্তি পাঠাগার, জুজারসাহা, হাওড়া।

গত ৮ই জুন স্থানীয় পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠান স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীননীলাল দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। সভায় শ্রীমানিকলাল মান্না প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিজ্ঞ' ও 'চঞ্চল' কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার সঙ্গে বিশিষ্ট শিল্পীগণ কর্তৃক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছিল।

মিলন পাঠাগার, বালী, হাওড়া।

বিগত ১১ই মে '৬৯ রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় পাঠাগারের উদ্যোগে বালী সাধারণ গ্রন্থাগারের রবীন্দ্রমণ্ডপে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। বেলুড় মঠ বি-টি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ পাঠাগারের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীঅধীর কুমার মুখোপাধ্যায় সভায় পৌরোহিত্য করেন। প্রধান বক্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অফ্ লাইব্রেরী সায়েন্স ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু মহাশয় "রবীন্দ্রনাথ ও ইউরোপীয় রোমান্টিক কাব্য এই পর্যায়ে তথ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। তাঁর হৃদয় গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ সমবেত শ্রোতাদের বিশেষ মুগ্ধ করে। সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। সভার প্রারম্ভে পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে সভাস্থ সকলে একমিনিট নীরবতা পালন করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় এই উপলক্ষ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। শোক প্রস্তাবের অনুলিপি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। পাঠাগারের সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা শেষ হয়। সভায় উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়া মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ৩।২ চার্চ রোড, হাওড়া-১

১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হাওড়া মেডিক্যাল লাইব্রেরী এই জেলার এই ধরণের একমাত্র গ্রন্থাগার। নিজস্ব ভবনে অবস্থিত এই গ্রন্থাগার হাওড়া মেডিক্যাল ক্লাবের সমর্থন পুষ্ট। চিকিৎসক ও তৎ সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও গবেষকদের পুস্তক, সাময়িক পত্র সংবাদপত্র প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করাই এই গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য। রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন অপরাহ্ন ২ ঘটিকা হতে রাত্র ৯ ঘটিকা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য এই গ্রন্থাগার খোলা থাকে।

সংকলয়িত্রী : শীলা গুপ্ত

News from Libraries

গ্রন্থাগার কর্মি সংবাদ

বিগত ৮ই জুন আসানসোল অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারিকের বিশেষ আমন্ত্রণে তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, জনবাণীর সম্পাদক সুশীল ঘোষ ও সাংবাদিক অজিত বর্মণ গ্রন্থাগার পরিদর্শনে আসেন। গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার সংলগ্ন প্রশস্ত জমিতে কোয়ার্টার নির্মাণের দাবী পেশ করেন। গ্রন্থাগারিক মাননীয় মন্ত্রীকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার আইন' সম্পর্কিত দুটি পুস্তিকা প্রদান করেন।

* * *

১০ই জুন উক্ত গ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠান সদস্যদের প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। বর্ধমান জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীকামিনী কুমার নাথের সভাপতিত্বে এই সভায় ত্রিশজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সভার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীর সম্পাদক গ্রন্থাগার আইন চালু করার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন এবং গ্রন্থাগারগুলির প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী পেশ করা হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শ্রীনাথ এই সকল সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

* * *

বিগত ৬ই জুলাই মাননীয় আবগারী মন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার পুরুলিয়া শহরে আসেন। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার এক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন—সমিতির পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

গত মে মাস থেকে পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীরা বেতন ও ভাতা ও অক্টোবর মাস থেকে অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার টাকা পাচ্ছেন না। জানা গেছে, বহু পূর্বে সরকারী আদেশপত্র আসা সত্ত্বেও নানা অজুহাত দেখিয়ে অনুদান দিতে দেরী করা হচ্ছে।

তুলীন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা বেতন পান নি। অবগত হওয়া গেছে, গ্রন্থাগার সম্পাদকের বাড়ীতে ডাকাতি হওয়ায় নাকি গ্রন্থাগারের সব টাকা চুরি গেছে।

কর্মীদের অবিলম্বে বেতন ও ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মুখ্য পরিদর্শকের নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

* * *

গত ১৯শে জুন গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বীরভূম জেলা শাখার প্রতিনিধিগণ নিয়মিত বেতন ও অন্যান্য দাবীতে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের কাছে

ডেপুটেশনে উপস্থিত হ'ন। তিনি তাদের দাবী ১১ই জুলাইএর মধ্যে মিটিয়ে দেবার আশ্বাস দেন।

পাণ্ডুয়া ইউ. বি হল লাইব্রেরীর কর্মিগণ স্থানীয় বিধানসভা সদস্য কমরেড দেবনারায়ণ চক্রবর্তীর সংগে সাক্ষাৎ করেন ও একটি স্মারকলিপি দেন।

* * *

গত ২৬শে মে মেটেলী পাবলিক লাইব্রেরীতে পশ্চিমবঙ্গের কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প মন্ত্রী শম্ভুনাথ ঘোষ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

* * *

গত ৫ই মে বেতনহার ছাড়াও অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কে. জি. বসুকে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

Library workers in the news

ঃ গ্রন্থ পঞ্জী ঃ

৺সুখলতা রাও এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ ঃ

বাংলা ঃ শিশু সাহিত্য

১। আরো গল্প। কলিকাতা, ইউ-রায় অ্যাণ্ড সন্স ১৯১৫। ১১৬ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ০'৬২।

২। অলিভুলির দেশে। কলিকাতা, বিদ্যোদয় ১৯৫৭। ১১২ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ২.০০।

৩। ঈশপের গল্প; পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা চিত্রিত। কলিকাতা, শিশু-সাহিত্য-সংসদ, ১৯৬৩। ৪৮ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ১'২৫ পঃ।

৪। কিশোর গ্রন্থাবলী। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৩। ৮৬ পৃঃ চিত্র। মূল্য ৪'৫০ পঃ।

৫। খেলায় পড়া। কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১। ৪১ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ০'৭৫।

৬। খোকা এলো বেড়িয়ে। কলিকাতা, এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ১৯৬১। ৮৬পৃঃ। চিত্র। মূল্য ২'৩০।

*৭। গল্প আর গল্প। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ. ১৩০ পৃঃ চিত্র। মূল্য ৪'০০।

৮। গল্পের বই। কলিকাতা, ইউ. রায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১২। ১১৯ পৃঃ। চিত্র। মূল ০'৬২।

*৯। দুই ভাই। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ৮৮ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ২.৫০।

১০। নতুন ছড়া। কলিকাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৫২। ২৪ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ১.১৫ পঃ (ইংরাজী হইতে অনূদিত)।

১১। নানান গল্প। কলিকাতা, এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, ১৯৬০। ১০৪ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ২.০০।

১২। নানান দেশের রূপকথা। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৩। ৬৩ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ১.৫০ পঃ।

১৩। নিজে পড়। কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৯। ৪৯পৃঃ। চিত্র। মূল্য ০.৭৪।

১৪। নিজে শেখ। কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ৪৮ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ০.৭৫ পঃ।

১৫। নূতন পড়া ১ম ভাগ। কলিকাতা ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২২। ১২ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ০.১৯ পঃ।

১৬। পড়াশুনা। কলিকাতা, ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২১। ৩২ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ০.৩৭ পঃ।

১৭। বনে ভাই কত মজাই। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৪। ৬১ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ২.০০।

১৮। বিদেশী ছড়া। কলিকাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৬২। ৫৬ পৃঃ চিত্র। মূল্য ২.০০।

*১৯। সোনার ময়ূর। কলিকাতা। মিত্র ও ঘোষ, ৮৭ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ২.৫০ পঃ।

২০। স্বাস্থ্য। কলিকাতা, ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২৫। ৪৬ পৃঃ চিত্র। মূল্য ০.৩৭ পঃ।

বাংলা : অনুবাদ সাহিত্য

২১। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী : মাটির মানুষ। কলিকাতা। ত্রিবেণী, ১৯৫৯। ১১৩ পৃঃ মূল্য ২.৫০ পঃ।

ইংরেজী সাহিত্য

২২। Behula : an Indian myth ; with introduction by Rabindra Nath Tagore. Calcutta, U. Roy & Sons, 1930. 34P. Col. Plates.

২৩। Leading Lights. Calcutta, Mahendra Nath Dutt, 1956. 52P. Price Rs. 2/-.

(গ্রন্থপঞ্জীটি মিনতি চক্রবর্তীর সহায়তায় সঙ্কলিত)

Books by Sukhalata Rao

সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য পুস্তকাদি ঃ

স্বদেশ ও বিদেশ

স্বদেশে

1 Development of libraries and library science in India, by Subodh Kumar Mukherjee Calcutta, World Press, 1969. Rs. 21·50 P.

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিদ্যার পর্য্যালোচনা ও বর্ত্তমান অবস্থা। সাধারণ গ্রন্থাগার ও জাতীয় উন্নতি, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা।

2 Education of women in India, 1850-1966 : a bibliography ed. by V. K. Khandwala. Bombay, S. N. D. T. Women's University, 1968. Rs. 5·50.

বোম্বের এস, এন, ডি, টি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত। নয়টি বিষয়ে বিভক্ত করে গ্রন্থপঞ্জীটি রচনা করা হয়েছে। ইতিহাস, সমীক্ষা, বিদ্যার মান, মহিলা ও বৃত্তি ইত্যাদি। বর্ণানুক্রমিক লেখক সূচী।

3 Free book service for all, ed. by S. R. Ranganathan & N. A. Gupta. Bombay, Asia publishers, 1968. Rs. 35·00

মহীশূর গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে প্রকাশিত। সমস্ত পৃথিবীতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থার পর্য্যালোচনা। আটাশজন ভারতীয় গ্রন্থাগারিক অংশ গ্রহণ করেছেন।

4 Guide to Indian periodical literature : annual cumulative volume 1965. Gurgaon (Haryana) Prabhu Book Service 1969. Rs. 80·00.

১৪০টি ভারতীয় সাময়িক পত্রের নির্ঘণ্ট। ২০,০০০টি রচনা লেখক ও বিষয়ের শিরোনামায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে সঙ্কলিত। ২২টি বিষয়ের রচনাপঞ্জী আছে।

5 Index India No. 3 (April to June 1969) ed. by N. N. Gidwani. Jaipur, Rajasthan University Library. (Annual subscription Rs. 100, single issue Rs. 25)

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বের সমস্ত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত ভারতের সম্বন্ধে নির্ব্বাচিত রচনা, সম্পাদকীয়, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদির নির্ঘণ্ট। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা বাদে ১১,৩৪৫ রচনার তালিকা ৮০০টি পত্রিকা থেকে সঙ্কলিত।

6 Index Indo-asiaticus, Vol. 2, No. 2, 1968 Calcutta, Post Box 11215. Rs. 10·00.

ইংরাজী ও অন্যান্ত বিদেশী ভাষায় এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রে ভারত ও এশিয়ার উপর প্রবন্ধাবলীর নির্ঘণ্ট। আখ্যা ও বিষয় এই দুটি স্থচীতে বিভক্ত প্রথম সংখ্যাটি প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ উইলিয়ম জোন্‌স্‌কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

7 Reading in library seience by B. S. Gujrati. Ludhiana, Lyall Book Depot., 1968. Rs. 15·00

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন সাময়িক পত্র থেকে ২০টি রচনার পুনর্মুদ্রণ…। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

8 Who's who of Indian Musicians. Sangeet Natak Akademi, Rabindra Bhawan, New Delhi, 1969.

ভারতীয় রেফারেন্স বইএর স্বল্পতার ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। বিষয়ের দিক থেকে প্রথম প্রচেষ্টা। প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞের বিষয় নিম্নলিখিত ভাবে সাজান হয়েছে, নাম, জন্মতারিখ, শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা, সঙ্গীতের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, যে সিনেমা বা রেকর্ডে যেখানে অংশ গ্রহণ করেছেন, বিদেশ ভ্রমণ, কোন প্রকাশন এবং সর্বশেষে বাসস্থানের ঠিকানা।

বিদেশে

9 A programmed course in cataloguing and classification, by A. F. Johnson, London, Deutsch, 1968. 25s.

স্থচীকরণ ও বর্গীকরণের একটি সহজবোধ্য প্রাথমিক পুস্তক। স্থচীকরণ ও বর্গীকরণের নিয়মগুলি ১৯৬৭ সালের অ্যাংলো আমেরিকান স্থচীকরণের নীতি, Dewey দশমিক বর্গীকরণের ১৭শ সংস্করণ ও Sears-এর বিষয় স্থচীর ৯ম সংস্করণ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

10 A study of the rules for entry and heading in the 'Anglo-American cataloguing rules', 1967 (Br. text) by M. Gorman. London Library Asson , 1968. 20s.

১৯৬৭ সালের অ্যাংলো-আমেরিকান স্থচীকরণ নীতির চিন্তাপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও ঐ নীতি অনুযায়ী স্থচীকরণের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।

11 Automation in libraries, by R. T. Kimber. Pergamon Press, 1968. 45sh.

গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনায় Electronic computer এর কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার আলোচনা।

12 Britain : an official handbook, London, H. M. S. O, 1969.

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বিশ্বের ঘটনাবলীর সঙ্কলন।

13 Encyclopædia of library and information science ; ed. by A. Kent and H. Lancour, Vol. 1. Marcel Dekker, 1968. $ 45 per vol. (non subscriber), $ 35 (subscription)

১৮ খণ্ডের গ্রন্থবিজ্ঞানের কোষগ্রন্থের এটি ১ম খণ্ড। ৭৩ জন লেখক এতে অংশ গ্রহণ করেছেন আফ্রিকা, ভারত, ইউরোপ ও রাশিয়ার লেখকগণ আছেন। ইহাদের মধ্যে ৯ জন বিশেষজ্ঞ। বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী।

14 Guide to reference books, by E. P. Sheely : 8th ed. first suppliment 1965-66. Chicago, A L A ; 1968, $ 3 50.

১৯৬৫-৬৬ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের রেফারেন্স গ্রন্থের বিবরণ। সাময়িক পত্রের পর্য্যালোচনা আছে।

15 James Duff Brown, by W, A Munford 1862—1914: portrait of a library pioneer, London, Library Asson., 1968. 30s.

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিশারদ জেমস ডাফ ব্রাউনের প্রথম তথ্যমূলক সংক্ষিপ্ত জীবনী।

16 Library & information science abstracts, 1969—　　, London, Library Asson. £6. 6s. per year.

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাময়িক পত্র নয় এমন সব পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার নির্ঘণ্ট ও সংক্ষিপ্তসার।

17 The American Revolution : a selected reading list.

বৃটেনের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত থেকে ১৭৮০ পর্য্যন্ত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইতিহাস জানার জন্য যে সকল পুস্তক প্রয়োজন তার নির্ব্বাচিত তালিকা। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের পর্য্যালোচনা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যে শিশু পাঠ্যপুস্তকে গল্পে বা বর্ণনায় কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আছে তাও তালিকাভুক্ত হয়েছে।

Recently published books and other publications on Library Science in India and abroad.

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্রিল, ১৯৬৯ সালে

গৃহীত বি, লিব, এস-সি,র পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা।

প্রথম বিভাগ

(ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী)

১ শ্রী গোপালদাস ভট্টাচার্য
২ ,, দীপিকা নাথ
৩ ,, মীনাক্ষী সেনগুপ্তা
৪ ,, অর্জুন দাশগুপ্ত
৫ ,, হরেন্দ্রনাথ বসু
৬ ,, আভা ব্যানার্জী
৭ ,, রমা মজুমদার
৮ শ্রী সাম্যসাম মুখোপাধ্যায়
৯ ,, ব্রজগোপাল ঘোষ
১০ ,, দেবযানী মৈত্র
১১ ,, অলোককুমার মুখোপাধ্যায়
১২ ,, গুরশরণ কাউর কাণ্ডোলা
১৩ ,, তপতী গুপ্ত (বাগচী)
১৪ ,, উমা গাঙ্গুলী (ব্যানার্জী)
১৫ শ্রী মঞ্জুশ্রী বসু

দ্বিতীয় বিভাগ

১৬ শ্রী সুকান্তি সেনগুপ্ত
১৭ ,, মঞ্জু সেনগুপ্তা (দে)
১৮ ,, পরমানন্দ সিনহা
১৯ ,, দুধেশ্বর শর্মা
২০ ,, রবীন্দ্র প্রসাদ
২১ ,, সিদ্ধেশ্বর কুণ্ডু
২২ ,, বিনয়ভূষণ দত্ত
২৩ ,, অসীমা মজুমদার
২৪ ,, মমতা চৌধুরী
২৫ শ্রী চন্দেশ্বর প্রসাদ
২৬ ,, ইলা সাহা
২৭ ,, রমেশচন্দ্র রায়
২৮ ,, শান্তি সরকার
২৯ , মনীষা বিশ্বাস
৩০ ,, রমা দেব
৩১ ,, শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী
৩২ ,, শ্যামলী ঘোষ
৩৩ ,, প্রতিমা মজুমদার

Education for Librarianship : B. Lib. Sc. resutls
—Jadavpur University.

বার্তা-বিচিত্রা

মুহম্মদ আবদুল হাইএর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জগত থেকে মুহম্মদ আবদুল হাইএর চিরবিদায় দুই বাংলার জনগণের কাছে গভীর বেদনাদায়ক। গভীর দুঃখের বিষয়, মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ঢাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। মুর্শিদাবাদে মরচা গ্রামে তার জন্ম। কিন্তু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বি-এ ও এম-এ পাস করেন। পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন কলেজে অধ্যপনা শেষ করে তিনি ১৯৪৯ খৃঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বাংলা ও হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছিলেন। ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পালের 'বাংলা সাহিত্যে আরবি ফারসি শব্দ' এই অভিধানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত করে তিনি দুই বাংলার মিলনের সেতু রচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্য-পত্রিকা'র মধ্যে দিয়ে তিনি যে শুধু নিজেই জ্ঞানচর্চ্চা করেছেন তা নয় অপরকেও এই বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ''বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান'', 'বিলাতে সাড়ে সাত শ দিন', 'ভাষা ও সাহিত্য', মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা (সম্পাদনা) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম সাধক তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য রসজ্ঞান নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

লিটল ম্যাগাজীন প্রতিযোগিতা :

ত্রৈমাসিক 'শিল্পরূপ' পত্রিকা গত এক বছরে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজীনের এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে পঞ্চাশ টাকা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

মারাঠী ভাষায় ঋকবেদের অনুবাদ ও মারাঠী জীবনীকোষ :

মারাঠী সাহিত্যিক সিদ্ধেশ্বরী শাস্ত্রী চৈতরও মারাঠী ভাষায় ঋকবেদের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি প্রখ্যাত মনীষীদের জীবনীকোষও তিনি মারাঠি ভাষায় প্রকাশ করেন। ঋকবেদের অনুবাদের জন্য পুণা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেন।

১ম ও ২য় শ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্য বিনামূল্যে পুস্তক দান :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় ঘোষণা করেছেন যে, আগামী জানুয়ারী মাস থেকে ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিদ্যালয়ের গ্রন্থ সরবরাহ করা হবে। চতুর্থ পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হবে। ১৯৭০ খৃঃ জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করবেন বলেও সরকারী প্রেস নোটে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রবীন বিপ্লবী গ্রন্থকার শ্রীনলিনীকিশোর গুহর সম্বর্ধনা :

গত ২৬শে জুলাই মহাবোধি সোসাইটি হলে 'বাংলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণের প্রকাশ উপলক্ষে গ্রন্থকার, বিপ্লবী ও সাংবাদিক শ্রীনলিনীকিশোর গুহকে সম্বর্ধনা জানান হয়। হেমচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে এই সভায় প্রধান বক্তা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী গুহের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় ভারতীয় গ্রন্থ প্রকাশ :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', ইংরাজীঅনুবাদ করেছেন টি ডবলু ক্লার্ক ও তারাপদ মুখার্জী এবং ফরাসী অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী ফ্রাঁস ভট্টাচার্য। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' 'দি পাপেটস টেল' নামে অনুবাদ করেছেন শচীন্দ্রলাল ঘোষ এবং এর প্রকাশক সাহিত্য আকাদমী। প্রেমচাঁদের 'গোদান' ইংরাজীতে অনুবাদ করছেন গর্ডন সি রোডারমল।

সংবাদপত্র প্রকাশে নতুন পদ্ধতি :

২৬শে জুলাই মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা কোয়েমবাটুর থেকে ঐ পত্রিকার একটি ফ্যাক-সিমিলি সংস্করণ প্রকাশ করে আজ ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। এই প্রথম ভারতের কোন সংবাদপত্র মূল প্রকাশ স্থান থেকে দূরে অন্য কোন কেন্দ্রে মূল সংবাদপত্রের হুবহু প্রতিরূপ ছেপে প্রকাশ করল। উন্নততর ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে টেলিফোন কো-আকসিয়েল কেবলে মাদ্রাজে সম্পাদিত ও কম্পোজ করা বিভিন্ন পাতায় ছবি (পেজ প্রুফ) কোয়েমবাটুরে পাঠান হয় এবং ফ্যাকসিমিলি থেকে জিঙ্ক এনগ্রেভিং তৈরি করে তার থেকে কাগজ ছাপা হয়।

প্রকাশকদের স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রচেষ্টা :

ইংল্যাণ্ডে কয়েকজন প্রকাশক একত্রে মিলে শিল্প-সাহিত্য-সংরক্ষণ নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সমিতি কোন লেখক বা পাঠক-পাঠিকা যদি কোন গ্রন্থ প্রকাশকের বিরুদ্ধে কোন মামলা পেশ করেন, তবে এই সংরক্ষণ সমিতি সেই প্রকাশকের মামলার খরচাদিতে সাহায্য করবেন। কয়েকজন লেখকও এই সমিতির সঙ্গে জড়িত।

বুলগেরিয়ায় শিশুসাহিত্য সপ্তাহ পালন :

সম্প্রতি বুলগেরিয়ায় শিশুসাহিত্য ও শিল্প সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ এক সাহিত্যিক শিল্পীগোষ্ঠী শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিশু পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। এই সপ্তাহে আবৃত্তি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও শিশুনাট্য ও চলচ্চিত্র অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের জন্য চার হাজার তিনশত শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ হয়েছে, তাদের প্রচার সংখ্যা আট কোটি।

সঙ্কলয়িত্রী : গীতা মিত্র

Notes & News.

চিঠিপত্র

[প্রকাশিত পত্রের প্রতিবাদ]

সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়, গ্রন্থাগার পত্রিকার ১৩৭৬ সালের আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীস্বর্ণ সেনের 'প্রশ্ন তাই··· জবাব চাই' শীর্ষক চিঠি প্রসঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব হিসেবে কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই। যদিও ঐ চিঠি শ্রীস্বর্ণ সেনের ব্যক্তিগত চিঠি এবং চিঠিতে উল্লিখিত মতামতের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি এবং পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আদৌ দায়ী নন, তথাপি যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয় তার জন্যই এই চিঠি।

১। উক্ত চিঠিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সিলেক্সনলিস্ট ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে ১৯৬৪ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করে শ্রীস্বর্ণ সেন শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল :

(ক) শ্রীস্বর্ণ সেন শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসুর বাচনভঙ্গী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা অসমীচীন ও অশোভন।

(খ) উক্ত পত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে ১৯৬৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থগারিকতা শিক্ষণ বিভাগে শ্রীযুক্ত বসুর 'আমল' ছিল। শ্রীযুক্ত বসু ঐ সময় উক্ত বিভাগের প্রধান ছিলেন না। সুতরাং ঐ সময়কার ঘটনাবলীর জন্য তাঁকে কিভাবে দায়ী করা যায় ?

(গ) বিগত ৩০ বছরেরও অধিককাল ধরে শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গীয়গ্রন্থাগার পরিষদ ও পরিষদের শিক্ষণ বিভাগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। পরিষদ ও পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের স্নেহ ও ভালবাসা কারও সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখে না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁরা সকলেই একথা স্বীকার করবেন। শ্রীযুক্ত বসু যখন উক্ত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তির ফর্মে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পাশ কিনা এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল (বর্তমানে যা অপসারিত হয়েছে)। ঐ সময় প্রতি বৎসর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধিক সংখ্যায় ভর্তির সুযোগ পেতেন (যে সুযোগ থেকে সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমানে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে)। পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য তাঁর কাছ থেকে আমরা প্রতি বৎসর Dewey-র Schedule পেয়ে এসেছি (যে সুযোগ থেকে বর্তমানে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে) উপরোক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে পরিষদ ও পরিষদের শিক্ষণ বিভাগ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসুর ঐকান্তিক মনোভাব।

(ঘ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ব্যাপারে নীতি বহির্ভূত কিছু হয়ে থাকলে

বা কিছু ত্রুটি থাকলে তা নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার হয়ত শ্রীস্বর্ণ সেনের আছে, তবে সেই সমালোচনা হওয়া উচিত তথ্যভিত্তিক এবং নীতিগত প্রশ্নে। কখনই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তাছাড়া ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য (যদি কিছু হয়ে থাকে) শ্রীযুক্ত বসু কতটা দায়ী বা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বা অন্য কোন মহল কতটা দায়ী তাও অনুসন্ধান করে মন্তব্য করা উচিৎ।

(ঙ) যদিও এই চিঠি শ্রীস্বর্ণ সেনের, তা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বসু সম্পর্কে ব্যক্তিগত মন্তব্য সম্বলিত এই চিঠি 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশ হওয়ার জন্য আমি ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন ব্যক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রীস্বর্ণ সেন কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল :

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের উদার সাহায্যের ফলে দীর্ঘদিন ধরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সার্টিফিকেট ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই বিষয়ে আমরা শ্রদ্ধেয় উপাচার্য্য, রেজিষ্ট্রার, কণ্ট্রোলার অব্ এগজামিনেশনস্, পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সেক্রেটারী, গ্রন্থাগারিকতা বিভাগের ডীন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাহায্য যেমন একদিকে পেয়েছি ও পাচ্ছি, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছ থেকেও আমরা নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি ও পাচ্ছি। এর জন্য আমরা এদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমাদের রেজিষ্টার্ড অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। একটি বেসরকারী বৃত্তিমূলক সংগঠন ও তার শিক্ষণ বিভাগের প্রতি উদার মনোভাব ও সহযোগিতার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কিন্তু বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের কোন কোন শিক্ষক (অধিকাংশই নন) পরিষদ ও তার শিক্ষণ বিভাগ সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি করেছেন। পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য Dewey 16th ed. দিতে অস্বীকার করা (অল্প ২/৩ মাসের জন্য দরকার হয়), গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভর্তির ফর্ম থেকে সার্টিফিকেট পাশ কিনা এই জিজ্ঞাস্য বিষয় তুলে দেওয়া, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির সুযোগ থেকে বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে বঞ্চিত করা, সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য ঘর পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা এ সবগুলি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে পরীক্ষার সময় আমরা পরিষদ থেকে আমাদের Dewey-র বই দিয়ে থাকি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট ক্লাস হওয়ার পথে যে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা কর্মীদের জন্য নয়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের কোন কোন শিক্ষকের জন্য) সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে, পরিষদের

অসম্পূর্ণ বাড়ীকে সম্পূর্ণ করে পরিষদের নিজস্ব ভবনে শিক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে আসা এবং ক্লাস অনুষ্ঠিত করার জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। আর এই কাজ সম্ভব করতে হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে—মুক্তহস্তে দান করে পরিষদ ভবনের কাজ শেষ করতে হবে। মনে রাখবেন এক স্বয়ং নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান অনেক বলিষ্ঠভাবে অন্যায় ও যথেচ্ছচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে।

(খ) পরিষদের অনেক সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অনেক ছাত্র-ছাত্রী আমাদের কাছে মৌখিক ভাবে বা লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের কোন কোন শিক্ষক (অধিকাংশই নন) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পরিষদের শিক্ষণ বিভাগ সম্পর্কে কটূক্তি ও ব্যাঙ্গোক্তি করতে খুবই উৎসাহী ও তৎপর। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিষদ সম্পর্কে তাঁদের এই এলার্জির কারণ কি আমরা জানি না। খোলাখুলিভাবে আমাদের কাছে এই মনোভাবের কারণ কি তা তাঁরা জানান নি। স্বর্ণ সেন ঠিকই বলেছেন বিরোধ কোথায় ?

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল সত্য সত্যই যদি কেউ কোন কুৎসা রটনা করে থাকেন তা হলে সে সম্পর্কে উপেক্ষার মনোভাব দেখানো ভাল। অন্যথায় কুৎসা ও কুৎসা রটনাকারীরা প্রাধান্য পাবে, পরিষদের শক্তির অপচয় ঘটবে। বাংলাদেশের সামগ্রিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব পরিষদের উপর। তার শক্তিকে এভাবে অপচয় করতে দেওয়া যায় না। নেপথ্য ও গোপন সংলাপে যারা বিশ্বাসী তাদের নিয়ে আমাদের এত মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পরিবর্তে কোন ব্যক্তি যদি কুৎসা ও বিভেদের আশ্রয় নিয়ে থাকেন (এবং তা যদি সত্য ঘটনা হয়) তাহলে তিনি একদিন ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত হবেন। পরিষদের কাজের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে আমরা কুৎসা ও বিভেদকে ভাসিয়ে দেব।

(গ) পরিষদের বহু সদস্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী বহু নাগরিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচনের নীতি ও পদ্ধতি, শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, শিক্ষণ পদ্ধতি, সিলেবাস ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ ও বক্তব্য রেখেছেন এবং এই সম্পর্কে বৃত্তিগত সংগঠন হিসেবে আমাদেরকে সক্রিয় ভাবে কিছু করতে বলেছেন।

বিষয়গুলি নীতিগত ও শিক্ষা সম্পর্কিত। তাই বিশদ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। তাছাড়া উক্ত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও মতামত জানা দরকার। পরিষদের পক্ষ থেকে এই আলোচনা আমরা শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। গ্রন্থাগার কর্মীরাও নীতিগত ও শিক্ষাগত প্রশ্নে তাদের মতামত জানাতে পারেন। বিশদ আলোচনার পর বিষয়গুলি আমাদের বৃত্তির সংগে জড়িত সকলের সামনে রাখা হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

(শেষাংশ ১৫০ পাতায় দেখুন)

গ্রন্থাগার কর্মি সংবাদ

গ্রন্থাগার কর্মীদের বিধানসভা অভিযান

গত ৬ আগষ্ট ১৯৬৯ সহস্রাধিক গ্রন্থাগার কর্মী ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ও পোষ্টার সহ নানাবিধ শ্লোগান দিতে দিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ডাকে এই দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী বেলা ২॥০ টার সময় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও জাতীয় গ্রন্থাগারের এমপ্লয়িজ ইউনিয়নও তাঁদের কর্মীদের নিয়ে মিছিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমবেত গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং বিধানসভার মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে শোভাযাত্রাটি রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে যাত্রা শুরু করে। ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ও পোষ্টার শোভিত এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী নামে পরিচিত জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার, গবেষণা গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির কর্মীরা ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এমন কি, সুদূর জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলা থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরা এসেছিলেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের কলকাতার রাজপথে নামার ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। গত ১৯৬৭ সালের ১ আগষ্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারকর্মীরা এক মৌন মিছিল করে যান রাইটার্স বিল্ডিংএ। ঐ বছরেরই ২৬ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বার কলকাতার রাজপথে মিছিল বার করেন গ্রন্থাগারকর্মীরা। এবারে তাঁরা নিজেদের একক শক্তির ওপর নির্ভর করেই এই মিছিল বার করেছিলেন। পূর্ববর্তী দুটি মিছিলই ছিল মৌন মিছিল। এবারে কিন্তু গ্রন্থাগারকর্মীরা তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে মিছিলে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এই সব দাবী-দাওয়া পোষ্টারে ও ফেস্টুনে লিখে তাঁরা বহন করে তো চলেছিলেনই উপরন্তু মুহুর্মুহু শ্লোগানেও সেগুলি ঘোষিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, গ্রন্থাগার কর্মীদের এই মিছিলের চরিত্র আগের মিছিলগুলি থেকে পৃথক। এর চেহারাটা বেশ সংগ্রামী বলেই মনে হচ্ছিল।

মিছিলটি বিধানসভার গেটে পৌঁছাবার পর বিধানসভার মাননীয় সদস্যগণ সর্বশ্রী মনোরঞ্জন হাজরা, গীতা মুখার্জী, দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, অবিনাশ বোস, বিমল বোস, বিমল দাস, অজিত বিশ্বাস, প্রমুখ শোভাযাত্রীদের সম্মুখে বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক বক্তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং গ্রন্থাগার আইন পাশ করার জন্য

যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তাঁরা বলেন, তাদের এই দাবী-দাওয়াগুলি যাতে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার বিবেচনা করা হয় তার জন্য তাঁরা বিধানসভার ভিতরে ও মন্ত্রীমণ্ডলীর ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন। সরকারীভাবে যদি সম্ভব না হয় তবে বেসরকারীভাবেও গ্রন্থাগার আইনটি যাতে বিধানসভায় আনা যায় তার জন্য তাঁরা সমবেতভাবে চেষ্টা করবেন। ইত্যবসরে এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি পেশ করেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শোভাযাত্রীদের সম্মুখে এসে বক্তৃতা করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় বলেন, তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের সকল সমস্যাই অবগত আছেন। শিক্ষক সমিতির সঙ্গে গ্রন্থাগার সমিতির যোগাযোগ দীর্ঘকালের। অতপর তিনি রাজ্যের বাজেটের শোচনীয় অবস্থা এবং শিক্ষাখাতে ব্যায়ের পরিমাণ উল্লেখ করে বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়া খুবই ন্যায্য কিন্তু তিনি তাঁর সীমিত পরিধির মধ্যে এঁদের জন্য কতটা করতে পারবেন সেটা মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস না পেলে সঠিক বলতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়া বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া বলেন, গ্রন্থাগার হল জনসংযোগ ও সমাজশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। একে অবহেলা করা চলে না। গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষসংযোগ রয়েছে সুতরাং তাঁদের কখনই অসন্তুষ্ট রাখা চলে না। তিনি মনে করেন তাঁদের দাবী দাওয়ার সব পূরণ না করতে পারলেও অন্তত কিছু কিছু তাঁদের পূরণ করতে যে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জাতীয় গ্রন্থাগারের ভেতর পুলিশ মোতায়েন ও ইউনিয়নের পোষ্টার অপসারণ সম্পর্কে প্রতিনিধিদল উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রী বসু এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে জানালে শোভাযাত্রীরা ফিরে যান।

উল্লেখযোগ্য যে, এই দিনের বিধানসভা অভিযানের মুল দাবীগুলি ছিল: গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, শিক্ষা বাজেটের ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়, বিদ্যালয় বাজেটের ৫ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়, স্পনসর্ড প্রথার অবসান, সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরূপ মহার্ঘভাতা দেওয়া ইত্যাদি।

জাতীয় গ্রন্থাগারে অবাঞ্ছিত পুলিশ অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ

গত ৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার জাতীয় গ্রন্থাগারে অকস্মাৎ পুলিশের অনুপ্রবেশ ঘটে। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পুলিশের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠান যে তাঁর কর্মচারীদের একাংশ বিশেষভাবে উগ্র ও হিংস্র হয়ে উঠেছে এবং তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে তিনি

বিশেষভাবে আশঙ্কিত বোধ করছেন। কতিপয় কর্মচারীর নামের তালিকাও তিনি পুলিশের নিকট পেশ করেন এবং তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধও তিনি জানান। তিনি একথাও জানান যে কর্মচারীরা এত বেশী উগ্র যে তাঁরা বোমা দিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার উড়িয়ে দিতে চান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রন্থাগারিকের বিভিন্ন স্বেচ্ছাচারী আদেশের বিরুদ্ধে কর্মচারী সংসদ কিছুদিন যাবত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই সংক্রান্ত কিছু পোষ্টার সংসদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপিত হয়। এই পোষ্টারিং-এর বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারিক আপত্তি প্রকাশ করায় কর্মচারী সংসদের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। সামান্য উপলক্ষে চার গাড়ী পুলিশকে তিনি গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে আনয়ন করেন। ইতিপূর্বে পুলিশের বেশ কিছু সংখ্যক পদস্থ কর্মচারীও গ্রন্থাগারে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্যণীয় যে বচসার পূর্বেই গ্রন্থাগারিকের তরফ হতে পুলিশের কাছে কর্মীদের বিরুদ্ধে হাস্যকর, অপমানজনক, মিথ্যা অভিযোগ পেশ করা হয়। যদিও পরে গ্রন্থাগারিক স্বয়ং তাঁর ব্যবহারের জন্য কর্মচারীদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু কর্মীদের বিরুদ্ধে এ হেন মিথ্যাচারের জন্য সকলেই বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এরূপ নিন্দনীয় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান হয় এবং কর্মচারী সংসদের প্রতি পরিষদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ৬ আগষ্ট বিধানসভা অভিযানের সময় শোভাযাত্রার পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

Library workers in the news

কুচবিহারের সাসপেণ্ড আদেশ-প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীজিতেন্দ্র নন্দীর সাহায্যার্থে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে যে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল তাতে সাড়া দিয়ে কলকাতার চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার ২০৲ টাকা পাঠিয়েছেন।

গত ৬ আগষ্ট বিধানসভা ভবনের সম্মুখে একটি ছাতা হারাইয়াছে। কেহ পাইয়া থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া পরিষদ অফিসে জমা দিবেন।

(১৪৭ পাতার শেষাংশ)

৩। এই চিঠি শেষ করার আগে আরও একটি বিষয় সম্পর্কে বলতে চাই। আমাদের বৃত্তি, বৃত্তিগত শিক্ষা, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার, কর্মীদের অবস্থার উন্নয়নের আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ের নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে যে কোন বক্তব্য হাজির করা প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীর অধিকার আছে। তবে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ইতি

প্রবীর রায়চৌধুরী

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ কথা

৮ সেপ্টেম্বর

আন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা বিরোধী দিবস উদ্‌যাপনের আহ্বান

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর তারিখটি সারা বিশ্বে নিরক্ষরতা বিরোধী দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যেও নিরক্ষরতার অভিশাপ সমধিক। এই রাজ্যের প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ এখনও অক্ষরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত। অক্ষরজ্ঞান ছাড়া বর্তমানকালে মানুষের ব্যবহারিক জীবন অচল। অক্ষরই শিক্ষার ধারক ও বাহক এবং অক্ষরাশ্রয়ী শিক্ষার সাহায্যেই ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ-জীবনের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধিত হয়। তাই পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে অনতিবিলম্বে মুক্ত করার শপথ গ্রহণের প্রয়োজন।

এতদুদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে আয়োজিত নিরক্ষরতা বিরোধী দিবসটিকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌যাপনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সকল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁরা যেন ঐদিন নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুযায়ী দিবসটি উদ্‌যাপন করেন :

১। স্থানীয় সকল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে আলোচনা বৈঠকের আয়োজন এবং উপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণ। একাজে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে আহ্বান জানানো প্রয়োজন এবং উৎসাহী প্রতিটি ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমপক্ষে একজন করে নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করার সংকল্প গ্রহণ।

২। জনসভা ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনীর আয়োজন। নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানের উপযোগী নাটকাভিনয় ও প্রমোদানুষ্ঠান।

৩। নিরক্ষরতা বিরোধী শিক্ষাকেন্দ্রে সরঞ্জামাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ।

৪। সদ্যসাক্ষর ব্যক্তিদের পাঠস্পৃহা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা এবং রাজ্য সরকারের নিকট বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বিনা চাঁদায় সর্বস্তরের মানুষের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

স্মরণে

রাত্রির আকাশে অজস্র তারার সম্মিলনে সমুজ্জ্বল যে নক্ষত্রসভা বসে তা থেকে কত তারাই তো খসে যায় কে-ই বা তার খোঁজ রাখে! বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে এতকাল ধরে কত কর্মী এসেছেন এবং গেছেন—কর্মে ও কোলাহলে মুখরিত হয়েছে পরিষদের দপ্তর। তাঁদের বেশিরভাগই আজ কোথায় হারিয়ে গেছেন।

কিন্তু পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক ও সভাপতি তিনকড়ি দত্ত সম্পর্কে এ কথা খাটে না। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে নিজেই উদ্যোগী হয়ে এই পরিষদে যোগ দেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহযোগিতা করতে। ১৯৬৩ সালে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পরিষদের সেবা করে গেছেন এরকম একনিষ্ঠতার উদাহরণ বিরল। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে তিনকড়ি দত্তের নাম তাই অক্ষয় হয়ে রইল। গ্রন্থাগারের উন্নতিই যেন ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সব কিছুতেই তিনি আগ্রহ সহকারে যোগ দিতেন। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংগঠন থেকে আরম্ভ করে নিখিল ভারত পর্যন্ত সকল গ্রন্থাগার সংগঠনেই তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাঁর সমগ্র ধ্যান-ধারণা নিয়োজিত হয়েছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজে। পরিষদকে ঘিরে তাঁর নানারকম স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল। একমাত্র তিনি ছাড়া তাঁর এই সব স্বপ্নে আর কেউই বোধ হয় অতটা বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্বলহীন পরিষদেব পক্ষে যে নিজস্ব ভবন নির্মাণ সম্ভব তা তিনি ছ[illegible] অতটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কে ভাবতে পেরেছিল ?

পরিষদ প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। কি করে পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা যায় এ বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। পরিষদের একটি নিজস্ব প্রেস করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি তিনি নিয়মিত আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন। সাহিত্য বিষয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি 'রবিবাসর' ও 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এই দুটি সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—রবিবাসরের অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন পাশ করাবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। আজ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা এসেছে। তিনকড়ি দত্ত আজ আমাদের মধ্যে থাকলে কত সুখীই না হতেন !

তিনকড়ি দত্ত, মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, বা সুশীল ঘোষ এঁদের কারোই জন্মদিন পরিষদে এখন আর আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয় না। তাঁদের জন্মদিন আসে আবার চলেও যায়। আমরা এই উপলক্ষে কখনো তাঁদের স্মরণ করি আবার কখনো তাও বা করতে ভুলে যাই। এই তো সেদিনের কথা—১৯৬৩ সালের ৭ জুলাই কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেন্টস হলে তিনকড়ি দত্তের মৃত্যুর পর যে শোকসভা হয়েছিল তাতে গ্রন্থাগারিকরা একের পর একে উঠে অশ্রুসজল চক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর আরব্ধ কর্ম সমাধার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। ঘটা করে কোন একদিন স্মরণসভা না করেও যদি আমরা তাঁর আরব্ধ কাজগুলি সমাধা করার চেষ্টা করি তবেই বোধ হয় তাঁকে সার্থকভাবে স্মরণ করা হবে।

Association Notes

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়   সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৫ } { ১৩৭৬, ভাদ্র

॥ সম্পাদকীয় ॥

নিরক্ষতা ও গ্রন্থাগার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য সমাপ্ত "বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস" সম্পর্কে জাতীয় সম্মেলনের শেষে অনেকেই হয়তো আশান্বিত হবেন নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানের এক সুফলের আশায়। গত ৬-১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সপ্তাহ পালন করা হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তে, তাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এইসব অনুষ্ঠান, সম্মেলন প্রভৃতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি দেশে শিক্ষা আলোর বন্যা বয়ে যাবে? বরং এর ফলে ভারতের এক ঘন তমসাচ্ছন্ন দিকেই লক্ষ্য পরে বার বার। ইউনেস্কো গত ১৯৬৭ সাল থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর "আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস" উৎযাপন করে আসছে কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে এই অভিযান শুরু হয়েছে অনেক আগেই। তা সত্ত্বেও সমস্যার কোন বিশেষ সমাধান তো হয়ই নাই বরং উপরন্তু দিন দিন সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে। ভারতে আজ যত নরনারী সাক্ষর তার চেয়ে অনেক বেশী নিরক্ষর। বস্তুত দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় এ দেশের জনসংখ্যা যত ছিল আজ নিরক্ষরের সংখ্যা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আজও ভারতে শতকরা ২৪.২ ভাগের বেশী জনসংখ্যার কোন অক্ষর পরিচয় নেই। অন্যান্য দেশের শিক্ষা হারের তুলনায় ভারত যে সর্বপশ্চাতে কেবল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এ তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ব্যাপকহারে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ হয়তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায়না যে যে-পরিমাণে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারলাভ করা প্রয়োজন সে তুলনায় কিছুই হয়নি।

এ ছাড়াও রয়েছে বয়স্ক নিরক্ষরদের সমস্যা। তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সরকার থেকে বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু এখানেও ব্যর্থতা। টাকার অভাব কেউ বলবেন না কারণ সরকারই স্বীকার করেছেন প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে কোটি

কোটি টাকা খরচ করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। অথচ প্রত্যেকেই জানেন কেবল দারিদ্র্যই দেশের অগ্রগতির পথে একমাত্র বাধা নয়, শিক্ষাহীনতাও আর এক চরম বাধা। বয়স্কদের শিক্ষাদান কালে অভাব হয় সদ্য সাক্ষরদের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় পুস্তকের আর শিক্ষা শেষে সদ্য লব্ধ জ্ঞানকে ধরে রাখতে যে চর্চার প্রয়োজন তার জন্যও নেই উপযুক্ত পুস্তক ভাণ্ডার বা গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারই জিইয়ে রাখতে পারে সদ্য সাক্ষরদের লব্ধ অক্ষরজ্ঞানকে, নিয়মিত পুস্তকের যোগান দিয়ে। ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসারলাভে যেমন সদ্য সাক্ষরদের শিক্ষা চর্চার সুযোগ হবে অনুরূপ ভাবে নিরক্ষরদেরও প্রলুব্ধ করবে শিক্ষা গ্রহণে। "অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস" এ আপ্তবাক্য অবিসম্বাদী সত্য। যদি গ্রন্থাগারের সাহায্যে সদ্য লব্ধ শিক্ষা চর্চার ব্যবস্থা না থাকে তবে সেই সদ্য সাক্ষরেরা আবার নিরক্ষরদের দল ভারী করবে, ফলে নিরক্ষরতার এক "দুষ্ট চক্র"ই আবর্তন করবে বার বার, মূল সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে। তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারনও একান্ত প্রয়োজন। বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে স্থানীয় পল্লী গ্রন্থাগারের সঙ্গে একত্রীভূত করে এক বাস্তব প্রকল্প গ্রহণ করলেই অসংখ্য প্রচেষ্টার অনেকটা সাফল্য আসবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে ছাত্র সমাজও এগিয়ে এসেছেন গত ১৯৬৫ সাল থেকে। কিন্তু এ কেবল কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর দায়িত্ব নয়। নিরক্ষরতা এক জটিল সমস্যা, বিশেষ করে ভারতের এ এক জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে শিক্ষিত বা সাক্ষর প্রত্যেককেই সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এই শিক্ষাহীনতা। এই বাধাকে অস্বীকার করা যায় না। আর সবার সাথে গ্রন্থাগারিকেরাই এগিয়ে আসবেন সর্বাগ্রে, কারণ তাঁরাই আজ মানুষ গড়ার কারিগর। আমাদের মনে রাখতে হবে অগ্রগতির পথে পথ চলার সাথে "এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা', ওদেরও করতে হবে আমাদের পথ চলার সাথী, কারণ আমরা জানি, অন্যথায় "পশ্চাতে ফেলিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২০)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কারাগার গ্রন্থাগার

স্থানীয় ব্যবস্থাপরিষদের বরাদ্দ অধিবেশনের সময় বহু বৎসর ধরিয়া আলোচনা হওয়ার ফলে সরকার বাঙ্গালার কারাগার গ্রন্থাগারের জন্য গত বৎসর মাত্র এক হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অন্ততঃ তিন বৎসর স্থায়ী থাকিবে। ইহা একটি সঠিক পদক্ষেপ এবং আমি আশা করি নুতন সংবিধানে কারাগার মন্ত্রী কারাগার গ্রন্থাগারসমূহের জন্য যথেষ্ট অনুদানের ব্যবস্থা করিবেন। সাক্ষর বন্দীদের পক্ষে মনের খোরাকের অভাব একটা অতিরিক্ত সাজা।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, যথা—জিলা মণ্ডল এবং গ্রাম মণ্ডলের নিজ নিজ এলাকার অধীন গ্রন্থাগারসমূহের জন্য যথেষ্ট অনুদানের ব্যবস্থা করিবার পক্ষে এখন কোন আইনগত বাধা নাই। হুগলী জিলা মণ্ডলই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারকে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং এই জিলার একটি গ্রাম মণ্ডল অনুদান দেওয়ার পথ দেখাইয়াছে। তখন হইতে কতিপয় জিলা এবং গ্রাম মণ্ডল গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ দেখাইয়া অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান আদৌ কোন ব্যবস্থা করে নাই। সুখের বিষয় যে কতিপয় পৌরসভা গ্রন্থাগার সমূহের জন্য অনুদানের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতেছে। ইহাই ত' হওয়া উচিত। পাশ্চাত্ত্যের পৌরসভাসমূহ করদাতাদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ একটা প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া মনে করে। স্পেনের মাদ্রিদ, স্যালাম্যানকা, সেভিল ও বার্সিলোনায় বহু পৌরসভার গ্রন্থাগার দেখিয়াছি। তাছাড়া প্রমোদ উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট বিনাচাঁদার গ্রন্থমণ্ডপও আমার নজরে পড়িয়াছে। বাঙ্গালাদেশের, বিনাচাঁদার না হইলেও, নারায়ণগঞ্জে ও চট্টগ্রামে পৌরসভার গ্রন্থাগার রহিয়াছে। ঢাকার নর্থব্রুক হল গ্রন্থাগার সম্প্রতি ঢাকার পৌরসভার পরিচালনাধীনে আসিয়াছে। কিন্তু আধুনিক প্রণালীতে গড়িয়া তুলিবার জন্য কোন চেষ্টা আজও করা হয় নাই। আমি গ্রাম মণ্ডল সমেত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর আগ্রহান্বিত করিয়া স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রীকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাই।

সার্বজনীন গ্রন্থাগার শতবার্ষিকী

বাঙ্গালাদেশের সার্বজনীন গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে কলিকাতা সার্বজনীন গ্রন্থাগার সম্ভবতঃ প্রদেশের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থাগার। ইহা বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক সাম্রাজ্যিক গ্রন্থাগারে

রূপান্তরিত হইয়াছে বা উহার গঠনকল্পে ইহাকে মুখ্য আধাররূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। মাত্র এক বৎসর পূর্বে আমাদের পরিষদ ইহার শতবার্ষিকী উদযাপন করিয়াছে।

মেদিনীপুর সার্বজনীন গ্রন্থাগার

তারপরে আসে মেদিনীপুর সার্বজনীন গ্রন্থাগারের কথা। ইহা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পঁচাশী বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন এই গ্রন্থাগারের একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস লিখিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। এই পর্যন্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতিদের সানুগ্রহ আনুকূল্যে প্রায় নয়শত সার্বজনীন গ্রন্থাগারের নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আরও অনেক গ্রন্থাগারের নাম সংগ্রহ করিতে বাকী আছে।

বগুড়া পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাগার

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট হইতে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অনেক উপযোগী তথ্য রহিয়াছে। বগুড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীনূরন্নবী চৌধুরীর বিবরণ অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। বগুড়া জিলায় পল্লীমঙ্গল সমিতি গঠনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ দেখাইয়াছেন। এই সমিতি জিলার ভিতরে দেড় হাজার নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। জিলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে শ্রীনুরন্নবী চৌধুরী যে আগ্রহ দেখাইতেছেন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সাক্ষররা যাহাতে তাহাদের শিক্ষা ভুলিয়া না যায় তাহা রোধ করিবার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে পল্লীমঙ্গল সমিতির সংগঠকরা যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করিতেছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহারা এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন যে অন্যান্য জিলাসমূহের তাহা অনুকরণ ও অনুসরণ করা উচিত। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে হইলে নৈশ বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপনই প্রকৃষ্টতম এবং সহজতম পন্থা।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া চলন্ত গ্রন্থাগার

ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় চলন্ত গ্রন্থাগার যে কাজ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে ত্রিপুরার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরায় নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন :

গ্রামবাসীদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান বিকিরণের জন্য চলন্ত গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবেড়িয়া সমবায়ী গ্রাম পুনর্গঠন সমিতি লিমিটেড যে চেষ্টা করিতেছে তাহাতে আনন্দ হয়। ইহার ভাণ্ডারে দুই হাজার বই আছে। মহকুমায় যত গ্রাম মণ্ডল আছে ততটা বইর বাক্স আছে এবং পালাক্রমে প্রত্যেক গ্রাম মণ্ডলের সভাপতির নিকট খানবিশেক বই বোঝাই করিয়া ঐ বাক্সগুলি পাঠান হয়। এই ব্যবস্থায় খুব ভাল কাজ হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই উত্তম সম্ভাবনাপূর্ণ এবং অন্যান্য মহকুমায় এই ব্যবস্থার অনুকরণ করা আর্থিক সাহায্য দিয়া জিলা মণ্ডলের এই ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া বিধেয়। জিলা মণ্ডলের

এই ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া বিধেয়। জিলা মণ্ডলের চলন্ত গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং আমি আশা করি গ্রামাঞ্চলে জ্ঞান বিকিরণের এই সহজ পন্থার দিকে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী জিলা মণ্ডলকে দৃষ্টি দিতে বলিবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী

বাঙ্গালাদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিষদ কি করিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সর্বপ্রথমে আমি এই কথাই বলিতে চাই যে আর্থিক অসঙ্গতির দরুণ ইহা কোন বৃহৎ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারে পাই। যাহা হউক ইহা সামান্য সম্বল লইয়া নিম্নোক্ত পরিকল্পনাসমূহ হাতে লইয়াছে :

(১) গ্রন্থাগারের অবস্থার সমীক্ষা—কলিকাতা ও হাওড়ার গ্রন্থাগারসমূহের যে প্রথম সমীক্ষা করা হইয়াছে তাহা এই সম্মেলনে বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইবে।

(২) গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রবর্তন।

(৩) একটি খণ্ডপত্রিকা প্রকাশ—'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা' নামক একটি খণ্ডপত্রিকা প্রকাশ করা হইবে। ইহাতে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে রক্ষণোপযোগী গ্রন্থের তালিকা থাকিবে। পুস্তক নির্বাচন সমিতি কয়েক মাস আগেই এই সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন!

(৪) পরিষদ গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগারের অঙ্গীভূত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায় এইরূপ পুস্তকের জন্য পরিষদে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থাগার হইতে আঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

(৫) জনসভায় বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা—গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কখনও কখনও বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে চারটি বক্তৃতা দেওয়ান হইয়াছে।

(ক) বিশ্বভারতীর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—(বাঙ্গালায়) বর্গীকরণের দশমিক পদ্ধতি।

(খ) 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড'-এর সম্পাদক ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়—রোগী ও অক্ষমদের জন্য গ্রন্থ পরিবেশন।

(গ) ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীআসাদুল্লাহ্—ছোট গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রণালী।

(ঘ) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা।

কলিকাতায় ও মফস্বলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা :

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বক্তৃতা দেওয়া হয়—হুগলীর সেণ্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন, শিবপুর তরুণ সঙ্ঘ, হাওড়া, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা, রাজবলহাট গ্রন্থাগার সম্মেলন, হুগলী, শালকিয়া ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী, হাওড়া চন্দননগর

পুস্তকাগার, বেলেঘাট। সান্ধ্য সমিতি, দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সঙ্ঘ, কালীমাতা লাইব্রেরী, কালীঘাট, কৃষ্ণনগর বান্ধব সম্মেলনী লাইব্রেরী, নদীয়া, প্রথম বিহার গ্রন্থাগার সম্মেলন, গয়া, শ্রীপুর টাউন লাইব্রেরী, খুলনা, বাণী সরস্বতী পাঠাগার, হাওড়া, বিক্রমপুর গ্রন্থাগার সম্মেলন, ঢাকা, চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘ, দশভুজা সাহিত্য মন্দির, মানকুণ্ডু এবং চুঁচুড়া বয়েজ ওন লাইব্রেরী।

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ

বিদায়ী মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব লইয়া এক প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরিত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থাগার আইন

প্রদেশের ভিতরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধন করিতে হইলে গ্রন্থাগার আন্দোলন অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্যে এবং বৃটিশ উপনিবেশে এমন কোন দেশ নাই যেখানে গ্রন্থাগার আইন নাই। আশা করি আমাদের প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়ে অগ্রণী হইবেন। উপসংহারে প্রদেশের গ্রন্থাগার সমূহের জন্য যথেষ্ট অনুদানের ব্যবস্থা করিতে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি।

অতঃপর ডঃ নীহাররঞ্জন রায় নিম্নোক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র ও বাণী পড়িয়া শোনান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যুক্ত প্রদেশ গ্রন্থাগার সমিতির অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ ওয়ালী মহম্মদ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহার গ্রন্থাগার সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক, রায় মথুরা প্রসাদ, বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীওয়াকনিস, মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং মাদ্রাস গ্রন্থাগার সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক রাও সাহেব শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন ; বগুড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ত্রিপুরা, বর্ধমান, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজশাহী, বীরভূম, হুগলী, নদীয়া ও খুলনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটবর্গ ; রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভার সভাপতি, বরিশালের সদর মহকুমা হাকিম, পটুয়াখালির মহকুমা হাকিম ; বীরভূম, দার্জিলিং ও যশোহরের বিদ্যালয় সমূহের জিলা পরিদর্শক ; জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার ; বালটিমোর-এর ইনক প্র্যাট ফ্রি লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীজোসেপ হুইলার।

সম্মেলনের সভাপতি মাননীয় ফজলুল হক গত গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রশস্তি পত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের, (১৩৪৪ বঙ্গাব্দের) সর্বপ্রথম গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম :

(১) শ্রীঅভয়কুমার সরকার, সালকিয়া ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক 'এ' ক্লাস (অনার্স)। (২) শ্রীশৈলেশকুমার সেন, কুমিল্লার সেনস্ পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক

'এ' ক্লাস। (৩) শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী, চন্দননগর পুস্তকাগারের গ্রন্থাগারিক 'বি' ক্লাস। (৪) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদের এঙ্গলো-বেঙ্গলি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের গ্রন্থাগারিক 'বি' ক্লাস। (৫) শ্রীক্ষিতিনাথ সুর, খুলনার কুমিরা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক 'বি' ক্লাস। (৬) শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গ্রন্থাগারিক 'বি' ক্লাস। (৭) শ্রীমাতাদিন উপাধ্যায়, কলিকাতার শ্রীমহেশ্বরী পুস্তকালয় 'বি' ক্লাস। (৮) মহম্মদ আরিফ, ঢাকার শেরিফ লাইব্রেরী 'সি' ক্লাস। (৯) শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোহরের নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১০) শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নদীয়ার চুয়াডাঙ্গা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১১) শ্রীঅনন্তকুমার বিশ্বাস, বাঁকুড়া কলেজের গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১২) শ্রীঅজিত ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১৩) তফজ্জল হোসেন, বাঙ্গালার শিল্প অধিকারিকের কার্যালয়ের গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১৪) শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়, হাওড়া অ্যাসেমব্লির সহকারী গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১৫) শ্রীঅমিয়কুমার সরকার, স্যার আশুতোষ মেমোরিয়্যাল ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১৬) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার, বঙ্গবাসী কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১৭) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস। (১৮) শ্রীসুবোধ চন্দ্র সরকার, চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরীর সহকারী গ্রন্থাগারিক 'সি' ক্লাস।

প্রশস্তিপত্র বিতরণান্তে সম্মেলনের সভাপতি প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক তাঁহার ভাষণ দেন। জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিকিরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যে মুখ্য ভূমিকা রহিয়াছে তাহা তিনি সর্বপ্রথমে জোর দিয়া বলেন। তিনি স্বীকার করেন প্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার খুব সামান্যই জানা আছে। কিন্তু বগুড়ায় গিয়া তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাব কতটুকু তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। সেখানে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট-এর সহায়তায় ও চেষ্টায় এই আন্দোলন শিকড় গাড়িয়াছে এবং বহু গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রধানতঃ গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বহু গ্রন্থাগার দেখিয়াছেন। এমন কি যাহারা নিরক্ষর তাহারা গ্রন্থাগারে আসিয়া পঠনক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা বই পড়াইয়া শোনে। তাহারা এই সকল গ্রন্থাগারে বই কিনিবার জন্য টাকাও দিয়াছে। তবে তিনি এই সকল গ্রন্থাগারে একটা প্রতিবন্ধক লক্ষ্য করিয়াছেন। এখানে বাঙ্গালা বই খুব কমই রাখা হয়। প্রধানতঃ ইংরেজী উপন্যাস, নাটক, কবিতা এবং কখনও কখনও আপত্তিজনক ধরণের বই-ই এই গ্রন্থাগার সমূহ কিনিয়া থাকে। গ্রন্থাগারে কি ধরণের বই কেনা হইবে এই সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়ার কেহ না থাকার ফলেই এইরূপ ঘটে। গ্রন্থাগার সমূহকে উপযোগী ও কর্মদক্ষ করিয়া তুলিতে হইলে আপত্তিজনক সাহিত্য যাহাতে স্থান না পায় তাহার পথ ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে। অধিকন্তু গ্রন্থাগারের বই কিনিবার সময় কোন্ শ্রেণীর পাঠকের মনের খোরাক যোগাইবে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। পাঠকের সাধারণ জ্ঞান_বৃদ্ধির জন্যই যে শুধু বই কিনিতে হইবে তাহা নয় জনগণের সমস্যা সম্বন্ধে

আলোচনা রহিয়াছে এমন বই সংগ্রহ করিবার প্রতিও যত্নশীল হইতে হইবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ইহা উৎসাহ পাওয়ার যোগ্য। সংগঠকদিগকে তিনি এই আশ্বাস দেন যে তিনি যেভাবে পারেন গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সহায়তা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন।

পরিশেষে কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বাঙ্গালাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন চালাইতেছেন বলিয়া তিনি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মেদিনীপুর পৌরসভার সভাপতি এবং মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি রায় শীতলপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর তাঁহাকে এই সম্মেলনে উপস্থিত হইবার এবং বক্তৃতা করার সুযোগ দেওয়ায় কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি সানন্দে এই কথা প্রকাশ করেন যে তিনি সম্মেলনে আসিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মেদিনীপুর সহর হইতে তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন যে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, ১২৬৮-১২৬৯ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অর্থাৎ ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও প্রাচীনতর শ্রীনৌশের আলী খাঁ নামক স্থানীয় জমিদার এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য তিন বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। সেই জমির সঙ্গে ছিল চার বিঘার মত একটি বড় দীঘি। মেদিনীপুরের তদানীন্তন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবেইলি এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সর্বসাধারণের বদান্যতায় গ্রন্থাগারের জন্য একটি সুন্দর ভবন নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু বৎসর ইহা অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। ফলে ইহার কথা জনগণ ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রদেশের প্রাচীনতম এই গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের জন্য বর্তমান জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন যে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহার জন্য তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। বিনয় বাবু অর্থ সংগ্রহের জন্য জিলাবাসীদের প্রতি এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। গত তিন মাসের মধ্যে প্রায় চার হাজার নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে এবং গ্রন্থাগারে বিজলী বাতি আসিয়াছে। এই প্রাচীন গ্রন্থাগারের আর্থিক বনিয়াদ পাকা করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। শীতল বাবু জানান যে মেদিনীপুর পৌরসভা সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতিকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দিয়াছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন মেদিনীপুরে করিবার আমন্ত্রণ জানাইলে সভাস্থ সকলে তাঁহার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভাপতির ভাষণান্তে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী ঘোষের সৌজন্যে দুইটি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখান হয়।

দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে অধ্যাপক অনাথনাথ বসুর 'বিদ্যালয় ও বালকদের গ্রন্থাগার' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করিবার কথা ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতির

দরুণ ইহা সভায় পঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয় এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া সভায় আলোচনা চলে।

শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'আমাদের কলেজ গ্রন্থাগার' নামক একটি প্রবন্ধ সভার বিবেচনার্থ উপস্থিত করিলে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কলেজের গ্রন্থাগারের প্রধান সমস্যাবলী সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া উন্নতিবিধায়ক পথের সন্ধান দেন।

বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবল, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, করপোরেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সত্যানন্দ রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। কলেজ ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজে যোগসূত্র স্থাপন, পুস্তক নির্বাচন, অবাধে গ্রন্থাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা, আকরগ্রন্থ হইতে তথ্য সরবরাহের বর্গীকরণ ও তালিকা প্রণয়নের কাজ এবং গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সম্পর্কেই প্রধানতঃ আলোচনা চলে।

বৈকালীন অধিবেশনে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ঢাকা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, দার্জিলিং, বগুড়া, জলপাইগুড়ি জিলাসমূহ হইতে প্রাপ্ত স্থানীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত মূল্যবান বিবরণ পাঠ করিয়া শোনান।

অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু 'গ্রামীণ ও ছোট সহরে গ্রন্থাগার' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে উপস্থিত সভ্য ও প্রতিনিধিবর্গ আলোচনায় যোগ দেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, গ্রন্থাগারের দুরবস্থা ও অসুবিধার কথা অকপটে ব্যক্ত করেন।

শ্রীওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে সম্মেলনের সাফল্যের জন্য যাঁহারা কাজ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। তিনি আশা করেন যে এই সম্মেলনে যে সকল করণীয়ের আভাষ পাওয়া গেল গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল তাহা যথাযথভাবে বিবেচনা করিয়া কাজে পরিণত করিবেন। তিনি জোর দিয়া বলেন যে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার এবং জিলা পৌরসভাযুক্ত সহরে জিলা পৌরসভা গ্রন্থাগার স্থাপনের অনুকূলে প্রবল জনমত গঠন করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে জিলায় জিলায় শাখা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইলে এই সম্পর্কে নিয়মকানুনও প্রণয়ন করা হয়। যে সমস্ত জিলায় শাখা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের নাম দেওয়া গেল।

১ হাওড়া—(সম্পাদক) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী।
২ দিনাজপুর ,, মহম্মদ হেমায়েৎ আলী, স্যার খাজা নাজিমউদ্দিন মুসলিম হল।
৩ নোয়াখালি ,, শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভৌমিক, নোয়াখালি টাউনহল পাবলিক লাইব্রেরী।
৪ পাবনা ,, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আনন্দ গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী।
৫ মালদহ ,, রায় পঞ্চানন মজুমদার বাহাদুর, মালদহ পাবলিক লাইব্রেরী।

৬	হুগলী—(অস্থায়ী সম্পাদক)		শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী।
৭	নদীয়া	,,	শ্রীঅনন্তকুমার মিত্র, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী।
৮	ফরিদপুর	,,	শ্রীপুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, করোনেশন পাবলিক লাইব্রেরী, গোপালগঞ্জ।
৯	বরিশাল	,,	রায় গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর, বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরী
১০	রাজশাহী	,,	রায় সাহেব ধরণীমোহন মৈত্র, রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরী
১১	ত্রিপুরা	,,	শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, কুমিল্লা।
১২	দার্জিলিং	,,	শ্রীসিংহ, হিমাচল হিন্দী ভবন।
১৩	বাঁকুড়া	,,	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কর, বিষ্ণুপুর পাবলিক লাইব্রেরী।
১৪	চব্বিশ পরগণা	,,	শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউট, বারাকপুর।
১৫	যশোহর	,,	কুমার গুরুক্রম মজুমদার, পাবলিক লাইব্রেরী, যশোহর।
১৬	খুলনা	,,	ডঃ অরুণচন্দ্র নাগ, ম্যাকফারসন লাইব্রেরী, বাগেরহাট।
১৭	বগুড়া	,,	শ্রীচৌধুরী, উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরী, বগুড়া।
১৮	বীরভূম	,,	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল, জুবিলী পাবলিক লাইব্রেরী, সিউড়ী।
১৯	কলিকাতা	,,	শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী, রামমোহন লাইব্রেরী।

সম্মেলনের শেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা ছিল একান্ন।

শ্রীপুর বেনেভোলেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রথম দুইটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

(১) এই সভা ভারতীয় ফুটবল সমিতিকে অনুরোধ করিতেছে যে দানের এবং জনহিতকর উদ্দেশ্যে যে টাকা দানের প্রতিযোগিতা দ্বারা ইহা তুলিয়া থাকে তাহার শতকরা কিছু অংশ যেন উক্ত সমিতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হস্তে অর্পণ করেন। (২) এই সভা সকল জিলা মণ্ডল এবং পৌরসভাকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন গ্রন্থাগারের জন্য অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন এবং এই অনুদান যে সকল গ্রন্থাগার সুসংগঠিত হইলেও কোন সাহায্য পায় না তাহাদিগকেই যেন মঞ্জুর করেন। (৩) অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক কলিকাতা শাখা স্থাপিত হইবে কিনা সেই সম্বন্ধে সভার মতামত জানিতে চাহিলে আলোচনান্তে স্থির হয় যে কলিকাতা শাখা যথারীতি স্থাপিত হউক। কলিকাতা ও অন্যান্য জিলা শাখা যথারীতি স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যক পন্থা অবলম্বনের জন্য কাউন্সিলকে ক্ষমতা দেওয়া হইল।

এই বৎসর কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়—সভাপতি, শ্রীতিনকড়ি দত্ত—সাধারণ সম্পাদক, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু—যুগ্ম সম্পাদক, শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক ও শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ

মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও গ্রন্থাগার আইন

সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ায় ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পর পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনসূত্রে এক বিশেষ তৎপরতা দেখা দিয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর দীর্ঘজীবন যাবৎ এক সুষ্ঠু বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আনয়নের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এবারের সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়ই ছিল— "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন : রূপরেখা।"— গ্রন্থাগার আইনের দাবী আমাদের মৌলিক দাবী এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এই সূত্রে ভারতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রথম প্রয়াস ও তার প্রয়াসীকে স্মরণ সময়োচিত বলেই মনে হয়। তার আরও একটি বিশেষ প্রয়োজন এই যে প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় অবিভক্ত বাংলায় আইন প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ কাজে তাঁকে যাঁরা বিশেষভাবে সহায়তা করেন তাঁদের মধ্যে ডঃ রঙ্গনাথনের ভূমিকা স্মর্তব্য। রঙ্গনাথনের লেখায় পাওয়া যায় যে, "I heard from the Rai Mahasai that he had applied for the Viceroy's permission to introduce the Bill into the Bengal Legislature. Though it turned out eventually that the permission was refused he has the credit of having been the first Indian legislator to give notice to Government of a Public Library Bill." সম্প্রতি কোন এক জায়গায় লেখা হয়েছে যে মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় আপার হাউসের সদস্য ছিলেন এবং আপার হাউসে অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপনের ক্ষমতা থাকে না বলে রায় মহাশয়ের বিলটি পাশ হয়নি। বস্তুতঃ উভয় তথ্যই ঠিক নয়। তবে শেষোক্ত তথ্যটি সম্বন্ধে বলা যায়, পরবর্তীকালের অনুরূপ এক প্রচেষ্টার সঙ্গে এর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয় একবার একটি বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন (১৯৫২) যেটি আপার হাউস সংক্রান্ত অসুবিধা থাকায় উত্থাপনের সুযোগ পায় নি।

কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বিল যথারীতি ব্যবস্থাপক সভায় আনীত হয়েছিল এবং ভোটে নাকচ হয়ে যায়। রায় মহাশয়ের ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ ইতিপূর্বে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "গ্রন্থাগার" (কার্তিক, ১৩৭৩)-এ তাঁর 'কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও গ্রন্থাগার আন্দোলন' প্রবন্ধে সংযোজিত করেছেন। প্রসঙ্গত ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ মনীষী কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের জীবনী এখানে সংক্ষেপে স্মরণ করা যাক।

হুগলীর অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ার এক খ্যাতনামা জমিদার পরিবারে মুণীন্দ্রদেব রায়-এর

জন্ম হয় ১৮৭৪ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে। মোগল আমল থেকেই উক্ত পরিবারের খ্যাতি। এই পরিবারেরই এক পূর্বপুরুষ রাজা রামেশ্বরকে রায় মহাশয় উপাধি দিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব (১৩৭৩)। প্রাচ্যবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়, টোল স্থাপন ইত্যাদি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা ঐতিহ্য বাঁশবেড়িয়া পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯২৮-৩৬ পর্যন্ত তিনি হুগলী মিউনিসিপ্যাল কনষ্টিটিউয়েন্সির প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। গ্রন্থাগার আইনের বিল প্রবর্তনে ব্যর্থ হলেও ইউনিয়ন বোর্ড, ডিষ্ট্রিক বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির বহু আইন কানুন তাঁর প্রচেষ্টায় সংশোধিত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে সুযোগ পেলেই তিনি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ক কিছু না কিছু বক্তব্য অথবা প্রশ্ন তুলতেন। এ প্রসঙ্গে রঙ্গনাথন লিখেছেন—"Not a session of the legislature would he allow to pass without raising the library issue in one form or another—it may be a cut motion, or a resolution or at least an interpellation."

দীর্ঘকাল তিনি বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। নিজ এলাকায় রাস্তা, পার্ক ইত্যাদির উন্নয়নের সঙ্গে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্যে ৪টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন সহ ১টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং দুটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁর উদ্যমের সাক্ষ্য আজও বিদ্যমান। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকাকালে তিনি অনেকগুলি জনহিতকর বিল প্রবর্তনে সক্ষম হন, তার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা বিশেষ অভিনব।

মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সাহিত্যচর্চাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দীর্ঘ ১৯ বৎসর "পূর্ণিমা" নামক মাসিক পত্রিকা তিনি পরিচালনা করেন। এ ছাড়া বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের মুখপত্র "কায়স্থ পত্রিকা" ও ইংরাজি দৈনিক "The Eastern Voice" এবং সাপ্তাহিক "The United Bengal" এর সম্পাদনা ভারও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে গ্রন্থাগার বিষয়ক দুইটি গ্রন্থ "গ্রন্থাগার" ও "দেশবিদেশের গ্রন্থাগার" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া "হুগলী কাহিনী", "সিংহলদ্বীপ", "দক্ষিণ ভারত", "উত্তর ভারত", "বেনারস-সারনাথ", "মথুরা ও বৃন্দাবন", "Current Problems", "Decadence of Rural Bengal", "History made by rivers", "Delhi—Past and Present", "Bansberia—Past and Present", "Saptagram", "Pandua—an ancient city in ruins", "Tribeni—a seat of ancient culture", "Bandel and its chequered history", "Hooghly under the Mughals"— ইত্যাদি তাঁর রচনাবলীকে সমৃদ্ধ করেছে।

সমাজ কল্যাণব্রতে তাঁকে আমরা নানাভাবে পাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদ ইত্যাদি বিদ্বৎসভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর ঐকান্তিক

চেষ্টায় ১৯২৫ এ Hooghly Historical Research Association এর প্রতিষ্ঠা হয়। স্থানীয় জেলার মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ তৎকালীন প্রধান প্রধান পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি চন্দননগরে Bengal Journalists' Conference (১৯৩৪) ও চুঁচুড়ায় Bengal moffusil Journalists' Conference (১৯৩৬)-এ পৌরোহিত্য করেন। শ্রীরামপুর টাউন হল, কোন্নগর ও বৈদ্যবাটীতে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে তাঁর ভাষণের পর আশু এক নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। বরোদার গ্রন্থাগার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গদেশে অনুরূপ আন্দোলনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। স্বর্গীয় সুশীল কুমার ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত, আসাদুল্লাহ সাহেব ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রমুখ কৃতী ব্যক্তিগণের সহায়তায় তাঁর আরব্ধ কার্যকরী রূপ নিয়েছিল। বাঁশবেড়িয়ার অন্যতম সুযোগ্য সন্তান তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের সহায়তায় তাঁরা ১৯২৫-এ হুগলী গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন করেন। উভয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একটি সার্ভে সেদিনের একটি বিস্ময়কর সফল প্রচেষ্টা।

১৯২৫ সনেই রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ও মুণীন্দ্রদেবের সহসভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠান পরে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ এবং পরিশেষে Bengal Library Association (১৯৩৩) এই নাম গ্রহণ করে। ১৯৩৩ হতে আমৃত্যু (২০ নভেম্বর, ১৯৪৫) তিনি পরিষদের সভাপতি ছিলেন (মধ্যে দুই বৎসরের বিরতি) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তাঁর রচনা দুটি "গ্রন্থাগার" (১৩৩৭) ও 'দেশবিদেশের গ্রন্থাগার' (১৯৩৮) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার হতে প্রকাশিত।

১৯৩০ এ সুশীলকুমার ঘোষ (পরিষদের প্রথম সম্পাদক) মহাশয়ের সহায়তায় ডঃ রঙ্গনাথনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক নানা সভা সম্মেলন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের সম্পর্ক ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

রায়মহাশয়ের প্রচেষ্টাতেই বাঁশড়িয়ায় বাংলার প্রথম গ্রন্থাগার শিক্ষণ প্রচেষ্টা রূপায়িত হয় (জুন ১৩৩৪)। এ বিষয়ে তাঁর সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইত। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে গ্রন্থাগারিকের কার্য শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে, বাংলা দেশে তাহার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সরকারও একেবারে উদাসীন ছিলেন। এই ঔদাসীন্য ঘুচাইবার প্রস্তাব করিলে তাঁহারা বলেন যে এখানে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের চাহিদা নাই। চাহিদা আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য ১৯৩৪ সনে আমরা বাঁশবেড়িয়ার নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থাগারের কর্মীদের লইয়া একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলি। তাহাতে দেখা যায় শিক্ষার্থীর অভাব নেই। সে কেন্দ্রের শিক্ষার ভার লন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।" (গ্রন্থাগার ২১৮ পৃঃ)। প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর মতই এই ব্যবস্থা পরবর্তীযুগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সের প্রস্তুতি পর্ব।

পাশ্চাত্য দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। স্বদেশেও অনুরূপ উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কারাবাসীদের ব্যবহারের জন্য জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরই আবেদনের ফলশ্রুতিতে সরকার এই খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া শিশু গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, হাসপাতাল গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ইত্যাদির পরিকল্পনা তাঁর মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। বিভিন্ন বক্তৃতামালার আশ্রয়ে তিনি জনমনকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি বক্তব্য—"স্কুল সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, আদৌ চিত্তাকর্ষক নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে একটি শিশু বিভাগ খুলিয়াছি—তাহার পরিচালনার ভার শিশুদের হাতে অনেকটা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফল অনেকটা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে। এই বিভাগ খুলিবার পর শিশুদের পুস্তক পাঠে অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছে।" গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে ব্যর্থ হলেও জেলা বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডে সংশোধিত আইনের বলে তাদের এলাকাভুক্ত গ্রন্থাগারে যথাশক্তি আর্থিক সাহায্যদানের প্রচলন তিনি করেন। বাংলা দেশে হুগলী জেলা বোর্ডই এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপক। গোঘাট ইউনিয়ন বোর্ডই সর্বপ্রথম এই সাহায্যদান করে।

প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বারা তিনি হুগলী জেলার সদর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমার গ্রন্থাগারগুলির কর্মী ও কর্মধারা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীবসু মহাশয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার পরিচালন সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছিলেন।

গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষণ প্রচলন অনুমোদনের জন্য নিয়োজিত সুপারিশ কমিশনের তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এছাড়া Public Libraries' Enquiry Commission এর তিনি সভাপতি ছিলেন।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তাঁরই আগ্রহে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে জেলার বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের চাঁপাডাঙ্গা (১৯৩৫) ও বর্ধমান (১০৪৪) এর অধিবেশনে তিনি পৌরোহিত্য করেন। ১৯৩৭ এ ঢাকা বিক্রমপুর গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৩৮ এ জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় ছাত্র সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন।

অবিভক্ত সারা বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যেমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তেমনি তদানীন্তন অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র ছিল। Indian Library Journal-এর সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২৭এ মাদ্রাজে All India Public Library Conference এ তিনি যোগদান করেন। তাঁরই আহ্বানে পরবর্তী সম্মেলন কলিকাতায় (১৯২৮) অনুষ্ঠিত হয়।

সারা ভারতে এক সুষ্ঠু শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর

অন্যতম সুহৃদ কে এম আসাদুল্লাহর (তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক) সহযোগিতায় কলিকাতায় প্রথম নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হয়। সভাশেষে নবগঠিত Indian Library Association-এর সহসভাপতি ও সম্পাদকরূপে যথাক্রমে মুণীন্দ্রদেব ও আসাদুল্লাহ নির্বাচিত হন।

১৯৩৪-এ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত All India Public Library Association, (বেজওয়াদা) সম্মেলনে তিনি পৌরোহিত্য করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষী তাঁর পূর্বসূরী। ১৯৩৫-এর এপ্রিলে All India Library Association (লক্ষ্ণৌ) এর দ্বিতীয় সমাবেশে যোগদানের পর তিনি স্পেনে দ্বিতীয় বিশ্ব গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের প্রথম প্রবক্তারূপে আমরা একমাত্র ভারতী প্রতিনিধি মুণীন্দ্রদেবকে পাই। সংবাদে প্রকাশ, "The only Indian representative Kumar Munindra Dev Rai Mahasaya, M. L. C. was accorded a cordial welcome on the opening day and he was the first speaker to speak on the Library movement in India which received high encomium from different quarters. The National Bibliotheas of Paris and Rome visited by the Kumar accorded him cordial reception. The Pope also gave him a special audience. (Modern Librarian, July 1935). সভান্তে তিনি ইউরোপীয় গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতির অভিলাষে গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালী পরিভ্রমণ করেন।

১৯৩৭ এ বিহার গ্রন্থাগার সম্মেলনে (গয়া) তিনি পৌরহিত্য করেন। ১৯৩৮-এ প্রতীচ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিদর্শন ও সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের ইচ্ছায় তিনি দ্বিতীয়বার সেখানে যান। স্বদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির আশায় তাঁর আশা ও উদ্যম সেদেশের জনমনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। সেদিনের সংবাদে প্রকাশ --"An interesting visitor to Liverpool at the moment is Kumar Munindra Deb Rai Mahasai a man who has done much to foster the growth of public libraries and school libraries in India. (Liverpool Daily Post. Wednesday, October 26, 1938).

চতুর্থ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ১৯৪৫-এর ২৫ ডিসেম্বর তিনি সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আকস্মিক অসুস্থতায় ভাষণ দানের পূর্বেই তাঁকে সভামণ্ডপ হতে অবসর গ্রহণ করতে হয়। এরপর রোগশয্যা হতে গ্রন্থাগারসেবীরূপে তাঁকে আমরা পাই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভা বা অন্যান্য করণীয় যা কিছু তাঁর রোগশয্যাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৪৫-এর ২০ নভেম্বর ভারত তথা বাংলার গ্রন্থাগার প্রেমিক মুণীন্দ্র দেবের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

গ্রন্থাগার আইন ও মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

21F, Rani Sankari Lane,
Kalighat, Calcutta.
27.1.1932

My dear Tincowri,

4 days have been alloted for non official Resolutions from 1st to 4th February next. My library enquary committee Resolutions being 2nd in the list will come up on the opening day. I have not as yet go ready my speech. If you have got any specially to urge please inform me. Some library literature are also necessary. Ranganathan's book may prove useful. Non-official member's Bills will be taken up on the 5th Government business including Government Bills will have 5 days from the 15th to 19th February. I have got six Bills for the session, which will be taken up on the 5th.

Trusting you are well.

Yours affly
Sd/- Munindra Deb Rai Mahasai.

উল্লিখিত পত্রটি বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দলিল। এরপরই আমরা ১৯৩২-এর ১ ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) Non-official Members' Business Resolutions এ মুণীন্দ্র দেবকে গ্রন্থাগার আইনের প্রস্তাবকরূপে দেখি। ইতিপূর্বে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে (গ্রন্থাগার: কার্তিক, ১৩৭৩) মুণীন্দ্র দেবের বক্তৃতা অনুবাদ করেছেন। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি না করে বর্তমানে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বিলটি উত্থাপনের শুরুতেই রায় মহাশয় সভা সমক্ষে এই প্রস্তাব আনয়ন করেন যে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে সরকারীভাবে এক কমিটি গঠনের জন্যও তিনি প্রস্তাব রাখেন।

(১) মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী;
(২) শিক্ষা অধিকর্তা, বাংলা;
(৩) রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, নসিপুর;
(৪) ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম. এ. ডি এল;
(৫) শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বার এ্যাট-ল;
(৬) মৌলবী আবদুল করিম;
(৭) খান বাহাদুর মৌলবী আজিজুল হক,

(৮) রেভঃ বি. এ. নাগ ;

(৯) স্তর ল্যান্সল্ট ট্রাভারস, কে. টি, সি আই. ই, ও. বি. ই ;

(১০) কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।

উক্ত কমিটির কার্যধারার উদ্দেশ্যও তিনি সভাসমক্ষে তুলে ধরেন। সামগ্রিকভাবে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে কমিটি ভবিষ্যৎ কর্মসূচীও নির্ধারণ করবে। বয়স্ক শিক্ষার কার্যসূচী সেদিনের সরকার গ্রহণ করেছিলেন। সেই কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ করে তুলতে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একান্ত কাম্য। জনসাধারণের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্নতা দূর করে এক সর্বাঙ্গীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করতে হলে গ্রন্থাগার আইন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

এরপর তিনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের (যথা গ্রেট ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর তথ্যবহুল বক্তৃতা শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বেই আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। সভাসমক্ষে তিনি এই প্রস্তাব রাখেন যে নিয়োজিত কমিটি তিনখানা পরে যে রিপোর্ট পেশ করবে তার ভিত্তিতে সরকার যেন গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে তৎপর হন।

রায় মহাশয়ের সেদিনের ভাষণ তথ্যবহুলতা ও সারগর্ভতার দাবী নিয়ে সভায় উপস্থিত হয়েছিল। উত্তরদানকালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু প্রধানতঃ সরকারের আর্থিক অসঙ্গতির উল্লেখ করে তিনি প্রস্তাবটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানান। রায় মহাশয় সরকারের বক্তব্যের পর তার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু সভার অপর সদস্য মৌলবী সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমীর প্রতিবাদে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। পরে সেটি ভোটে নাকচ হয়ে যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

(১) শ্রীসুধীরচন্দ্র দত্ত (স্বর্গত তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের পুত্র)

(২) শ্রীমতি প্রতিমা মৈত্র (বিধানসভা গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ)

(৩) কুমার বিনয়েন্দ্রদেব রায় মহাশয়।

Munindra Dev Rai Mahashai and Library Legislation

: Suchitra Ganguly

এই প্রসঙ্গে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বিধান সভায় প্রদত্ত গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কীত ঐতিহাসিক মূল ইংরাজী বক্তৃতা পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

Resolutions. [1st Feb 1932)

Non-Official Members' Business Resolutions

(On matters of general public interest)

DEVELOPMENT OF LIBRARIES

Munindra Deb Rai Mahasai : I beg to move that the Council recomends to the Government that a committee of inquiry be formed with the following members with powers to co-opt. library experts when required to inquire into the library provision in the Provlnce, to draw up a comprehensive scheme on future development and submit its report within three months :—

(1) The Hon'ble Minister of Education ;
(2) The Director of Public Instruction, Bengal ;
(3) Raja Bhupendra Narayan Sinha Bahadur, of Nashipur ;
(4) Dr. Naresh Chandra Sen Gupta, M.A.D.L ;
(5) Mr. Syamaprosod Mukherjee, Bar-at-Law ;
(6) Maulavi Abdul Karim ;
(7) Khan Bahadur Maulavi Azizul Haqque ;
(8) Rev. B. A. Nag,
(9) Sir Lancelot Travers, KT., C.I.E , O B.E., and
(10) Myself.

Mr. President, Sir, I should like to state the object I have in mind for moving this resolution. The purpose of the Committee of Inquiry is to ascertain the conditions under which the existing libraries were working and to discover the type of organisation which would most completely and adequately cover the field. The Committee will have to examine the question of adult education in all its aspects and if it succeeded in drawing up a comprehensive scheme, I believe our popular Minister of education will take it up in right earnest and will undertake legislation on his own initiative sound library service cannot develop without a logical and adequate law. Individual libraries may exist and flourish without authorisation of law but without an enabling Act, an assured troined administration and inter-library co-operation cannot be developed library laws have been enacted in almost all civilised countries of the world including the colonies and dominions under the British crown. Let me first take up the case of Great Britain. In October, 1924, Lord Eustace Percy, President of the Board of Education, confirmed the appointment of a committee, formed by he

predecessor, Mr. C. P. Trevelyan the object of which was to inquire into the adequacy of the library provision already made under the public libraries Acts, and the means of extending and completing such provision throughout England and Wales, regard being had to the relation of the libraries conducted under those Acts, and to other public libraries and to the general symtem of national education. The committee met 39 times. A questionnaire was issued to all public library authorities, both urban and county in reply to which immense amount of information was received and tabulated. The committee further took evidence from 52 witnesses representing library and municipal associations, educational bodies, librarians and individuals. They presented an almost unanimous report and in due course the recommendations are to be embodied in the law. Under the existing Act, library provision may be made by the councils of the counties, the city of London, Metropolitan boroughs, county boroughs who are the major authorities, each occupying independent territory ; but the councils of places not of ' county status, i.e., boroughs, urban districts and rural parishes may remain library authorities.

In South Africa by an Ordinance passed in 1836, the libraries were given the right to receive a free copy of every publications issued In Cape Colony. Provisional legislative authorities make grants to the libraries within their jurisdiction. In 1874, an Act was passed by the legislature of Natal for regulating literary and other societies not legally incorporated.

In Canada, under a general libraries Act of 1854, county councils were authorised to establish four classes of libraries : (1) libraries attached to each school for the use of children and ratepayers ; (2) a general public library available to all ratepayers in the municipality ; (3) professional libraries of books on teachihg etc., for teachers only ; and (4) a library in any public institution under the control of a municipality.

The Australian colonies have all passed seperate laws somewhat similar to those in force in other parts of the Empire. New South Wales, Queensland, Tasmania, New Zealand have got their own library laws embodying the libraries as part of the national system of education. I have just mentioned the progress of the library movement in the counties which form part of the British Empire only in the hope that a beginning should be made on similar lines.

It is needless for me to dilate on the marvellous progrese of

libraries in other parts of the world ; specially in countries tested by the fiery furnace of the great war. I should like to mention a few of them just to show how these war-worn countries are striving to raise the general level of intellectual life. Czechoslovakia for example, has under an Act, passed in 1919, established a whole net-work of libraries. The number of libraries has risen from 3,400 in 1920 to 16, 200 in 1926 The State grant for libraries amount to fifteen lakhs of rupees per annum In Poland there are 3.000 libraries and when the new library Bill now on the legislative anvil will be passed into law, about 15,000 libraries will come into existence In Finland, under the library Act of 1928, all libraries have been placed under the direction of a State library board with a Director of libraries under it. The 537 rural communes are now served by 1,000 libraries. The State grants 50 percent of the expenditure. Norway has sixty municipal and over one thousand rural libraries. Sweden has got 8,500 libraries which receives annually Rs. 15,00,000 from local bodies and Rs 3,75,000 from the State. Denmark has got the most carefully co-ordinated system of libraries possible. The system of inter library loan makes all the book resources of the nation available for a reader, no matter where he may live, and reduces the duplication of books to a minimum consistent with the library Act of 1920, which in a sense, nationalised the libraries of the country and placed their development and supervision in the hands of a State Library Director assisted by a strong Library Inspectorate. In Germany, Volksbucherein have spread rapidly and under the direction of Walter Hofmann of heipzig have been a strictly educative force, since every assistance is given to the reader to enable him to receive the material most appropriate for his development. The Fascist Government of Italy has appointed a Director General of libraries to enable him to receive the material most appropriate for his development. The Fascist Government of Italy has appointed a Director General of libraries to re-organise the library system of the country. Soviet Russia has resolved to liquidate illiteracy withjn 5 years and has established 46,759 libraries and is sending out 50,000 travelling libraries to countryside. In Bulgaria, the Minister of Education had a law enacted in 1928, which has resulted in rapidly increasing the number of Chitalistas, which are a sort of libraries combining the activities of a theatre, movies, social hall and libraries. In Yugoslavia, the Ministry of Education has established a special department of libraries. This department has already organised more than a thousand village libraries and nearly 700 courses of illiterates in which hundreds of men and women are learning to read and write. In spite

of the revolution, and dismemberment, the Minister of Education of Hungary inaugurated in 1923 an elaborate inquiry into the needs and means of effective popular education. As a result of the inquiry, an Adult Education Bill has been drafted. The third chapter of the Bill deals with the library movement and makes it obligatory for villages and towns to found libraries.

Adult education in the United States of America represents new tendencies and developments in educational theory and practice. It emphasises need desire, not age, as fundamental in education and seeks to impress in public consciousness the basic idea of continuous mind expansion and adjustment as necessary for personal growth and social progress. In Mexico, the Revolution of 1910, created aspirations for popular culture. A department of libraries under the Ministry of Public Education has been established in September, 1920, which has proved so successful that Maxico has now 1,500 public libraries, 1,000 school libraries, 800 industrial libraries and 500 rural libraries. The Department runs a bibliographical magazine entitled El libre yel pueble.

In Japan, an Imperial Rescript was proclaimed in 1872 to the effect that 'It is designed henceforth that Education shall be so diffused that there may not be a village with an ignorant family, nor a family with an ignorant member.' The first library law of Japan was passed in 1899. In 1926-27, there were 4,337 libraries in Japan. The library law is now being revised for the further expansion of libraries. In Palestine, China and in some other countries of the East the libraries continue to develop. Even in the Hawaiian Islands, library facilities are afforded to the smallest island having 15 only inhabitants. Now let us come back to India. Baroda leads the way in the development of libraries in the States. In the Punjab, the Government has thrown open all school libraries to the public at large and training in librarianship is given in the University library. Punjab contained 1,769 libraries in 1928. In four districts of the United Provinces circulating libraries have been experimentally created at the expense of the Government and the issue of books in boxes meet and stimulate a demand. Grants in aid are also liberally given to the public libraries in the Province. The Madras Government initiated the half grant system. Training in librarianship is given at the University library. In would have been a pleasant task for me if I had a good record to show for Bengal. I am sorry for my disappointment. It is unfortunate that the Government of Bengal happens to be the most backward province in India at least in library

matters. Apart from Calcutta, there is only one library in the province which is the recipient of state aid to the extent of Rs 25 a month. Comment on this is needless. The time has come for atonment for past omissions, and I hope, the proposed committee should see the dawn of a new era in the library development in this Province.

Now that the Primary Education Act so ably sponsored by our Education Minister, will come into force shortly, the time has come for us to think whether any provision was necessary to keep up the education to be given in these schools at a proper level or to supplement it by further study. If no such provision is made, we shall have to consider whether there was any risk of lapse to illiteracy. If that happened even partially, may I ask whether the money spent over their education would not be a sheer waste of public funds ? Was it not our bounden duty to guard not only against the lapse to illiteracy but to provide facilities within easy reach of one and all to further their knowledge at little or no cost ? It has been universally acknowledged that library is the only instrument which can be profitably utilised for the realisation of the high ideals of education. A library, if properly equipped and managed, will serve the purpose of an ideal University by itself. As to the risk of lapse to illiteracy, I should like to mention what happened in Rumania. Rumania, which had compulsory Elemenentary Education law from 1866, recently realised the futility and the wastage involved in having a scheme of compulsory education without making any provision side by side to supply the books that are necessary to keep up and give exercise to the literacy that is purchased at a heavy cost. As her finances are very poor, she induced her Astras and Atheneums to spread the library movement and threw open eight thousand and odd school libraries to the public at large. I hope the lesson of Rumania should not be lost sight when question of compulsory primary education will be taken into consideration.

We should remember that the people of any community are its greatest economic rest. Everything that conserves this human asset and helps to make it more productive and valuable, is of direct economic value to the community. Library is one of the most important public institutions for improving the economic value of the human asset. This economic value of the people is a very real one, even though we may not of the vastness of this human wealth in terms of rupees, annas and pies. As the betterment and expansion of this new instrument of adult education are essential for the raising of the electorate that I have brought this resolution for the formation of a

Committee of Inquiry to examine the library provision in this Province and to draw up a comprehensive scheme on future development which I commend for the acceptance of the House.

5-15 P.M

• **The Hon'ble Mr. KHWAJA NAZIMUDDIN :** It is well known in the members of this House what great interest my friend Munindra Deb Rai Mahasai takes in the spread, improvement and extension of libraries in Bengal. The speech which he has delivered just now will prove that he has taken great pains to collect relevant materials on the subject and there is no doubt that he is very keen and anxious that something should be done to bring about real improvement. But while acknowledging the importance of librarie, I should at the same time say that Government find themselves in a difficult position. Firstly. the policy of this Government, towards libraries, was explained in answer to a question of the mover of this resolution in which it was stated that so far as libraries were concerned, the Provincial Government were not directly and primarily responsible but that they relied on the generous public for financial support and extension.

And secondly, apart from, the question of policy, there is no doubt that at the present time, owing to financial stringency, it will not serve any useful purpose to appoint a committee as proposed by the mover. To begin with, the money to be spent on this committee will be difficult to find. As has been stated by my colleague the Hon'ble finance member, on the resolution just disposed of. Government would avoid. Secondly, supposing for argument's sake that we have a committee and we accept their recommendations, I am afraid their recommendations cannot be given effect to in the near future. In two or three years' time the problems that face the committee now will change.

The mover of the resolutions has called attention to the fact the Primary Education Act has been passed and the Government should now make some provision for libraries, so that the boys who are taught in these primary schools may not relapse into illiteracy. It is quite true, but so far the Act has not been brought into operation and we have got to wait and see haw we should tackle this question of lapsing into illiteracy of those who pass out from these primary schools. Therefore I submit that if a committee is appointed at the present time their conclusions may be different from the conclusions that may be arrived at by another committee is appointed at the three or four years

hence. Therefore I would ask to mover to consider whether it will be to the interest of the Province at the present moment to appoint a committee when everyone, both inside this council and outside, agree that we cannot find the money necessary to give effect to the recommendations of that committee. I would accordingly request the mover to withdraw the resolution, because the committee will not be able to any very effective work.

MUNINDRA DEB RAI MAHASAI : After hearing this explanation of the financial position of Government, I would like to withdraw my resolution.

The question that leave be given to Munindra Deb Rai Mahasai to withdraw his resolution was put but as Maulvi Syed Jalaluddin Hashmey objected to leave being given, it was put to the vote and lost.

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী

গীতা মিত্র

উনবিংশ শতাব্দীতে নবম সংস্কৃতির ভাববন্যায় প্লাবিত বাংলা দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের যে উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, বর্তমানের বহু সুবিখ্যাত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বীজ প্রোথিত হয় সেদিনের সেই উর্বর মৃত্তিকায়। তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীও সেই সব প্রতিষ্ঠানের একটি। শিক্ষা ও সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে আধুনিকতা আনমনের যে প্রচেষ্টা সেদিন সুরু হয়েছিল, তার ঐতিহ্যময় ইতিহাস অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতনই তালতলা সাধারণ গ্রন্থাগার বহন করে নিয়ে চলেছে। নবজাগৃতির আদর্শকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, সেই আন্দোলনে সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তালতলার পল্লীবাসীরা। তাঁদেরই আগ্রহ ও কর্মপ্রচেষ্টায় আজ থেকে ৮৮ বৎসর আগে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৭৯ খৃঃ প্রমথ নাথ মিত্র তালতলা পল্লীবাসীদের গ্রন্থ পাঠের অভাব দূর করবার জন্য ঐ অঞ্চলে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনে প্রয়াসী হন। তাঁরই উদ্যোগে এক জনসভা আহুত হয়। সর্বশ্রী তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি রায়, অতুলচন্দ্র লাহা, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতে এই সভায় গ্রন্থাগারের জন্য একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়। এই ধনভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থে মাত্র ৫০/৬০ খানি গ্রন্থ কিনে এই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। প্রথম এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হয়। পরে স্থানাভাব বশতঃ তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গৃহেই কয়েকজন গ্রন্থাগার অনুরাগী যুবক ও তারকনাথবাবুর অক্লান্ত সাধনায় গ্রন্থাগার ক্রমেই বড় হতে থাকে এবং ১৮৮২ খৃঃ আনুষ্ঠানিকভাবে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী এই নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় পাঠাগারের কর্মসচিব ছিলেন তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র ঘোষ ছিলেন গ্রন্থাগারিক। পল্লীর বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের সক্রিয় সাহায্যে পাঠাগারটি ক্রমশঃ উন্নত হতে থাকে। ১৮৮৭ খৃঃ-এর বার্ষিক অধিবেশনে 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে গ্রন্থাগারে গ্রন্থের স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য যে অভিযান সুরু হয় তাতে গ্রন্থাগারের সঙ্গে আজীবন জড়িত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গলী পত্রিকা", নরেন্দ্রনাথ সেন "ইণ্ডিয়ান মিরর" এবং অন্যান্যরা বহু গ্রন্থ বিনামূল্যে গ্রন্থাগারে দান করেন। ১৮৯৪খৃঃ এ 'বসুমতী' ও 'হিতবাদী'ও গ্রন্থাগার বিনামূল্যে পেতে থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে তালতলা গ্রন্থাগার তার গ্রন্থভাণ্ডার, পাঠক সমষ্টি নিয়ে এবং শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কীয় বিবিধ কার্যাবলী অনুসরণ করে, সমাজে একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান রূপে পরিগণিত হয়। ১৮৯৪খৃঃ এখানে মহাকালী পাঠশালা নামে

একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২/১৩ বৎসর এই শিক্ষালয় চালু ছিল। সাহিত্য চক্র বা আলোচনা সভাও এখানে আয়োজিত হত। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ তাও উঠে যায়।

গ্রন্থ ও পাঠকের আয়তন বৃদ্ধিতে গ্রন্থাগারের স্থানাভাব দেখা দেয় এবং তখন গ্রন্থাগারের একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নীলমণি মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র রায় প্রভৃতির চেষ্টায় বারশত টাকা সংগৃহীত হয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণও অর্থ সাহায্য করেন। পল্লীবাসীদের অনুরোধে নরেন্দ্রকুমার মহাশয়, মাসিক মাত্র ১৲ ভাড়ায় এক খণ্ড জমি প্রদান করেন এবং গ্রন্থাগারের জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণের অনুমতি দেন। ১৯০১-১৯১২খৃঃ পর্যন্ত পল্লী-বাসীদের প্রবল উৎসাহে, বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগারের নিজস্ব একতলা বাড়ী তৈরী হয়। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমানশীল গ্রন্থাগারের এই গৃহেও পুনরায় স্থানাভাব হয়। এইজন্য ১৯৪৩খৃঃ একটি গৃহনির্মাণ-তহবিল খোলা হয়। ১৯৪৪খৃঃ উমাচরণ সাহা, অভয়চরণ সাহা ও পাঁচুকালী সাহা, পাঠাগারের জমিটি ক্রয় করে গ্রন্থাগারকে দান করেন। অতঃপর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং যুবকদের নিরবিচ্ছন্ন সাধনায় ১৯৫৭ খৃঃ বর্তমান দ্বিতল গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। এই কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন, সর্বশ্রী বিজয় সিংহ নাহার, বিনয়লাল ঘোষ, অমূল্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। দুইদিনব্যাপী গৃহপ্রবেশ উৎসবে গ্রন্থাগার বিষয়ক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। শিশু সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সভাপতিত্বে মুকুল বিভাগের রজত জয়ন্তী উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে তালতলা গ্রন্থাগার তার সার্থক পরিণতির পথে একটির পর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকে। গ্রন্থাগারকে শুধু বই লেনদেনের কেন্দ্র না করে, এটি যাতে শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হতে পারে তার চেষ্টা সুরু হয়। ১৯২৮খৃঃ থেকে সারস্বত সম্মেলন নামে এক আলোচনাচক্রে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৩২খৃঃ এই সারস্বত সম্মেলনই বিখ্যাত কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে রূপায়িত হয়। বেশ কয়েক বৎসর, সামান্য সামর্থ ও অর্থ নিয়ে বিপুল আগ্রহে এই সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮খৃঃ পাঠাগারের হীরক-জয়ন্তী উৎসবে ইহার পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু বছর দশেক চলার পর অর্থাভাবে ও লোকাভাবে এর অকাল মৃত্যু ঘটে। এ কথা অনস্বীকার্য যে এই প্রচেষ্টা প্রতিটি গ্রন্থাগারকে এক বিশেষ কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলী সঙ্কেত করছে, এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সকল প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

১৯৩২ খৃঃ তালতলা গ্রন্থাগার আর একটি সমাজ কল্যাণব্রতে ব্রতী হয়। এই সময় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগারে এক শিশু বিভাগ খোলা স্থিরীকৃত হয়। মাত্র ১০০ খানি গ্রন্থ ও একজন ম াত্রবালিকাসভ্যা নিয়ে এই বিভাগের পত্তন হয়।

১৯৫০ খৃঃ এই বিভাগের নাম রাখা হয় মুকুল বিভাগ। বর্ত্তমানে এই বিভাগে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় উপযুক্ত শিক্ষাদাতার তত্ত্বাবধানে নানাবিধ হস্তশিল্প ও চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে মুকুল শিল্পীদের পারদর্শী করা হচ্ছে। প্রতি বছর এই শিশুশিল্প প্রতিভার এক প্রদর্শনীর আয়োজন হয় এবং শিল্পসম্ভার বিক্রীও করা হয়। ১৯৫৭ খৃঃ ৬৮টি মহিলা সভ্যা ও ২৫০টি গ্রন্থ নিয়ে মহিলা বিভাগও খোলা হয়।

১৯১০ খৃঃ গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য একটি খসড়া আইন তৈরী হয়। আজও সেই আইনেই গ্রন্থাগারটি পরিচালিত। মূলতঃ গ্রন্থাগার অনুরাগী স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারাই গ্রন্থাগারটি পরিচালিত। সামান্য মাসহারা নিয়ে এখানে চারজন কর্মী আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন। শিশুদের হাতের কাজ শিক্ষাদানের জন্য একজন বেতনভুক শিক্ষক আছেন। কর্মীর স্বল্পতা গ্রন্থাগারের কর্ম প্রসারে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করছে। গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলী গ্রন্থাগারের সভ্য/সভ্যাদের দ্বারা নির্বাচিত। ১৩৫৭ খৃঃ এখানে একটি অছিমণ্ডলী তৈরী হয়। এ ছাড়াও, পুস্তক নির্বাচন সমিতি ও শিশুবিভাগ পরিচালক সমিতি আছে। বিভিন্ন সময় বিখ্যাত ব্যক্তি গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক, অছিমণ্ডলীর সদস্য; পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ইত্যাদি নানাভাবে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সর্বশ্রী বি, এস কেশবন, হুমায়ুণ কবীর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পঙ্কজ গুপ্ত, বিনয়লাল ঘোষ ইত্যাদি ব্যক্তিগণ গ্রন্থাগারকে গৌরবান্বিত করেছে। বর্ত্তমানে সর্বশ্রী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ সরকার, পঙ্কজ গুপ্ত, পাঁচুকালী সাহা ইত্যাদি পৃষ্ঠপোষক, শ্রীবিজয় সিংহ নাহার সভাপতি, সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি সহ-সভাপতি, অপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায়, কর্মসচিব, এবং শিবাঙ্কর নাগ গ্রন্থাগারিক আছেন। গ্রন্থাগারটি সকালে সাড়ে ৬টা থেকে ৮টা, রাত্রে ৭টা থেকে ৯টা, এবং শিশু বিভাগ বিকালে সাড়ে ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রতি সোমবার গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। গ্রন্থাগারে চাঁদার হার ৮০ পয়সা, শিশু বিভাগ ২৫ পয়সা। জমা চার টাকা, পাঁচ টাকার বেশী মূল্যের বই নিতে হলে বই এর মূল্য অনুপাতে অতিরিক্ত টাকা জমা দিতে হয়। রিডিং রুম ব্যবহারের জন্য কোন বাধা নেই। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ, কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান ও কলিকাতা জিলা সমাজশিক্ষা অধিকর্ত্তা পাঠাগারে অর্থ সাহায্য করেন।

১৯৫৭ খৃঃ পাঠাগার যখন নিজস্ব বাসগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর সভ্য সংখ্যা ছিল ৫৮২, মুকুল বিভাগে ২২৩, মহিলা বিভাগে ৭০। বর্ত্তমানে সাধারণ বিভাগে ৯২০, এবং মুকুল বিভাগে ৫৪০। প্রায় ১৫০ জন এককালীন ১০০ টাকা দিয়ে আজীবন সদস্য।

বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থরাজি পাঠাগারের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। যামিনীকান্ত সেনের আন্তর্জাতিক রূপতন্ত্র, অমরেশ্বর ঠাকুরেণের ও নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থের বাল্মীকীয়ং রামায়ণম। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভাগত ও পুরাণ সংগ্রহ মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত) ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ। মাত্র ৬০

খানি গ্রন্থ নিয়ে যে গ্রন্থাগার তার জীবন সুরু করেছিল ; ১৯৫৭ খৃঃ তার গ্রন্থসম্ভার ১৪২৮০, বর্ত্তমানে প্রায় ২৩ হাজার। শিশু সাহিত্যের সংখ্যা ৪ হাজারেরও অধিক। গবেষকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধুনা অপ্রচলিত বহু বিখ্যাত সাময়িক পত্র গ্রন্থাগারটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। কয়েকটি সাময়িক পত্র গ্রন্থাগারটি বিনামূল্যে পেয়ে থাকে। গ্রন্থভাণ্ডারে সংগৃহীত গ্রন্থের ১৯৬২ খৃঃ পর্য্যন্ত মুদ্রিত তালিকা আছে। অর্থাভাবে নতুন কোন তালিকা প্রকাশ্য সম্ভব হয়নি। তবে নতুন বই এর একটি হস্তলিখিত তালিকা, পাঠকদের সুবিধার্থে নিয়মিত রাখা হয়।

অর্থাভাব ও লোকাভাব গ্রন্থাগারটির মহান দায়িত্বে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছে। পূর্বের সাহিত্য সম্মেলন ও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠান এখন বন্ধ। মাত্র গুটি কয়েক বিশেষ অনুষ্ঠান ও বিখ্যাত মহাপুরুষের জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়েই গ্রন্থাগার তার কর্ত্তব্য সীমিত করতে বাধ্য হয়েছে। তবুও রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে যে সব আলোচনা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা সত্যই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে এই সময় প্রকাশিত "রবীন্দ্র স্মরণিকা" যে কোন গ্রন্থাগারের একটি মূল্যবান সংগ্রহ বলে পরিগণিত হবে। এই স্মরণিকায় রবি মিত্র, রাজ্যেশ্বর মিত্র, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন। সুশীল রায় গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাষায় ''শত বার্ষিক'' রচনায় লিখেছেন," আজি হতে শতবর্ষ পরে যদি রবীন্দ্রনাথের দ্বিশত বার্ষিক পালিত হয় তবে হয়তো প্রথম শত বার্ষিকের মত ঘটা তাতে থাকবে না, থাকবে ঘট—মঙ্গল ঘট। সেই শতবর্ষ পালন যারা করবে তাদের আমরা ঈর্ষা করি।" সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে, রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রালোচনা। কলকাতায় অনেক বৃহৎ গ্রন্থাগারে, অনেক উচ্চ বেতনে দক্ষ, কুশলী কর্মীবৃন্দ আছেন, কিন্তু এই ধরণের একটি রচনা-নির্ঘণ্ট তাদের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এটা গভীর দুঃখের বিষয়, স্বল্প শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে অর্থাভাব থাকা সত্ত্বেও, একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ; গ্রন্থাগার বৃত্তির মহান দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে, অথচ বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলি প্রচুর অর্থ ও লোকবল নিয়েও গ্রন্থাগার বৃত্তির আদর্শকে সার্থক করতে পারছে না। পরিশেষে, তালতলা সাধারণ গ্রন্থাগারের ৮৮তম জন্ম জয়ন্তীতে তার সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে, এই আশা করি যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম শরিক হিসাবে, গ্রন্থাগার বৃত্তিকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে, এই গ্রন্থাগার যেন অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে অনুপ্রাণিত করে।

Taltala Public Library
: Gita Mitra

কেন অবহেলিত ?

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়]

সম্পাদক সমীপেষু,

আমার স্বামী একজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। তিনি গত মে মাস থেকে বেতন পাননি। এমনকি গত ১৩।১।৬৯ তারিখ হইতে ১১।৩।৬৯ তারিখ পর্য্যন্ত Medical Leave-এর সমস্ত নথিপত্র দেওয়া সত্বেও তিনি তাঁর বেতন ও ভাতা পাননি। আমার স্বামীর মত বহু গ্রন্থাগার কর্মী আজ তিন চার মাসের বেতন পাননি। সেখানে সরকারী কর্মচারীরা (কেরাণীগণ) মাসের ১লা তারিখে বেতন পেয়েও মাসের শেষ সপ্তাহে দোকানদারের কাছে নতুন বন্ধুবান্ধবের দ্বারস্থ হতে হয়, সেখানে আমার স্বামীর মত ন্যূনতম বেতনের কর্মচারীরা ৩।৪ মাসের বেতন না পেলে কিরূপ দুরবস্থা হয় একবার চিন্তা করে দেখুন ? দোকানদাররা, অন্যান্যরা তবু সরকারী কর্মচারীদের ধার দেয় ২রা তারিখে টাকা পাবার আশায়। কিন্তু আমাদের স্বামীদের কোন তারিখের আশায় ধার দেবেন ? আমার স্বামী মাহিনে পেলে টাকা দেবো বলে দোকানদারের কাছে খাদ্য সামগ্রী চাইতে গেলে দোকানদার তাঁকে কটু কথা শুনিয়ে দেয়. বন্ধুবান্ধবের কাছে কয়েকটা টাকা ধার চাইতে গেলেই তাঁরা নেই বলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যান, যথা সময়ে ছেলে মেয়েদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আনতে না পারলে তাঁকে আমারও গজগজানী শুনতে হয়। যথা সময়ে বেতন না প্াওয়ার ফলেই শুধু আমার স্বামীকে নয়, আমার মত শত শত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীকেও ঐরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। ইহার কারণ কি ? শোনা যায় সরকারী আইনের জন্যই নাকি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীরা যথা সময়ে বেতন পাননি—আইনের জন্যই নাকি তাঁরা দশ বারো বছর চাকরী করার পরও স্থায়ীত্ব পাননি—আইনের জন্যই নাকি তাঁরা সব রকমের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাহলে বলি, যে আইনে কারোর কোন কল্যাণ হয় না, তবে সে কিসের আইন ? যে আইনের ফলে নিজ আত্মীয়ের কাছে, দোকানদারের কাছে, বন্ধুবান্ধবের কাছে তথা সমাজের কাছে তাঁদের নিপীড়িত ও অবহেলিত হতে হয় সে আইন তো সরকারী আমলাগোষ্ঠীদের, ঘৃন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের।

সুতরাং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তথা পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের-মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার সবিনয় নিবেদন, ঘৃন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের, সরকারী আমলাগোষ্ঠীদের ঐ ভুয়া আইনকে কবর দিন। অবিলম্বে অবহেলিত নিপীড়িত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও ভাতা মিটিয়ে দিন। অবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আইন চালু করুন।

শ্রীমতী মায়ারাণী খাঁড়া
গ্রাঃ ও পোঃ—ওয়াদিপুর
জেলা—হাওড়া

১১।৮।৬৯

গ্রন্থ সমালোচনা

Kalyan Kumar Banerjee. INDIAN FREEDOM MOVEMENT REVOLUTIONARIES IN AMERICA. Calcutta, Jijnasa, 1969. III-P. Price Rs. 10·00

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বেশ বড় একটি অংশ বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে নানা আকারে গড়ে উঠেছিল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তারই একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন। নাম থেকেই বইটির বিষয় বোঝা গেলেও প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জার্মান-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র নামে খ্যাত মামলা, ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে গোপনে অস্ত্র আমদানির প্রয়াস এবং সমসাময়িককালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়দের স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামী কর্মতৎপরতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় বইটির ন'টি পরিচ্ছেদে। উক্ত ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম জড়ানোরও একটি প্রসঙ্গ আছে।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের জীবিকাসূত্রে আগমণ ও বসবাস, কোমাগাটামারু নামে খ্যাত সশস্ত্র সংঘর্ষের বিবরণ সহ লেখক গদর পার্টির সূত্রপাত (১৯১৩) ও তার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বহু ব্যক্তির অল্পবিস্তর বৃত্তান্ত বইটিতে পাওয়া যায়। প্রথম সারির নেতৃবর্গের মধ্যে বিশেষ করে হরদয়াল ও রামচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রকাশিত ভিন্ন গ্রন্থাদিতে অনেক ব্যক্তি ও ঘটনার কথা যা জানা যায় তা বইটিতে না পাওয়ায় কিছুটা নিরাশ হতে হয়েছে।

গদর পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের নাম অনুল্লিখিত রয়েছে কেন তা বোঝা গেল না। উত্তরকালে যে দলটি গদর পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে তার নাম ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ। যুগান্তর আশ্রম নামক একটি সংস্থার কথাও জানা যায়। কালিফোর্নিয়ায় তিনজন বাঙালী যুবকের (তারকনাথ দাস, খগেন্দ্রচন্দ্র দাস ও অধরচন্দ্র নস্কর) সহায়তায় খানখোজে উক্ত সংঘের পত্তন করেছিলেন (১৯০৭)। এ বিষয়ে রাউলাট কমিটির রিপোর্ট (১৯১৭) কোনো কোনো তথ্যাভিজ্ঞ মহলের কাছে প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হয় না। বইটিতে সত্যেন সেন, মোহন সিং গ্রন্থী, ধনগোপাল মুখার্জি, আনন্দ কুমার স্বামী প্রমুখ ব্যক্তির কথাও কিছু জানা যায় না। শেষোক্ত দুজনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য না হলেও স্বনামধন্য ধনগোপালের সঙ্গে সমসাময়িককালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যানার্কিষ্টদের সংযোগ ও কুমার স্বামীকে ন্যাশন্যাল কমিটি ফর ইণ্ডিয়ান ফ্রিডমের সভাপতি (১৯৩৮) হিসেবে জানা যায়। প্রামাণ্য তথ্যাদির অভাবেই হয়তো এঁদের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়নি। অবশ্য বইটি যে নির্দিষ্ট বিষয় ও সময়েরই; এবং পূর্ণাঙ্গ যে নয় সেকথা লেখক প্রথমেই বলেছেন।

বহু পরিশ্রম ও যত্নে লিখিত এই গবেষণামূলক বইটিতে লেখক প্রচুর দুর্লভ দলিল ও তথ্যাদির উল্লেখপঞ্জি যুক্ত করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে উৎসুক পাঠক ও গবেষকদের কাছে একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বইটি সমাদর লাভ করবে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত মুক্তি সংগ্রামীদের কয়েকটি প্রচারপত্র ও দুষ্প্রাপ্য যন্ত্রের আলোকচিত্র এই বইটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। বইটির পশ্চাতে প্রদত্ত নির্ঘণ্টের বিন্যাস অপটু হস্তের পরিচয় দেয়।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বিয়োগ পঞ্জী

হুমায়ুন কবীর

বিগত ২৮শে আগষ্ট অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের আকস্মিক জীবনাবসান একটি শোকাবহ ঘটনা। রাজনীতির অন্তরালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কবীর সাহেবের বৈচিত্র্যময় জীবন ও অবদান স্মরণীয়। কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রচিন্তা—প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা সুবিদিত। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে তাঁর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউনোস্কোর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব পালনের ব্যবস্থা, রবীন্দ্র রচনাবলী ও বিবেকানন্দ রচনাবলী প্রকাশ করা, ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'টেগোর লেকচারারের' পদের সৃষ্টি, ভারতের বাইরে ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার ব্যবস্থায় তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিভিন্ন আকাদেমীর ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি সমধিক আগ্রহী ছিলেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া যেত। প্রায় বছর দশেক অগে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য্যালয় পরিদর্শন করেন। তাঁরই চেষ্টার ফলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বছরে দু হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। পরে এই অনুদানের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কে পি টমাস

বিখ্যাত সাংবাদিক কে পি টমাস আকস্মিকভাবে ২রা আগষ্ট পরলোকে গমন করেছেন। তিনি "হোশ" এই ছদ্মনামে সুপরিচিত। ১৯০৩ খৃঃ ত্রিবাঙ্কুরে তাঁর জন্ম হয়। ছেলেবয়সেই তাঁর সাংবাদিক প্রতিভার উন্মেষ দেখা যায় The students' নামক পত্রিকা সম্পাদনে। তার পর তিনি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় যোগদান করেন এবং মৃত্যু কালেও তিনি স্বদেশ থেকে এই পত্রিকায় লিখতেন। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের পর তিনি অমৃত বাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ অথচ সরস পর্যালোচনা ও মন্তব্যের জন্য তিনি পাঠক মহলে খুবই প্রিয় ছিলেন। ১৯৫৭ খৃঃ তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন।

সতীন্দ্রনাথ লাহা

বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পূজারী সতীন্দ্রনাথ লাহা বিগত ২২ আগষ্ট পরলোক গমন করেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতায় শ্রীলাহার জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা সাহিত্যে এম, এ, ডিগ্রী পাওয়ার পর তিনি চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি থাকলেও তিনি শিশু সাহিত্যিক হিসাবে শিশুদের

নিকট প্রিয়। 'শকুন্তলা' নামে তাঁর একটি চিত্র-গ্রন্থ আছে এবং শিশু মাসিক পত্রিকা 'পাঠশালার, তিনি সম্পাদক ছিলেন।

বিনয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ৩০শে জুলাই শিশু সাহিত্যের সুপরিচিত গ্রন্থকার, ও অবিভিক্ত বাংলার, ঢাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তিনি কয়েক বছর শিশু মাসিক পত্রিকা শিশু সাথী ও বার্ষিক শিশুসাথীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন।

মকতুম মহিউদ্দিন

ভারতের প্রখ্যাত উর্দু কবি জনাব মকতুম মহিউদ্দিন ২৫ আগষ্ট নয়া দিল্লীতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। জনতার সংগ্রাম, দুঃখ-বেদনা, প্রেম ও বিচ্ছেদ, তাঁর কাব্যে প্রতিটি ছন্দ ও ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে বলে, তাঁকে "জনগণের চারণ-কবি"—এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ফাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রামে মকতুম এর লেখা "জঙ্গে আজাদী" সহ তাঁর বহু কবিতা ও গান সংগ্রামী মানুষের কণ্ঠে সর্বদাই ফেরে। তাঁর লেখা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা সহ রাশিয়ান এবং ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৫২ খৃ তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্য বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে কবি হিসাবে তিনি যোগদান করেছিলেন।

আনন্দীরাম দাস

আসাম সাহিত্য সভা কর্তৃক অভিহিত গীতিকাব্য রাজ্যের রাজপুত্র শ্রীযুক্ত আনন্দীরাম দাস গত ৪ঠা আগষ্টে গৌহাটিতে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। ১৯০৯ খৃ অক্টোবরে তাঁর জন্ম হয়। অসমীয়া লোক কাব্য-গীত-ও লোক নৃত্যে তাঁর অবদান আসামের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বরোগীত সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান গবেষণা, তাঁকে এই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসনে স্থান দিয়েছে। তাঁর প্রকাশিত 'বিরহী' ও 'সুরনির্ঝর' গীতকাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মহম্মদ হেমায়েত আলী

গত ১৩ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর শহরের লালবাগে নিজ বাসভবনে দীর্ঘ তিন বৎসর রোগ-ভোগের পর পাকিস্তানের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রনায়ক মোঃ হেমায়েত আলী ৭৪ বৎসর বয়সে ইহ জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই সংবাদে আমরা গভীর বেদনা বোধ করছি। মোঃ হেমায়েত আলী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রবীন মফঃস্বল সাংবাদিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক 'নওরোজের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং প্রদেশের অন্যতম বৃহৎ পাঠাগার খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল ও লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা, আজীবন অবৈতনিক সম্পাদক, পাকিস্তানের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রনায়ক। তাঁর

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পাকিস্তানের নাজিমুদ্দিন হলের নতুন অডিটোরিয়ামের নামকরণ হয় 'হেমায়েত আলী হল'। আলহাজ্ব মোহাম্মদ হেমায়েত আলী তমঘায়ে খিদমত ইংরাজী ১৮৯৫ সালে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমাধীন আটোয়ারী থানার নলপুকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে জনাব আলী কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ লাইব্রেরী সমিতির সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন।

ডাঃ হো চি মিন

It is your body which is in prison not your mind……(Prison Diary)

১৯৪২ খৃঃ মহান নেতা হো চি মিনের দেহ ছিল চীনের বন্দীশালায়,—মন ছিল মুক্ত। কিন্তু আজ মহাবিপ্লবীর দেহ ও মন উভয়ই মর জগতের সকল বন্ধন মুক্ত করে অমর লোকে চির শান্তি লাভ করেছে। পরাধীনতার ঘন তমশায় আচ্ছন্ন ভিয়েতনামকে স্বাধীনতার প্রজ্জ্বলিত আলোকে উদ্ভাসিত করে, আলোক-দিশারী স্বদেশবাসীকে দিয়েছেন মুক্ত ও সুখী জীবনে সমানভাবে বাঁচার অধিকার। সংগ্রামী জননেতার বিরাট কীর্ত্তিময় জীবন উত্তর ভিয়েৎনামের নবযুগের ইতিহাস রচনা করেছে। ইতিহাস স্রষ্টা সে ইতিহাস রেখে গেছেন ভাবীকালের উত্তরাধিকারীদের জন্য। স্বাধীনতার বিজয় উৎসব মুহূর্তে ১৯৪৫ সালে তিনি সর্বপ্রথম তাঁর অভিভাষণ দিয়েছেন। এরূপ কোন বিশেষ সময়ে অন্য কোন দেশের কোন নেতাই জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী শিশুদের জন্য উৎসর্গীত করেন নি। সত্যানুসন্ধানী হো চি মিন তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে, যে সত্যকে বিশ্ববাসীর সামনে উন্মেষিত করেছেন, বিশ্বে সাহিত্যের জগতে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর কতিপয় রচনার মধ্যে ১৯১৭ সালে ফরাসী পত্রিকায় লেখা 'Reminiscences of an exile,' 'Bamboo Dragon' নাটিকা, ১৯২২ খৃ 'Le Paria' পত্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে তাঁর তীব্র আক্রমনাত্মক প্রবন্ধাবলী ও বিদ্রূপাত্মক রচনা "Zoology", ১৯২৬ খৃঃ প্রাভদায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, 'The Black race' পুস্তিকা, ১৯২৬ খৃঃ The Road to Revolution' ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্মণীয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ "Prison Diary"—যেখানে সত্যদ্রষ্টা কাব্যের ঝঙ্কারে সার্বজনীন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন—"Good, evil……no one is either by nature. It is what you become, mainly through upbringing" এইভাবে তিনি শাশ্বত সত্যকে আমাদের সামনে উন্মেলিত করেছেন আজ তার চিরবিদায়ের দিনে আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কসবা সাধারণ পাঠাগার। ২৫৭, বি, বি, চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৪২।

গত ১৩ই জুলাই "আলোর পরশের" নূতন ভবনে কসবা সাধারণ পাঠাগারের ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসচিব শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় পাঠাগারের বিগত বৎসরের কার্য বিবরণী পাঠ করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। এই পাঠাগারের বর্তমান সভ্য সংখ্যা ৩৭১ জন। পাঠাগারের তালিকাভুক্ত পুস্তকের সংখ্যা মোট ১০৪৭৮ খানি। এই পাঠাগারের পরিচালনায় "আলোর পরশ" নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ উন্নতির পথে। পাঠাগার পরিচালিত অন্য একটি প্রতিষ্ঠান হল মহিলাদের ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র নামে একটি সূচী শিক্ষা বিদ্যালয়। কোষাধ্যক্ষ শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায় সাধারণ সভায় বিগত বৎসরের এবং আগামী বৎসরের (প্রস্তাবিত) আয় ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত সভ্যদের লইয়া ১৯৬৯-৭০ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে।

সর্বশ্রী শীতাংশু ভূষণ মিত্র (সভাপতি), সুকুমার ঘোষ (সহঃ সভাপতি), পতিত বন্দ্যোপাধ্যায় (সহঃ সভাপতি), বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (কর্মসচিব), চন্দন ভট্টাচার্য (সহঃ কর্মসচিব), তপন কুমার মিত্র (গ্রন্থাগারিক), মহাদেব ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (সহঃ গ্রন্থাগারিক), শান্তি মুখোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), বিমল চক্রবর্তী (আভ্যঃ হিসাব পরীক্ষক), প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, অশোক দত্ত, পুলিন বিহারী চৌধুরী (সভ্যবৃন্দ)।

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলি-২৭।

জাতীয় গ্রন্থাগারের (কলিকাতা) কর্মিবৃন্দের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। এই সম্পর্কে মুখ্য শ্রম কমিশনার তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের পর্যবেক্ষন শেষ করেছেন।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী, কলি-৪।

বিগত ২৭শে জুলাই এই গ্রন্থগারের ৮৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। এই সভায় ১৯৬৮ সালের কার্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। এই বৎসর গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ বসুর পৌরোহিত্যে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়।

কবি নরেন্দ্র দেবের পৌরোহিত্যে শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর

য়ারের পৌরোহিত্যে এক কবি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া, সমাজে ফিল্মের প্রভাব ও ফিল্ম সেন্সার সম্পর্কে এক আলোচনা সভা ও শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থাগারটীকে পাবলিক লাইব্রেরী রূপে স্বীকৃতি দান করেন। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ৭৪২ এবং পুস্তক সংখ্যা ৪৮৫।

২৪ পরগণা

ঘাটেশ্বর সমাজ কল্যাণ সংসদ

এই সংসদের প্রচেষ্টায় একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগার 'বঙ্গীয়' গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) নিকট থেকে আর্থিক সাহায্যে একটা পুর্ণাঙ্গ শিশু (গ্রন্থাগার) বিভাগ স্থাপিত হয়েছে।

বনগ্রাম

সাধুজন পাঠাগার, বনগ্রাম

বিগত ১৩ই শ্রাবণের অপরাহ্ণে এই পাঠাগারের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী সভা এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শিক্ষাব্রতী, শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্তত্রাণ ভাণ্ডারের উদ্বোধন করেন সভাপতি মহাশয়।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

গত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগার ভবনে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবির জীবনাদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বিগত ৪ঠা জুলাই এই পাঠাগারের ৪৮শ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব শ্রীরামশংকর মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২১ এর ৪ঠা জুলাই এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে এই পাঠাগারটি রুর‍্যাল লাইব্রেরী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৩৬ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। কয়েক বৎসর যাবৎ এই পাঠাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি সভ্য নির্বাচিত হয়ে আসছে।

গত অক্টোবর থেকে গান্ধী শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রতি মাসের দ্বিতীয় দিনটিতে মহাত্মা স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বহড়াম পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার, কেতুগ্রাম—২,

বিগত ১৫ই আগষ্ট পাঠাগার প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। অপরাহ্ণে পাঠাগারের পঞ্চোদশতম বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকীয় বিবরণী, অডিট রিপোর্ট ও বাজেট পেশ করা হয় ও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় ভাষণ দান করেন গ্রন্থাগারিক, নিত্যানন্দ মুখার্জী, বিধুভূষণ হাজরা ও সভাপতি মহাশয়।

বাঁকুড়া

কাকাটিয়া সাধারণ পাঠাগার

১৯৬৯ এর ১৫ই আগষ্ট সাধারণ পাঠাগার ও অন্যান্যদের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এক সভায় গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থ সম্পাদক ও সভাবৃন্দ ভাষণ দান করেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ী

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে দান

সম্প্রতি বোলপুরের শ্রীঅনিল কুমার মুখার্জি মহাশয় সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ১০১ এক শত এক টাকা দান করেছেন। তাঁর এই মহান দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয়েছে।

গত ২৫শে আগষ্ট, সন্ধ্যায় এই গ্রন্থাগারের ও রামরঞ্জন পৌরভবনের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন সভায় পৌরোহিত্য করেন বীরভূম জেলা সমাহর্তা শ্রী জি ভেঙ্কটরমনন, আই এ এস মহোদয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী। ভাষণ দেন— গ্রন্থাগারের সহ সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারের সহ সভাপতি ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষে নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠান হয়।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার

১৯৬৯ এর ১৩ই জুলাই তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থবিদ্যা গবেষণা সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার গ্রন্থাগারিক শ্রী এস. এম. কুলকার্ণি। সংগঠক ও প্রতিবেদক ছিলেন জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, হিন্দী বিভাগের সহ-সম্পাদক শ্রীএস. আর. গুরনানী। ও জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, তামিল বিভাগের সহ-সম্পাদক শ্রীপি. এন. বেঙ্কটাচারী।

প্রধা
শ্রীদে

বিগত ১৩ই শ্রাবণের সন্ধ্যায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভায় পুরোহিত জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরাম রঞ্জন ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গী কিশোর গজম রুর‍্যাল লাইব্রেরী

বিগত ১২ই আগষ্ট বনমহোৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বৃক্ষরোপন করেন সমাজশিক্ষা অধিকারিক শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য। উৎসব শেষে এই সভায় পাঠাগারগুলির ত্রুটি বিচ্যুতি, পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা ও উন্নত পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

হাওড়া

জুজার সাহা শক্তি পাঠাগার

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উৎসব পালন করা হয় পাঠাগার প্রাঙ্গণে। সভায় পৌরহিত্য করেন শ্রীসতীশ চন্দ্র গলুই এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়। উৎসব শেষে সকলে রাস্তা সংস্কার করেন।

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, লালারাম শাখার রোড, বেলুড় মঠ

৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৎসরব্যাপী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে গত ১৫ই আগষ্ট এক মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ডঃ কালী কিঙ্কর সেন গুপ্ত। নৃত্য-গীত ও নাটক পরিবেশনে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে।

হুগলী

আঁইয়া বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার

বিগত ২৭শে জুন ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সঙ্কলয়িত্রী : শীলা গুপ্ত

বার্তা-বিচিত্রা

তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ৺শ্রী আন্নাদুরাই এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি বিনা চাঁদার সার্বজনীন গ্রন্থাগার ও একটি শিল্পকলা বিভাগ গত ১০ই আগষ্ট কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরিজনার আন্না তামিল সংঘ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এখান থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক পড়তে দেওয়া হবে এবং দুটি শিক্ষাকেন্দ্রও এই তামিল মহাসঙ্ঘ থেকে খোলা হচ্ছে।

*　　*　　*

স্বাধীন ভারতে নিরক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ভি. কে. আর ভি রাও লোক সভায় জানিয়েছেন যে, গত নয় বছরে ভারতে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

*　　*　　*

গুজরাটে নবমশ্রেণী পর্য্যন্ত বালিকাদের শিক্ষা বেতন মুক্ত করা হয়েছে। আগামী বছর দশম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হবে। বর্তমানে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত বালক ও বালিকা উভয়কেই বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়।

*　　*　　*

অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সহঃ সভাপতি হয়েছেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ আর কে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিবাবুর এই সম্মানে ভারতবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত। বর্তমানে তিনি লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি।

*　　*　　*

ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রানস্লেটারস ভারতের ট্রানস্লেটরস সোসাইটিকে অনুমোদন দান করেছেন। সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সংস্থার এক অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

*　　*　　*

সম্প্রতি 'গীতগোবিন্দের' ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন মণিকা ভার্মা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' মালয়ালাম ভাষায় অনুবাদ করছেন রবি বর্মা। তারাশঙ্করের হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, দুই পুরুষ, প্রবোধ সান্যালের দেবতাত্মা হিমালয় হিন্দীতে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন 'জ্ঞানপীঠ'। এ ছাড়া বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, মারাঠি, গুজরাটী, মালয়ালাম, কানাড়ী—প্রত্যেকটি ভাষার প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যকারদের বাছাই করা নাটক নিয়ে হিন্দীতে 'প্রতিনিধি সংকলন' প্রকাশিত হচ্ছে।

*　　*　　*

শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা শিল্পরূপ পরিচালিত 'লিটল ম্যাগাজিন' প্রতিযোগিতায় ত্রৈমাসিক "ইমন" পত্রিকা ৫০ টাকা পুরস্কার ও মানপত্র পেয়েছেন। শিল্প-রূপের পক্ষ থেকে শীঘ্রই একটি 'লিটল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগার খোলা হবে। লিটল ম্যাগাজিন গুলিকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য রাজ্যের তথ্য-দপ্তরকে আবেদন জানানো হবে।

৪র্থ যোজনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক আকাদেমী সাহিত্য, জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্য, শিল্প সাহিত্য ও বিভিন্ন তথ্য জ্ঞাপক পুস্তকাদির ৫০০টি উর্দু ভাষায় প্রকাশ করবেন। এই পুস্তক প্রকাশনের ব্যয় হবে এক কোটি টাকা।

* * *

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাসভবনটি সংরক্ষণ করা হবে বলে পূর্তমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন। ৩১শে ভাদ্র শরৎ জয়ন্তীর মধ্যেই যাতে রূপনারায়ণপুর সেতুর নাম যাতে শরৎ-সেতু করা যায় তার চেষ্টা করা হবে এবং শরৎচন্দ্রের বাসভবনটি জাতীয় সংগ্রহশালা ও শিক্ষা সংস্কৃতির গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক আদেশে খ্রীশ্যামা নওয়াজি লিখিত নিম্নলিখিত উর্দু পুস্তিকা মুসলমান সমাজের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ও তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আঘাত হানিকর বলে নিবদ্ধ করেছেন। যথা : (1) Namaj ki Haquiqut, (2) Milad-ki-Haquiquat, (3) Muzeza ki Haquiquat, (4) Tazia ki Haquiquat (5) Haquiquat-Vols I & II, (6) Rooh—E—Islam, (7) Tafaraque—E—Islam, (8) Haj-ki-Hquequet.

* * *

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে মেক্সিকো সরকার তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থগুলি হল (১) মহাত্মা গান্ধীর জীবনী ও সমকালীন ভারত, (২) গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তা, (৩) ছবিতে গান্ধীর জীবনী।

* * *

সংবাদে প্রকাশ নু-ইয়র্ক শহরে নাকি একটা অশ্লীলতা-বিরোধী সংস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলিকে সুস্থ সামাজিক রাখাই হবে এর কাজ।

এজন্য ১৮২ নম্বর ব্রডওয়েতে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। অশ্লীলতা এবং অপরাধ বিষয়ক বই ও রিপোর্ট থাকবে এই গ্রন্থাগারে। দুনিয়াজোড়া অশ্লীল সাহিত্যের যে মহোৎসব চলেছে তার বিরুদ্ধে যদি কারোর কোন বক্তব্য থাকে, তাহলে তাঁরা উক্ত ঠিকানায় লিখে জানাতে পারেন। নাম অপারেশন ইয়র্ক ভিল।

* * *

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত মে মাসে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় একটি লেকচারারশিপ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর আর কোন দেশে কোন গ্রন্থের নাম বা প্রকাশনা উপলক্ষে কোন চেয়ার বা লেকচারারশিপ প্রতিষ্ঠা এর পূর্বে সম্ভবতঃ কখনও হয় নি। প্রকাশক উইলিয়াম বেন্টন ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণের একটি হুবহু পুনর্মুদ্রণ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

সঙ্কলনে : সহ সম্পাদিকা

পরিষদ কথা

শ্রী এস. আর. রঙ্গনাথনের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বিগত ১২ই আগষ্ট পরিষদ ভবনে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস. আর রঙ্গনাথনের ৭৭ তম জন্ম বার্ষিকী বিশেষ মর্যাদা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীরঙ্গনাথনের জীবন ও কীর্তির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় আলোচনার উদ্বোধন করে বলেন যে শ্রীরঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা, গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে মাষ্টারস ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টারস ডিগ্রী প্রবর্তন ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থগার বিজ্ঞান পঠন-পাঠনকে উন্নততর করার জন্য শ্রীরঙ্গনাথনের অবদানের কথা সভাপতি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর শ্রীযুক্ত প্রবীর রায়চৌধুরী সূচীকরণ, শ্রীসুহাস মুখার্জী ডকুমেন্টেশন, শ্রীআনন্দরাম বর্গীকরণ, শ্রীসুব্বা রাও রেফারেন্স এই সব ক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথনের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীফনিভূষণ রায় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সমাজকল্যানের সম্বন্ধ সম্পর্কে শ্রীরঙ্গনাথনের আদর্শ ও তা রূপায়ণে তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে, শ্রীভেঙ্কটাচারী, শ্রীরঙ্গনাথনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ও গ্রন্থগারের প্রতি তাঁর অসীম দরদ এবং শ্রীআবদুল রহমান শ্রীরঙ্গনাথনের ব্যক্তিগত জীবন ও শ্রীমতী রঙ্গনাথনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন।

পরিষদের শিক্ষণ বিভাগের কর্মসচিবের বিদেশ যাত্রা

গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ উপসমিতির কর্মসচিব ও বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারের সহ গ্রন্থাগারিক শ্রীতপন কুমার সেনগুপ্ত বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য গ্রেট ব্রিটেন রওয়ানা হয়েছেন। তাঁর অবর্তমানে শিক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীচঞ্চল কুমার সেন।

বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

গত ২৯।৮।৬৯ তারিখে পরিষদভবনে বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন উপসমিতির সভাপতি শ্রীদ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত।

সম্পাদক শ্রীতুষার সান্যাল কর্মসূচী বিশ্লেষণ করার পূর্বে আলোচনা প্রসংগে জানান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্পনসর্ড ও অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মীদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাগুলি একই স্থানে রয়েছে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের প্রতিটি স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সামিল হবার উপযোগী একটি কর্মসূচী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৬ } { ১৩৭৬, আশ্বিন

॥ সম্পাদকীয় ॥

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী

এ বছর ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের মহান নেতা লেনিনেরও জন্মশতবার্ষিকী আসন্ন। লেনিন গান্ধীজীর একবছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। মত ও পথের পার্থক্য সত্বেও এই দুই মহান নেতার মধ্যে কিছু কিছু মিলও সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা পাশ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার সংগ্রামে গান্ধীজীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীজীর আবির্ভাব এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

প্রায় একই সময়ে ভারতবর্ষে গান্ধীজী, রাশিয়ায় লেনিন এবং চীনে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এশিয়ার এই তিনটি বৃহৎ দেশকে শোষক ও অত্যাচারী শাসকের কবল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নির্ভীক যোদ্ধা এবং প্রধানতঃ এঁরাই বর্তমান শতকে এশিয়ায় বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করেন। এমন কি, এই মহাদেশের বর্তমান রূপ এঁদেরই দান বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা একেবারেই স্বতন্ত্র। যে অর্থে লেনিন বা সান ইয়াৎ সেনকে বিপ্লবী বলা হয়ে থাকে গান্ধীজীকে হয়তো ঠিক সেই অর্থে বিপ্লবী বলা চলে না। তাছাড়া বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে গান্ধীজীর ধ্যান-ধারণা হয়তো অচল বলে মনে হবে। বস্তুতঃ তাঁর সত্য, অহিংসা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ইত্যাদি আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় এ সম্পর্কে খুব কম সংখ্যক লোকই বোধ হয় নিঃসংশয় হতে পেরেছেন। গান্ধীবাদ বা তাঁর মতাদর্শ তাঁর স্বদেশবাসীই গ্রহণ করেনি। তবু গান্ধীজীর নাম এবং তার মতাদর্শের কথা সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর আদর্শ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন আফ্রিকার কালো মানুষ এবং আমেরিকার নিগ্রোরা। গান্ধীজীর বাণী অবশ্য নতুন কিছু নয়—এই পৃথিবীতে বারবার সেইসব বাণী উচ্চারিত হয়েছে খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য ও তলস্তয় প্রভৃতি মহাপুরুষের মুখে। কিন্তু বড় কথা হল এই বিংশ শতাব্দীতেও গান্ধীজী সেই সব চির পুরাতন মানবিক মূল্যবোধগুলি নিজের জীবনে প্রয়োগ

করতে পেরেছিলেন সার্থকভাবে। তাছাড়া গান্ধীজী অবাস্তব স্বপ্নবিলাসীও ছিলেন না। সর্বপ্রকারের গোঁড়ামি মুক্ত ছিল তার মন—কি ধর্মের ব্যাপারেই হোক, আর সমাজ সংস্কারেই হোক। ভারতের নারী সমাজকে তিনি মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। পুরুষের পাশাপাশি সমানাধিকার নিয়ে দাঁড়াতে তিনি তাদের সাহায্য করেছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতীয় মেয়েরাও যে পথে বেরিয়ে এসেছিল একথা আজ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাছাড়া শিক্ষা স্বাস্থ্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জনকল্যাণ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর মতামত দৈনন্দিন জীবনে নিশ্চয়ই অনুসরণযোগ্য।

২৬ বছর বয়স থেকে ৪৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯১৫ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এর কয়েক বছর পর জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন অবশ্য শুরু হয়েছিল গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাবের পূর্বেই। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িককালে আবেদন-নিবেদনই ছিল এই আন্দোলনের একমাত্র পন্থা। গান্ধীজীই প্রথম দেশকে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পথ দেখান। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাকে সে সময়ে যেন জনসমুদ্রে জোয়ার এসে গিয়েছিল। দলে দলে লোক নির্ভীকভাবে কারাবরণ করেছিল তাঁর ডাকে। দেশবাসীর মনে তিনি আত্মমর্যাদা বোধ এবং স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা এনে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গান্ধীজীই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বেগ সঞ্চার করেছিলেন।

শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিদেশের অনেক স্থানেই মহা সমারোহে গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। জন্মদিন, জন্মবার্ষিকী এবং জন্মশতবার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষে আমরা এমনি আরও অনেক বরণীয় ব্যক্তিকে স্মরণ করে থাকি। কিন্তু আমরা তাঁর বাণী ও আচরিত ধর্ম ভুলে গেছি। গান্ধীজী আমাদের প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অহিংসার বাণী শুনিয়েছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু মহান এবং শ্রেষ্ঠ তাকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর জীবনে কর্ম, ত্যাগ ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নবজাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য। দেশকে অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করবার সময় আমাদের তাঁর জীবন ও শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকদের এ ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব আছে। তাঁর রচনা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হল গ্রন্থাগারিকদের। গান্ধীজীর নিজের রচনাবলী তো আছেই—তাঁর সম্পর্কে বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। সুখের বিষয়, গ্রন্থাগার কর্মী ও গবেষক পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় এই বিপুল গান্ধী সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কিছু গ্রন্থপঞ্জীও ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাগারিকদের এ বিষয়ে অবহিত থাকা অবশ্য কর্তব্য হবে।

The Birth Centenary of Mahatma Gandhi

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২১)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মেদিনীপুর পৌরসভার সভাপতি রায় বাহাদুর শীতলপ্রসাদ ঘোষের আহ্বানে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের (১৩৪৪ বঙ্গাব্দের), ১৯শে ও ২০শে মার্চ, (৫ই ও ৬ই চৈত্র), শনিবার ও রবিবার মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এতকাল কলিকাতা সহরেই শুধু এই সম্মেলনের অধিবেশন হইত। কিন্তু এবার ঘটিল ব্যতিক্রম। মফস্বল সহরে এই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হইল। এই সম্মেলনে সভাপতি হইয়াছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এম. এ. (কলিকাতা), ডি. লেট. অ্যাণ্ড ফিল. (লেডেন) ডিপ. লিব. (লণ্ডন) আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন। নির্বাচিত সভাপতিকে শ্রীশীতলপ্রসাদ ঘোষ মাল্যভূষিত করিলে সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ইংরেজী ভাষণের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল:

"মেদিনীপুরবাসীদের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের গোড়ার দিকের অধিবেশনস্থল হিসাবে মেদিনীপুরকে বাছিয়া লওয়া সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কারণ ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুরের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। মেদিনীপুরের সার্বজনীন গ্রন্থাগার বাঙ্গলা দেশের মধ্যে মফস্বলের সর্বপ্রথম সার্বজনীন গ্রন্থাগার। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, (১২৫৮-৫৯ বঙ্গাব্দে), অর্থাৎ ভারতের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পূর্বে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল আর সংসদীয় আইনবলে ব্রিটেনে ইহার দুই বৎসর পরে সার্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনের ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল।

কার্লাইল বলেন, 'আজকালকার দিনে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় মানেই নানাবিধ পুস্তকসংগ্রহ'। এই দেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারকে যে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হইবে ইহা গত কয়েক বৎসর যাবৎ গ্রন্থাগার পরিষদের নিরন্তর চেষ্টায় ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

সম্প্রতি বঙ্গীয় সরকার প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহা করিতে গিয়া ইহা বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়া বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার ব্যাপারে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। ভারত অপেক্ষা জগতের অন্য কোন দেশেই জনগণের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় নয়। জগতের প্রগতিশীল দেশসমূহের মধ্যে ভারতকে বাস্তবিকই যদি স্থান পাইতে হয় তবে ঐ বাধা অবশ্যই দূর করিতে হইবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাসমস্যার সমাধান আন্তরিক-

ভাবে করিতে হইবে। বঙ্গীয় সরকারের প্রণীত পরিকল্পনায় প্রস্তাব হইয়াছে যে গ্রামাঞ্চলে নিযুক্ত সাব-রেজিষ্ট্রারদিগকে অবসর সময়ে কাজে লাগাইয়া প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ইহা স্পষ্ট যে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারে এই পরিকল্পনা জনগণের চেতনা সঞ্চারের পক্ষে একটি পদক্ষেপ মাত্র। সমগ্র গ্রামাঞ্চল জুড়িয়া এই ধরণের কেন্দ্র যাহাতে ছড়াইয়া দেওয়া যায়—তাহাই প্রয়োজন। ঐ সকল অঞ্চলে বেসরকারী স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টারও অবশ্যই একটা ভূমিকা থাকিবে। বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশিত পথে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র চালাইতে হইলে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহ করিতে হইলে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহ করিতে এবং প্রয়োজনমত অভাব মিটাইতে হইবে। এখানেই প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনায় গ্রাম্য গ্রন্থাগার ও গ্রামে পুস্তক পরিবেশনের উপযোগিতা রহিয়াছে। এই সকল প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকে প্রকৃত জীবন্ত কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে কৌতূহল উদ্দীপক এবং উপকারী গ্রন্থের নিরন্তর সরবরাহ থাকা অত্যাবশ্যক।

এই কাজ শুধু শিক্ষাবিভাগের নয় জিলা মণ্ডল এবং গ্রাম মণ্ডলেরও। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রেও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিই গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারসাধনে অগ্রণী হইয়াছে। আইনের বলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি এই উদ্দেশ্যে বিশেষ কর বসাইবার অধিকারও পাইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে কর বসানর প্রশ্নটি সব সময়ই প্রীতিকর নয়। বিশেষ করিয়া ভারতে কোন কর বসাইতে হইলে দীর্ঘ দিন ধরিয়া জনমত সৃষ্টি করিতে হয়। যে ভাবেই হউক ব্রিটেনের সার্বজনীন গ্রন্থাগার আইনের মত আইন ভারতের আইনের বইতে কোন স্থান পাইবে না তাহার কারণ বুঝা যায় না। বড় বড় পৌরসভার এলাকায় এইরূপ জনমত সৃষ্টি করিতে অসুবিধা হইবে না। অন্ততঃ গ্রামাঞ্চলের এই চেষ্টা বর্তমানে না করাই সম্ভবতঃ ভাল। ইহা বুঝিতে পারি না কেন জিলা মণ্ডলগুলি অন্যান্য খাতের অনাবশ্যক ব্যয় কমাইয়া বা প্রত্যেক গ্রাম মণ্ডলে প্রদত্ত বার্ষিক আয়বর্ধক অনুদানের কিছু পরিমাণ কমাইয়া বা উভয়ই কমাইয়া সেই বাঁচান অর্থের দ্বারা গ্রামে গ্রন্থ পরিবেশনের কাজে সহায়তা করিবে না। গ্রাম মণ্ডপও এই ব্যাপারে সহায়তা করিতে পারে এবং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের কোন কোন গ্রাম মণ্ডল তাহা করিতেছেও। যতটা জানি মেদিনীপুর জিলা মণ্ডল এই পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিতে ব্যগ্র। আশা করি এই সম্মেলনে যে সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের সহায়তায় এমন একটি বাস্তব পরিকল্পনা খাড়া করা হইবে যাহা এই জিলার এবং অন্যান্য জিলার পক্ষে উপযোগী হইবে। শিক্ষাবিভাগ সম্পর্কে বলিতে গেলে ইহার বিবেচনার্থে এই প্রস্তাব করা যাইতে পারে যে যে-সকল গ্রাম্য গ্রন্থাগার প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাদের জন্য প্রচুর অনুদান মঞ্জুর করার কোন পরিকল্পনা উহা স্থির করিতে পারে কিনা। আমি পূর্বেই বলিয়াছি প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনা সফল করার পক্ষে নিরন্তর পুস্তক সরবরাহ একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ এবং অপর একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হইতেছে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা

করিবার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা।

গ্রামে গ্রন্থ পরিবেশনের সঠিক সংগঠন আমাদের সমস্যার একটি দিক মাত্র। বাঙ্গলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে প্রধান অন্তরায়গুলির মধ্যে সম্ভবতঃ একটি হইল মাতৃভাষায় উপযুক্ত পুস্তকের অভাব। গ্রামে ইংরেজী বই কোন কাজে আসিবে না। কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিশেষ বিষয়ে বাঙ্গলা শব্দ চয়ণ করা হইতেছে। অথচ এই বিষয়সমূহে গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ আগ্রহান্বিত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কেবল অপেক্ষাই করিতে পারি। এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টা উচ্চ প্রশংসা ও জনসমর্থন পাওয়ার যোগ্য।"

কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় তাঁহার উদ্বোধনী ইংরেজী ভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই :

"তের বৎসর আগে এই প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্তন হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আমরা প্রথম বার এক মফস্বল সহরে মিলিত হইলাম। এইজন্য শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন আমাদের ধন্যবাদার্হ, কারণ তিনি অনুগ্রহপূর্বক এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করি মফস্বলের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ সম্মেলন করা সম্ভব হইবে এবং এখানে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইল তাহা অন্যেরাও অনুসরণ করিবে। মফস্বলে এইরূপ সম্মেলন গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ভাবের আদানপ্রদানের এবং কর্মীদিগকে আন্দোলনের বর্তমান ধারার সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত করিবার সুযোগ ঘটাইয়া থাকে।

আমাদের গত সম্মেলন সুপরিকল্পিত ছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর নিরলস প্রচেষ্টায় ইহা বহুলাংশে সফলতা লাভ করিয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী শ্রীফজলুল হক এই উপলক্ষে সভাপতি হইয়াছিলেন। জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারসাধনে গ্রন্থাগারগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে তাহার সম্বন্ধে তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন।

এই সম্মেলনও সুপরিকল্পিত। বিনা চাঁদায় গ্রন্থ পরিবেশন এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় হইবে। আশা করি ডঃ রায়ের সুযোগ্য পরিচালনাধীনে এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনি শুধু একজন বিশেষজ্ঞ নহেন বিখ্যাত পণ্ডিতও বটেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলন জানাইবার জন্য আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে কোন কৃত্রিম বাধা নাই। কাজটি যে শ্রমসাধ্য ও কঠিন তাহা নিঃসন্দেহ। সকল দিকে আমাদের কার্যাবলী প্রসারিত করার পক্ষে আমাদের সম্বল এবং সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ। কাজেই আমাদের সম্বলকে পরিমিত পরিমাণে ব্যয় করিতে হইবে এবং আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে—যথা, জিলা শাখা গঠন করিয়া প্রত্যেক জিলার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা, গ্রন্থাগারিকদের জন্য প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করা, নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা ও বাঙ্গলার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত পুস্তক প্রকাশ করা, বর্গীকরণ ও তালিকাকরণের সমজাতীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্ম পরিষদের একটি মুখপত্র প্রকাশ করা এবং সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারের অবস্থা উন্নত করার চেষ্টা করা।

আমাদের বিভিন্ন জিলাবাসী সদস্যদের সহায়তায় প্রদেশময় জিলা শাখা সংগঠন করাই আমাদের পরিষদের প্রধান কাজ। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে প্রদেশকে সুসংগঠিত গ্রন্থাগারে ছাইয়া ফেলাই হইবে ইহার উদ্দেশ্য। ইহার ফলে শাখাগুলি আমাদের পরিষদ হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাইবার সুযোগ পাইবে। সানন্দে জানাইতেছি যে অনেক জিলা শাখা গঠিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশে আরও শাখা গঠিত হইতেছে। কতগুলি জিলায় জিলায় সরকারী কর্মচারীরা স্থানীয় সংগঠকদের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। কতকগুলি প্রধান জিলা, যথা—ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম জলপাইগুড়ি ও বর্ধমান হইতে সামান্য সাড়া পাওয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত। ঐ সকল জিলায় গ্রন্থাগারমনা লোক আছে সন্দেহ নাই। নিজ নিজ জিলায় আন্দোলনের প্রসারসাধনে সহায়তা করা এবং জিলা শাখা গঠন করার জন্য আমি তাহাদিগকে তৎপর হইতে বলি। এই প্রসঙ্গে আমি নোয়াখালি জিলার কার্যাবলীর প্রশংসা করি। অন্যান্য জিলা ইহাদের অনুকরণ করিতে পারে। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিগত ও যৌথ জীবনে সহযোগিতাই সাফল্যলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

গত কিছু কাল যাবৎ বাঙ্গলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে কিন্তু এখানে এই প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। দুঃখের বিষয় গ্রন্থাগারিকের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪০-৪১ বঙ্গাব্দে) এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং ইহার সুপারিশবলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অনুমোদনও লাভ করিয়াছিল কিন্তু সরকারের মঞ্জুরী না পাওয়ায় ব্যাপারটি মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিক প্রণালীর প্রবর্তন করা এবং গ্রন্থাগারের অঙ্গীয় কলাকৌশলের সাধারণ জ্ঞান দেওয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের, (১৩৪১ বঙ্গাব্দের) মে মাসে কার্যরত গ্রন্থাগারিকদের জন্য প্রশিক্ষণচক্র স্থাপন করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং এই সম্মেলনের সভাপতি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই চক্রের অধিকর্তা ছিলেন। তাঁহার সহকারীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীওয়ার্ডসওয়ার্থ সহ আরও নয়জন শিক্ষক। আগামী ১লা মে ডঃ রায়ের অধিকর্তৃত্বে দ্বিতীয় বার পরিষদ একটি প্রশিক্ষণচক্র চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই চক্রের পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া সাজান হইয়াছে। প্রশিক্ষণচক্রের ছাত্রদিগের অবাধ ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যয়সংকোচ পরিচালনা ও উহার অঙ্গীয় কলাকৌশল সম্পর্কিত বহু মূল্যবান পুস্তক পরিষদের গ্রন্থাগারে

সংগৃহীত হইয়াছে এবং ব্যবহারিক শিক্ষারও অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা হইতেছে। শুধু গ্রন্থাগারকর্মীদের মধ্যেই ভর্তি সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। যে সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকদিগের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাগারসমূহকে আধুনিক প্রণালীতে গড়িয়া তুলিবার জন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদিগকে উপযুক্ত সুযোগ দিবেন।

আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্ত পরিষদ চেষ্টা করিতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে শিশুভারতী ও কৈশোরদের সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভারতীয় বালক সাহিত্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 'সাহিত্যের বাজার' সম্পর্কে গত ডিসেম্বর মাসে এক আলোচনাসভা হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅর্ধেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গত ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে এক বিশদ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন সমিতির অন্যান্ত কাজের মধ্যে অন্যতম। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া এক বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পূর্বেকার সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে, (১৩৪২-৪৩ বঙ্গাব্দে) এই সমিতি কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রণীত তালিকা আমাদের সমিতির সংবাদপ্রকাশক খণ্ডপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পাঁচজন সহকর্মী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ (১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করার কাজে লিপ্ত আছেন। ইহা প্রকাশিত হইলে বহু-দিনের অভাব ঘুচিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা বা পরিষদের বুলেটিন (খণ্ডপত্রিকা) ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সম্পাদনা করিতেছেন। এই পত্রিকার প্রকাশন উল্লেখ করিবার মত একটি কাজ। পরিষদের এই মুখপত্রে ইহার কার্যাবলী ও অন্যান্ত সংবাদ সন্নিবেশিত হয়। ইহা সমাদর পাইতেছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে ইহার অধিক বার মুদ্রণ বা কলেবর বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে না।

গ্রন্থাগারকর্মীদের এবং প্রশিক্ষণচক্রের ছাত্রদের পাঠার্থে বাঙ্গলায় পুস্তকমালা প্রকাশের কাজেও পরিষদ হাত দিয়াছে। 'গ্রন্থাগার' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং অপর পুস্তক 'দেশবিদেশের গ্রন্থাগার' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এছাড়া অন্ত দুইখানা বইও লেখা হইতেছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংস্কারসাধন অপর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্ত শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দকে সভাপতি এবং শ্রীঅনাথনাথ বসুকে সম্পাদক করিয়া একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে তাঁহারা পরামর্শ দিবেন। সানন্দে জানাইতেছি যে তাঁহারা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধনের জন্ত যে কার্যক্রম স্থির করিয়াছেন তাহা এই সম্মেলনে উপস্থিত করা হইবে।

বিশেষ বিষয়ক গ্রন্থাগারের উন্নতি ও প্রসারসাধনের জন্ত ইম্পিরিয়্যাল রেকর্ডস

ডিপার্টমেন্ট-এর শ্রীআবদুল আলী, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রীজোহান ভ্যান ম্যানেন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ইহার সম্পাদক। সমিতি ইহার একটি কার্যক্রম স্থির করিয়াছেন। এই বিষয়ে নিশ্চিত যে এই প্রদেশের বিদ্বজ্জন সংস্থাসমূহের গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সহিত পরিচয় ঘটাইবার ব্যাপারে তাঁহাদের চেষ্টা পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হইবে।

অনেক প্রধান গ্রন্থাগার হইতে তথ্য সংগৃহীত না হওয়ায় বাঙ্গলার গ্রন্থাগার পঞ্জী প্রকাশ স্থগিত আছে। যত সত্বর সম্ভব আমি সকলকে প্রয়োজনীয় পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

গত ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে যে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন আহূত হইয়াছিল তাহাতে আমাদের পরিষদ হইতে প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিহার গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আহ্বানে আমাদের পরিষদের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বিহারের শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহের সহিত তাঁহাদের হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছিল।

পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান স্থির করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের খণ্ডপত্রিকার বিনিময়ে আমরা বহু বিদেশী গ্রন্থাগারসংক্রান্ত পত্র পত্রিকা পাইতেছি। এইজন্য ঐ পত্র পত্রিকাসমূহের পরিচালকবর্গ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

এই বৎসরের একটি নূতনত্ব এই যে গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নানা ধরনের মুদ্রিত ফরমের দোকান খোলা হইতেছে। এইগুলি অতি সস্তা দরে এখানে পাওয়া যাইবে।

Librery movement in Bengal (21)
: Gurudas Bandyopadhyay

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : গ্রন্থকার : গ্রন্থনির্মেতা : গ্রন্থাগারিক

: গীতা মিত্র

জগতে অনেকেই আছেন যাঁরা গ্রন্থকার। কিন্তু গ্রন্থনির্মেতা বা গ্রন্থাগারিক নন, গ্রন্থাগারিক কিন্তু গ্রন্থকার বা গ্রন্থনির্মেতা নন। যদি বা কেউ এই তিনটির যে কোন দুটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হন ; কিন্তু তিনটি বিষয়েই জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি সংসারে বিরল। বাংলার নবযুগের ইতিহাস স্রষ্টা বিদ্যাসাগর কিন্তু একদিকে ছিলেন গ্রন্থপ্রণেতা ও গ্রন্থনির্মেতা এবং অন্যদিকে যথার্থ গ্রন্থাগারিক। বিদ্যাসাগরের বিপুল বিচিত্র কর্মবহুল জীবনে গ্রন্থকে ঘিরে তাঁর যে কর্মপ্রচেষ্টা এবং অনন্যতন্ত্রতা, গ্রন্থাগারিকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিভাত, এই প্রবন্ধে তার কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

আজ যে ভাষায় আমরা পড়ি বা লিখি, বিদ্যাসাগর সেই ভাষার জন্মদাতা। গ্রন্থকার হিসাবে তাই তাঁর প্রতিভার প্রথম প্রয়োগ হয়েছে নিত্য পরিবর্তনশীল, প্রবহমান বাংলা ভাষার উপর ; যে ভাষাকে সকলের উপযোগী শিক্ষাপ্রদ করতে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষাকে তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে পরিমার্জনা করে, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংযত করেছেন এবং সমভূমি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ছেদচিহ্ন আনয়ণ করে নবযুগের প্রবর্তন করেন। যে ভাষায় আমরা জগত সভায় গৌরবের আসন অধিকার করেছি, বিশ্বকবি সেই ভাষা ভাস্করের উদ্দেশে বলেছেন "ভাষার প্রাঙ্গণে তব, আমি কবি, তোমারি অতিথি"। পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্য দিয়ে, আমাদের আদি শিক্ষাগুরুর, গ্রন্থকার হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ।

বিদ্যাসাগরের সমস্ত জীবনী রচয়িতাদের মতে অপ্রকাশিত "বাসুদেব-চরিত"ই বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ ; কিন্তু বিদ্যাসাগর যখন ১৮৩৯ খৃঃ এ ন্যায়শাস্ত্র শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন তখনই তিনি ভূগোলখগোলবর্ণনম গ্রন্থ রচনা করেন ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি এটি প্রকাশের সঙ্কল্পও করেন, এই গ্রন্থের ভূমিকায় সে কথা লেখা আছে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৯২ খৃঃ তাঁর পুত্র এটি প্রকাশ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থের ৪০৮টির মধ্যে ১০০টি শ্লোক ছাত্রজীবনের রচনা। যাহা হউক, অমীমাংসিত বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা "বাসুদেব-চরিত" লিপিমাধুর্যে ও ভাষা-সৌন্দর্যে বাংলা গদ্যের আদর্শস্থল। এর পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের অনুরোধে হিন্দী বৈতাল পঁচিসী'র কিছু পরিবর্জন ও পরিমার্জন করে লিখলেন 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'। প্রথমে এই পুস্তক পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয় নি বটে কিন্তু পরে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তকরূপে স্বীকৃত হয়। এই পুস্তকের মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করেন। বাসুদেব-চরিত ছিল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ,

বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দী থেকে, এরপর তিনি মার্শমানের "হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল" ইংরাজী গ্রন্থ থেকে "বাঙ্গালার ইতিহাস", ২য় ভাগ অনুবাদ করেন। অনুবাদক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব অতুলনীয়।

বিদ্যাসাগর এরপর একে একে বর্ণপরিচয়, কথামালা, ঋজুপাঠ, ব্যাকরণ-কৌমুদী রচনা করে আমাদের শৈশব শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আদি ভাষাবিজ্ঞানী ঈশ্বরচন্দ্র বর্ণপরিচয়ের মধ্যে দিয়ে শিশুদের ভাষা শিক্ষার নতুন বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার করেন। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির শিল্পিজন সুলভ প্রতিভাকে তিনি বাংলাদেশের অসহায়, অজ্ঞ শিশু ও বালকদের মুখ চেয়ে খর্ব করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও তারই মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', যাদের ভিত্তি করে বাংলা সাহিত্য আজ বিরাট সৌধ সৃষ্টির গর্ব অনুভব করে। বিদ্যাসাগরের রচনার বেশীর ভাগই অনুবাদ, অনুস্মৃতি বা সঙ্কলন। কিন্তু তাঁর মৌলিক রচনা অল্প হলেও তার মধ্যে তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, আত্মচরিত, সর্বশুভঙ্করীতে লেখা "বাল্য-বিবাহের দোষ, ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' 'ব্রজবিলাস' ইত্যাদি তাঁর সরস রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর থেকেই বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ইংরাজী রচনা 'Selections from the Writings of Goldsmith, 'Selections from the English literature সঙ্কলিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন সাহিত্য সাগরে ডুব দিয়ে তিনি যথার্থ সাহিত্য রসিক রূপে, 'অন্নদা-মঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', 'উত্তরচরিতম', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি গ্রন্থরত্ন সম্পাদিত ও মুদ্রিত করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগরের রচিত ও গঠিত ভাষা ও সাহিত্য আজ আমাদের মূলধন। তাঁর উপার্জিত সম্পত্তিতে আমাদের উত্তরাধিকারী করে তিনি আমাদের চির ঋণী করে গেছেন।*

নবযুগের মুক্তির অগ্রদূত মুদ্রণ যন্ত্র ও মুদ্রিত গ্রন্থ। নবযুগের কাণ্ডারী বিদ্যাসাগরের বহুমুখী প্রতিভার আর একটি নিদর্শন তাই গ্রন্থ-মুদ্রণ। প্রাচীন যুগে কোন দেশেরই পণ্ডিত বা পুরোহিতরা মুদ্রণের প্রকাশ ও প্রচার কামনা করেন নি। বাংলাদেশেও পণ্ডিত প্রবররা ও কোন কোন ইংরেজ শাসন কর্তা গ্রন্থ মুদ্রণের প্রয়াসে বিরোধিতা করেছেন। রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরই তাঁদের বিরুদ্ধাচারণ অগ্রাহ্য করে মুদ্রণ ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আনয়ন করেন। বিদ্যাসাগর মুদ্রণ-ব্যবসায়ী বা সৌখিনপ্রকাশক ছিলেন না। মুদ্রণ ব্যবস্থায় উন্নতির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। মুদ্রণ কার্য সহজসাধ্য ও দ্রুততর করার জন্য তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন এবং অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। অক্ষর-সংযোজন ও সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা তিনি

---

*(বিদ্যাসাগর-রচিত গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ—এই পত্রিকায় প্রীতি মিত্র সঙ্কলিত "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : গ্রন্থপঞ্জী" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রে অনুকূল হয়ে থাকে। একে "বিদ্যাসাগর সার্ট" বলা হয়।

প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি-সাহিত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আমাদের পূর্বপুরুষের কীর্তি ঐশ্বর্যে অজ্ঞানতার অন্ধকার গুহাগহ্বর থেকে আহরিত করে, নিজেই সম্পাদিত ও মুদ্রিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। যুগ যুগ সঞ্চিত প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারকে তিনি তাঁর মুদ্রণ-যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে উজাড় করে দিয়েছেন। শিক্ষাপ্রসার ছাড়া ও সামাজিক কুসংস্কার দূর করাও ছিল বিদ্যাসাগরের মুদ্রণ যন্ত্রের আর একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বিদ্যাসাগরের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়ে এই কাজে সহায়তা করেছিল। বিদ্যাসাগরের লেখনী ধন্য 'সোমপ্রকাশ' বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র প্রচারের অন্যতম নিদর্শন।

গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ সৃষ্টি করেই বিদ্যাসাগর জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা থেকে বিরত হননি। গ্রন্থ সংগ্রহ ও গ্রন্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডারকে তিনি আদর্শ গ্রন্থাগারে রূপায়িত করেছেন। এর অপূর্ব দৃষ্টান্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিদ্যাসাগর সংগ্রহ। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ প্রেমিকতা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। কাহিনীর সত্য-মিথ্যা যাই থাকুক না কেন, এই কাহিনী থেকে এটাই প্রমাণিত হয় বিদ্যাসাগর একজন যথার্থ গ্রন্থাগারিক ছিলেন। আদর্শ গ্রন্থাগারিকের মতন যেখানে যে বিষয়ের ভাল বইএর সন্ধান পাওয়া যেত, যে কোন মূল্যে তিনি তা সংগ্রহ করতেন। পুস্তক নির্বাচনে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল। সঞ্চয়ের নেশায় মেতে বা গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধনের জন্য তিনি বইগুলি সংগ্রহ করতেন না। সুদক্ষ গ্রন্থাগারিকের মতন তিনি তাঁর প্রতিটি গ্রন্থের বিষয় অবগত থাকতেন। তাই যখনই কেউ কোন বই সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছেন তিনি সুন্দরভাবে সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। কোথায় কোন লেখক তার মত সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন তা তিনি সহজেই বলতে পারতেন। তাঁর নিজের গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের গ্রন্থাগারের পাঠক করে তুলেছিলেন এবং গ্রন্থের সঙ্গে তাঁদের পরিচিত করে দিয়েছিলেন।

এই নিজস্ব গ্রন্থভাণ্ডারে সংস্কৃত, ইংরাজি, বাংলা ও অন্যান্য স্বদেশী ও বিদেশী ভাষায় রচিত বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন। যে সব প্রাচীন গ্রন্থ তখন পাওয়া যেত না সেগুলি পুনরায় মুদ্রণ করে গ্রন্থাগারের রাখতেন। বহু প্রাচীন পুঁথিও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, কেননা তিনি জানতেন আমাদের ঐতিহ্যময় প্রাচীন ইতিহাস এই পুঁথিগুলির মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। আধুনিক যুগের গ্রন্থবিজ্ঞানের পাঠ বিদ্যাসাগরের ছিল না, এ কথা সত্য তবুও তিনি বর্তমানকালের অনেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের চাইতে এ কথা ভাল করেই জানতেন গ্রন্থাগারিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য গ্রন্থগুলিকে সংরক্ষণ করা; অর্থাৎ যে কোন মূল্যে সুন্দর করে মজবুত করে বাঁধানো। গ্রন্থকে কালের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি প্রতিটি গ্রন্থ সুদৃশ্যভাবে প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থব্যয় করে বাঁধিয়ে আনতেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যগ্রন্থের যে বিপুল ও দুর্লভ সমাবেশ বিদ্যাসাগরের

গ্রন্থাগারে হয়েছিল, তা সমকালীন কোন গ্রন্থাগারে ও ছিলই না, বর্তমান কালেও বিরল। এই গ্রন্থাগারকে স্থায়ী ও দর্শনীয় করে তুলতে তিনি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। আজকে তাঁর স্মরণোৎসবে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থানুরাগ যেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং বাংলাদেশের গ্রন্থভাণ্ডারগুলিকে রক্ষা করার সঙ্কল্প যেন আমরা গ্রহণ করতে পারি।

Iswar Chandra Vidyasagar :: Author : Printer : Librarian
: Gita Mitra

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ

			সংখ্যা
১।	সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার	...	৭
২।	জেলা গ্রন্থাগার	...	১৭
৩।	মহকুমা/টাউন গ্রন্থাগার	...	২০
৪।	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	...	২৪
৫।	পল্লী পাঠাগার	...	৫২৯
৬।	সাহিত্য সংস্থা সমূহ	...	৪২৫
৭।	সম্পূর্ণ সংস্থা	...	৫৩৩
৮।	নৈশ বিদ্যালয়	...	৭৬৪
৯।	এক-শিক্ষক-পাঠশালা	...	৬৮২
১০।	বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়	...	৩২
১১।	বিদ্যালয় তথা সমাজশিক্ষা কেন্দ্র	...	৩৭
১২।	সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত সমাজশিক্ষা কেন্দ্র	...	৪০২০
১৩।	সাহায্যপ্রাপ্ত সাধারণ গ্রন্থাগার	..	২৩৫৮
১৪।	গ্রন্থাগার কেন্দ্র	...	১০০০
১৫।	স্বেচ্ছা প্রণোদিত সংস্থা	...	৩৫

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ গ্রন্থপঞ্জী (১)

প্রীতি মিত্র

যে কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থপঞ্জী গ্রন্থের রচনাকাল অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন। এ ছাড়া তিনি বহু গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে বারবার পরিবর্জন ও সংযোজন করিয়াছেন, ফলে প্রথম রচনা হইতে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইয়াছে। এইজন্য সবদিক বিবেচনা করিয়া প্রকাশকাল অনুযায়ী গ্রন্থগুলি শ্রেণীভুক্ত করা হইল। প্রতি গ্রন্থের সঙ্গে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের অনেক গ্রন্থই আজকাল দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থা কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন লেখক দ্বারা সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে বিদ্যাসাগরের রচনাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ যাবৎকাল বিদ্যাসাগরের চারিটি গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারিটি গ্রন্থাবলীকে এখানে ক, খ, গ, ঘ এই চারি শ্রেণীভুক্ত করা হইল। প্রতিটি রচনার সংক্ষিপ্তসারের শেষে এই চার শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর কোন অংশে সেই রচনাটি আছে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক শ্রেণী : নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৩০২ সালে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী মাত্র দুইটি খণ্ডে সম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করেন।

খ শ্রেণী : মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির পক্ষ হইতে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনা 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' নামে, সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা ও বিবিধ, এই তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৩৪৪ থেকে ৪৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। (তৃতীয় খণ্ডটি দেখা সম্ভব হয়নি)

গ শ্রেণী : প্রমথ বিশী সম্পাদিত বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত।

ঘ শ্রেণী : সম্প্রতিকালে দেবকুমার বসু সম্পাদিত ৪ খণ্ডে বিদ্যাসাগর রচনাবলী (১৯৬৬—৬৯)।

১। **বাসুদেব চরিত।** ১৮৪২—৪৬।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত বিদ্যাসাগরের প্রথম অপ্রকাশিত গদ্য গ্রন্থ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করা হয় কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনুমোদন না করায় গ্রন্থটী প্রকাশিত হয় নাই।

২। **বেতাল পঞ্চবিংশতি।** ১৮৪৬।

কলেজ অফ্ ফোর্ট উইলিয়াম বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের পাঠার্থে, মার্শাল সাহেবের অনুরোধে 'বৈতাল পচ্চীসী' নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বনে রচিত। ইহাই বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ক (১খ), খ (সাহিত্য), গ, ঘ (১খ)

৩। **বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ।** ১৮৪৮।

মার্শমান সাহেবের 'History of Bengal' ইংরাজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন আরোহন থেকে বেন্টিঙ্কের রাজত্বকাল পর্যন্ত। ঘ (১খ)।

৪। **জীবনচরিত।** ১৮৪৯।

চেম্বার্স' বায়োগ্রাফিকাল ডিক্সনারিতে বিদ্যাসাগর রচিত মহাপুরুষদের জীবনীর অনুবাদ। ইহাতে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, লিনিয়াস, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার জীবনী আছে। ঘ (১ম খণ্ড)

৫। **বাল্য বিবাহের দোষ।** ১৮৫০।

সর্বশুভকরী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ। খ (সমাজ), ঘ (১খ)।

৬। **বোধোদয়।** ১৮৫১।

চেম্বার্স' রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজ গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী করিয়া শিশু শিক্ষা ৪র্থ ভাগ বা বোধোদয় রচনা হয়। নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। গ, ঘ (১খ)।

৭। **সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা।** ১৮৫১।

এই গ্রন্থে ছোটদের শিক্ষাপোযোগী মূল বিষয় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পড়িয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে বুৎপত্তি না জন্মিলেও সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুবিধা হইবে। ঘ (১খ)।

৮। **ঋজুপাঠ** (১ম, ৩য় ভাগ) ১৮৫১।

ঋজুপাঠের ১ম ভাগে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান আছে, ৩য় ভাগে হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেনীসংহার এর অংশবিশেষ আছে। ঘ (১খ)।

৯। **নীতিবোধ।** ১৮৫১।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত পুস্তকের বিদ্যাসাগর লিখিত ৭টী প্রস্তাব। ঘ (৪র্থ খ)।

১০। **ঋজুপাঠ** (২য় ভাগ)। ১৮৫২।

ইহাতে রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের অংশবিশেষ আছে। ঘ (১খ)।

১১। **সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব।** ১৮৫৩।

কলিকাতার বীটন সোসাইটিতে প্রথম পড়া হয়। ইহার দুইশত কপি পুস্তিকাকারে প্রথম প্রচারিত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ঘ (১খ)।

১২। **ব্যাকরণ কৌমুদী** (১ম, ২য় ভাগ)। ১৮৫৩।

১৩। **শকুন্তলা।** ১৮৫৪।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের উপাখ্যানভাগ। আধুনিক বাংলা সাধু ভাষায় লিখিত। ক (১), খ (সাহিত্য), গ, ঘ (২)।

১৪। **ব্যাকরণ কৌমুদী** (৩য় ভাগ) ১৮৫৪।

১৫। **বর্ণপরিচয়** (১ম, ২য় ভাগ)। ১৮৫৫।

ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'বর্ণপরিচয়' বিদ্যাসাগরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। পূর্বে প্রচারিত বিভিন্ন লেখকের বর্ণপরিচয়ের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিয়া নতুনভাবে অক্ষর বা বর্ণমালার সংযোজন।

১৬। **বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।**

১ম পুস্তক (১৮৫৫)

২য় পুস্তক (১৮৫৫)

প্রথম পুস্তিকাখানিতে বিদ্যাসাগর বিষয়টী মাত্র উত্থাপন করেন যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা ?

২য় পুস্তকে যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে 'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' এই নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ 'Marriage of Hindu Widows' নামে ইংরাজীতে, ১৮৬৫ সালে বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী মারাঠীতে অনুবাদ করেন।

বিধবা বিবাহ, ১৯২৯ (সম্বৎ) ক (২), খ (সমাজ), ঘ (২)। (এই নামেও প্রকাশিত হয়েছে)।

১৭। **কথামালা।** ১৮৫৬।

রেভারেণ্ড টমাস জেমস ঈশপ রচিত গল্পের ইংরাজী ভাষা হইতে অনুবাদ। তৎকালীন শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ উইলিয়ম গার্ডন ইয়ঙ্ এর অভিপ্রায় অনুসারে গল্পগুলি অনুদিত। গ, ঘ (২)।

১৮। **চরিতাবলী।** ১৮৫৬।

সংক্ষেপে, সরলভাষায়, কতকগুলি মহানুভবের বৃত্তান্ত। ইহাতে ডুবাল, রস্কো, ষ্টোন, হণ্টর, সিমসন, ওগিলবি, লীডন, জেঙ্কিন্স, গিফোর্ড, উইঙ্কিলমন, পষ্টেলস্, এভিয়ন, খ্রিডো, এড্ডাব, লমনসফ, মেডকস্, লজোমণ্টেন্স, ও রেমসের জীবনী আছে। ঘ (২)।

১৯। **পাঠমালা।** ১৮৫৯।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী বিদ্যার্থীগণের ব্যবহারার্থ জীবনচরিত, শকুন্তলা ও মহাভারতের অংশবিশেষ নিয়ে সঙ্কলিত।

২০। **মহাভারত** (উপক্রমণিকা ভাগ)। ১৮৬০।

ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি মহাভারতের প্রকৃত আরম্ভ ধরিলে তাহার পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি উহার উপক্রমণিকা স্বরূপ। ইহাই মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগের অনুবাদিত অংশ।

ক (১), খ (সাহিত্য), ঘ (৩)।

২১। **সীতার বনবাস**। ১৮৬০।

ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে সঙ্কলিত।

ক (১), খ (সাহিত্য), গ, ঘ (৩)।

২২। **ব্যাকরণ কৌমুদী** (৪র্থ ভাগ)। ১৮৬২।

২৩। **আখ্যান মঞ্জুরী** (১ম ভাগ)। ১৮৬৩।

পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে আখ্যানগুলি সঙ্কলিত। গ, ঘ (৩)।

২৪। **শব্দমঞ্জুরী**। ১৮৬৪।

বাংলা অভিধান। ঘ (৩)।

২৫। **আখ্যান মঞ্জুরী** (২য়, ৩য় ভাগ)। ১৮৬৮।

১ম, আখ্যান মঞ্জুরীর সঙ্গে আরও নতুন আখ্যানগুলি যোগ করিয়া ২য় ৩য় ভাগে রূপান্তরিত হইল। ঘ (৩খ)

২৬। **রামের রাজ্যভিষেক**। **অসমাপ্ত**। ১৮৬৯।

নারায়ণ বিদ্যারত্ন লিখিত 'রামের অধিবাস' গ্রন্থের অংশ বিশেষ।

সীতার বনবাসের পর রামের রাজ্যাভিষেক, কিন্তু 'সহচর' সম্পাদক শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এর "রামের রাজ্যাভিষেক" গ্রন্থ উপহার প্রাপ্তির পর নিজগ্রন্থ সমাপ্তির ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

খ (সাহিত্য), গ, ঘ (৪)।

২৭। **ভ্রান্তিবিলাস**। ১৮৬৯।

সেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' এর উপাখ্যানভাগ। বাংলা ভাষায় সঙ্কলিত।

ক (১), খ (সাহিত্য), গ, ঘ (৩)।

২৮। **অতি অল্প হইল** (বেনামী)। ১৮৬৯।

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।

খ (সমাজ), গ; ঘ (৪)।

২৯। **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার**। ১৮৭১।

প্রথম পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করা। কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় ও অন্যান্য দ্বারা বহুবিবাহের প্রথা দূর করার চেষ্টা। এবং তাহার বিরুদ্ধে যে আপত্তি তাহা মীমাংসাকল্পে প্রথম পুস্তক মুদ্রণের চেষ্টা এবং পীড়িত হওয়ায় স্থগিত। পুনরায় সনাতনধর্মরক্ষিণী সভা কর্তৃক বহুবিবাহ রোধ করা চেষ্টায় সহায়তা করিবে ভাবিয়া পুনরায় প্রকাশ। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে বহুবিবাহ সমর্থনকারীরা যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাদের মত খণ্ডন করিয়া দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত করেন। মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর অনূদিত ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ক(১), খ(সমাজ), গ, ঘ(৪)।

৩০। **বামনাখ্যানম্।** ১৮৭৩।

মধুসূদন তর্ক পঞ্চাননের ১১৭টী সংস্কৃত শ্লোক। তর্কপঞ্চাননের অনুরোধে বাংলায় অনুবাদ করিয়া নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করেন ঘ (৪)।

৩১। **আবার অতি অল্প হইল।** (বেনামী) ১৮৭৩।

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত। খ (সমাজ), গ, ঘ (৪)।

৩২। **ব্রজবিলাস।** (বেনামী) ১৮৮৪।

গৌড় দেশের সর্বপ্রধান সমাজ বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা হইয়াছিল, সেই সমস্ত জিনিষ পড়িয়া যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা ব্রজবিলাসে প্রকাশ করা হইয়াছে। খ (সমাজ), গ, ঘ (৪)।

৩৩। **বিনয় পত্রিকাঃ**

বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা। ১৮৮৪।

হিন্দুধর্ম রক্ষা করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ ছিল তাহা বিধৌত করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব ও মর্ম প্রতিপন্ন করা এই সভার উদ্দেশ্য। ২য় সংস্করণের ইহা বিনয়পত্রিকা নামে পরিচিত। খ (সমাজ), ঘ (৪)।

৩৪। **রত্নপরীক্ষা।** ১৮৮৬।

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এই তিন পণ্ডিতরত্নের প্রকৃত পরিচয় প্রদান। খ (সমাজ), ঘ ৪।

৩৫। **নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস।** ১৮৮৮।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত শিশু শিক্ষা গ্রন্থ রচনার অধিকার বিদ্যাসাগরের উপর দোষারোপ করেন। সেই দোষ খণ্ডনের জন্য এই গ্রন্থের প্রকাশ। গ, ঘ (৪)।

৩৬। **সংস্কৃত রচনা।** ১৮৮৯।

বাল্যকালের কতকগুলি সংস্কৃত রচনা। ছাত্রজীবনে যে রচনা লিখে পুরস্কার পাইয়াছিলেন তার সঙ্কলন। ঘ (৪)।

৩৭। **শ্লোকমঞ্জরী।** ১৮৯১।

কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ। খ (শিক্ষা ও বিবিধ), ঘ (৪)।

৩৮। **বিদ্যাসাগর চরিত।** ১৮৯১।

বিদ্যাসাগরের স্বরচিত আত্মচরিত তাঁর মৃত্যুর পর নারায়ণচন্দ্র শর্মা কর্তৃক প্রকাশিত। খ (সাহিত্য), গ, ঘ (৪)।

৩৯। **ভূগোলখগোলবর্ণনম্।** ১৮৯২। ৫১পৃঃ।

বিদ্যাসাগর যখন ন্যায়শাস্ত্রে অধ্যয়ন করিতেন তখন এই রকম পুস্তক প্রকাশনে সংকল্প

করেছিলেন নারায়ণচন্দ্র শর্মা। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁহার সংকল্পানুসারে এই গ্রন্থটী প্রকাশ করা হয়। এর ১০০টী শ্লোক পূর্ব রচনা। বাকী পরে সংযোজন। ঘ (৪)।

৪০। **প্রভাবতী সম্ভাষণ**। ১৮৯২।

বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রিয়পাত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে এই পুস্তিকা রচিত। ১২৯৯ সালে বৈশাখ মাসের 'সাহিত্যে' প্রথম প্রকাশিত হয়। খ (সাহিত্য), গ।

৪১। **মাতৃভক্তি**। ১৮৯৩।

'সখা'র এপ্রিলে প্রকাশিত। ঘ (৪)।

৪২। **শব্দ সংগ্রহ**। ১৩০৮।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর জীবিতকালে বহু খাঁটি বাংলা শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই শব্দ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ঘ (৪)।

৪৩। **ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস**। ১৩১৬।

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে 'মুকুলে' প্রকাশিত।

৪৪। **আমেরিকার আদিম নিবাসীর ন্যায়পরায়নতা**। ১৩১৯।

আষাঢ় সংখ্যা 'ধ্রুব'তে প্রকাশিত।

সম্পাদিত গ্রন্থ :

বাংলা : অন্নদামঙ্গল : ১৮৪৭ খৃঃ।

পদ্য স'গ্রহ : ১ম ভাগ ১৮৮৮।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত।

পদ্য সংগ্রহ : ২য় ভাগ ১৮৯০।

ভারতচন্দ্র রায় থেকে সঙ্কলিত।

ইংরাজি : (1) Selections from the writings of Goldsmith.

(2) Poetical selection from English Literature.

(3) Poetical Sclection.

হিন্দী : বৈতাল পচ্চীসী : ১৮৫২ খৃঃ

সংস্কৃত :

রঘুবংশম—	১৮৫৩।	কাদম্বরী—	১৮৬২।
কিরাতার্জ্জুনীয়ম—	১৮৫৩।	বাল্মীকি রামায়ণম	
সর্বদর্শন সংগ্রহ—	১৮৫৩-৫৮।	মেঘদূতম—	১৮৬৯।
শিশুপাল বধ—	১৮৫৭।	উত্তরচরিতম—	১৮৭০।
কুমার সম্ভব—	১৮৬১।	অভিজ্ঞানশকুন্তলম—	১৮৭১।

হর্ষচরিতম—১৮৮৩।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাধানাথ রায়

অবিভক্ত ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ, সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে লাহোরে অবস্থিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নাম সুপরিচিত ছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে খ্যাত আমেরিকান গ্রন্থাগারিক আশা ডন ডিকিনসনের নাম এর সঙ্গে জড়িত। ১৯১৫ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক থাকাকালীন, তিনি সেখানে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার স্কুল চালু করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার স্কুলের প্রথম প্রবর্তন করেন বরোদা রাজ্য গ্রন্থাগারিক, ১৯১১ সালে বরোদায়। দেশবিভাগের ফলে পূর্বতন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্তমান পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় ১৯৪৭ এর ১লা অক্টোবর এক বিশেষ সরকারী অর্ডিন্যান্স বলে। এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহের অভাব ও আর্থিক অপ্রতুলতার দরুণ বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন শহরে ও দিল্লীতে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে চালিয়ে যাওয়া হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্থান হয় সিমলাতে। কর্তৃপক্ষ একটি ভাল গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে সিমলার ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাবের ঘর ভাড়া করা হয় আর সেই ক্লাব গ্রন্থাগারের ১২০০০ পুস্তক ক্রয় করে সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজকর্ম সাময়িক-ভাবে চালু করা হয়। ১৯৫১ সালে নবনির্মিত চণ্ডীগড় শহরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩৩৩ একর জমি সংগ্রহ করেন। ১৯৫৮'র ডিসেম্বরে তদানন্তীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বর্তমান গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর এক বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাগার সিমলা থেকে এখানে স্থানান্তরিত করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট এই গৃহটি সম্পূর্ণ হতে প্রায় তিন বৎসর লাগে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ১৯৬৩'র ২৩শে অক্টোবর। চণ্ডীগড় শহরের স্থাপত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক গ্রন্থাগারের কাজকর্মের উপযোগী এই অপূর্ব গ্রন্থাগার ভবনটির স্থাপত্য পরিকল্পনা করেন বিখ্যাত ফরাসী স্থপতি মঁসিয়ে পি জানারেত। মডুইলার পরিকল্পনায় নির্মিত এই বাড়িটির প্রতিটি মডুলের (module) আয়তন ১৭'×১৭'।

সমগ্র গ্রন্থাগারের ভিতরের অংশটাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: কর্মীদের কাজের জায়গা, পুস্তকাগার (stock) ও পড়বার জায়গা। ছাত্রদের পড়বার জন্য দ্বিতলে ও চতুর্থতলায় পুস্তকাগার সংলগ্ন দুইটি বড় পাঠকক্ষ আছে। এই দুইটির মোট আয়তন ১৬,০০০ বর্গফুট এবং এখানে একসঙ্গে ৫০০ পাঠক পড়াশোনা করতে পারেন। এ ছাড়াও আরো তিনটি পাঠকক্ষ আছে -দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ও সাময়িক পত্রিকার জন্য দুইটি

একতলায় এবং শিক্ষকদের পড়বার জন্য পৃথক একটি চারতলায়। চলাচলের গোলমালের দরুন পাঠকদের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য প্রত্যেকটি পাঠকক্ষের মেঝেতে 'রাবার প্যাড' লাগান আছে। চারিতলা বিশিষ্ট পুস্তকাগারটি প্রধান পাঠকক্ষগুলিকে চারিপাশে যেন আবেষ্টন করে রেখেছে। পাঠকদের এতে অবাধ প্রবেশধিকার (open access) থাকার দরুণ সময় নষ্ট হবার সম্ভবনা কম থাকে। পুস্তকাগারের ৫ লক্ষ পুস্তক রাখার ব্যবস্থা আছে। প্রতি তলায় ছয়টি করে মোট চব্বিশটি কিউবিকল (cubicle) গবেষকদের পড়বার জন্য আছে। একতলা ও চারতলার মধ্যে বই আনা নেওয়ার জন্য দুইটি এলিভেটর (elevator) আছে।

গ্রন্থাগারের প্রসেসিং বিভাগগুলি রাখা হয়েছে একতলায়। বই লেনদেনের স্থান হয়েছে একতলায় প্রবেশ দ্বারের কাছে। তিনতলায় গ্রন্থাগারিকের কর্ম পরিচালনা কক্ষ। আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ প্রদর্শনীর জন্য শীর্ষতলায় একটি প্রশস্ত প্রদর্শনী কক্ষ আছে।

গ্রন্থাগারে বর্তমান পুস্তকের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। নীচের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে গত নয় বৎসরের পুস্তক সংখ্যা কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে :

বৎসর	পুস্তক সংখ্যা
১৯৬০	৮৬,৭১৭
১৯৬৪	২,০৬,২৮৫
১৯৬৮	২,৬০,৪৬২

ডিউই দশমিক নিয়মানুযায়ী পুস্তকাদি বর্গীকরণ করা হয়। সূচীকরণে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের নীতি অনুসরণ করা হয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যে ভারতীয় ইতিহাস, চারুকলা, ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যাই অধিক। এ ছাড়া সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, পারসী, উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায় বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি এবং স্বর্ণাঙ্কিত অপূর্ব মিনিয়েচার পেন্টিং'এর কিছু নিদর্শন এই গ্রন্থাগারের মহামূল্য সম্পদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রগুলি (Thesis Paper) সংরক্ষিত করা হয়। প্রায় ১৬শ পত্র-পত্রিকা গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসে।

সাধারণ কাজের দিনে গ্রন্থাগার দৈনিক ১৩ ঘণ্টা অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং রবিবার বেলা তিনটে থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় পুরোদমে চালুরাখা কালীন দৈনিক ১৫০০।১৬০০ পাঠক গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মীরাই প্রধানতঃ এর সভ্য। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানগত হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত কলেজসমূহ ও কিছু গবেষণাকেন্দ্র এই গ্রন্থাগারের সদস্য। পাঠকদের সহায়ক সদা-তৎপর 'রেফারেন্স' বিভাগ গ্রন্থাগারের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। বিভাগীয় গ্রন্থাগার-গুলি (Departmental libraries) বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগৃহীত হবার 'ক্যাটলগ' করা হয় ও এরপর চাহিদানুযায়ী

বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠান হয়। চণ্ডীগড়ের বাহিরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক ও ছাত্রদের সুবিধার জন্য লুধিয়ানায় একটি Extension library এবং সিমলা, রোহটক ও জলন্ধরে তিনটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (Regional library) খোলা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলে। আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক আদানপ্রদানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন কি বিদেশের বিশিষ্ট গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হয়। মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রো কার্ড পড়াবার জন্য একটি মাইক্রোফিল্ম রীডার ও একটি মাইক্রো কার্ড রীডার গ্রন্থাগারে আছে। মাসিক সংযোজন তালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত নতুন পুস্তকের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করান হয়। উল্লেখযোগ্য নতুন গ্রন্থগুলি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী গবাক্ষে (Show window) কিছুদিনের জন্য রাখা হয়। প্রদর্শনী কক্ষে প্রায়ই পুস্তক, চিত্র, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রী এস. এস. বোঠ লাহোরে থাকাকালীনই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় সিমলায় ইউ, এস ক্লাবের অল্প কয়েকটি পুস্তক নিয়ে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সূচনা হয়। বর্তমান গ্রন্থাগারিক ডঃ জগদীশ শর্মা ১৯৫৯ সালে কার্যভার গ্রহণ করেন। একদল তরুণ ও উৎসাহী সহকর্মীর সাহায্যে তিনি একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থাগারের মোট কর্মীর সংখ্যা ৭০ জন। এর মধ্যে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর সংখ্যা ৩০ ও অপেশাদারী কর্মী ৭ জন। বৃত্তিকুশলী কর্মীদের মধ্যে আছেন—গ্রন্থাগারিক ১ জন, উপগ্রন্থাগারিক ১ জন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের লেকচারার ১ জন, সহকারী গ্রন্থাগারিক ৪ জন, প্রধান সহকারী (First Asst.) ৪ জন, ১৫ জন সিনিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট ও ৫ জন জুনিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট। গ্রন্থাগারের প্রধান ছয়টি বিভাগের প্রত্যেকটির ভার একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক অথবা একজন প্রধান সহকারীর উপর ন্যস্ত থাকে।

১৯৬০ সাল থেকে এখানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি 'ডিপ্লোমা কোর্স' চালু করা হয়। বর্তমানে একে বি.লিব. এস-সি (স্নাতোকত্তর ডিগ্রী) পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জন শিক্ষার্থী এখান থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। পাঞ্জাব লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বার্ষিক গ্রন্থাগার সম্মেলন, 'সেমিনার' প্রভৃতি অনুষ্ঠান গ্রন্থাগারে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারগুলির মধ্যে ১৯৬৪ সালে 'গ্রন্থাগার আইন' সম্পর্কে ও ১৯৬৫ সালে 'চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের স্থান' শীর্ষক সেমিনার দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় আই. এস লিক (Iaslic) সেমিনার ও ১৯৬৬ সালে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ষোড়ষ বার্ষিক সম্মেলন এই গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Reference—(1) University News : July, 1969
(2) Punjab University Report.

Punjab University Library
: Radhanath Roy

সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য পুস্তকাদি

স্বদেশে

1. Children's book festival, 1968
   State Central Library, Ambala Hariyana.

   হরিয়ানার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত কিশোর-কিশোরীদের পাঠ্যাভাস সম্পর্কিত আলোচনা চক্রের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ। শিশুসাহিত্য ও গ্রন্থ, ছোটদের কোষ গ্রন্থ, ছোটদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস তৈরী করা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কীয় প্রবন্ধাবলী।

2. Learned Institutions in India :
   Activities and publications, comp. & ed. by Mohinder Singh, Ahmedabad, Balgovind Prakashan, 1969. 281 p. Rs. 16·00.

   ২৫১টি গবেষণামূলক ও শিক্ষামূলক সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ও তৎসহ তাদের প্রকাশিত ২০০০টি গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কর্মতৎপরতা ও প্রকাশনের বিবরণ।

3. Library Science : Based Service, by S. R Ranganathan. Madras, New Century Book House, 1969. Rs. 3·00.

   মাদ্রাজে গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলনে শ্রীরঙ্গনাথন কর্তৃক ভাষণের পুনর্মুদ্রণ। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা, গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর আলোচনা।

4. Modern Cataloguing : Theory and Practice by S. M. Tripathy. Agra, Shiva Lal Agarwala, 1969. 101 p. Rs. 15·00.

   অ্যাংলো আমেরিকান কোড, এ. এল. এ রুলস ও ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ কোড, এই তিনটি নিয়মেরই উদাহরণ সহযোগে আলোচনা। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থের এবং সমস্ত প্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রযোজ্য সূচীকরণ নিয়মাবলীর পরিশেষে সূচীকরণের উপর একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী আছে।

বিদেশে

5 ALA Rules for filing cataloguing cards ; ed. by P. A. Seely ; 2d ed Prepared by the ALA editorial committee. ALA, 1968, $ 2 00

   ১৯৪৩ সালের পর প্রথম সংশোধিত আকারে, পাঠক ও গ্রন্থাগারিক উভয়ের পক্ষেই সহজবোধ্য ও সুবিধাসূচক পদ্ধতিতে নতুন সূচীকরণ নিয়মাবলী।

6. Biographical Dictionaries of Scientists, ed. by T. J. Williams London, Adams & Charles Black, £ 5.

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এক হাজার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞের প্রামাণ্য জীবনী ও কীর্তি। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের গবেষণার উল্লেখ ও তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর সঙ্গে সম্পর্ক, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি তথ্যবহুল সংবাদ আছে।

7. Comulative Bibliography of Aslan Studies, 1941—1965. Boston, Asso. for Asian Studies, 1969.

• ইউরোপীয় ভাষায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, সুদূর প্রাচ্যের সমস্ত বিষয়ের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী। বিষয় ও লেখক সূচী পৃথক। ৪ খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম খণ্ড অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে।

8. (The) Dickens Encyclopaedia, by A. L. Hayward. London, Routledge Kegan Paul, 1969. 184 p. 42s.

ডিকেন্সের গ্রন্থাবলীর বর্ণানুক্রমিক এই কোষগ্রন্থ ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। বহুকাল অপ্রকাশিত থাকার পর পুনরায় গল্পের নাম চরিত্র, সঙ্গীত, স্থান প্রভৃতি প্রত্যেকটি উল্লেখিত বিশেষ শব্দ বা বাক্যের তথ্য সম্মিলিত কোষগ্রন্থ হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হলো।

9. Library Catalogue : their presentation and maintenance by photographic & automated techniques ; a study by the research libraries of New York public library ; ed. by J. W. Hendorson & J. A. Rosenthal. MIT Report No. 14. London, MPT Press, 1968. 70s.

পুরাতন ধ্বংসমুখ ক্যাটালগ কার্ডকে কি করে রক্ষা করা যায়। বর্গীকরণ ও সূচীকরণের নিয়মাবলীর পরিবর্তনের সঙ্গে পুরাতন কার্ডগুলিকে কি করে সমন্বয় সাধন করা যায়, প্রতিচ্ছবি গ্রহণ কি করে গ্রন্থের আকারে পুরাতন কার্ডগুলি রেখে দেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা।

10. Readers' Guide to books on computor and E. D. P, Comp. by P. F. Cox & M. Wooddrow. Londod, Library Asson. 2s. 6d.

১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত ৬০০০ হাজার পুস্তকের তালিকা।

11. University Libraries for developing countries by M. A. Gelfand (Unesco Memals for libraries—No 14) Paris, Unesco, 1968. 18s.

সমস্ত উন্নতকামী দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা। গ্রন্থাগারের উপর সরকারী কর্তৃত্ব, গ্রন্থাগারের বই হারানোর ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা।

সঙ্কলয়িত্রী : গীতা মিত্র

Books on Library Science : Compiled by Gita Mitra

সুখচর শশধর পাঠাগার ঃ (স্থাপিত—১৯০৪ খৃঃ)

সন্তোষ কুমার বসাক

খড়দহ আর পানিহাটি। মাঝে সুখচর গ্রাম। গ্রাম আর সহরের অপূর্ব সংমিশ্রণ। গ্রামের সকল বৈশিষ্টই আছে। আছে গাছপালা, পুকুর, পাখীর কলকাকলী। সহরের সুখ সুবিধারও অভাব এখানে নেই। আশেপাশে অনেকগুলি কারখানা গড়ে উঠেছে, কিন্তু গ্রামের ছন্দোময় জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। পূর্ব দিক দিয়ে চলে গিয়েছে বি, টি. রোড। বাস চলেছে ঘনঘন। কলকাতা এখান থেকে মাত্র ন' মাইল দূর। পশ্চিম দিকে গঙ্গার শান্ত জীবন। মাঝে মাঝে জোয়ার ভাটার অপূর্ব খেলা। পাড়ের কিছুটা অংশ চলে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। তীরের বট, অশ্বত্থ গাছ পড়েছে হেলে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে পানিহাটি গ্রামে এসেছিলেন। তিনি যে ঘাটে নেমেছিলেন, সে ঘাট এখনও ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান থেকে গ্রামের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে। রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের ষ্টেটের অধীন ছিল সুখচর গ্রাম। গঙ্গার ধার বেয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাগান বাড়ী—'রাজার বাগান'।

ধনজনে সমৃদ্ধ, প্রাচীন ঐতিহ্যপুষ্ট সুখচর গ্রামে পাঠাগারের গোড়াপত্তন হয়েছিল আজ থেকে ৬৪ বৎসর পূর্বে ইংরেজী ১৯০৪ সালে (বাংলা ১৩১১ সাল)। তখন এর নাম ছিল—"ইয়ং মেন্‌স লিটারারি এসোসিয়েশন"। কলকাতা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেন্দ্র, শিক্ষার পীঠস্থান। এরই ঢেউ এসে লাগল সুখচরের কয়েকটি কিশোরবৃন্দের মনের উপর। একটা কিছু করতে হবে—ভাল কাজ, জনসেবা, শিক্ষার প্রসার—গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা। চেয়ে চিন্তে বই এনে তক্ষুনি ইচ্ছেটাকে কাজে পরিণত করা হলো। সংগ্রহ হলো রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি। কিন্তু উপন্যাস ও অন্য ধরণের বইও পাঠাগারের জন্য প্রয়োজন। এবার চাই অর্থ, বই কেনা দরকার। গ্রামে বিত্তবান লোক থাকলেও তেমন সাড়া পাওয়া গেলনা। উদ্যোক্তাগণ নিরুৎসাহ হলেন না। নিজেদের থেকেই হলো টাকা সংগ্রহ। কেনা হলো নূতন ও পুরাতন পুস্তক। তারপর চললো পাঠাগারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপাত পরিশ্রম আর নিঃস্বার্থ সেবা। কিশোরদের পেছনে এসে প্রথম যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হলেন গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একটি টেবিল, একটি চেয়ার ও একটি আলমারি দান করলেন পাঠাগারের উদ্দেশ্যে। প্রথমে পাঠাগার শুরু হলো যুগল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানা ঘরে। নামকরণ হলো—"Youngmen's Literary Association", কার্যনির্বাহক সমিতিতে ছিলেন—সভাপতি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সভ্য : (১) বিষ্ণুপদ তরফদার, (২) কার্তিকচন্দ্র পাল, (৩) পরেশচন্দ্র সেন, (৪) মতিলাল ঘোষ, (৫) অভয়পদ হাজরা, (৬) নটবর দাস, (৭) যুগল চট্টোপাধ্যায়, (৮) বনমালি চরণ দে, (৯) সত্যহরি নন্দী ও আরো অনেকে।

পরের বৎসর ১৯০৫ সাল। বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে হঠাৎ পাঠাগার গৃহে আগমন হলো পুলিসের। পাওয়া গেল 'বোমা' তৈরীর করমূলার কাগজপত্র। হাতে নাতে ধরা পড়লেন কয়েকজন ব্যক্তি। পরপর আরও দু'বার পুলিসী জুলুম চলেছে পাঠাগার গৃহে। বইপত্র হয়েছে তছনছ। সরকারী চিহ্নিত নিষিদ্ধ পুস্তকগুলি রাখতে হয়েছে সরিয়ে। পুলিসী জুলুমের পর যে কয়খানা পুস্তক বেঁচে রইলো, তাই নিয়ে পাঠাগার পুনরায় কাজ চালাতে লাগলো কার্তিকচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতে।

'অনুশীলন সমিতি' যোগাযোগ করেছে পাঠাগার সভ্যদের সঙ্গে। পাঠাগারের মাধ্যমেই লাঠি খেলা, ছোরা খেলার পাঠ চলেছে দিনের পর দিন। কিছু দিন চলার পর পাঠাগার পুনরায় স্থানান্তরিত হলো ৺কালীপদ শেঠ মহাশয়ের বৈঠকখানায় ও পরে ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেউরির দোতলায়। দিনে দিনে পাঠাগার পুষ্টিলাভ করেছে। চাই বড় ঘর, জ্ঞানরাজ্যকে স্থান দেবার ঘর। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য সংগ্রহ হলো অর্থ। কালীতলায় নির্মিত হলো একতলা গৃহ। এই নির্মাণ-কার্যে দু'জন মহিলার দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনোদিনী দে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন। যা বিক্রয় করে তখন ৫৫০ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। অপরজন বিধু বেওয়া, যিনি জীবনের শেষ সর্বস্ব ৪৫০ টাকা দান করেন। এ ছাড়া রায়বাহাদুর ডাঃ গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস নাগ এবং গ্রামবাসীদের সহৃদয় দানে একখানি গৃহ তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। এই গৃহে সকালে ও দুপুরে বসতো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস। নাম—"সুখচর বঙ্গ বিদ্যালয়"। রাত্রে চলতো পাঠাগারের কাজকর্ম।

৺শশধর তরফদার মহাশয়, যিনি এই গ্রামের উন্নতিকল্পে অকাতরে পরিশ্রম করে অকালে কালের কবলে নিপাতিত হয়েছিলেন, তাঁরই নাম চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যগণের ও গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণের মত অনুসারে গ্রন্থাগারের নাম "সুখচর শশধর পাঠাগার" রাখা স্থির হয়। ফলে ২১শে আগষ্ট ১৯২৭ সালে গ্রন্থাগারের নাম "ইয়ং মেন্‌স লিটারারি এ্যাসোসিয়েশন"—এর পরিবর্তে "সুখচর শশধর পাঠাগার" নামকরণ হলো।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের দিকে যুবকগণ তেমন নজর দিতে পারেননি। কারণ, পরাধীন ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার প্রেরণায় তারা ছিলেন মগ্ন। ১৯০৪ সালে যে গ্রন্থাগার সামান্য কয়েকখানি বইয়ের পুঁজি নিয়ে আরম্ভ হয়েছিলো ক্রমান্বয়ে সেই গ্রন্থাগারের বই আরও বেড়েছে। এই সময় যাঁরা গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন—৺প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনীরোধশ্যাম ঘোষ মহাশয়। একটিমাত্র ঘরে তাকে আর কুলোয় না। চললো দ্বিতল গৃহ নির্মাণের জন্য যুবকদের

উৎসাহব্যঞ্জক শ্রম। পানিহাটি পৌরকর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণের সাহায্যে সংগৃহীত হলো প্রায় ৩,০০০৲ টাকা। ১৯৫২ সালের শেষার্দ্ধে নির্মিত হলো দ্বিতল কক্ষ। ছাদটি হলো টিনের। আসবাব-পত্রও তৈরী হলো। একতলার ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য।

১৯৫৩ সালের ৮ই জানুয়ারী গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠান হলো। গ্রন্থাগার দ্বিতলের নতুন ঘরে স্থায়ী বাসস্থান পেলো। এই বৎসরই বৈশাখ মাসে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ে টিনের চাল উড়িয়ে নিলো। সুসজ্জিত কক্ষ হলো বিনষ্ট। ইট-সুরকীতে চাপা পড়লো বহু গ্রন্থ ও দ্রব্যসম্ভার। কিন্তু যুবকদের উৎসাহের কোনদিনই অভাব হয়নি। আজও হলো না। দ্বিগুণ উৎসাহে ৩০০৲ টাকা সংগ্রহ করে নতুন করে ভাঙ্গা ছাদ তৈরী করা হলো। যুবকদের গ্রন্থাগার-মনা এবং উৎসাহ সংগঠনে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যিনি কর্মক্লান্ত দিনগুলিতেও পাঠাগারে এসে পাঠাগারের উন্নতি ও সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনের কথা চিন্তা করেছেন, কিন্তু খ্যাতির আশা করেননি, তিনি হলেন পাঠাগার-দরদী শ্রীমানিকলাল মিত্র। তিনি ১৯৩৫ সাল থেকে পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং তাঁর অমূল্য সময়ের অংশ নিয়মিত দিনের পর দিন গ্রন্থাগারের নানা কাজে ব্যয় করে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীই তাঁর উপদেশ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে ও পালন করে আসছে। এইভাবে সুখচর শশধর গ্রন্থাগার যুগ যুগ ধরে ইতিহাস রচনা করে চলেছে।

পরিচালন ব্যবস্থা : বাৎসরিক সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্য কর্তৃক ১২ জন কার্যনির্বাহক সদস্য নির্বাচিত হন। ইঁহারাই গ্রন্থাগারের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। এ ছাড়া মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একজন কর্মী পুস্তক আদান-প্রদান ইত্যাদি করেন।

গ্রন্থাগারের আয় : সদস্যের চাঁদা—প্রথম শ্রেণী ৭৫ পয়সা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ৩৮ পয়সা। প্রথম শ্রেণীর সদস্য দুইটি পুস্তক লইবার সুযোগ পান। 'কিশোর ভারতী' সদস্যের চাঁদা ১৩ পয়সা। ইহারা কিশোর ভারতী ভুক্ত পুস্তকগুলি লইবার অধিকারী। **সরকারী সাহায্য**—D S E O—২৪ পরগণা প্রতি বৎসর ১০০ টাকা এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি প্রতি বৎসর ৩৩০ টাকা পুস্তক খরিদ বাবদ সাহায্য করে।

পাঠকক্ষ : অমৃত, দেশ, মাসিক বসুমতী, সাপ্তাহিক বসুমতী গ্রন্থাগার, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিশুসাথী, শুকতারা, মৌচাক, আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। বেশীর ভাগ পত্রিকাগুলিই উদারমনা সদস্যগণ কর্তৃক সাহায্য দ্বারা ক্রীত হয়। পাঠকক্ষ ব্যবহার করতে সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নাই।

পুস্তক সংখ্যা : বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত ও পত্রিকা মিলিয়ে মোট পুস্তক সংখ্যা ৫৮৯৩ খানি। ইহার মধ্যে 'কিশোর ভারতী'র মোট ১০৭১ খানি।

গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ খোলার সময় : প্রতি বৃহস্পতিবার বাদে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯-৩০টা পর্যন্ত এবং রবিবার ও বুধবার সকাল ৮টা থেকে ৯-৩০টা পর্যন্ত।

সদস্য সংখ্যা : শশধর পাঠাগার—১২৯ জন এবং কিশোর ভারতী—৬০ জন। সর্বমোট—১৮৯ জন।

অনুষ্ঠান : নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্র জয়ন্তী, সরস্বতী পূজা, সদস্যগণ কর্তৃক নাট্যানুষ্ঠান, আবৃত্তি, সংগীত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

অন্যান্য বিভাগ

গ্রন্থাগার কেবলমাত্র গ্রন্থসম্ভারের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। তার কর্মশক্তিকে যথাযথ সমাজের কাজে লাগাবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে নানা বিভাগের।

১। কিশোর ভারতী : কিশোর বিভাগ।

দেশকে উন্নতি করতে হলে সর্বপ্রথম শিশুদের উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই কারণে ১৯৫৩ সালে "কিশোর ভারতী" নামে কিশোর বিভাগের সৃষ্টি হয় তখন এর সম্পত্তি ছিলো ৩৫০ খানি পুস্তক ও একটি কাঠের র‍্যাক।

এই বিভাগে একটি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতি রবিবার সকালে, কোন কোন দিন বিকেলে ইহার অধিবেশন বসে। ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা যোগ দিয়ে থাকে। এই আলোচনা-চক্রে গানবাজনা, আবৃত্তি, গল্প ও জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। সাধারণ জ্ঞানেরও পরীক্ষা লওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শীতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও আছে। এই বিভাগ থেকে হাতে লেখা একটি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

২। মহিলা সমিতি : "জাগরী"

গ্রামের মহিলাদের জ্ঞান প্রসার ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য এই 'জাগরী' সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। পরিচালনার দায়িত্ব ছিল পাঠাগার সভ্যদের। পাঠাগারের একতলার ঘরে বিদ্যালয়ের ছুটীর পর সেলাই শেখার ব্যবস্থা ছিল সপ্তাহে দু'দিন। বর্তমানে এই বিভাগটি উৎসাহী কর্মীর অভাবে বন্ধ আছে।

স্কুল প্রতিষ্ঠা

শিশুদের শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাতঃকালীন "নলিন স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়"টি এই গ্রন্থাগারের চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়েছে এবং ক্লাশের জন্য গ্রন্থাগার বাড়ীর নিচের তলা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ও মধ্যাহ্নে ঐ একই গৃহে ক্লাশের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পাঠাগারে পদার্পণ করেছেন ও এখানকার কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

Sukhchar Sasadhar Pathagar (1904)
: Santosh Kumar Basak

বার্তা-বিচিত্রা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনটি ৫,০০,০০০ টাকা খরচ সাপেক্ষে সম্প্রসারিত করা হবে।

* * *

অদূর ভবিষ্যতে জহরলাল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণে ১৩·৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। এর ফলে গ্রন্থাগারের পুস্তকাগারে ৫,০০,০০০ লক্ষ গ্রন্থ রাখা যাবে, ৮০টি, গবেষণা কক্ষ এবং ৬০০ জন পাঠক এক সঙ্গে পড়তে পারে এমন একটি বৃহৎ পাঠকক্ষ তৈরী করা সম্ভব হবে।

* * *

পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমিতি ও শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত করবে। এই আলোচনা-চক্রের বিষয় হলো : (১) কোলোন, ডিউই, প্রভৃতি বর্গীকরণের সমকালীন কার্যকারীতা ; (২) গ্রন্থ ও পত্রিকা লেন দেনের ব্যাপারে কতটা শ্রম সঞ্চয় করা যায় ; (৩) বই দেওয়া, হারানো ও চুরি যাওয়া ; (৪) আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক বিনিময় ও আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা ; (৫) শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ; (৬) গ্রন্থাগার ও প্রকাশক।

* * *

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের বাৎসরিক সম্মেলন আগামী ডিসেম্বর মাসে তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

* * *

ইউনেস্কোর প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কার মহম্মদ রেজা পহ্লভী পুরস্কার বোম্বের সমাজশিক্ষা সমিতিকে এই বছর অন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা দিবসে দেওয়া হয়েছে।

* * *

ইউনেস্কো স্থির করেছে গান্ধীর মানবিকতায় সত্য ও অহিংসা সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র প্যারিসে ১৪ই থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০-এ জানুয়ারীতে ভারতে গান্ধী শতবার্ষিকী জাতীয় কমিটি এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত করবে এবং বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় লেখা গান্ধীজীর একটি গ্রন্থপঞ্জী ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

চব্বিশ পরগণা

নেহেরু স্মৃতি পাঠাগার, সুভাষনগর, বনগ্রাম।

বিগত ৭ই আষাঢ় তারিখে এই পাঠাগারের ৩য় বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা উৎসব সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পণ্ডিত হেমেন্দ্রনাথ স্মৃতি-কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ। সভায় পাশ্চাত্ত্য দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবস্থা ও বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হয়। বর্তমান বৎসরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়।

বীরভুম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, সিউড়ী।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, রামরঞ্জন পৌরভবনে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুধীর কুমার করণ মহোদয়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী শ্রীশ চন্দ্র নন্দী।

মেদিনীপুর

বিবেকানন্দ জনকল্যাণ কেন্দ্র, ভিহিগুমাই।

বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর এই কেন্দ্রের উদ্যোগে আন্তর্জাতিকতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে একদিনের একটি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে মহিষাদল ১নং উন্নয়ন সংস্থার আধিকারীকের অন্তর্ভুক্ত ১৫টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের ৩০ জন কর্মী ও ৮ জন গ্রাম সেবক ও বিভিন্ন উন্নয়ণ সম্প্রসারকগণ এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুরু হয়—আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় ও গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

মুর্শিদাবাদ

দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার, রঘুনাথগঞ্জ।

বিগত ৯ই আগষ্ট এই পাঠাগারে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডি. এস. ই. ও শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য ও মহকুমা শাসক শ্রীঅসিত রঞ্জন দাসগুপ্ত। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, বিতর্ক ও ছোটগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠে।

হাওড়া

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার।

বিগত ২রা অক্টোবর বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার ভবনে গান্ধী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। শিশুবিভাগের সভ্যরা উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করে। বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীপান্নালাল কোলে ও গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীবাণীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় ভাষণ প্রদান করেন।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী, ত্রিবেণী।

এই পাঠাগারের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন বর্তমান বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পাঠাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠানগতসভ্য। বর্তমান বৎসরে অনুষ্ঠিত পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি যথা সময়ে না পাওয়ায় ঐ সভায় যোগদান করা সম্ভব হয় না।

বর্তমানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৫০৪৯ ও সদস্য সংখ্যা ২৭৫।

স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক

বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্তের স্মরণে প্রতি বৎসর 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের প্রবন্ধকারকে স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত স্বর্ণ পদক দেবার সিদ্ধান্ত কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৩৭৩ সালে স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত স্বর্ণ পদক দেওয়া হয়। ১৩৭৪ ও ১৩৭৫ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিচারের ফলাফল শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। ৫।১০।৬৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভায় প্রবন্ধ বিচারের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুমোদন করা হয় :

(ক) 'গ্রন্থাগার' উপসমিতির সুপারিশক্রমে কার্যনির্বাহক সমিতি প্রতি বৎসরের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচন করবেন।

(খ) নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের দ্বারা লিখিত কোন প্রবন্ধ বিচারের মধ্যে আনা হবে না।

(গ) কোন অনুদিত প্রবন্ধ বিচার করা হবে না।

(ঘ) একবার পদকপ্রাপ্ত প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ দ্বিতীয় বা ততোধিকবার বিচারের মধ্যে আনা হবে না।

(ঙ) কোন প্রবন্ধকার ইচ্ছে করলে নিজ প্রবন্ধ বিচারের বাইরে রাখার জন্য আবেদন করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁকে প্রতি বৎসরের শেষ সংখ্যা (চৈত্র সংখ্যা) বের হবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে।

চিঠিপত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়]

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
"গ্রন্থাগার", কলিকাতা-১৪।

বর্তমানে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের সরকারী সাহায্যে প্রাপ্ত (৮৪নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯) লাইব্রেরীতে যে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি ও আত্মীয়-তোষণ চলিতেছে তাহার কয়েকটি আপনাদের অবগতি ও প্রতিকারের জন্য জানাইতেছি।

(১) লাইব্রেরী কর্মীদের মধ্যে একমাত্র গ্রন্থাগারিক (LIBRARIAN) ব্যতীত আর কাহাকেও নিয়োগপত্র (appointment letter) দেওয়া হয় নাই। বহুবার অনুরোধ করা সত্বেও নিয়োগপত্র পাওয়া যায় নাই। এই নিয়োগপত্র বিহীন কর্মীদের বিনাকারণে সুবিধামত ছাঁটাই করিতে ২৪ ঘন্টার নোটিশই যথেষ্ট।

(২) গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী অনিল কুমার ঘোষকে গত ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিনা নোটিশে বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্তের কারণ তাহার শিক্ষার মান ম্যাট্রিক পর্যন্ত এবং আংশিক সময়ের জন্য (বেলা ৩টা হইতে রাত ৮টা) কোন কর্মচারী রাখিবেন না। অনিল ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে আজ প্রায় ৮ বৎসর সুনামের সহিত কাজ করিতেছে। তাহাকে মাসিক ৪৫ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া হইত এবং তাহার কাজের যোগদানের সময় তাহার শিক্ষা ও লাইব্রেরীর অভিজ্ঞতা জানিয়াই তাঁহাকে লইয়াছিলেন।

(৩) অনিল ঘোষকে বরখাস্ত করিবার পর উপযুক্ত লোক আনান হইবে বলিয়া সম্পাদক মহাশয় আশ্বাস দেন। কিন্তু তাহার স্থলে নন-ম্যাট্রিক ও লাইব্রেরীর সার্টিফিকেট বিহীন ও অভিজ্ঞতা শূন্য হলের কেয়ারটেকার শ্রীকল্যাণ কুমার রায়কে ঐ পদে বহাল করা হয়। তাহার লাইব্রেরীতে কাজের সময় সকাল ৯টা হইতে ১১টা পর্যন্ত স্থির হয়। অনিল ঘোষের ৫ ঘণ্টার স্থলে ইহার কার্য সময় দুই ঘণ্টা মাত্র—ইহা লক্ষ্য করিবার মতো। তাহার কার্যসময় দুই ঘণ্টা হওয়াতে পরবর্তীকালে উহা বাড়াইয়া সকাল ৭টা হইতে বেলা ১১॥০ পর্যন্ত করা হয়। যদিও লাইব্রেরী সকাল ৯টায় খোলে।

(৪) শ্রীমতী অনিমা ঘোষ বি এ. বি. টি. সার্টলিব (বি. এল. এ) লাইব্রেরীর দ্বিতীয় সহকর্মী হিসাবে ১লা মার্চ ১৯৬৫ হইতে কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু কল্যাণবাবুর আগমনের পর অনিমা ঘোষকে attendent দেখাইয়া কল্যাণবাবুকে (নন্‌-ম্যাট্রিক) দ্বিতীয় সহকর্মী হিসাবে দেখানো হয়।

(৫) শ্রীকল্যাণ রায়কে পূর্ব হইতেই কার্যরত হিসাবে দেখাইয়া সরকারী মহার্ঘভাতা

(Govt. D. A.) পরে বিল করিয়া লইয়া তাহাকে arrear paymont করা হয়। ইহার পরিমাণ প্রায় ৬০০ টাকা।

(৬) সতীবাবুর "Artico" অফিসের কর্মচারী শ্রীঅজিত কুমার মুখার্জীকে লাইব্রেরীর অন্যতম কর্মী হিসাবে দেখাইয়া তাহাকে মাসিক ৬০ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া হইত এবং বর্তমানে ১০০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। অজিতবাবু জীবনে কোন দিনও লাইব্রেরীতে পদার্পণ করেন নাই।

(৭) সরকার হইতে ডি. এ আসিবার পর কর্মীরা তাহা ২।৩ মাস পর উহা পান। এই দীর্ঘসময় টাকাটি তাঁহার ব্যবসায় খাটানো হয় বলিয়া শোনা যায়।

(৮) ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৬৯ সালের জুন মাসের মধ্যে ১৭ জন কর্মীকে বরখাস্ত অথবা তাহাদের পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। কোন কর্মীকে নিয়োগ করা হইল এবং কাহাকে কেন বরখাস্ত করা হইল তাহা ট্রাষ্টি বোর্ডের সভ্যরা কেহ জানিতেও পারেন না—কারণ এইগুলি সতীবাবুর ব্যক্তিগত ব্যাপারের মত।

(৯) এই কল্যাণবাবুর অশালীন আচরণে সহঃ গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী গায়ত্রী সেনগুপ্তা সতীবাবুকে বারবার জানাইয়া প্রতিকার না পাওয়ায় গত জুনমাসে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(১০) সম্প্রতি সম্পাদক মহাশয় বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীনরেশ চন্দ্র বসু মহাশয়কে এম. এ. ডিপ. লিব. বি. টি. সাহিত্য সরস্বতীকে অকর্মণ্য ও অপদার্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। নরেশবাবু গ্রন্থাগারে প্রথম হইতেই গ্রন্থাগারিক হিসাবে সুনামের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন।

এইরূপ স্বেচ্ছাচারী সম্পাদককে সরকার এখন কেন সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

আমরা প্রার্থনা করি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া এই অন্যায় অবিচার অবিলম্বে বন্ধ করুন এবং যাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন অথবা যাঁহাদের বরখাস্ত করা হইয়াছে তাহাদের অনতিবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন। ইতি—

বিক্ষুব্ধ প্রাক্তন কর্মীবৃন্দ

গায়ত্রী সেনগুপ্তা

৬৮।১০৮, যশোহর রোড, কলিঃ-২৮।

অনিল কুমার ঘোষ

১৪ই আগষ্ট, ১৯৬৯। ১৪।১।১, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬।

পরিষদ কথা

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা।

গত ত্রয়োবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (১৯৬৯) পরিষদের পক্ষ থেকে বাঙলা দেশের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং যুক্তফ্রণ্টের নূতন শিক্ষানীতির সফল রূপায়নের জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিষদের বেতন ও পদমর্যাদা সমিতির একটি গ্রুপ সভার আয়োজন করা হয় গত ২০।৯।৬৯ তারিখে। বিভিন্ন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে গ্রুপের সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শ্রীচঞ্চল কুমার সেন ও শ্রীপ্রবীর কুমার দে। এই গ্রুপ সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়:

(১) পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন চালু করা হোক।

(২) বাঙলা দেশের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হোক।

(৩) শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা নির্ধারিত করা হোক।

(৪) গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক।

বিঃ দ্রঃ—ইতিমধ্যেই পরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করা হয়েছে। বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের এই "গ্রুপে"র সংগে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা:

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতির ২৯।৮।৬৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে, পরিষদ ভবনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা শ্রীদ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭।৯।৬৯ তারিখে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী এই সভায় উপস্থিত থেকে তাঁদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি "অ্যাকশন কমিটি" গঠন করা হয়। প্রাথমিক কর্মসূচী

হিসেবে এই 'অ্যাকশন কমিটি'ই পূজাবকাশের পরে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগে সংযোগ স্থাপন করে একটি "কনভেনশনের" আয়োজন করবে ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করবে :—

সর্বশ্রী দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত (সভাপতি), নারায়ণ চন্দ্র সাধু (সম্পাদক), অনিলচন্দ্র পাল, বিনয় কুমার গুহ, সুবীর রায়, অঞ্জলী রায়চৌধুরী, সান্ত্বনা হক, শশাঙ্ক বাগচী, সুশান্ত ত্রিপাঠী আনন্দমোহন চ্যাটার্জী, সুকুমার বাগচী, অরুণদেও সিং, আদিত্যশেখর অধিকারী, সুধীরচন্দ্র পাল, কীর্ত্তি চক্রবর্ত্তী, হরেকৃষ্ণ দত্ত।

মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

বিগত ৬ই আগষ্ট '৬৯ গ্রন্থাগার কর্মীদের গণডেপুটেশনের সামনে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী পরিষদ প্রদত্ত স্মারকলিপি সহানুভুতির সহিত বিবেচনা করবার যে প্রতিশ্রুতি দেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সমিতি

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় পরিষদের সাধারণ কার্যালয়ে ডঃ আদিত্য ওহদেদারের সভাপতিত্বে। পত্রিকা সমিতির কর্মসচিবের বিবৃতি অনুযায়ী পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও প্রবন্ধের অপ্রতুলতার জন্য সক্রিয় ভাবে এই সমস্যার সমাধানে প্রত্যেক সদস্যকে অনুরোধ করা হয়। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ইংরাজীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী প্রকাশের জন্য পত্রিকা সম্পাদককে সাহায্য করার জন্য শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার সেনকে অনুরোধ করা হয়। পত্রিকার সহ-সম্পাদিকার প্রস্তাবক্রমে 'গ্রন্থাগার' সমিতির প্রত্যেক সদস্য অন্ততঃ তিনটি করে প্রবন্ধ সংগ্রহের দায়িত্ব নেবেন বলে ঠিক হয়।

এই সভা আরও প্রস্তাব করেন যে প্রেস সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী নেবেন, এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত, শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন ও শ্রীঅসীম ঠাকুর অবিলম্বে সচেষ্ট হবেন। এই সভায় আরও স্থির হয় যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করা হবে না।

সঙ্কলনে : তুষার সান্যাল

PUBLICATIONS OF UNIVERSITY OF CALCUTTA

1.	Aryyamanjusrinama Sangiti : (Sanskrit Tibetan Text) : Edited by Sri Durgadas Mukherjee. D/F Cap 8 Vo. Pp. 202 1963	15·00
2.	Asutosh Sanskrit Series No. 4 (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি—২য় খণ্ড) : Edited by Pt. Narendrakrishna Vedantatirtha. Royal 8 Vo. Pp. 442. 1964.	Rs. 9·00
3.	Aesthetic Enjoyments : By Dr. R. K. Sen. Royal 8 Vo. Pp. 568. 1966.	Rs. 25·00
4.	Critical Theories & Poetic Practice in the 'Lyrical Ballads'' (2nd Edition) : By Dr. Srikumar Banerjee. D/Demy 16 mo. Pp. 208. 1965.	Rs. 7·50
5.	Chandimangal (কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম বিরচিত) (in Bengali) Edited by Sri Bijanbehari Bhattacharyya. D/Demy 16 mo. Pp 640. 1966.	Rs. 15·00
6.	Dictionary of Indian History : By Sri Sachchidananda Bhattacharyya. Demy 16 mo. Pp. 904 1967.	Rs. 40·00
7.	Elements of Scientific Philosophy : By Dr. Provasjiban Chaudhuri. D/Demy 16 mo Pp. 184.	Rs. 15·00
8.	English Literary Criticism in 2nd half of the 18th Century : By Dr. Sailendrakumar Sen. D/Demy 16 mo. Pp. 424. 1965.	Rs. 15·00
9.	Indian Cultural Influence of Cambodia : (2nd Revised Ed) : Dy Dr. B. R. Chatterjee. D/Demy 16 mo. Pp. 304. & Maps. 1964.	Rs. 12·00
10.	Idealist Theory of Value : By Dr. Apala Chakrabarti. Demy 16 mo. Pp. 272. 1966.	Rs. 10·00
11.	Indian Feudalism c 300—1200 : By Shri Ram Saran Sarma. D/Demy 16 mo. Pp. 334. 1965.	Rs. 15·00
12.	(The) Jaina Prayer : By Dr. Harisatya Bhattacharyya. D/Demy 16 mo. Pp. 140. 1964.	Rs. 50·0

For Further Details Please Contact,

Publication Department, University of Calcutta.

48, Hazra Road, Calcutta-19.

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

STUDENTS' RE-UNION COMMITTEE 1969

P-134, C.I.T. SCHEME L II, CALCUTTA-14.

November 22, 1969

Dear friend,

We are glad to inform you that the Students' Re-Union function of this year is going to be held on December 21, 1969. Your co-operation is solicited.

We shall be highly obliged if you please send your subscription to the above mentioned address.

Thanks,

Yours sincerely,
Shambhu Nath Pal
Pranab Kr. Sengupta
Jt. Convenor,
Students' Re-Union Committee, 1969

৩৩৩

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৭ } { ১৩৭৬, কার্তিক

॥ সম্পাদকীয় ॥

জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ ও গ্রন্থাগার দিবস

জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হয়েছে গত ১৪ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর। শিক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে গ্রন্থাগারের অবদান ও প্রয়োজনীয়তার কথা আজ বার বার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। জাতীয় জীবনে শিক্ষা যে অপরিহার্য একথা সামাজিক চেতনা সম্পন্নদের বুঝিয়ে বলার অবকাশও নেই। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয় কি আমরা এ কথা বলতে পারি যে আমরা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল? গ্রন্থাগার তার সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই সমাজকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে থাকে। প্রাত্যহিক জীবনে গ্রন্থাগারের অসীম চাহিদার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সার্বিক গ্রন্থাগারের ব্যাপকতর প্রসার কিন্তু এজন্য প্রচেষ্টা বা চেতনা কোথায়? অন্য প্রদেশের কথা বাদ দিয়েও পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরলে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারি না. আজও সর্বস্তরে গ্রন্থাগার প্রসার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি। তা হলে কি এই ধারণাই করব যে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনা আজও! কার্যত তাই। বৎসর শেষ হতে চলেছে। শুরু হবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষা প্রস্তুতিতে অর্থ পুস্তক এবং বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় অংশগুলি মুখস্ত করেই অধিকাংশ পরীক্ষার্থী চাইবে পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে। কিন্তু সারা বছরে এই সব পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল্যায়ন কি শেষ পর্যন্ত অর্থপুস্তক আর কয়েকটি অতি অতি প্রয়োজনীয় (Very Very Important) অংশ মুখস্থের মধ্যেই শেষ হবে? সারা বছরের বিদ্যার্জনের মানদণ্ড কি কেবলমাত্র অর্থপুস্তক মুখস্ত করা! এর জন্য দায়ী কে? অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নেই কোন গ্রন্থাগার। নির্ধারিত পাঠ্য তালিকার অতিরিক্ত কোন জ্ঞানার্জনের পথে প্রথমেই বাধা! শিক্ষা মরশুম শেষ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করবে অসংখ্য অর্থপুস্তক ও সহায়িকা। পরিবর্ত্তিত হবে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা আর নতুন শাখা খোলার জন্য সচেষ্ট হবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এই অবস্থাতেও কি প্রতি প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন সকলে ?

আগামী ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে পালিত হবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। এই শুভদিনে আমরা স্বাগত জানাই প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মিকে, গ্রন্থাগার সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে। কেবলমাত্র কয়েকটি সভা, সমিতি বা বিশেষ সপ্তাহ ও দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করলেই গ্রন্থাগারের সম্যক প্রচার ও প্রসার হবে না। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি স্তরে। অধীত জ্ঞানকে ধরে রাখার জন্য গ্রন্থাগারের সাহচর্য যে একান্ত আবশ্যক সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। গ্রন্থাগারকে কেবলমাত্র শিক্ষিতদের জ্ঞান ভাণ্ডার আখ্যা দিয়ে গ্রন্থাগার-সেবা মূল্যায়নে ভুল ধারনার অবসান ঘটাতে হবে। গ্রন্থাগার কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি বিশেষের সেবাতেই নিযুক্ত নয়, সমষ্টির সেবাতেই এর আত্মনিয়োগ। সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে প্রত্যেকের কাছে, জনমানসে গ্রন্থাগার চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। গ্রন্থাগার দিবসের প্রাক্কালে আমরা যেন প্রত্যেককে বলতে পারি "এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।"

The National Library week
and the Library Day.

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (২২)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মেলনের সভাপতি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ইংরেজীতে তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণ দেন। তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশনে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া আপনারা যে সম্মান দিয়াছেন সেই সম্পর্কে আমি গভীরভাবে সচেতন। এই ধরণের অনুষ্ঠানে মামুলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বিনীত নিবেদন উপস্থিত করিতে অযথা বাক্যব্যয় না করিয়া আমি শুধু ইহাই বলিব যে, যে পেশা অবলম্বনের সুযোগ পাইয়া গর্ববোধ করিয়াছি তাহার নামেই আমি সবিনয়ে এবং সসম্ভ্রমে এই দুষ্প্রাপ্য সম্মান মাথা পাতিয়া লইয়াছি। প্রবীণত্বের ভার, সামাজিক মর্যাদা বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া আমি কোন দাবি করি না; বর্তমান সাংস্কৃতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত এবং মানসিক প্রগতির সর্বাধিক প্রভাবশালী ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অন্যতম অর্থাৎ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য যাঁহারা কাজ করেন বলিয়া দাবি করেন আমি যে তাঁহাদেরই একজন দীন প্রতিনিধি হিসাবে এখানে আসিয়াছি সেই সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে সচেতন।

আমার বন্ধুরা এবং যাঁহাদিগকে সাধারণ শিক্ষামানের বিচারে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃতিবান বলিয়া মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সরল বিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া থাকেন— তোমাদের উদ্দেশ্য কি, গ্রন্থাগার আন্দোলন কেন কর, এত বক্তৃতা, এত সম্মেলনের কি সার্থকতা? আমি তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হই না, বিরক্ত হওয়া ত' দূরের কথা। নিউইয়র্ক-এর কার্ণেগী সমিতির অর্থসাহায্যপুষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার শিক্ষাসংক্রান্ত সমীক্ষা পরিষদ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রতিবেদন বাহির করিলে অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের মধ্যে দারুণ শিক্ষার অভাব রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে উক্ত পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ইহা স্বীকার করিয়াছে। দুঃখের বিষয় আমরা কার্ণেগী সমিতির অর্থ সাহায্য পাওয়ার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত, আর আমাদের কর্তৃপক্ষ ও আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমীক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করার কোন ইচ্ছা বা কল্পনা পোষণ করেন না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই কাজের ন্যূনতম অংশবিশেষে হস্তক্ষেপ করিয়াছে মাত্র এবং আমরা যে সামান্য কাজ করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের মধ্যেও দারুণ শিক্ষার অভাব প্রকটিত হইয়াছে। আমরা সময়ে সময়ে ধীরেসুস্থে, সুস্পষ্টভাবে ও সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছি যে শিক্ষাসংক্রান্ত সাজসরঞ্জামের অপরিহার্য অঙ্গের দিক দিয়া আমরা শুধু পাশ্চাত্য দেশসমূহেরই যে অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি তাহা নহে জাপান, চীন, তুরস্ক, মিশরের ন্যায় প্রাচ্য দেশ এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মত শিশু দেশসমূহেরও অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি।

ইহা সত্য যে অবারিতদ্বার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সকল দিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে ব্যাপক, সার্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তির উপর ইহাকে দাঁড় করাইতে হইবে। কিন্তু যখন আমরা ভাবি যে আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কলা বিজ্ঞান পরিষদ ও অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সকল স্তরের ও পেশার লোকে ভর্তি বড় বড় সহরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নৈরাশ্যজনকভাবে ও শোচনীয়ভাবে ন্যূন তখন আমাদের এই ধারণা না হইয়া পারে না যে শিক্ষাসংস্কৃতির বাহক সংস্থা হিসাবে গ্রন্থাগারকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে আমাদের সহরের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এবং জনসংস্থার কর্তৃপক্ষের অনুকূল মনোভাব জাগিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। যখন অন্যান্য দেশসমূহ সুসজ্জিত সুপরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক ও অবারিতদ্বার সার্বজনীন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিবার ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে এবং দ্রুত উন্নতি করিতেছে তখন আমরা প্রায় কিছুই করিতে পারি নাই। দেশের নিরক্ষর জনগণের কথা আমি বলিতেছি না, কারণ কলঙ্কের বিষয় প্রাকৃত জনের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠরত এবং শিক্ষিত লোকদেরও কোন প্রগতিশীল ও সুদক্ষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহিত কোন সংস্রব নাই এবং ইহার কার্যধারা ও সুবিধার সম্বন্ধেও তাহারা কিছু জানে না। বন্ধ তাকের এলোমেলো সারিযুক্ত গ্রন্থাগার বলিয়া আখ্যাত দুর্দশাগ্রস্ত ছোট ছোট কুঠরীগুলিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, জনসংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে আত্মতুষ্টির ভাব দেখাইয়া থাকে তাহা লক্ষ্য করিলে কারুণ্যের উদ্রেক হয়। এই গ্রন্থাগার সমূহ বহু পূর্বেই পুরাতন এবং বিস্মৃত পুস্তকাবলীর গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে এবং তথাকথিত গ্রন্থাগারিক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়াই তাকাইয়া থাকে। তিনি কেমন করিয়া সাহায্য করিতে পারেন? গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা, পুস্তকনির্বাচন, আয়ব্যয়ের বরাদ্দের অনুপাত, পাঠকের চাহিদা ও প্রয়োজন, পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন ও বর্গীকরণ সম্বন্ধে তিনি যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সম্ভবতঃ তিনি আকরগ্রন্থ, গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত ও তথ্য সরবরাহের কাজের কোন সংবাদই রাখেন না। সাধারণতঃ সকলের ধারণা যে গ্রন্থাগারের থাকিবে সুপ্রশস্ত ও আরামপ্রদ বাড়ীঘর, সেখানে কতিপয় ভাবী জ্ঞানান্বেষী অন্যত্র ভাল জীবিকার সংস্থান করিয়া সময় কাটাইবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য অধ্যয়নে। এই ধারণা সর্বত্র সর্বাধিক প্রচলিত। যতদিন এই ধারণা থাকিবে ততদিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদৌ কোন ভবিষ্যৎ থাকিবে না। সভ্য এবং প্রগতিশীল দেশ বলিয়া যাহারা দাবি করে তাহারা তাহাদের দেশবাসীর জন্য দ্রুত প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার সাধন করিতেছে। শুধু বিলাসের জন্য তাহারা ইহা করিতেছে না, বরঞ্চ তাহারা ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে তাহাদের অগ্রগতি, জীবনসংগ্রামে তাহাদিগকে তৈয়ারী করিয়া তোলা ও তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখার পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক। আমাদের যে সকল উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহার মধ্যে এই অত্যাবশ্যকতার বোধ জাগানই সর্বপ্রথম কর্তব্য।

জনগণ কোন্ বই চান তাহার সমীক্ষা করাই শুধু প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের কাজ নয়,

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনাও তাহার অত্যাবশ্যক কাজ। যদি স্বীকার করা হয় যে সমাজের বা জাতির শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান আছে তাহা হইলে ইহাকে শুধু পুস্তকভাণ্ডার বলিয়া গণ্য করা উচিত হইবে না আর গ্রন্থাগারিকও কেবলমাত্র পুস্তকভাণ্ডারের রক্ষক বলিয়া সান্ত্বনা পাইবে না। বই নিজে নিজে পাঠকের কাছে যাইবে না, বইয়ের কাছে পাঠক যাহাতে আসে তাহা দেখাই হইবে গ্রন্থাগারিকের কাজ। যদি কোন গ্রন্থাগারিক ইহা দেখিবার পদ্ধতি না জানে তবে তাহার সেখানে থাকা না থাকারই সামিল হইবে।

আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়াছে। এক সময়ে মনে করা হইত যে বিদ্যালয়ে জনগণকে অক্ষরজ্ঞান দিয়া কোন একটা পাঠক্রমে শিক্ষিত করিয়া তুলিলেই জগৎ বাঁচিয়া যাইবে। এইভাব কার্যকরী হয় নাই। কারণ স্থানু সমাজের উপযোগী এই শিক্ষা দ্বারা ইহা স্থিতাবস্থা জীয়াইয়া রাখিতেই সহায়তা করিয়াছে। আজ শিক্ষাকে একটা জীবনব্যাপী সাধনা বলিয়া মনে করা হইতেছে এবং পরীক্ষা লইলে, উপাধি বা প্রশস্তিপত্র দিলেই শিক্ষা শেষ হয় না বা ইহাকে শেষ করা উচিতও নয়। আজ গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করার উপরেই একটা জাতির উন্নতি নির্ভর করে। বিদ্যালয়ে যে কাজ বিধিবদ্ধভাবে আরম্ভ হইয়াছিল এবং মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়াছিল গ্রন্থাগার সেই কাজই স্বচ্ছন্দভাবে চালাইয়া থাকে। সঠিক মনোবৃত্তির উন্মেষ সাধন এবং প্রয়োজনের প্রতি যথোচিত অবহিত থাকার উপরই ইহা নির্ভর করে। ছাত্রদিগকে ছাপান বই পড়ানই যথেষ্ট নয়। বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া ও ভালভাবে বুঝিয়া পড়িবার শিক্ষাই তাহাদিগকে দিতে হইবে আর আমাদের মনকে অনুসন্ধিৎসুও করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের নিয়ম বাঁধা শিক্ষা তাহা করিতে পারে না। শুধু ইহা দ্বারাই গ্রন্থাগার ব্যবহারের চাহিদা বাড়ান যাইবে।

প্রগতিশীল সমাজে প্রগতিশীল শিক্ষাপ্রসারে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন একটি বিশেষ অঙ্গ। গ্রন্থাগার বলিতে বই রাখিবার জন্য বাড়ীঘর ছাড়া আরও অনেক কিছু বুঝায়। যেহেতু শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার সাধনই ইহার উদ্দেশ্য সেহেতু যাহারা ইহার ভার লইয়া থাকে তাহাদের এমন শিক্ষা অর্জন করা দরকার যাহা দ্বারা তাহারা চালক ও উপদেষ্টারূপে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের কাজ বজায় রাখিতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বয়স্ক শিক্ষা, নিরক্ষর শিক্ষা, বেতারের মাধ্যমে শিক্ষা এবং চলচ্চিত্রের শিক্ষা বিষয়ক অনিয়মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিবার সুযোগ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। যে পরিবর্তনশীল জগতে আমরা বাস করি তাহার উপযোগী সংস্কৃতির সহিত খাপ খাওয়াইবার এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি বিকাশের মাধ্যম হিসাবে কেবল তখনই গ্রন্থাগার তাহার ন্যায্য স্থান লাভ করিতে পারিবে। আর এই বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিই প্রগতিশীল সমাজকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব করিয়া তুলিবে।

আমাদের উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয় এবং তাহার থেকে কম কিছু না হয় তবে কিভাবে তাহা কাজে পরিণত করা যাইবে? আমাদের প্রদেশে এখন নানা ধরণের বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার আছে এবং প্রদেশের সাক্ষরতার অনুপাতে তাহাদের সংখ্যা খুব কম নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের নিয়মাবলী অনুসারে বিদ্যালয়ে এবং মহাবিদ্যালয়ে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা ছাড়া প্রদেশে ছোট ছোট গ্রামীণ ও সহরে বহু গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু এগুলিকে সৌজন্যের খাতিরেই শুধু গ্রন্থাগার বলা হয়। কলিকাতা রোটারি ক্লাবের সভাদের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার সময় আমি ইহাই দেখাইয়াছিলাম যে আমাদের রাজধানীতেও এমন বহু সংখ্যক গ্রন্থাগার কলিকাতা পৌরসভার অনুদান পাইয়া থাকে যাহারা শুধু নামেই গ্রন্থাগার এবং পৌরসভার কর্তৃপক্ষও উদ্দেশ্যহীন নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতেছেন। ইহা সুস্পষ্ট যে এই অবস্থায় এই সকল গ্রন্থাগার হইতে যদি কোন প্রকৃত কাজ পাইতে হয় তবে ইহাদের উন্নয়নের আশু প্রয়োজন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া যে গ্রন্থাগারগুলি পূর্ব হইতেই আছে সেগুলির উন্নতি সাধন করাই হইবে আমাদের প্রথম কাজ।

আমি প্রথমতঃ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কথাই বলিতেছি। এইগুলি ন্যূনাধিক পরিমাণে এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে। এই গ্রন্থাগারসমূহের অবস্থার উন্নতি সাধনের এবং প্রয়োজন মিটাইবার জন্যে যে যে পন্থা অবলম্বন করা বিধেয় তাহার সম্বন্ধে খুটিনাটি আলোচনা করিতে চাই না। কারণ এই সম্মেলনে আপনারা বিশদভাবে এই সম্পর্কে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন। কিন্তু যে মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া ইহাদের পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হইবে তাহা সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া পারিলাম না।

বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের নিয়মাবলী অনুসারে প্রত্যেক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার রাখিতে হইবে এবং কোন না কোন মানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বজায় আছে ইহার প্রতি পরিদর্শক মহোদয় নজর রাখিবেন এই আশাও করা যায়। এক্ষণে আপনাদের কাছে আমি এই নিবেদনই করিতে চাই যে ইহার মান অত্যন্ত নীচু এবং বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মান কি হওয়া উচিত তাহা প্রায় না জানিয়াই স্থির করা হয়। অবশ্য এই গ্রন্থাগারে নিজেদের পাঠক্রম অনুযায়ী বইর ব্যবস্থা ত' থাকিবেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাহারা শিক্ষা দিতে চায় তাহাকে সার্থক করিতে হইলে ইহার থেকে অধিকতর ভাল ব্যবস্থা করার আশা আমরা রাখি। প্রথমতঃ তাহারা ছাত্রদের পাঠস্পৃহা জাগাইবে, দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে গ্রন্থাগারমনা করিয়া তুলিবে, তৃতীয়তঃ এবং ইহাই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়, তাহাদিগের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা বাড়াইবে। আমাদের বর্তমান বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ইহার কোনটাই করে না। বস্তুতঃ তাহাদের পরিকল্পনা ও সাজগোজ অনুযায়ী ইহার কোনটা করার অবস্থাই তাহাদের নাই। আমাদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারকে যে মর্যাদা দেওয়া উচিত তাহা দেন না। অনেক

সময় সর্বাধিক স্যাঁতসেঁতে এবং অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে গ্রন্থাগারের জায়গা দেওয়া হয়, প্রচুর পুস্তকসংগ্রহ নাই, উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং কোন পদ্ধতি না মানিয়া বই বাছাই করা ও ক্রয় করা হয়, ন্যূনাধিক পরিমাণে মামুলী ধারায় গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও যথোপযুক্তভাবে তালিকা প্রস্তুত করা হয় না, এত বেশী সময় পড়াশুনার কাজে লাগান হয় এবং পাঠক্রমও এত বেশী গুরুভার যে ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের কোন সময় থাকে না অথবা গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয় না, গ্রন্থাগারের পরিবেশ থাকে অনাকর্ষণীয় এবং যে গ্রন্থাগারিক একজন কেরাণী ছাড়া আর কিছুই নয় সে পাঠকদিগকে কোন পরামর্শ দিতে বা পথনির্দেশ দিতে পারে না।

ক্রমশঃ

Library Movement in Bengal (22)
: Gurudas Bandyopadhayay

বনগ্রামের সংস্কৃতি তীর্থ 'সাধুজন পাঠাগার'

সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধুজন পাঠাগার পশ্চিমবঙ্গের একটী বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—অবৈতনিক-সাংস্কৃতিক গ্রন্থাগার। ১৩৪১ (১৯৩৪) সালের ২৮শে আশ্বিন শুভ শারদ সপ্তমীতে, বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর বালক শ্রীমান গোপালচন্দ্র সাধু খেয়ালের বশে, মাত্র ৫ খানা বই নিয়ে "সাধুস্ ওন লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪৫ সাল থেকেই প্রকৃত পক্ষে ব্যাপকভাবে এই পাঠাগারের কাজ সুরু হয় শ পাঁচেক বই পত্রিকা নিয়ে। ১৩৪৯ সালে পাঠাগারের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয়, "সাধুজন-পাঠাগার"। ১৩৬৪ সালে পাঠাগারটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার রূপে সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং তদবধি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছে।

১৩৬১ সালে দুই হাজার বই, জমি, পাঠাগার গৃহ, আসবাবপত্র ও সাজ সরঞ্জাম সহ দশ হাজার টাকা মূল্যের পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু এবং তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধু রেজেষ্ট্রী দলিল মূলে জনসাধারণকে দান করেন। অতঃপর ৫ জনের অছিপরিষদ ও মোট ১৭ জনের কার্যকরী সমিতি বার্ষিক নির্বাচনের ভিত্তিতে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছেন। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সাধু একজন পরম বিদ্যোৎসাহী। তিনি স্থানীয় বনগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সাহিত্য সেবী, সুবক্তা ও সমাজ সেবক এবং ১৩৫১ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। বর্তমানে শ্রীযুক্ত সাধু তাঁর জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় চৌদ্দ সহস্রাধিক টাকা ও আরও জমি সম্প্রতি পাঠাগারকে দান করেছেন। সেই জমিতে এখন "বিরামকুঞ্জ" নামে পার্ক গড়ে উঠেছে। শ্রীযুত সাধু "সাধুজন পাঠাগার অধ্যক্ষ", নামেই সর্বত্র পরিচিত। শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধুও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং নিয়েছেন। ১৩৫৫ থেকে সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং ১৩৬৪ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক পদে তিনি অধিষ্ঠিতা আছেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বর্তমানে এই পাঠাগারের সাইকেল পিওন।

পাঠাগারটির বহু অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ এই পাঠাগারটি সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক পাঠাগার। এখানকার গ্রাহক হতে পাঠক-পাঠিকার কোন চাঁদা দিতে হয় না; তিনি আজীবন সদস্য রূপেও গণ্য হন। বাংলাদেশে অবৈতনিক পাঠাগার দুর্লভ।

আর একটি বৈশিষ্ট্য অবধি অধিগম্য প্রথার (open access system) প্রবর্তন। সামান্য ট্রেনিং নেবার পর প্রতিটি গ্রাহকই সরাসরি পুস্তকাগার থেকে বই বাছাই করে নিতে পারেন। পাঠাগারের ৩৪টি বৃহৎ বৃহৎ আলমারীতে দশ হাজারেরও বেশী গ্রন্থ আছে। সমস্ত বিষয়ের উপরেই উল্লেখ যোগ্য পুস্তক সংগ্রহ আছে। শব্দ কল্পদ্রুম, শিশু ভারতী, পত্রিকা সংগ্রহ, Encyclopaedia Britannica, American Educator

Encyclopaedia, Webster Dictionary, Decline and fall of Roman Empire, Principia mathematicia, Hunter's Indian Gazetteer প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থ এখানে সংরক্ষিত আছে। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় পুস্তক সংগ্রহই সবচেয়ে বেশী হলেও এখানে French, German, Russian, Latin প্রভৃতি ইউরোপীয় এবং হিন্দী, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, গুজরাটী, সিন্ধী, কাশ্মীরী, মারাঠী, আসামী কানাড়ী, পাঞ্জাবী, পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, নেপালী, তিব্বতী ভাষারও পুস্তক আছে। সামান্য সংখ্যক "পুঁথি"ও আছে।

সাধু যাদুপ্রদর্শনী নামে পাঠাগারের সংগে একটী যাদুঘরও প্রতিষ্ঠিত আছে। এতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুদ্রা, সারা দুনিয়ার ডাকটিকিট, বিশ্বশিল্পী চিত্র, মনীষীদের হস্তলিপি, তাঁদের ব্যবহৃত জিনিষপত্র, মূর্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক সঞ্চয়, ভৌগলিক উপাদান, দেশ বিদেশের স্মৃতি, আরকে রক্ষিত জীবজন্তু, দেশ বিদেশের খেলনা, আলোক চিত্রপঞ্জী, চিত্রপঞ্জী, স্বাক্ষর পুস্তিকা প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে।

পাঠাগারের অধীনে "সাধু-সংগীত সমাজ" নামে একটি বৈতনিক সংগীত বিদ্যালয় আজ ১৮ বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। "সাধু-সংস্কৃতি সংঘ" নামক নাট্যবিভাগটি নিয়মিত নাটক পরিবেশন করে থাকেন। "চলো যাই ভ্রমণে", নামক ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে প্রতি বর্ষে নিকট-মধ্য দূর পাল্লায় ভ্রমণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। পাঠাগারের নিজস্ব বই বাঁধাই বিভাগের নাম, "গ্রন্থনী"।

সাধুজন পাঠাগার বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগে গত তিন দশক থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও এর সদস্য ভুক্ত। এটি ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদেরও সদস্য।

প্রতিবর্ষে ২৮শে আশ্বিন পাঠাগারে বার্ষিক উৎসব সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে প্রতিবর্ষে একজন স্থানীয় গুণীকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। বিভিন্ন গুণপনার জন্য সভাসভ্যাদের পদক-পুস্তক, অভিজ্ঞানপত্র উপহার দেওয়া হয়। বিশ্বের মনীষী ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাবাণীও পাঠ করা হয়। জ্ঞানতপস্বী শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শ্রীফণিভূষণ রায়, শ্রীচঞ্চল কুমার সেন প্রভৃতিও এই উৎসবে বিভিন্ন বর্ষে পৌরোহিত্য করেছেন।

নেতাজী জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী, সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে উভয়ের সম্বন্ধে বিস্ময়কর সংগ্রহ সমৃদ্ধ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মাসে ও তারিখে মনীষী স্মৃতি তর্পণ, ঋতু উৎসব, বিতর্ক, পাঠচক্র, সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পাঠাগারের কাজ পারতপক্ষে মাতৃভাষা বাংলাতেই করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের আড়াই শতাধিক জ্ঞানী গুণী মণীষী ব্যক্তি সাধুজন পাঠাগার পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

"জনগুঞ্জন স্বাগতম" নামে পাঠাগারের নিজস্ব সংগীত আছে। প্রতিটি উৎসবেই এটি বহু কণ্ঠে গীত হয়। পাঠাগারের নিজস্ব পতাকা আছে। এই পাঠাগারের সময়নিষ্ঠা

প্রবাদ বাক্যের ন্যায়। পাঠাগারের মুখপত্র, "সাধুজন পত্র", ২৪ বছর ধরে চলছে। প্রতি বুধবার বিকালে, "গল্পদাদার মজলিশ" নামে ছোটদের আসর বসে আসছে গত ২২ বছর ধরে। বিরামকুঞ্জে নানা প্রকার খেলাধুলার ব্যবস্থাও আছে।

পাঠাগারটির সাধারণ বিভাগ ছাড়া স্বতন্ত্র কিশোর ও মহিলা বিভাগ আছে। গবেষক-দের সুবিধার জন্য "যতি বিভাগ" (scholar section) আছে। ছাত্রদের সুবিধার জন্য গতবর্ষে পাঠ্যপুস্তক বিভাগ খোলা হয়েছে। "স্বেচ্ছা সরবরাহ বিভাগ" থেকে সাইকেল পিওন মাধ্যমে বই বিলি করা হয়। এর অধীনে "পোষক-পাঠাগার"ও আছে।

পাঠাগারটিতে একটী মনোরম "পত্রিকা পরিষদ্" বিভাগ আছে। তিনখানা দৈনিকপত্র, রবিবারে ৭ খানা দৈনিকপত্র, অর্দ্ধশতাধিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিকপত্র রাখা হয়। পাঠকক্ষের আসনসজ্জা ও বিজলী ব্যবস্থাও সন্তোষজনক। পাঠাগারটি দৈনিক সকালে ৪ ঘণ্টা ও বিকালে ৩ ঘণ্টা খোলা থাকে, কোন সাপ্তাহিক ছুটি নেই। বছরে মাত্র ১৭ দিন পাঠাগার বন্ধ থাকে। প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতিতে বছরে প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয় হয়ে থাকে।

সাধুজন পাঠগারের বাঁধানো স্থানের পরিমাণ প্রায় ১১২০ বর্গ ফুট। ক্রম বর্ধমান পুস্তক সংগ্রহ ও বহুতর বিভাগের জন্য পাঠাগারে এখন স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। পাঠাগার কর্তৃপক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে গৃহ সম্প্রসারণের এক পরিকল্পনাও নিয়েছেন। কিন্তু সরকার ও জনসাধারণ মুক্ত হস্তে অর্থদান না করলে এই পরিকল্পনা আশু রূপায়নের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সাধুজন পাঠাগারে বনগ্রামের সংস্কৃতি তীর্থ। গত ৩৫ বৎসর যাবৎ দেশবাসীর সেবা করে আসছে। কলকাতা থেকে মাত্র ৭৫ কিলোমিটার দূরে, ৬৫ হাজার জন সমৃদ্ধ বনগ্রাম সহরের কেন্দ্রস্থলে ৩৫ নং জাতীয় সড়ক যশোর কলকাতা রোড থেকে মাত্র ৫ গজ দূরে, ইছামতী নদীর ভাসমান পুলের বাঁদিকে তপোবন সদৃশ কোলাহল মুক্ত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সাধুজন পাঠাগার সেবাব্রতের আদর্শ নিয়ে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছে। সে আহ্বানে সাড়া দিন।

Sadhujan Pathagar
: Sudhir Chandra Bandyopadhayay

পশ্চিমবঙ্গের বয়স্ক শিক্ষার কথা

সত্যব্রত সেন

বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করে এই প্রবন্ধ লিখছিনা। তবে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে বয়স্কশিক্ষা প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত একজন কর্মী হিসাবে এ'বিষয়ে দু'চারটি কথা সাধারণের জ্ঞাতার্থে লিখতে সাহসী হয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা প্রতি হাজারে ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে বেড়েছে ৫৩ জন। অথচ এই সংখ্যা গুজরাটের ক্ষেত্রে ৭৪, অন্ধ্রে ৮১, মহারাষ্ট্রে ৮৯, পাঞ্জাবে ৯০, মাদ্রাজে ১০৬ এবং মণিপুরে ১৯০ জন। আরেকটি আদমসুমারীতে এ সংখ্যা কি দাঁড়াবে জানি না। তবে পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় ২৫ লক্ষাধিক টাকা প্রতি বছর ব্যয় করে যাচ্ছেন :

(ক)	নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র—	৪২৫টি
(খ)	,, ,, এর সম্পূর্ণকেন্দ্র—	৫৩৩টি
(গ)	এক শিক্ষক পাঠশালা—	৬৮২টি
(ঘ)	নৈশ বিদ্যালয়—	৭৬৪টী
(ঙ)	বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়—	৩২টি

এ ছাড়া ২০টি ভ্রাম্যমান অডিও-ভিসুয়াল কেন্দ্র আছে যাদের জিম্মায় একটি জীপগাড়ী ও প্রোজেক্টারাদি দেওয়া হয়েছে, এবং আরও ২০টি কমিউনিটি সেণ্টারও আছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও অল্পবিস্তর ব্লক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

এখন (ক) পর্যায়ের ৪২৫টি কেন্দ্রে একজন শিক্ষক আছেন। তিনি সাক্ষরতা বিষয়ে পাঠ দেওয়া ছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত কিছু শিক্ষা দেবেন।

(খ) পর্যায়ের ৫৩৩টি সম্পূর্ণ কেন্দ্রে দু'জন শিক্ষক আছেন। একজন সাক্ষরতা বিষয়ে পাঠ দেবেন, অন্যজন সমাজশিক্ষা বিষয়ে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শেষোক্ত শিক্ষক (ক) পর্যায়ের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা বিষয়ে পাঠ দেবেন।

(গ) পর্যায়ের এক শিক্ষক পাঠশালাও প্রায় (ক) পর্যায়ের কেন্দ্রের মত তবে এগুলির শিক্ষকদের মাসিক ভাতা কিছু বেশী—১০।২০ টাকার স্থলে কোথাও ৩০ টাকা, কোথাও ৫০ টাকা। আনুষঙ্গিক খরচের জন্য সর্বক্ষেত্রের অবশ্য মাসিক ১০ টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হয়।

নৈশ স্কুল বা বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়গুলি অবশ্য মূলতঃ সাক্ষরতার জন্য নহে ; অধিক পাঠগ্রহনেচ্ছু, স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা চালিয়ে যেতে অক্ষম ব্যক্তিবর্গের জন্য।

এই চিত্রটি ব্যাপক নিরক্ষরতার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে খুবই অপ্রতুল হলেও

তুলনামূলকভাবে এর সাফল্য আরও অপ্রতুল বা সামান্য। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে যদি হাজারে ৫৩ জন অতিরিক্ত স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে ১৯৭১ সালে তা খুব জোর আর ৫৩ জন বাড়বে, অর্থাৎ শামুকের গতি। ফলে সাক্ষরতার প্রয়োজন গণতন্ত্রী দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের সহায়ক হওয়া, কিন্তু এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী উন্নয়ণের সহায়তা করতে একেবারে ব্যর্থ।

এর কারণ কি ?

কারণ অবশ্য একেবারে মূলে প্রথমে। তারপর ছড়িয়েছে অন্যত্র। মূলে বলতে এই বোঝাতে চাই, সমাজের কর্ণধাররা এর সাফল্য আন্তরিকভাবে হয়ত কামনা করেন নি। যদি এক্ষেত্রে সাফল্য কাম্য হতো, তাহলে সরকারী অর্থব্যয়ে কি হচ্ছে, তার উপর নজর রাখা হত অনেক যত্নের সঙ্গে। কিন্তু তা হয় নি।

গত ২০ বছর যাবৎ যাঁরা শিক্ষক হিসাবে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত, খোঁজ নিলে দেখা যাবে (১) তাদের বৃহত্তর অংশকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে কি পদ্ধতির শিক্ষা অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে কোন শিক্ষাদান করা হয়নি। (২) নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রের অনেকেই নানা দলাদলি ও সভাসমিতি নিয়ে ব্যস্ত। (৩) বয়স্ক শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তকাদিও প্রকাশিত হয়েছে খুব সামান্য। কোনও মিশন থেকে সরকারী অর্থানুকূল্যে "সমাজ শিক্ষা" নামে যে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, উপযুক্ত বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা হিসাবে যথেষ্ট সাফল্যজনক নয়।

ফলে, জেলায় জেলায় সমাজশিক্ষা অধিকারিক ও তদধীন সমাজশিক্ষা সংগঠকদের পরিদর্শনের কাজ মোটেই আশাপ্রদ নয়। বলা বাহুল্য এসব কাজ গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতিনিয়ত পরিদর্শন অসম্ভব। গ্রামের লোকেরা সহযোগিতা না করলে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে একথা সত্য যে নিরক্ষর গরীব গ্রামবাসীদের একবার জড় করতে পারলে, আন্তরিকতা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে, স্বাক্ষরতার প্রকৃত তাৎপর্য একবার বুঝিয়ে দিলে, অনেকদিন তার রেশ থাকে, কিছু ফল প্রাপ্তিও অবশ্যম্ভাবী।

কাজেই গত ২২ বছরের ব্যর্থতার কথা স্মরণে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রোগ্রাম নতুনভাবে রচিত ও অনুসৃত না হয় তবে হতাশার চিত্র আবারও দেখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কুচবিহারে ২২টি গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাফল্য সংবাদ কোন কোন সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে (মালদহ বাদে) কুচবিহারই বোধহয় নিরক্ষরতার দিক থেকে সবচাইতে পশ্চাৎপদ জেলা। এখানে ব্যক্তিগতভাবে এই জেলায় ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ে যে জাতীয় সম্মেলন হয়েছে, তার প্রস্তুতি কমিটির তরফ থেকে তিনজন প্রতিনিধিও সম্প্রতি ঘুরে এসেছেন। ঐ রিপোর্ট, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় সংবাদপত্র 'কোচবিহার সমাচার" মারফৎ জ্ঞাত খবর থেকে বলা যেতে পারে, এখানেও কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। এইভাবে

নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা মোটেই সাফল্য লাভ করবে না, ঢাকঢোল পেটালেই তো আর উৎসব হয় না।

তবে, একাজে সরকারী পরিদর্শক সম্প্রদায়ের সঙ্গে উৎসাহী কলেজের ছাত্রদের বা বেকার শিক্ষিত যুবকদের ব্যাপক যোগাযোগ ঘটিয়ে কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার। শিক্ষকের কাজে দীর্ঘদিনের নিয়োগপ্রথা একেবারে অকেজো। প্রাইমারী শিক্ষকদের কারও কারও জন্য উপরি পাওনার বন্দোবস্ত করে দেওয়ার মধ্যেও সাফল্যের আশা ক্ষীণ। সাথে সাথে অবশ্য প্রয়োজন, মহকুমা ভিত্তিতে প্রতিবছরের সাফল্যে হিসাব প্রতিবছরেই নেওয়া, প্রকৃত অবস্থার পর্যালোচনা করা। শুধুমাত্র মাইনে পাওয়ার ছাড়পত্রস্বরূপ মাসে মাসে সংখ্যা কণ্টকিত রিপোর্ট একাজের নিয়ামক বা পরিচায়ক ধরলে আবার ভুল হবে। কাজের জন্য উপযুক্ত মেসিন ঠিক না করে অর্থব্যয় করার অর্থ অর্থব্যয়ের অঙ্ক দেখিয়ে বাহাদুরী দেখানো বা হতাশা ডেকে আনা মাত্র।

Adult Education System in West Bengal
: Satyabrata Sen

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম লেনিন গ্রন্থশালা

লেখিকা : তাতিয়ানা পস্ত্রেমোস্তা

(মস্কোর লেনিন লাইব্রেরির সেক্রেটারি)

লেনিনের নামে চিহ্নিত

মস্কোর লেনিন গ্রন্থশালা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম এবং বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম। লেনিনের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁরই নামে এই গ্রন্থশালার নামকরণ করা হয়। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে এই লাইব্রেরির উদ্বোধন হয় এবং বহু বছর ধরে এটা ছিল রুমিয়ান্তসেফ সংগ্রহশালার একটি অংশ হিসেবে। রুশ রাষ্ট্রনীতিবিদ এন. বি. রুমিয়ান্তসেফের স্মৃতিতে সংগ্রহশালাটির এই নাম দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরই যাবতীয় বই, পাণ্ডুলিপি, নৃকুলবিদ্যা আর প্রত্নবিদ্যা সংক্রান্ত নানা সংগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে এই সংগ্রহশালা আর গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়।

গ্রন্থাগারটি যখন স্থাপিত হয় তখন এর একটির বেশি পাঠকক্ষ ছিল না, আর সেই পাঠকক্ষে মাত্র কুড়িজন পাঠকের বসার জায়গা ছিল। তার পরেও কয়েক দশক ধরে মাত্র চারজন গ্রন্থাগারিককে নিয়ে একটি কর্মীদল এর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করে এসেছেন। কিন্তু তখনও এই গ্রন্থশালায় ছিল ১ লক্ষ গ্রন্থের একটি খুব বড়ো সংগ্রহ। বহু প্রগতিশীল রুশ বুদ্ধিজীবী এই লাইব্রেরিতে এসে জড়ো হতেন। এখানকার পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে লেনিনও ছিলেন। পাঠকদের লাইব্রেরির হাজিরা-খাতায় সই করার জন্যে অনুরোধ করা হত। আগস্ট ২৬, ১৮৯৩ তারিখে, ২৩৬ নম্বরের পাশেই লেনিনের স্বাক্ষর দেখা যাচ্ছে। সেই সময়ে তিনি সামারা থেকে সেন্ট পিটার্সবুর্গে যাবার পথে দিন কতক মস্কোয় ছিলেন। ১৮৯৭ সালে ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি লেনিন আবার এই লাইব্রেরির পাঠকক্ষে পড়বার জন্যে এসেছিলেন। সে সময়ে এটা 'রুমিয়ান্তসেফ সাধারণ গ্রন্থশালা' নামে পরিচিত ছিল।

বিপ্লবপূর্ব কালে এই গ্রন্থশালার পাঠকদের মধ্যে ছিলেন তলস্তয় দস্তয়েভস্কি চেখফ মেন্দেলিয়েফ তিমিরিয়াজেফ ৎসিওলকোভ্‌স্কি কোরোলেঙ্কো প্রভৃতির মতো রুশ সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ।

আজ মস্কোর ছোট বড়ো আর মাঝারি চার হাজার গ্রন্থাগার রয়েছে। এবং বহু লোকেরই নিজস্ব অতি সুন্দর গ্রন্থসংগ্রহ রয়েছে। তবু, এই লেনিন লাইব্রেরি তার বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার এবং বহু দুষ্প্রাপ্য আর অনন্যসাধারণ বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জনসাধারণকে আকর্ষণ করে চলেছে—বিশেষ করে যারা গবেষণামূলক কাজে রত তাদের।

১৫৫০ থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়ায় প্রকাশিত ৫,৫০,০০০ বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে এবং অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত ২০ লক্ষ বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে যে কোনোটি এখানে পাঠকের কাছে লভ্য। সেই সঙ্গে, মুদ্রণশিল্পের

উদ্‌ভাবনের পর থেকে গত ৫০০ বছরের মধ্যে বিদেশে মুদ্রিত বহু বইও এই গ্রন্থাগারে পড়বার জন্যে পাওয়া যাবে।

সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ার জন্যে এই গ্রন্থাগারে একটি বিশেষ হল-ঘর রয়েছে যেখানে পাঠকরা সোভিয়েত ও বিদেশী সংবাদপত্র আর সাময়িক পত্রিকা পড়তে পারেন (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ৭,৩০০ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়)। গ্রন্থাগারে প্রতি বছরে বিদেশে প্রকাশিত ১৬,০০০ সাময়িক পত্রিকা আর প্রায় এক হাজার সংবাদপত্র এসে পেঁছায়।

গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার লোক লেনিন লাইব্রেরির পাঠকক্ষগুলিতে এসে পড়াশোনা করেন। এঁদের অধিকাংশই মস্কোবাসী, কিন্তু এঁদের মধ্যে অন্যান্য সোভিয়েত শহর গ্রামের অধিবাসী এবং পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের সবগুলির লোকজনও আছেন। ১৯৬৮ সালে ১১০টি বিভিন্ন দেশের চার হাজারেরও বেশি বিদেশী নাগরিক লেনিন লাইব্রেরিকে তাঁদের কাজে লাগিয়েছেন।

বিভাগীয় ব্যবস্থা

পাঠকদের সুবিধার জন্যে বিভাগীয় ব্যবস্থার নীতি অনুযায়ী পাঠকক্ষগুলির কাজকর্ম পরিচালিত হয়, বিজ্ঞান অকাদমির সদস্য আর উচ্চ ডিগ্রিধারী গবেষক-বিজ্ঞানীদের জন্যে একটি হলঘর আলাদা করে রাখা হয়েছে। কতকগুলি হলঘর আছে যেগুলির প্রত্যেকটিতে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কলেজের শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে এক-একটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বা জ্ঞানের এক-একটি শাখার পাঠ্যবিষয়সমূহ। এ ছাড়া, ৫০০ আসনযুক্ত একটি সাধারণ পাঠকক্ষও আছে : এখানে পড়াশোনা করে তারা যাদের কোনো কলেজ-ডিগ্রী নেই, বিশেষত ছাত্ররা। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবস্তুর জন্যে বিশেষ বিশেষ ঘর রয়েছে— সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা, মাইক্রোফিল্‌ম্, পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য বই, সংগীতের স্বরলিপি ইত্যাদি। মোট ২,৫০০ জন পাঠকের আসনযুক্ত ২২টি পাঠকক্ষ রয়েছে।

১৯৬৮ সালে লাইব্রেরির মোট পাঠক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫ লক্ষ এবং মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ বই-পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশন পাঠকদের পড়বার জন্যে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য শহরের পাঠকদের জন্যে লেনিন লাইব্রেরির একটি আন্তঃ-গ্রন্থাগার বই ধার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সাময়িক ভাবে ব্যবহার করার জন্যে ৫ হাজার সোভিয়েত গ্রন্থাগারকে আর ৫০০ বিদেশী গ্রন্থাগারকে প্রায় ৫ লক্ষ বই এই লেনিন গ্রন্থাগার ধার দিয়ে থাকে। এইভাবে বারো শতেরও বেশি সোভিয়েত শহর-গ্রামের পাঠকরা লেনিন লাইব্রেরি থেকে বই ধার করে পড়তে পারেন।

এই গ্রন্থাগারে রয়েছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ৮৯টি ভাষায় এবং ১০৯টি বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত ২ কোটি ৫০ লক্ষ বই, পুস্তিকা, প্রতি বছরের বাঁধানো সাময়িক পত্রিকা আর সংবাদপত্রের ফাইল। প্রতি বছরই প্রায় ১০ লক্ষ নূতন বই আর পত্র-পত্রিকার দ্বারা এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে চলেছে আর এগুলি রাখার জন্যে দরকার হচ্ছে বাড়তি ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ তাক। এই গ্রন্থাগারে মোট তাকের দৈর্ঘ্য ৪৫০ কিলোমিটারেরও বেশি।

লাইব্রেরিটা ঘুরে দেখে বেড়াবার সময়ে আপনি দুষ্প্রাপ্য সংস্করণগুলির বিভাগে আসবেন যেখানে সংরক্ষিত আছে বহু রুশ ও বিশ্ব সাহিত্যের চিরায়ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ; চারুকলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু দুষ্প্রাপ্য বই। এই বিভাগে বিশেষ করে লেনিনের রচনাবলী খুব ব্যাপকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। পাণ্ডুলিপি বিভাগে আছে একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে লেখা অসংখ্য পাণ্ডুলিপির এক বিশাল সংগ্রহ।

বইকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে এই গ্রন্থাগার প্রতি বছরে সাত শতেরও বেশি পুস্তক-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা সময়োচিত সমস্যাবলী কিংবা বার্ষিকী আর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এইসব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কাজ

লেনিন গ্রন্থাগারের 'রেফারেন্স' গ্রন্থাগারিকরা প্রতি বছরে টেলিফোনে, ডাকে বা টেলেক্স যোগে প্রাপ্ত প্রায় ১,৪০,০০০ প্রশ্ন আর অনুসন্ধানের উত্তর দিয়ে থাকেন। এই গ্রন্থাগার নিয়মিত ভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশ করে, বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী সুপারিশ করে, গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজে উদ্যোগী হয় এবং পাঠকদের জন্য বিবরণমূলক গ্রন্থতালিকা সম্বন্ধে সেমিনার বা আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করে থাকে।

পাঠক-সম্মেলন এবং লেখক ও পত্রিকা-সম্পাদকদের সঙ্গে পাঠকদের মিলন-আসর সংগঠিত করার মতো জনসাধারণের জন্যে যেসব সমাবেশের ব্যবস্থা লেনিন গ্রন্থাগার করে থাকে তা বিশেষ জনপ্রিয় এবং এগুলি খুব ব্যাপক আর সোৎসাহ আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে।

সংগীত প্রেমিকদের জন্যে লাইব্রেরির সংগীত বিভাগ প্রতি শনিবারে তার রেকর্ড সংগ্রহ থেকে নির্বাচিত কতকগুলি রেকর্ড বাজাবার ব্যবস্থা করে থাকে।

লেনিন গ্রন্থাগার আজ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার বৃহত্তম কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে খুব বড়ো বড়ো সংস্করণে গ্রন্থ-বিজ্ঞান আর গ্রন্থাগার পদ্ধতিসমূহ সম্বন্ধে যেসব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয় তা গোটা দেশ জুড়ে অন্যসব গ্রন্থাগারের পক্ষে তাদের নিজেদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে।

লেনিন গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিক সংযোগগুলি খুব ব্যাপক। গ্রন্থাগার সমিতিসমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের কাজে-কর্মে এই গ্রন্থগারের কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এখানে এবং বিদেশে তাঁদের সহযোগীদের সঙ্গে ঘন ঘন এইসব সাক্ষাৎ আর আলোচনা বহু দেশের গ্রন্থাগারিকদের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে থাকে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ১৯৬৯ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা

প্রথম শ্রেণী

গুণানুসারে

	রোল নং	নাম		রোল নং	নাম
১।	১৩৪	পূর্ণিমা রায়	৬।	৭৩	সুনন্দা দত্ত
২।	৬১	কমল কিশোর দাস	৭।	১৩৬	রত্না রায়
৩।	১৫৬	সুধীর কুমার সেন	৮।	৩৮	দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
৪।	৪	সাগরমল আগরওয়াল	৯।	৮৪	দীপশিখা ঘোষ
৫।	১১২	কল্প মজুমদার	১০।	১৪১	প্রণিতা সাহা

দ্বিতীয় শ্রেণী

রোল নং অনুযায়ী

রোল নং	নাম	রোল নং	নাম
২	সমরেন্দ্রনাথ আচার্য	৪৩	উদয়শঙ্কর চন্দ্র
৩	নিমাইচাঁদ অধিকারী	৪৪	অরুণ বরণ চট্টোপাধ্যায়
৬	পরমেশ কুমার বাগচী	৪৫	ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়
৭	অনীত বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮	ইন্দিরা চৌধুরী
৮	ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	রথিন চৌধুরী
১০	গীতাঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১	তৃপ্তি চৌধুরী
১১	গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২	দিলীপ কুমার দোলুই
১২	কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩	অশোক কুমার দাস
১৩	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪	বিজন বিলাস দাস
১৬	শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০	গোপালচন্দ্র দাস
১৭	সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৩	উমারাণী দাস
১৯	ছায়া বসু	৬৭	অনুভা দত্ত
২৬	আশুতোষ বেরা	৭০	লাবণ্য দত্ত
৩০	মলয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৭১	রত্না দত্ত
৩২	পুষ্প ভৌমিক	৭২	সুভাষচন্দ্র দত্ত
৩৩	সুবোধচন্দ্র ভৌমিক	৭৭	নিশিথ কুমার দে
৩৭	বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী	৭৯	তারাশঙ্কর দে
৩৯	মধুমালা চক্রবর্তী	৮৫	ডলি ঘোষ

রোল নং	নাম
৮৬	পরেশনাথ ঘোষ
৮৯	সুমিতা ঘোষাল
৯০	বিমান বিহারী গোস্বামী
৯১	সজল কুমার গোস্বামী
৯৩	রত্নেশ্বর গুহরায়
৯৭	কিরণ প্রকাশ হালদার
৯৮	রথীন্দ্রনাথ হালদার
১০০	অলোক কুমার জানা
১০৪	মদন মোহন কুণ্ডু
১০৫	পুলক লাল কুণ্ডু
১০৬	সুখেশ কুণ্ডু
১০৭	ডলি লাহা
১০৮	অনিল কুমার মহাপাত্র
১০৯	অমিয় ভূষণ মাইতি
১১০	অসীম কুমার মাইতি
১১৭	দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়
১১৮	নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
১২০	তপতী মুখোপাধ্যায়
১২১	শিপ্রা নাগ
১২৪	পরিমল কুমার নস্কর
১২৬	বিমল কৃষ্ণ পাল
১২৮	শম্ভুনাথ পাল
১৩০	কালীপ্রসাদ
১৩১	অজিত কুমার রক্ষিত
১৩২	বি, এস, ভি রামানা
১৩৩	কৃষ্ণা রায়
১৩৭	স্নিগ্ধা রায় চৌধুরী
১৪০	প্রণতি সাহা
১৪৩	প্রভাসচন্দ্র সামন্ত
১৪৫	বিশ্বনাথ সরকার
১৪৮	পুষ্প রঞ্জন সরকার
১৪৯	রাজেশ্বর সরকার

রোল নং	নাম
১৫০	সন্তোষ কুমার সরকার
১৫১	শুভ্রা সরকার
১৫২	মিহির কুমার সেন
১৫৩	নীলিমা সেন
১৫৫	প্রজ্জ্বল সেন
১৫৭	সুমিত্রা সেন
১৫৮	আরতি সেনগুপ্তা
১৫৯	প্রণব কুমার সেনগুপ্ত
১৬২	অশ্বিনী কুমার শীল
১৬৩	পুষ্প সিন্‌হা
এন ১	বেবী বসু চৌধুরী
এন ২	বিশ্বনাথ বেরা
এন ৩	রমেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী
এন ৮	অবিনাশ চন্দ্র দাস
এন ৯	অনন্ত কুমার দাস
এন ১০	গীতা দাস
এন ১৪	অসি রঞ্জন দে
এন ১৫	মিনতি দে
এন ১৬	নিমাইচাঁদ ঘোষ
এন ১৭	নিবেদিতা ঘোষ
এন ১৮	সুলতা ঘোষ
এন ১৯	বাদল চন্দ্র ঘোষ রায়
এন ২০	কমল কৃষ্ণ ঘোষাল
এন ২১	বিনয় কুমার গুহ
এন ২২	নির্মলেন্দু গুপ্ত
এন ২৩	জীবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
এন ২৪	অরুণা মাইতি
এন ৩০	সনাতন পাল
এন ৩২	নমিতা রায়
এন ৩৩	গীতা রায়
এন ৩৪	নিবেদিতা সাহা
এন ৩৬	মায়া সেনগুপ্ত
এন ৩৯	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

Gram : Dokcentre

To

Mr. Raychaudhury,
Bengal Library Association,
P 134, C.I.T. Scheme 52,
Calcutta-14.

From

S. R. Ranganathan, M.A, L.T,
D. Litt, F.L.A.
National Research Professor in
Library Science

In reply please quote 2. 215, GAW of 15 Sept 1969.

My dear Raychcudhury,

This refers to your letter of 10 September 1969.

Subject :

1. Many thanks for your letter.

2. Convey the indebtedness of my wife and myself to the members of the Bengal Library Association for the unusually kind sentiments expressed by them.

3. Your words of appreciation are move in the measure of your kindness to me than anything else.

4. This kindness originated as far back as 1930, when I came into intimate contact with my good friend and your then President Kumar Munindra Deb Roy Mahasay—and Mr. T. C. Dutta. Though neither of them belonged to the library profession, their devotion to library cause put us all to shame.

5. I remember Mahasay making a journey to Madras to attend my course of University lectures and school library work

6. I remember also he and Dutta accompanying me to Banaras to attend the meeting of the Library Service Section of the First All Asia Educational Conference. I remember equally well the grand procession he arranged from the heart of the city of Calcutta to Bansberia, visiting each library on the way—, on my return home from Banaras to Madras.

7. I remember too Mahasay detaining me in Calcutta at that time for a few days to adapt my Model Library Act into a Library Bill for Bengal.

8. It is a great pity that though nearly 40 years had passed since then, Bengal is still without a library act.

9. Now that you have got a building of your own, and the library profession of Bengal stands behind your Association more solidly and move actively than in any other State, or in India, as a whole. I hope and pray that you succeed in the matter of Library Legislation without any delay.

10. Let me again tell you how much my wife and myself have been moved by your letter.

11. May God bless all the members of the Bengal Library Association and secure every success in its endeavour.

Yours sincerely,

S. R. Ranganathan

শ্রীযুক্ত ডেরেক ল্যাংরিজের ভারত সফর

নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ পলিটেকনিকের স্কুল অব লাইব্রেরিয়ানশিপের বর্গীকরণ ও সূচীকরণের প্রধান অধ্যাপক Mr. Derek Langridge আগামী ডিসেম্বর মাসে সারদা রঙ্গনাথন বক্তৃতার বক্তা হিসাবে ভারতে আসছেন। এর পূর্বে তিনি ১৫ই থেকে ২৫শে নভেম্বর কলিকাতা পরিদর্শনে আসবেন।

শ্রীযুক্ত ল্যাংরিজ ইংরাজী সাহিত্যে ডিগ্রী গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এক বৎসরের পাঠক্রমে শিক্ষিত হন। গ্রেট বৃটেনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশন "Cowpers powys : a record achievments"—এই বিবিলিওগ্রাফিক্যাল গবেষণার জন্য তাঁকে ফেলোশিপ প্রদান করেন। সোসাইটি অব ইনডেক্সের তিনি একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ইউ. ডি. সি. রিভিশন কমিটিরও তিনি সভ্য ছিলেন। ১৯৫৫ সালে শ্রীরঙ্গনাথনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৫৯-৬২ সালে তিনি Ashridge management College এর ইনফর্মেশন সার্ভিসের প্রধান ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি বর্তমান পলিটেকনিকে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত ল্যাংরিজের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে Ashridge : a guide to Ashridge past peresent, John cowpers powys : a record of achievement. Your Jazz collection. (শীঘ্রই প্রকাশিত হবে) এবং Sayers Memorial volume ও Traininging Indexing এর বিষয় নির্ঘণ্ট তিনি সঙ্কলন করেন। শ্রীযুক্ত ল্যাংরিজ পশ্চিমবঙ্গে সফরকালীন, রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় রাজ্য গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, ইণ্ডিয়ান ষ্টাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি পরিদর্শন করবেন। ১৭ নভেম্বর ১৯৬৯ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক এক সম্বর্ধনা সভায় "শিক্ষার জন্য গ্রন্থাগারিকতা এবং গ্রন্থাগারিকতার জন্য শিক্ষা" এই বিষয় বক্তৃতা করবেন। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করবেন এবং অরগানাইজেশন অব নলেজ এর সেমিনারে যোগদান করবেন।

পরিষদ কথা

২৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিলের ৫ই অক্টোবর, ১৯৬৯ তারিখের সভায় ২৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক) আগামী সম্মেলন ১৫ই মার্চ ১৯৭০ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের স্থান ও সময় পরে ঘোষণা করা হবে।

খ) সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান শ্রীবসিরুদ্দিনকে আহ্বান জানান হবে।

গ) সম্মেলনে আলোচনার জন্য আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের অনুরোধ জানান হবে :

১) অমলাংশু সেনগুপ্ত —স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সুপারিশ।

২) তুষার সান্যাল —কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সুপারিশ।

৩) প্রবীর দে —বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সুপারিশ।

৪) দ্বিজেন গুপ্ত —গবেষণামূলক ও বিশেষ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সুপারিশ।

৫) সত্যব্রত সেন —ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সুপারিশ।

৬) সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থাগারে পুস্তক হারানোর সমস্যা ও সুপারিশ।

ঘ) ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে উপরোক্ত প্রস্তাবমূলক প্রবন্ধগুলি পাওয়া গেলে সম্মেলনের পূর্বে গ্রন্থাগারে ছাপান হবে।

ঙ) উৎসাহী গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে প্রস্তাব রচয়িতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিরক্ষরতা বিরোধী দিবস পালন :

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর পরিষদ ভবনে মুখ্য সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রীঅমিয় কুমার সেনের সভাপতিত্বে নিরক্ষরতা বিরোধী দিবস পালন। সভায় বিভিন্ন বক্তা দেশের নিরক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকার বিস্তৃত বিবরণ দেন। বক্তাদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার আইন চালু করার দাবী জানান।

স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্তের জন্মতিথি উদ্‌যাপন :

বিগত ১১ই অক্টোবর শুভ মহালয়া তিথিতে শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের জন্ম দিবস ভাবগম্ভীর পরিবেশে পরিষদ ভবনে উদ্‌যাপিত হয়। এই সভা উপলক্ষে শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীসুধীর চন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর পিতার একটি আবক্ষচিত্র পরিষদকে দান করেন। তিনি পিতার সংগৃহীত ত্রৈমাসিক গ্রন্থাগারের কিছু পুরোন সংখ্যা দান করেন এবং পরিষদ সম্পর্কিত চিঠিপত্র, পত্রিকা ও অন্যান্য তথ্যবহুল কাগজপত্র পরিষদকে ভবিষ্যতে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় সর্বশ্রী গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পরিষদের সঙ্গে ৺তিনকড়িবাবুর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও পরিষদে তাঁর অবদান বিশেষ করে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণে তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করে পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ও প্রেরণা দাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি :

(ক) প্রতাপ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার-কর্মী-সভা

গত ২২.১০.৬৯ তারিখে পরিষদের নিজস্ব ভবনে প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা বসে। ঐ গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে সর্বশ্রী নরেশচন্দ্র বসু ও জ্যোতিষ দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

ঐ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিষদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সরকারের যথোচিত দপ্তরে ঐ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিরসনের অনুরোধ জানিয়ে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

(খ) কুচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা।

কুচবিহারের গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীজিতেন নন্দীর ওপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি ও রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে ১ ১১ ৬৯ তারিখে এক আলোচনা হয় পরিষদ ভবনে। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অন্যান্যদের মধ্যে সর্বশ্রী প্রাণকৃষ্ণ শীল ও বি. সেন। 'কুচবিহার সমাচার' এর সম্পাদক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ও এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এই আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুসারে সমাজশিক্ষা দপ্তরের মুখ-অধিকর্তার নিকট এক স্মারক-লিপি পেশ করা হয়।

শ্রীজিতেন নন্দীর ওপর থেকে অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে অবিলম্বে স্বীয় পদে যোগদান, বকেয়া বেতন প্রদান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে মুখ্য অধিকর্তার নিকট দাবি জানান হয়।

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ৫.১১.৬৯ তারিখের একপত্রে শ্রীজিতেন নন্দী পরিষদকে

জানিয়েছেন যে, তাঁর ওপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহৃত হয়েছে এবং তিনি স্বীয় পদে যোগদান করেছেন।

(গ) স্কুল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ. জি. সি বেতনক্রম চালু করা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

গত ৭.১১.৬৯ তারিখে পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, চঞ্চল সেন, সত্যব্রত সেন, রামকৃষ্ণ সাহা, প্রবীর দে ও তুষার সান্যাল।

(ঘ) পঃ বঃ অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ণের দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সভার দৃষ্টি আকর্ষণ।

গত ৬ই ও ১০ই নভেম্বর '৬৯ পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি যুক্তফ্রন্টের উভয়দিনে অনুষ্ঠিত সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৬ই নভেম্বর '৬৯ এক সাক্ষাৎকারে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার জানান যে, ১০ই নভেম্বরের যুক্তফ্রন্টের সভায় নির্দিষ্ট বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১০ই নভেম্বর '৬৯ তারিখে যুক্তফ্রন্টের সভায় পরিষদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত বিষয়ে অন্যান্যদের মধ্যে সর্বশ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, সত্যপ্রিয় রায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য, ইলা মিত্র, প্রণব মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সংগে সাক্ষাৎ করে উপরোক্ত বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

দ্বিতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ

(১৪ই—২০শে নভেম্বর ১৯৬৯)

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক উদ্‌যাপিত হবে। ১৯৬৮ সালে ১৪ই নভেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা স্থির হয় এবং ঐ বৎসর যথোপযুক্তভাবে উক্ত দিবস ও সপ্তাহ পালন করা হয়। ১৯১৯ খৃঃ ১৪ই নভেম্বর, বরোদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ডাইরেক্টর শ্রী জে. এস. কুদালকার মাদ্রাজে সর্ব ভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয় এবং এই কারণে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১৪ই নভেম্বর শ্রীজহরলাল নেহেরুর জন্ম দিবস উপলক্ষে 'শিশু দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। 'শিশু দিবসে'—ভারতের ভাবীকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধারক ও বাহকদের গ্রন্থমুখী করার জন্যও এই দিনটি স্থিরীকৃত হয়েছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আশা করেন, সমস্ত গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পুস্তক-

সংস্থা, শিশু-গ্রন্থ-সংস্থা, সাহিত্য আকাদেমি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী সংস্থা, গ্রন্থাগারিক এবং যারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তারা সকলেই, সভা, আলোচনা, ছায়াচিত্র, প্রদর্শনী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচার মারফৎ এই দিবস ও সপ্তাহটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন করবেন। এই অনুষ্ঠান দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে· (১) জনসমাজের তরুণ শ্রেণীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করা (২) নিরক্ষরতার অভিশাপ দেশ থেকে মুছে ফেলার জন্য সমস্ত জাতকে সচেতন করার প্রচেষ্টা। এই সঙ্গে এই অনুরোধ করা হচ্ছে প্রতিটি গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই দিবস ও সপ্তাহ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ যেন জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদে যথা সময় প্রেরণ করেন।

তৃতীয় জাতীয় গ্রন্থমেলা

(১৫ই নভেম্বর—৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬৯)

ভারতের জাতীয় পুস্তক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ৩য় জাতীয় গ্রন্থ মেলা আগামী ১৫ই নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৯ বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের জাতীয় পুস্তক সংস্থা ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হয়। এই সংস্থা ভারতীয় জনগনকে উত্তোরত্তর গ্রন্থমনা করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী, মেলা, আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত করে। ১৯৬৬ সালে এর ১ম গ্রন্থমেলা বোম্বাইতে ও ১৯৬৭ সালে ২য় গ্রন্থমেলা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান মেলা প্রধান বৈশিষ্ঠ্য ১৯৬৭ সালে জানুয়ারী মাস থেকে সমস্ত ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত নির্বাচিত গ্রন্থের সম্মেলন। এই সময় ১৪ই—২০শে নভেম্বর পর্যন্ত গ্রন্থ সপ্তাহ ও সেই সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই মেলা উপলক্ষে প্রকাশক ও গ্রন্থ বিক্রেতাদের এক সম্মেলন এবং "ভারতে প্রকাশনের ক্ষেত্রে আমদানীকৃত গ্রন্থের প্রভাব" ও "তরুণদের জন্য গ্রন্থ"—এই দুটি বিষয়ের উপর আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। এখানে ১৯৬৮ সাল থেকে প্রকাশিত বইএর জ্যাকেটের একটি প্রতিযোগিতা হবে এবং শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী প্রদর্শকদের দুটি ট্রফি পুরস্কার দেওয়া হবে। গান্ধী শতবার্ষিক উপলক্ষে গান্ধীজীর সাহিত্য সাধনা এবং শিশু-সাহিত্যের জন্য বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রদর্শনীতে ২৫০টি ষ্টল থাকবে এবং গ্রন্থমেলা প্রতিদিন বিকেল ৩.৩০ মিঃ থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ও ছুটির দিন অতিরিক্ত সকালে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

Association Notes

২০ ডিসেম্বর
গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালে এই দিনটিতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়। তদবধি এই দিনটি বাংলা দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

গ্রন্থাগার দিবস গ্রন্থাগার কর্মীদের আত্মসমালোচনার দিবস। এই দিনটিতে প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীকে সমালোচনা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বিগত বছরের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে আগামী দিনে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা নির্ণয় করতে হবে। গ্রন্থাগারকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য, বিভিন্ন ধরণের পাঠকের বিবিধ চাহিদা পূরণের জন্য, উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নানা ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এই দিনে। জনসাধারণকে গ্রন্থাগার অভিমুখী করে তোলার কাজে কর্মীদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই কথা অনুধাবন করতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবস আগামী দিনে সংগঠিত শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেওয়ার দিন। সর্বরকম প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য, গ্রন্থাগার কর্মীদের উন্নত বেতন ও মর্যাদার জন্য, বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে আমাদের।

গ্রন্থাগার দিবসে আমরা প্রতিটি গ্রন্থাগার ও সমাজকর্মীর কাছে আবেদন জানাই, বাংলা দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারে জনসভা, প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র ইত্যাদির আয়োজন করে গ্রন্থাগার দিবসের বাণী আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে। এই দিনটিতে নিম্নলিখিত দাবীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে এই প্রস্তাবের অনুলিপি মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, পৌর কর্তৃপক্ষ, সংবাদপত্র এবং পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা বিরোধী কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

খ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে।

গ প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার চাই।

ঘ) কলিকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

ঙ) গ্রন্থাগার ভবনের উপর পৌর কর আদায় ব্যবস্থার অবসান চাই।

চ) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা চাই।

ছ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্ত নিয়মিত মাসিক বেতন, সার্ভিস রুল প্রবর্তন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মীদের অনুরূপ ভাতাদি এবং অন্যান্ত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

জ) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সরকারী সাহায্য দিতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান : রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (ওয়েলিংটন স্কোয়ার)

তারিখ : ২০শে ডিসেম্বর, শনিবার, ১৯৬৯

সময় : অপরাহ্ন ৫-৩০ মিনিট

বিঃ দ্রঃ—(ক) ২০শে ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রন্থাগার দিবস পালনের কর্মসূচী নেওয়া যাবে।

(খ) পূর্বে যোগাযোগ করলে পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তা প্রেরণ করা হবে।

ভ্রম-সংশোধন

গত আশ্বিন সংখ্যায় প্রীতি মিত্র রচিত ঈশ্বরচন্দ্র "বিদ্যাসাগর : গ্রন্থপঞ্জী" শীর্ষক প্রবন্ধে, ২০৮ পৃষ্ঠায় শব্দমঞ্জুরী, আখ্যান মঞ্জুরীর স্থানে শব্দমঞ্জরী, আখ্যানমঞ্জরী এবং ২০৯ পৃষ্ঠায় শ্লোকমঞ্জুরীর স্থানে শ্লোকমঞ্জরী হবে।

—সম্পাদক

বার্তা-বিচিত্রা

আইরিশ ফরাসী নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট ১৯৬৯ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯২৩ খৃঃ প্রখ্যাত কবি ইয়েটসের পর এই দ্বিতীয়বার একজন আইরিশ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। ১৯০৬ সালে ডাবলিনে বেকেটের জন্ম হলেও তিনি ১৯৩৮ সাল থেকে ফ্রান্সবাসী ও ফরাসীতেই প্রধানত লেখেন। ইংরাজী সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ও ইংরাজীতেও তিনি কিছু কিছু বই প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত আইরিশ লেখক জেমস জয়েসের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুবাদক। তাঁর প্রখ্যাত নাটক ওয়েটিং ফর গোডো (১৯৫২) এবং ও দি গুড ডেজ (১৯৬৩) জন্য তাঁর এই পুরস্কার লাভ। এ ছাড়া আছে 'ফিন দ্য পার্ত' (নাটকের সমাপ্তি) এবং উপন্যাস 'লিনো মেবল'।

*　　　　*　　　　*

হিন্দী, সংস্কৃত এবং কোন অঞ্চলের মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বই লেখবার জন্য গ্রন্থকারদের পুরস্কার দানের একটি প্রকল্প কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী হিন্দী ও সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য ভাষাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তেরটি ভাষায় প্রত্যেকটিতে গড়ে পাঁচটি করে মোট ৬৫টি পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের মূল্য এক হাজার টাকা। উপন্যাস, নাটক, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ ও কবিতা—সাহিত্যের এই কয়েকটি শাখায় পুরস্কার দেওয়া হবে। অনুবাদ গ্রন্থও পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। ভারতীয় ভাষা সংস্থা প্রতি বছর ৮ই ফেব্রুয়ারী স্বর্গত রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের স্মরণে এই পুরস্কার ঘোষণা করবেন।

*　　　　*　　　　*

বাংলা সাহিত্য বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ রুশ সাহিত্যিক শ্রীমতী ভেরা নভিকভা রুশ ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি বিশেষ দিক নিয়ে এই ২১০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি রচিত। এতে গ্রন্থকারের মৌলিক বিস্তার বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীমতী নাভিকভা এ যাবৎ বাংলা সাহিত্যের ২৫টি গ্রন্থ রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর গবেষণা করে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ক্যানডিডেট অব সায়েন্স সম্মানে ভূষিত হন।

*　　　　*　　　　*

ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের যে চেষ্টা চলছে, সেই প্রচেষ্টায় কতগুলি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে। বি, জি, এন কর্তৃক লিখিত 'ক্যানসার', ডাঃ আর বিশ্বনাথন কর্তৃক 'প্রাচীন যুগে চিকিৎসাবিদ্যার সমস্ত', পি, কে দাস কর্তৃক লিখিত 'মনস্থন' গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

*　　　　*　　　　*

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি এস খেইর 'গীতার' উপর গবেষণা করে একটি বই

লিখেছেন। এই বইটির নাম 'কোয়েষ্ট ফর দি গীতা এই' বইতে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন গীতার লেখক হলেন জেন জন। কেননা এতে তিন রকম কালি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তিনটি কালির বাক-ভঙ্গীও তিন রকম। রামায়ণের উপর গবেষণা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন বেলিজিয়ালের ডাঃ কামিল কুলকে। ইনি বর্তমানে রঁাচির সেণ্ট জেভিয়াস' কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপক।

* * *

অসমীয়া ভাষায় বিংশ শতকের সোভিয়েত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন অসমীয়া কবি পরেশমল্ল বড়ুয়া। গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার স্মরণে।

* * *

মস্কোতে স্কুলের ছাত্রদের উদ্যোগে লেনিন গ্রন্থ মাস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে এক মাস ব্যাপী বিভিন্ন আলোচনা চক্র ও সভায় লেনিনের জীবনী ও গ্রন্থের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং লেনিনের নিজের লেখা ও তার উপরে লেখা এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

* * *

সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ বুলগেরিয়ায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি ইদানীং সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমানে এখানে যাদুঘরের সংখ্যা ১৩৫, প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ এই যাদুঘরগুলি দেখতে যায়। গ্রামঞ্চলে ৫০০টি বিশেষ পাঠসংস্থা আছে যার নিয়মিত পাঠক হলো দশ লক্ষের কিছু বেশী।

* * *

আর্জেন্টিনায় স্পানিশ ভাষায় 'ইজিতুর' নামে একটি কবিতা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এর দশম সংখ্যাটি এবার হবে ভারতীয় কবিদের কবিতার সঙ্কলন। ভারতীয় কবিতার উপর আলোচনা সহ মোট পনের জন কবির কবিতা এতে থাকবে। তার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন সাত জন কবিই হলেন বাংলা দেশের।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে শ্রীইন্দুশেখর চক্রবর্তী প্রণীত শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীসত্যচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত "গল্প মাল্য" পুস্তক এবং এতদ্‌ সম্পর্কীয় যাবতীয় নথি-পত্রাদি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আঘাত হানিকর বোধে বাজেয়াপ্ত করেছেন।

Notes and News

গ্রন্থাগার সংবাদ

শান্তি ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা-১২।

ইনষ্টিটিউটের সাধারণ অধিবেশনে ১৯৬৯।৭০ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সভায় বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হ'ন যথাক্রমে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (সভাপতি), মৃগাঙ্কমোহন শূর (কার্যকরী সভাপতি), সহ-সভাপতি—রামকুমার ভুয়ালক, যোগেন্দ্র মোহন সেন, কার্তিকচন্দ্র দত্ত ও ফটিকচাঁদ শীল। বিপ্রদাস দত্ত (সম্পাদক)। সহ-সম্পাদক যথাক্রমে সত্যচরণ দে, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও বিদ্যুৎরঞ্জন চ্যাটার্জী, তারকনাথ দত্ত (কোষাধ্যক্ষ), সহ-কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে বিষ্ণু প্রসাদ দে, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ নন্দী ও মধুসূদন দত্ত। গ্রন্থাগারিক—অশোকলাল গোস্বামী। সহ-গ্রন্থাগারিক যথাক্রমে নিমাইচাঁদ দত্ত, পাবন রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, সৌরেন হালদার, দীলিপ দে ও শ্যামল কুমার দত্ত।

বেলঘরিয়া সুধাস্মৃতি পাঠাগার, ২৪ পরগণা।

গত ১১ই অক্টোবর এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই পাঠাগারের উদ্যোগে গান্ধী জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমূল্যকৃষ্ণ সরকার ও প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅজিত কুমার লাহিড়ী। বিভিন্ন বক্তাগণ মহাত্মাজীর কর্মনীতি ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নেহেরু স্মৃতি পাঠাগার, সুভাষনগর, পোঃ বনগ্রাম, ২৪ পরগণা।

এই পাঠাগারে উদ্যোগে গত ২রা অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মাজীর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'সাফাইকরণ', আর্তসেবা, অহিংসার শপথ গ্রহণ ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমানভাবে বসবাসের সংকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এই উৎসবটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম, বর্ধমান।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২রা অক্টোবর '৬৯ মহাত্মাজীর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে 'সাফাইকরণ', মহাত্মাজীর জীবনী, বাণী ও আদর্শ আলোচনা প্রভৃতি বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার, পাণ্ডবেশ্বর, বর্ধমান।

১৯৬৯ এর ১লা অক্টোবর পল্লীমঙ্গল সমিতির সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ 'সাফাই দিবস' পালন করেন—এই উপলক্ষে তাহারা ঐ দিন রাস্তাঘাট সংস্কার করেন।

২রা অক্টোবর গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সকালে প্রভাতফেরী বাহির হয়—তাহার পর প্রার্থনা ও শপথবাক্য পাঠ করা হয়। অপরাহ্নে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার বিভিন্ন বক্তা মহাত্মার জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীখণ্ড জনকল্যাণ সমিতি, কাটোয়া, বর্ধমান।

বিগত ২রা অক্টোবর গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় গান্ধী পন্থীদের সম্বর্ধনা, গান্ধী জীবনী আলোচনা হয়।

কাকাটিয়া সাধারণ পাঠাগার, বাঁকুড়া।

বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি শ্রীবাসুদেব দে ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দ ভাষণ দেন।

গত ২রা অক্টোবর এই পাঠাগার গান্ধী জন্ম শত-বার্ষিকী পালন করে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা গ্রন্থাগারিক ও বিভিন্ন ব্যক্তির উপস্থিতিতে সর্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠে।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে একটি পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণা-প্রবন্ধ প্রতিযোগীতায় 'প্রাচীনে' তাম্রলিপ্তে কৃষি ও শিল্প' বিষয়ে শ্রীঅসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় ও 'প্রাচীনে তাম্রলিপ্তের ভৌগলিক অবস্থান' বিষয়ে শ্রীবাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে যথাক্রমে 'পঞ্চানন মাইতি' স্বর্ণ পদক ও 'হীরালাল মাইতি' রৌপ্য পদক দেওয়া হয়। এ ছাড়া নজরুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১০ জন কৃতীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সভাপতির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, গবেষণা জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে অপরিহার্য।

গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, গঙ্গাধরপুর, হাওড়া।

বিগত ২রা অক্টোবর '৬৯ গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে তাহারা বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেন—'সাফাই কার্য', প্রার্থনা সভা, সূত্রযজ্ঞ ও গান্ধীজী সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশিবনারায়ণ মান্না।

ভদ্রেশ্বর পাবলিক লাইব্রেরী, ভদ্রেশ্বর, হাওড়া।

বিগত ৪ঠা অক্টোবর ১৯৬৯ সন্ধ্যায় ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার সংলগ্ন প্রাঙ্গণে গ্রন্থাগারের দ্বিতল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমাজশিক্ষা পরিদর্শক ডঃ অমিয়কুমার সেন মহাশয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান শ্রীগোবিন্দ সরকার। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সভ্য ও পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত পরিবেশ ও স্থান সংকুলানের জন্য দ্বিতল গৃহ নির্মাণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। হুগলী জেলা শিক্ষা পরিদর্শক শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ ভদ্রও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া গ্রন্থাগারের আশু গৃহ সম্প্রসারণ ও এই প্রাচীন গ্রন্থাগারটিকে সমস্ত দিক হইতে সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন জানান। ডঃ সেন গ্রন্থাগারকে এই বৎসরের মধ্যেই আর্থিক সাহায্য দিয়া গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য আশ্বাস দেন।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক বা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দায়ী নন)

সম্পাদক সমীপেষু,

সম্প্রতি হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাঠকসাধারণ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে জেলা গ্রন্থাগারে সংগঠিত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে হাওড়ার পাঠকের ভূমিকা কতখানি সক্রিয়, 'গ্রন্থাগারের পাঠকদের তা' জানাবার দায়িত্ব পাঠকরাই নিচ্ছে।

দশ-বারো বছর আগে এখানে 'এক্সিকিউটিভ কমিটি' একবার নির্বাচিত হয়েছিল। সেই শেষ। নির্বাচন অনুষ্ঠান করে আর সময় নষ্ট করতে চাননি সম্পাদক মশাই। সরকারের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট্ সোশ্যাল এডুকেশন অফিসারও কমিটির সভ্যা, অথচ বেআইনী ব্যাপারের কোন প্রতিবিধান তো দূরের কথা, প্রতি বছর সরকারী টাকা এসেছে গ্রন্থাগারে নিয়মিত।

হ্যাঁ পাঠকরাও দোষী। সরকারী টাকা অপচয়ের চক্রান্ত ক'রে তারা টেক্স্ট বই কিনতে চাপ দেয় কর্তৃপক্ষকে সস্তা উপন্যাসের বদলে। অতএব, পাঠকদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন কর্তৃপক্ষ। গ্রন্থাগার অপ্রিয়করণের কাজ শুরু হল অবিলম্বেই। 'ওপন্ অ্যাক্সেস্ সিষ্টেম' তুলে দেওয়া হল। পাঠককে কমলো আলোর সংখ্যা। ফরমান জারি হল কর্মীদের উপর, যেন পাঠকদের সঙ্গে হেসে কথা বলা বন্ধ হয়। অতঃপর বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করলেন পরপর দুজন গ্রন্থাগারিক।

এ হেন পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিলেন কর্তৃপক্ষ। '৬৭ সালের জুলাই মাসে এক নোটিশ জারি করে পাঠকদের জানানো হল, বিনা চাঁদায় পড়া চলবে না। এবার থেকে সভ্যদের কাছ থেকে নিয়মিত বার্ষিক বারো টাকা চাঁদা আদায় করা হবে। প্রতিবাদ করলেন সভ্যবৃন্দ। কর্তৃপক্ষ অটল। অতএব, হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পাঠক সমিতি নামে এক সাময়িক সংগঠন তৈরী করে দৃঢ়তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হলেন পাঠকবৃন্দ। পিকেটিং করে বন্ধ করে দেওয়া হল গ্রন্থাগার। অবশেষে চাঁদার সিদ্ধান্ত রদ করলেন কর্তৃপক্ষ। পাঠকদের পড়াশুনা চললো অপ্রতিহত।

কিন্তু এরপর? ক্ষিপ্ত কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চাইলেন কোন কোন পাঠকের উপর। পাঠক সমিতির সম্পাদক কিছুদিন আগে সভ্যপদের জন্য আবেদন করেছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। সদস্যপদ গ্রহণের নিয়মিত ফর্ম দেবার সভ্যতাটুকুও তাঁর সঙ্গে করেননি কর্তৃপক্ষ। বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও,—এমন কি সরকারী প্রতিনিধি

ডিষ্ট্রিক্ট সোশ্যাল এডুকেশন অফিসারের কাছে দরবার করা সত্ত্বেও—আজও তিনি এমন কি সদস্যপদ গ্রহণের আবেদনপত্রটুকুও যোগাড় করতে পারেন নি। আশ্চর্য!

এবার শুরু হল কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ। সরাসরি চাঁদা আদায়ে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় গলি খুঁজির পথ খুঁজে বার করা হল। ঠিক হল, এবার থেকে নতুন সভ্য হতে গেলেই প্রবেশকালীন পঁচিশ টাকা এবং বার্ষিক বার টাকা চাঁদা দিয়ে' 'স্পেশাল' সভ্য হতে হবে। 'অর্ডিনারী' সভ্য আর গ্রহণ করা হবে না। সম্ভবতঃ পুরোনো সভ্যেরা যাতে এই সিদ্ধান্ত না জানতে পারেন, সে জন্য নোটিশ আকারেও এ সিদ্ধান্ত জানানো হল না জনসাধারণকে। সমস্ত ব্যবস্থাই যখন পাকাপাকি, একটুখানি ভুল তখন গণ্ডগোল করে দিল সমস্ত ব্যবস্থার। সভ্যপদ 'রিনিউ' করবার আবেদনপত্রের উপর ছাপা অক্ষরে 'স্পেশাল' ও 'অর্ডিনারী' কথা দুটি দেখে কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ নিলেন কোন কোন সভ্য। ধরা পড়লো সমস্ত চাল। বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারের জন্য আবার আন্দোলনের তোড়জোড় শুরু করলেন পাঠকসাধারণ। একটি স্মারকলিপির খসড়া রচনা পাঠকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করলেন কয়েকজন।

একদিন সম্পাদক মশাই সহ-সভাপতি সহ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করতে এলেন অতর্কিতে। বিক্ষুব্ধ পাঠকদের চাপে অবশেষে রাত এগারোটার সময় সম্পাদক মশাই লিখিতভাবে জানালেন, অবিলম্বে তাঁরা সভা ডাকবেন পাঠকদের নিয়ে। কিন্তু 'অবিলম্বে' শব্দটি অতিশয় 'অস্পষ্ট'। কারণ এ রচনার পর মাস দুই অতিক্রান্ত, আজও হাওড়াবাসী একই তিমিরে। উপরন্তু কোন কোন কর্মচারী পাঠকদের বিশ্বস্ত মনে হওয়ায় তাঁদের উপর আর্থিক এবং মানসিক অত্যাচার সহের সীমা অতিক্রম করতে চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার প্রচার চলছে, কতিপয় গুণ্ডাই নাকি গ্রন্থাগারের সমস্ত অব্যবস্থার জন্য দায়ী। তা'না হলে সম্পাদকমশাই? তাঁর মতো এমন গ্রন্থাগারপ্রেমী আর কে আছে?

আমরা অবশ্য সরকারী মহলে চাপ দেবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট সোশ্যাল এডুকেশন অফিসারের অফিসে ধর্ণা দিয়েছিলুম। তিনি তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গের অগণিত গ্রন্থাগার প্রেমিকের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

সরোজ মুখোপাধ্যায়
১১, কালী ব্যানার্জী লেন, হাওড়া-১।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৯।

সাম্প্রতিককালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

স্বদেশে

1. (A) Bibliography of Indian Folklore & related subject; by S. Sengupta & S. Parmer. Calcutta, Indian pub, 1969. Rs. 38·00.

লোক সাহিত্যের উপর ইংরাজী গ্রন্থ ও ইংরাজী সাময়িক পত্রের বিভিন্ন প্রবন্ধের একত্র সঙ্কলন। ৫০০টি গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

2. Dictionary for fashion and beauty for Indian women; by Cora Paul. Bombay, Jaico Pub. House, 1968. Rs. 4·00 176 p.

বিষয়বস্তুর নতুনত্বে রেফারেন্স গ্রন্থ সমূহের ক্ষেত্রে ইহা একটি বিশেষ সংযোজন। ইহা শুধু মহিলাদের নয়, অন্যান্য পাঠকদের ক্ষেত্রেও সমভাবে আকর্ষণীয়।

গ্রন্থাগারবিদ্যা, বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৬৮। মূল্য ৮ টাকা। ১০৮ পৃঃ।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর কতগুলি মূল্যবান প্রবন্ধের সঙ্কলন।

3. (An) Outline of Library Classification by Mohindra Singh. Kumar Sons, 1969. Rs. 15·00, 191 p.

বর্গীকরণ সম্পর্কে একটি সহজ পাঠ্যপুস্তক। গ্রন্থাগার বৃত্তিতে যাঁরা প্রথম প্রবেশ করেছেন বা যাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করছেন তাঁদের একটি প্রয়োজনীয় মূল্যবান গ্রন্থ।

বিদেশ

4. American Politics and elections: Selected abstracts of Periodical literature. California, Santa Barbare, $ 225. 44 p.

আমেরিকার রাজনীতি ও নির্বাচন সংক্রান্ত নির্ঘণ্ট ও সংক্ষিপ্তসার। America: History & Life পত্রিকায় প্রকাশিত ৬০৭টি রচনাপঞ্জী বিষয়বস্তু চারটি অংশে বিভক্ত, আমেরিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নির্বাচন পদ্ধতি, ভোট দেওয়ার রীতি, এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নিয়মকানুন। প্রথম তিনটি বিষয়, আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং কালক্রমানুসারে শেষটিও বিভক্ত।

5. Cowles Encyclopedia of Nations. New York, Cowles Education Corp. $ 12·50, 316 p.

বিভিন্ন রাজ্যের, উপনিবেশের ও বিশ্বের নির্ভরশীল দেশগুলির সম্বন্ধে সকল প্রকার

তথ্যামূলক সংবাদ। প্রতিটি দেশের আলোচনা, স্থান, জাতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সাজান হয়েছে। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত লোক সংখ্যা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য হয়েছে। এক পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থপঞ্জী ও ৬৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র আছে. একক খণ্ড কোন .গ্রন্থ হিসাবে এটি মূল্যবান।

6. How to organige and maintain the library picture/pamphlet. file, by Geraldine N. Gould & Ithmhr 'C. Wolfe Oceana/Dobbs Fery, 1968. $ S. 146 p

গ্রন্থাগারে ছবি ও পুস্তিকা সংরক্ষণ সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তিত উপদেশ সম্বলিত একটি পুস্তক। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের পক্ষে ইহা বিশেষ সাহায্যকারী। বিশেষ করে নবীন গ্রন্থাগারিদের ভার্টিক্যাল ফাইলের ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

বিশেষ করে আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে-আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ, ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৫৫ ,,
,, তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫ ,,
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০ ,,
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ ,,
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৬০ ,,
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৩৫ ,,

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি, আই. টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় . সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৮ } গ্রন্থাগার দিবস বিশেষ সংখ্যা { ১৩৭৬, অগ্রহায়ণ

লাইব্রেরী

: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি একপাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধ হইতে সংকলিত এবং বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রকাশিত)

Library

: Rabindranath Tagore

গ্রন্থাগারের সংস্কার

মুনীন্দ্র দেব রায়

Munindra Dev Rai, the one of the pioneers of library movement, describes in his article, the way to renovate the library system. Comparing with the old libraries, the author draws a pen picture of libraries of his period and suggestes a few points on its improvement. According to Mr. Dev Rai, the Librarian is the key-point to develope the library and for the country-wide development of the library, proper publicity comes in the second position of the list. He also mentiones that execessive carefulness about the loss of books drives out the readers from the library. The author gives a special emphasise on the introduction of Library Legislation in Bengal without which proper development of library movement is not at all possible. Mr. Dev Rai also feels the necessity of inter-library loan system and which he tried to introduce in the libraries of Bengal. With an appeal to the people of all sphere, to participate in the library movement, Munindra Dev Rai, concludes his article.

অতীত ও বর্ত্তমান।

অতীত কালের গ্রন্থাগারের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের গ্রন্থাগারের পার্থক্য অনেক। সেকালে পুস্তকের সংখ্যা অধিক ছিল না, পাঠকের সংখ্যাও খুব কম ছিল। নানা কারণে সেকালে সকলকে পুস্তক পাঠ করিবার অধিকার দেওয়া হইত না কিন্তু বর্ত্তমানে আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ছাপাখানার দৌলতে যে কোনও দেশেই পুস্তকের সংখ্যা অপরিমিত—পুস্তক পাঠে আজ কাহাকেও বাধা দেওয়া হয় না। বরং অধিকতর সংখ্যক লোককে যাহাতে পুস্তক পাঠ করিতে প্ররোচিত করা যায়, গ্রন্থাগার সমূহ যাহাতে ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে, তাহাই এখন প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে।

সুতরাং আজ গ্রন্থাগারকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত চালাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। সাধারণের সেবা করিতে না পারিলে কোনও প্রতিষ্ঠানই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেবা করিবার জন্য চাই জ্ঞান, চাই বুদ্ধি। নিজের যাহা নাই তাহা অপরকে দেওয়া যায় না। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে দাতা ও গ্রহীতার তুলনা চলিতে পারে। এখানে গ্রহীতা পাঠক, দাতা গ্রন্থাগারিকের দেয় গ্রন্থ। দিবার জন্য গ্রন্থাগারিকের যদি গ্রন্থই না থাকে তবে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইতে পারে না। তবে এ সম্বন্ধে অসুবিধা অনেক। বর্ত্তমানে পুস্তকের সংখ্যা অতি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। অধিক সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখা কোনও গ্রন্থাগারিকের পক্ষেই সম্ভব নহে।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব।

পুস্তকের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, উহাদের ঠিক[illegible] তত্ত্বাবধান করা [illegible] পাঠকের মধ্যে উহার বিতরণ করা গ্রন্থাগারিকের কাজ। এই সম্ব[illegible] তালিকা প্রস্তুত করা, উহা বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস করা, শ্রেণী বিভাগ করা ইত্যাদি কার্য্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন করা সহজ নহে। অন্যান্য যে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের মতই ইহাও শিক্ষাসাপেক্ষ।

এইরূপ দুরবস্থা ও অব্যবস্থার জন্যই এ দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু আর শৈথিল্য প্রদর্শন করা উচিত নহে। এই আন্দোলনের প্রচার ও সাফল্যের জন্য সকলেরই এখন অবহিত হওয়া কর্তব্য। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই এ দেশের সর্বত্র সম্রাটের রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ যদি সকল সহর ও গ্রামেই এক একটি করিয়া গ্রন্থাগার বা পাঠকেন্দ্র স্থাপন করেন, তবে তাহার দ্বারা সম্রাটের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। বস্তুতঃ দেশের সর্বত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

কালে এই সমস্ত গ্রন্থাগার সংস্কৃতির এক একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে। ইহারা পল্লী ও সহরের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও যুবকদিগকে প্রত্যহ একত্র মিলিত হইবার সুবিধা, জাতি গঠনের সহায়তা করিবে এবং ইহাদেরই প্রভাবে জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার হইতে থাকিবে। আমি আশা করি যে, স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ আমার এই কথা কয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

দেশব্যাপী প্রচার কার্য্য

কেমন করিয়া আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারলাভ করিতে পারে, তাহা আমাদিগকে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং ইহার প্রসারের পথে যে সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমার মনে হয় যে, এ আন্দোলনের প্রধান বিঘ্ন—দেশবাসীর অজ্ঞতা ; এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য, জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য আমাদিগকে দেশব্যাপী প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।

অতি সতর্কতার কুফল

আর এক বাধা গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাদের অতীব সতর্কতা। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে পুস্তক হারাইয়া যাইবার আশঙ্কায় কাহাকেও উহা বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় না। অনেক গ্রন্থাগারে কোনও কোনও পুস্তক কাহাকেও পড়িতে দেওয়া হয় না, এইরূপ অতিরিক্ত সতর্কতা বাঞ্ছনীয় নহে। ইহার ফলে পাঠকগণ গ্রন্থাগারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন এবং অনেক পুস্তকই আলমারীর মধ্যে অব্যবহৃত ও অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহাতে গ্রন্থাগারের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে

জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে কর্মকর্তাদিগকে এইরূপ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আবার অনেক স্থলে দেখা যায় যে, গ্রন্থাগার স্থাপনা করিবার সময়ে অনেকেই তৎপ্রতি উৎসাহী থাকিলেও কালক্রমে একে একে প্রায় সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া যান এবং একা সম্পাদক বা গ্রন্থাগারিকের উপরই সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ইহাও আন্দোলনের উন্নতির পরিপন্থী; ইহার ফলে গ্রন্থাগার সমূহ জন সমাজের সংশ্রবহীন নিষ্প্রাণ পুস্তক-সংগ্রহ হইয়া উঠে। এ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে সকলকেই ইহার উন্নতি সম্বন্ধে সর্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

আইনের আবশ্যতা

অন্যান্য বিষয়ের মত গ্রন্থাগার সম্বন্ধেও আইন প্রণয়ণের প্রয়োজন আছে বাঙ্গলায়। আমি এইরূপ একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু সরকারের সম্মতি না পাওয়ায় উহা ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থিত করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক সুখের কথা এই যে, বাঙ্গলায় আমরা স্বায়ত্বশাসনমূলক আইন সমূহের পরিবর্তন সাধন করিয়া ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রন্থাগার সমূহকে অর্থসাহায্য করা আইনসঙ্গত করিতে পারিয়াছি।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

দুঃখের বিষয়, ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার এই আন্দোলনের প্রসারকল্পে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিবার প্রয়োজন এখনও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। বড় বড় গ্রন্থাগারগুলি যদি পরস্পরকে পুস্তক ধার দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রন্থাগার উপকৃত হয়। আশা করি যে, এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষগণ অচিরে অবহিত হইবেন। গ্রন্থাগার সমূহের আর একটি কর্তব্য শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমানে শিশু-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া রাখা।

* * *

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের উপরই দেশের শিক্ষা বিস্তার বহুল পরিমানে নির্ভর করে। আমি গ্রন্থাগারকে সত্য সত্যই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া মনে করি। গ্রন্থাগার উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে এখানেই ছোটবড়, ধনীনির্ধন সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় সাধন করিতে পারে এবং উহার সকলের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই সমস্ত গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়াই আমাদের দেশের অজ্ঞতা দূর হইবে। সকল শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের প্রসার হইবে। জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে।

এই উদ্দেশ্য মহান ও পবিত্র; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আপনারা সমবেতভাবে চেষ্টা করিবেন—ইহাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থমালার ১ম গ্রন্থ "গ্রন্থাগার" পুস্তকের প্রবন্ধ সঙ্কলন হইতে সংগৃহীত।]

Renovation of Library : Munindra Dev Rai

লাইব্রেরী আন্দোলন

সুশীল কুমার ঘোষ
(পরিষদের প্রথম সম্পাদক)

[Late Sushil Kumar Ghosh, the 1st Secretary of Bengal Library Association, emphasised on the importance of the Bengal Library Association in the sphere of mass education. The then society was keen to improve the general education of Bengal through library movement and to implement the idea, the Bengal Library Association with its four district Centres in Hooghly, Mymenensing, Noakhali and 24 Parganas of undivided India, took a major responsibility. The author also indicated the devices to attract the people in the library. In this regard the author cidted the example of the Library Department of Baroda and the Central Public Library of Bangalore. Mr. Ghosh also emphasised on the preservation of manuscripts and of rare books. Those are the treasuries of the library and of the human civilization too. the author suggested that the librarian would be well-versed in knowledge and of pleasing personality.]

লাইব্রেরী আন্দোলন প্রধানত শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন। যাহাতে শিক্ষার বীজ জনসাধারণের মনে অতি সহজে বপন করিতে পারা যায় তাহার প্রচেষ্টা লাইব্রেরী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষিত সমাজে নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে অল্প আয়াসে লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে পারা যায়, তাহার জন্য সভ্য জাতি মাত্রেই এখন বিশেষ সচেষ্ট।

কোন আদর্শ ধরিয়া কার্য্য করিতে হইলে তাহা একাকী করাও চলে, পরকে লইয়া করাও যায়। তবে যে কার্য্য পরকে লইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে একাকী তাহা লইয়া থাকিলে চলিবে না। যে আদর্শ সমাজের মধ্যে ফুটাইতে চাই, তাহা পরিপুষ্টির জন্য লোকমতের প্রয়োজন। যে প্রথা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার কামনা হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জনসাধারণের মধ্যে তাহার অভিব্যক্তি একান্ত বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরী আন্দোলন দেশের মধ্যে চালাইতে হইলে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যে কোন আদর্শ কোন এক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তাহা যেরূপ কার্য্যকরী হয়, স্বতন্ত্র চেষ্টায় সেরূপ ফল কামনা করা দুরাশা মাত্র। এইজন্য দেখা যায় সমবেত চেষ্টায় Froebelian Movement-এর কর্ত্তৃপক্ষগণ Kindergarten পদ্ধতি দ্বারা বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল। এইজন্য Shakespeare Society একত্র সমাবেশে অমর কবি সেক্সপীয়রের

গ্রন্থাবলী আলোচনার জন্য ও ইংলণ্ডের ষোড়শ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত অতীত মহিমা জাগ্রত রাখিতে বিশেষ ব্যস্ত। আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতেছে কিসে লাইব্রেরীর সাহায্যে আপামর জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করা যায়। লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার জন্য আমাদের দেশেও গ্রন্থালয় পরিষদ (Library Association) বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলা দেশে লাইব্রেরী আন্দোলনের সূত্রপাত অল্পদিন হইলেও বরোদা, মহীশূর, মাদ্রাস প্রভৃতি দেশে ইহা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "নিখিল ভারত গ্রন্থালয় পরিষদ্" নাম দিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় গ্রন্থালয়গুলির অবস্থা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ দেশের মধ্যে লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ বাঙ্গালা দেশে লাইব্রেরীগুলির অবস্থার উন্নতিবিধান ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ভার লইয়াছে। যেখানে লাইব্রেরী বা গ্রন্থালয়ের সংখ্যা অল্প সে স্থানে গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা এবং যে স্থানে গ্রন্থালয় আছে, তাহার পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করায় চেষ্টা গ্রন্থালয় পরিষদের কর্ত্তব্য। ইহা কার্য্যেও পরিণত করিতে হইলে, প্রতি জেলায় একটি জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ স্থাপন করা অতীব আবশ্যক। ঐ জেলা গ্রন্থালয়ের কার্য্য হইবে জেলার মধ্যে কতকগুলি লাইব্রেরী বা রীডিং রুম আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা, তাহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া আর কোথায় কোথায় নূতন গ্রন্থালয় (Library) বা পাঠাগার (Reading Room) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করা। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের অধীনে অধুনা চারিটি জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ কার্য্য করিতেছে, একটি হুগলী জেলা, একটি মৈমনসিংহ, একটি নোয়াখালিতে আর একটি ২৪ পরগণায়।

লাইব্রেরী আন্দোলন এই কথাই দেশবাসীকে জানাইতে চায় যে লাইব্রেরীগুলিকে শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে। পড়াশুনার চর্চ্চা, গবেষণার কার্য্য প্রভৃতি, যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান বলিয়া দিয়া সাধারণকে সাহায্য প্রদান প্রভৃতি লাইব্রেরীর অন্যতম কার্য্য হওয়া উচিত। যাহাতে পাঠানুরাগ বৃদ্ধি পায়, সেজন্য নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক ছবি, chart, map, motto বরোদা রাজ্যের লাইব্রেরীগুলির দেওয়াল পরিশোভিত করিয়া থাকে। যেন তাহারা অলক্ষ্যে পাঠক পাঠিকার হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছে। সে motto গুলি লাইব্রেরীর সভ্যতার নীরব ভাষায় বলিয়া দিতেছে—"যদি আনন্দ চাও, বই পড় আনন্দ পাইবে"। "যদি শিক্ষা চাও, বই পড় শিক্ষা পাইবে।" "যদি মানুষ হইতে চাও, বই বড়, মানুষ হইবে" বরোদা মহারাজের Library Department আমেরিকার মত, প্রত্যেক লোকের বাড়ী বাড়ী পুস্তক সরবরাহ করে। বিনা আয়াসে বিনা পয়সায়, ঘরে বসিয়া যাহারা বই পায়, তাহারা বই না পড়িয়া ছাড়ে না। এইরূপে ক্রমশ পাঠের নেশা জন্মিয়া গেলে, তাহারা আপনই পুস্তকপাঠের ব্যবস্থা করিবে এবং ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া, পুত্র-কন্যাদের পুস্তকপাঠে উৎসাহ দিবে।

মহীশূর রাজ্যের সাধারণ লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আরও চমকপ্রদ। সেখানে লাইব্রেরী-গুলিকে এরূপ একটি আকর্ষণের কেন্দ্র করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সকলেরই মন ঐদিকে আকৃষ্ট হয়। অতি সযত্নে ঐখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালোর Central Public Library-তে যে সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আছে, তাহা অনেক লাইব্রেরীর আদর্শ হইতে পারে। তথায় আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রকার লোককে সুবিধা দিবার জন্য লাইব্রেরীটি এই কয়টি বিভাগে বিভক্ত :— পাঠাগার বা Reading Room ; Lending Section ; Children's Department (তরুণ বিভাগ) ; Ladies' Department (মহিলা বিভাগ) ; Reference Section ; এমন কি স্নানাগার ও ভোজনালয় পর্য্যন্ত। মহীশূরবাসীদের শিক্ষা প্রচার স্পৃহা এত প্রবল যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা Vernacular language এর সাহায্যে শিক্ষা প্রচার করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন।

আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশন নানাপ্রকার পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে। সর্বসাধারণের সুবিধামত Classification-এর পদ্ধতি এবং বিষয় অনুসারে পুস্তক বিভাগ সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা-মূলক পুস্তক তাহারা প্রায়ই প্রকাশ করে। এতদ্ভিন্ন প্রতি মাসে নূতন প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা পাঠাইয়া তাহাদের সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীগুলিকে পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। লাইব্রেরী পরিচালনা সুকৌশলে সংসাধিত করিবার জন্য, নিয়মিতরূপে লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাঁহারা ঐরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারাই সাধারণ পাঠাগারে কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

প্রাচীন পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, এখনও দেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উচিৎ মত রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, অল্পদিনের মধ্যে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের পাণ্ডুলিপি অতি সযত্নে রক্ষিত হয়া উচিৎ। ব্যক্তি-বিশেষের যত্ন বা আগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া সাধারণ পাঠাগারগুলি যদি এ সকল সংরক্ষণের ভার লয়, তাহা হইলে অনেক অমূল্য গ্রন্থ কালের কবল হইতে রক্ষা পায়। কোথায় কোন গ্রামে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা যেমন বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলি সাধারণের গোচব করিতে পারা বা পুনরায় সুবিধা করিয়া দেওয়া ততোধিক লোকহিতকর। এই সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের ফলে গবেষণাকারী বিদ্বন্মণ্ডলী প্রয়োজনমত পড়াশুনা করিয়া সেইগুলি হইতে নানা তথ্য আহরণ করিতে পারেন। সেগুলি পুনঃপ্রচারে উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। নব জীবন লাভ করিয়া উহারা নানাবিধ জ্ঞানরত্নের অপূর্ব আকরস্বরূপে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া ও সযত্নে সংরক্ষণ ও সুবিধামত প্রকাশ করিয়া, জ্ঞানবিস্তারকার্য্যে লাইব্রেরীগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

লাইব্রেরীর কাজ পড়াশুনার নেশা জাগানো। যাহার যেদিকে রুচি সেই মত পুস্তক

তাহাকে দিতে পারিলে জনসাধারণ লাইব্রেরীর দিকে ছুটিয়া আসিবে। আত্মার সন্তুষ্টিবিধান যাহার নিকট হইতে যে পরিমানে পাওয়া যায়, মানব-মন সেই পরিমানে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যুবকহৃদয় কাব্যকলা, সাহসিকতা, উন্মাদনা, ভ্রমণেচ্ছা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মনোবৃত্তির অধিক বশবর্তী বলিয়া মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মানব মনের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া অধুনাতম শ্রেষ্ঠ মনিষীগণ যাঁহারা সম্প্রতি Behaviourist আখ্যা পাইয়াছেন তাঁহারাও এ সিদ্ধান্তের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। অতএব বুঝিতে পারা যায়, যুবকদের পাঠানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে, যে সকল পুস্তকে পূর্বলিখিত প্রবৃত্তি বিশদরূপে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি লাইব্রেরীতে সংগৃহীত করিতে পারিলে, যুবকের দল লাইব্রেরীর নেশা কোনও মতে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তিকে যদি লাইব্রেরীয়ান করা যায়, তাহা হইলে অনুসন্ধিৎসু আগন্তুকের পাঠেচ্ছা, লাইব্রেরীতে আসিলে, ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। কোন্ পুস্তকে কি কি সংবাদ পাওয়া যায়, সাধারণভাবে তাহা লাইব্রেরীয়ানের জানা যেরূপ প্রয়োজন, কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে চইলে, কোন্ কোন্ পুস্তকের সাহায্য লইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, লাইব্রেরীয়ানকে তাহারও সদুত্তর দেওয়া চাই। সেইখানে লাইব্রেরীয়ানের কৃতিত্ব।

(বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

Library movement : Sushil Kumar Ghosh

লাইব্রেরী

সরলা দেবী চৌধুরাণী (পরিষদের প্রথম সহ-সভাপতি)

[Sarala Devi Chaudhurani, the Ist Vice-president of Bengal Library Association in her article 'Library', quotes from the ancient hymns that for the development of mind, a good-reading is essential. She compares among the libraries of ancient times and of present. There are a number of instances where the conquering king took the possession of the library of the conquered. There were also the practices that people with valuable books had to surrender those to the Library of the court. Some of the kings of Egypt wished that the libraries in their tombs would be marked as "spiritual hospital." The political relation among India, Arab and Greece also was enhanced through the inter-country loan system of books. Sarala Devi also rebukes those collectors of books who neither read the books nor allow others to read.]

প্রতি লোকালয়ে যেমন লোকের শরীরধারণের জন্য অন্নভাণ্ডার ও বস্ত্র ভাণ্ডারের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ধানের গোলা ও কাপড়ের হাটে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তেমনি প্রতি লোকালয়ে লোকের মানস-পুষ্টিসাধনের একটি ভাণ্ডারও খোলা থাকা চাই, নয় ত সেখানকার লোকদের মানসিক খিন্নতার সম্ভাবনা অত্যধিক। পূর্বেই বলিয়াছি মানুষ হওয়ার জন্য শরীরের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে মানস-খোরাক চাই। আমাদের পূর্বপুরুষরা মানবমাত্রের মানুষ হওয়ার উপায় স্বরূপ পঞ্চমহাযজ্ঞ নামে যে পাঁচটি দৈনন্দিন অবশ্য কর্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন,—স্বাধ্যায়, অর্থাৎ সু-অধ্যায় বা সুন্দর সাহিত্য পাঠ তার অন্যতম ছিল। পাঠ বিনা মনের পুষ্টি হইতে পারে না। সে পুস্তক হস্তলিখিতই হউক বা মুদ্রাঙ্কিত হউক। লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার পাঠের সহায়, ইহারা মানস-বস্তুর ভাণ্ডার বা মানুষ গড়ার কারখানা। ইহারা লোকপালনের মহত্তম অংশ বহন করিতেছে। যাঁহারা ইহার উদ্যোগী তাঁহারা যথার্থ মানবপ্রেমিক। বালিবাসিদিগকে তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার জন্য আমি অভিনন্দন করি।

পৃথিবীর লাইব্রেরীর ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে মিলাইয়া দেখিলে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইবেন। আজ মুদ্রিত পুস্তকসংগ্রহকে লাইব্রেরী আখ্যা দেওয়া যাইতেছে একদিন এমন ছিল যখন ছোট ছোট ইষ্টকখণ্ডের সংগ্রহই লাইব্রেরী ছিল। এই পৃথিবীতে এককালে আমাদেরই মত জাগ্রত জীবন্ত একটি জাতি অ্যাসিরিয়া ভূখণ্ডে নিবাস করিত। তাহাদের প্রতাপ, তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও তাহাদের সভ্যতা মহাকালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে—শুধু কতিপয় সহস্র ইষ্টকফলক তাহাদের আংশিক জীবনকাহিনী আজও নিজের গায়ে অনুবীক্ষণের সাহায্যে পাঠ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অক্ষরে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই ইষ্টক পুস্তিকাগুলি অ্যাসিরিয়ার অসুর-বনি-পাল নামধেয় গুণগ্রাহী কবিপালক সম্রাটের লাইব্রেরীর অঙ্গ। ইহার দশবিশখানি ইষ্টকে এক একখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ। এইরূপ দশ হাজার গ্রন্থ পাওয়া যায়। সম্রাট অসুর-বনি-পালের লাইব্রেরী তাঁর প্রজাসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। * * কোন স্মরণাতীত কালের কোন স্মরণাতীত জাতির হাতের স্পর্শ এই ইষ্টক পুস্তকগুলিতে বিদ্যমান। সে হাতগুলি পঞ্চভূতে কতদিন বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে প্রাণশক্তি সেই হাতদের প্রেরণা দিয়াছিল সে শক্তির ধ্বজা ইহাদের গাত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রোথিত—মহাকালও তাঁহাকে উৎপাটিত করেন নাই। তারপর ভূর্জপত্রে বা তদনুরূপ আধারের উপর মানুষের আত্মকাহিনী লিপিকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূর্জপত্রে লিখিত গ্রন্থসমূহের লাইব্রেরী মন্দিরে মন্দিরে বসিত হইত। পুরাকালে মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চীন প্রভৃতি সকল সভ্যদেশেই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য একটি শ্রেণী বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সেই পাণ্ডিত্যশ্রেণীর লোকেই মন্দিরের পৌরহিত্য করিতেন। তাই অতীতে লাইব্রেরী সমূহ দেব-মন্দিরেই স্থান পাইয়াছিল। এবং প্রত্যেক মন্দিরে লিপিকার সংখ্যাও কম ছিল না। কোন কোন পণ্ডিত স্বগৃহেও পুস্তক সঞ্চয় করিতেন—তাঁহাদের লাইব্রেরীও প্রসিদ্ধ লাভ করিত।

পৃথিবীর ব্রাহ্মণেও পৃথিবীর রেষারেষি আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে—কি আধ্যাত্মিকতায় কি বিদ্যানুরাগিতায়। তাই আমরা এক সময় হইতে দেখিতে পাই দরিদ্র বিদ্যামাত্রধনী ব্রাহ্মণের আশ্রয় ছাড়িয়া সরস্বতী সম্রাট ও সৈনিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজার আদেশে মিশরের প্রাচীন সম্রাটগণের সমাধিভবন সরস্বতীর নিবাসগ্রামরূপে নির্দিষ্ট হইল। সম্রাট ওসিমান্দিয়াসের সমাধিগৃহের পুস্তকাগারের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিত ছিল "আত্মার চিকিৎসালয়।"

আলেকজান্দ্রিয়ার ভুবনবিখ্যাত লাইব্রেরী মিশরের টলেমীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সম্রাট পরম্পরায় ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইউয়েৰ্গেতিস সম্রাটের রাজত্বকালে যে কোন বিদেশী মিশরে আসিতেন—তাঁহার নিকট পুস্তক থাকিলে মূল পুস্তক রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে স্থান পাইত। এবং বিদেশীকে তার পুস্তকের একখানি নকল মাত্র দেওয়া হইত। রাজগণের পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতাও চলিত। সুবিধা পাইলেই একজন আর একজনের লাইব্রেরী লুঠ করিয়া নিজের রাজ্যের গৌরব বাড়াইতেন। ... ... সীজর যখন আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে নিজের নৌবাহিনীতে আগুন ধরাইয়া দেন সেই আগুনের একটি লেলিহান শিখা আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমিগণের দুই ভাগে বিভক্ত লাইব্রেরীর একটি ভাগকে দৈবাৎ জ্বালিয়া দেয়। মিশর সাম্রাজ্ঞী ক্লিওপাট্রার প্রণয়মুগ্ধ সীজর-সেনাপতি অ্যান্টনি রাজ্ঞীর হৃদয় হইতে হুতাশনের কবলিত পুস্তকাগারের শোক বিমোচনের জন্য শত্রুরাজ্য পার্গেমাস হইতে তাদের সুবিখ্যাত লাইব্রেরী লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া তাঁর গরীয়সী প্রণয়িনীর দৌর্মনস্য বিদূরিত করেন।

প্রতীচ্য লাইব্রেরী ইতিহাসে আর একটি নারীর নাম পাওয়া যায়। রোমের সম্রাট অগাষ্টাস যে দুইটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী স্থাপনা করেন তাহার একটি তাঁহার বিদুষী ভগিনীর নামে প্রতিষ্ঠিত। * * *

বিদ্বান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের দানকৃপণ মুষ্টিবদ্ধ হাত হইতে মুক্তি পাইয়া দেবী সরস্বতী ঐশ্বর্য্যবান ক্ষত্রিয়ের মুক্তহস্ততায় প্রজাসাধারণের সুলভ হইলেন। রাজ-পুস্তকালয় সমূহ সর্ব্বলোকের নিমিত্ত উন্মুক্ত করা হইতে লাগিল, এবং অপর এক লাভ হইল। লুটপাটে ছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সংগৃহীত পুস্তকের লিপিসংখ্যা বাড়াইয়া পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান চলিতে লাগিল।

এইরূপে প্রাচ্যের বহু পুস্তক প্রতীচ্যের লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপিরূপে সংগৃহীত থাকিল। ভারতবর্ষ, আরব ও গ্রীসের মানসিক কুটুম্বিতা এইরূপে বজায় রহিল। বোগদাদ ও ত্রিপলির খলিফারা এবং স্পেনের মুরেরাও একদিন বিদ্যানুরাগিতায় এবং লাইব্রেরী প্রতিস্থাপন বিষয়ে মানবজাতির অগ্রণী ছিলেন। ইঁহাদের নিযুক্ত বহু লিপিকারগণের প্রাসাদে আজ ভারতবর্ষের অনেক লুপ্ত সাহিত্য বিদেশ হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়।

রাজাদের দেখাদেখি বড় মানুষদের মধ্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা ক্রমে অতীতকালে একটা ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। আজকালও তা লক্ষিত হয়—মানুষের স্বভাব অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষ হইয়া একইভাবে চলিতেছে। চিনিবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় চিনির স্বাদের ভাগী ইহারা অনেকেই নহেন, শুধু বোঝা বহনের অধিকারী। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সুবিপুল লাইব্রেরী অতি অল্প গ্রন্থই ইঁহারা স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া লাভবান হন, অথচ অন্যকেও ব্যবহার করিতে না দিয়া যাঁহারা শুধু সংগ্রহ সুখ ভোগ করিতে চান তাঁহারা কৃপাপাত্র। কিন্তু লাইব্রেরীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—বিদ্যালোলুপ হইয়া শুধু সংগ্রহ গৌরব—লোলুপ হইলেও তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের লাইব্রেরীর দ্বার বিদ্বৎগণের জন্য অবারিত রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যে সকল লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত করিতেন তাঁহারা প্রায়শই বড় বড় কবি, বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ।

* * *

প্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের জাগ্রতি সব দেশেই প্রবল হইয়া উঠিল। গুটিকতক উচ্চস্তরের মানবে অধিষ্ঠিত পারমার্থিক রসের পাশাপাশি সার্বজনীন অনুভূতি—রস আত্মবিকাশের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে লাগিল। সামান্যকে কল্পনা ও কলাশ্রীমণ্ডিত করিয়া জগতের সমক্ষে ধরিবার আকাঙ্ক্ষা জনহৃদয় সমুদ্রে উদ্বেল হইল। তারই ফলে আজ শত সহস্র পুস্তকাগারে লক্ষ লক্ষ সাহিত্য-গ্রন্থ। কিন্তু প্রকৃতিতে দেখা যায় কুঁড়িমাত্রই পূর্ণসুষমাসম্পন্ন পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, এবং শত শত পুষ্পের মধ্যে একটি ফলবান হয়। যতগুলি প্রাণ আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায়, সকলেরই ভাষায় আত্মপ্রকাশ যে সাহিত্য পদবাচ্য তাহা নহে, তুলিধারী মাত্রেই চিত্রকর নহে, গায়ক মাত্রই গুণী নহে। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লেখকের আত্মপ্রকাশের সুলভতায় আধুনিক লাইব্রেরীগুলি যে ধানের

বদলে খোলার কলেবর ভরিতে না পারে এমন নহে। সুতরাং আধুনিক লাইব্রেরীয়ানের দায়িত্ব প্রাচীন লাইব্রেরীয়ানের তুলনায় অত্যধিক নির্বাচনশক্তি গ্রহণ ও বর্জ্জনশক্তির যথোচিত প্রয়োগক্ষমতা না থাকিলে, আধুনিক লাইব্রেরীয়ান মানসিক উন্নতির স্থলে মানসিক অবনতি বিস্তারে সাহায্য করিতে পারেন। য়ুরোপের এক একটি বড় পুস্তকাগারের লাইব্রেরীয়ানের পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ, রসগ্রাহিতাও তদনুরূপ তীক্ষ্ণ, সুন্দর অসুন্দরের বিচারশক্তিও অপূর্ব ধারাল। * * * আমাদের দেশের ছোট বড় সকল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানদের নিজেকে এই ভাবে গুণী করিয়া তোলা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক লাইব্রেরীর পাঠক-পাঠিকা সংখ্যার তালিকায় অনুপাতে যে জনপদে সে লাইব্রেরী স্থাপিত সেই জনপদবাসীদের। আত্মোন্নতি কামনার বা সভ্যতার মাত্রার পরিমান করা যাইতে পারে। য়ুরোপের মধ্যে জার্ম্মানীর লাইব্রেরীগুলির পাঠক সংখ্যা সর্ব্বোচ্চ। রাশিয়ারও কম নহে। প্রাচ্য দেশের মধ্যে জাপানে পাঠক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আপনাদের এই লাইব্রেরীটির পাঠক-পাঠিকা সংখ্যা যতই বাড়িবে ততই আপনাদের এই জনপদটি মানুষ হওয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে জানিবেন।

কিন্তু মিষ্টি খাইয়া শরীর বাড়ে না সকলেই জানেন, কিছু কটা কষার লবণাক্ত জিনিসও প্রতিদিন দেহে যাওয়া চাই, নতুবা পাকযন্ত্রের জারক রসের মাত্রা পূর্ণ হয় না, এবং জীবনীশক্তিতেই খাঁকতি পরিয়া যায়। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন আহার্য্যতত্ত্বে বঙ্গগৃহিনীরা এ বিষয়ে তাঁদের অশিক্ষিত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন—কিঞ্চিৎ কটু সুক্তানি হইতে আরম্ভ করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এর বিধি বাঁধাই আছে। অতএব সুধী পাঠকমণ্ডলী লাইব্রেরীয়ানকে সাহায্য করিবেন, নিজেদের হিতকল্পেই আপনাদের লাইব্রেরীটিকে শুধু রসিকগণের রসভাণ্ডার করিবেন না, ইহাতে জ্ঞানীগণের জ্ঞানরত্নের মণিপ্রাসাদ ও ভাবুক-গণের চিন্তাসম্পদের শ্রীনিকেতনও গাঁথিয়া তুলিবেন।

(বালি পাবলিক লাইব্রেরীর গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভানেত্রীর অভিভাষণ—ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।)

Library : Sarala Devi Choudhurani

গ্রন্থাগার ও গণশিক্ষা

তিনকড়ি দত্ত

Tincori Dutta, one of the pioneers of Library movement and the founder of the Association Buildings in a special number of the 'Granthagar' throws light on the deteriorated condition of the in-organised libraries of Bengal. He points out that the libraries of Bengal have been running through a critical condition leaning towards purchasing of books on light-reading He possesses the view that Bengal Library Association should take the responsibility to organise those libraries and find out the ways to make the people library-minded. He referes to the "Reader's Service Bureau" of Baroda and also suggests that to up lift the mass literacy, measures should be taken to publish the neo-literate books in abundance in cheap rate for the people.

বাংলা দেশে গ্রন্থাগারগুলি নানা বিপর্যায়ের ভিতর দিয়ে কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে এতদিন। এইবার আমাদের দেখতে হবে কি করে এইগুলিকে সংহত করে গণশিক্ষার কাজে লাগান যায়।

আমাদের অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সভ্যদের দেওয়া চাঁদার টাকায় তাঁদেরই রুচিমত বেশীর ভাগ লঘুসাহিত্য কিনে আর সেইগুলি বিতরণ করে কোন রকমে চলে যাচ্ছে। তবে তার সঙ্গে কিছু ভাল বইএর সংগ্রহও আছে, কিন্তু সেগুলির প্রচার বা ব্যবহার হয় কমই। বর্তমান অর্থ সঙ্কটে গ্রন্থাগারগুলি কোন রকমে খোলা রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবৈতনিক কর্মীর অভাব সর্বত্রই। এখন এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে, উপযুক্ত কর্মীর ব্যবস্থা করে। তার জন্য চাই রাষ্ট্রীয় সাহায্য, যাতে এইগুলি পরমুখাপেক্ষী না হয়ে সরাসরি নিজ নিজ এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারে ব্রতী হতে পারে—ব্রতী দল পাঠিয়ে। তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য তাদের দরকারী বিষয়ে কিছু পড়ে শোনাবেন, ছবি দেখাবেন, আর পরে সেই সম্বন্ধে কোন বই বা পত্রিকা তাঁদেরই মধ্যে যিনি পড়তে পাবেন, তাঁকে পড়ে আর সকলকে শোনাবার জন্য বিলি করে আসবেন। পরের বারে গিয়ে সেই বই ফেরৎ নিয়ে আবার অন্য বই দিয়ে আসবেন। দরকার মত চলন্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তবে বর্তমান ব্যবস্থার সংস্কার করে যাঁরা চাঁদা দিয়ে নিজেদের পছন্দমত নতুন নতুন বই বা লঘুসাহিত্য পড়তে চাইবেন, তাঁদের জন্য উপযুক্ত চাঁদা নিয়ে বই সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারবে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই আমূল পরিবর্তন সাধন করতে না পারলে গণশিক্ষার কাজ এগুবে কি করে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এ সম্বন্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সদস্য শ্রেণীভুক্ত করে নিয়ে সেগুলি কিরূপে উন্নত ও কার্য্যকরী করা যায় সে সম্বন্ধে নিজস্ব পরিদর্শক পাঠিয়ে তথ্যসংগ্রহ করে, স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাঁদের নিজ নিজ পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করতে হবে। পরে যে সব বাধা বিপত্তি আসবে সেগুলি কি রকমে দূর করা যাবে সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে; দরকার মত পরামর্শ দিতে হবে। সংগৃহীত তথ্য ও পরিকল্পনাগুলি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করা হলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুবিধা হবে।

একদিকে এই রকম সংগঠন চলবে আর অন্যদিকে অল্পশিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বই যাতে বেরোয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভিন্ন ধরণের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য নির্বাচিত বইয়ের তালিকা আমাদের পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করে যেতে পারে।

বরোদায় যে রকম 'পুস্তকালয় সহায়ক সহকারীমণ্ডলী' নামে সমবায় সমিতির চেষ্টায় মারাঠি ও গুজরাটি ভাষায় ভাল ভাল বই বাহির হচ্ছে আর সেই প্রতিষ্ঠানের বহু সংখ্যক সদস্যকে গ্রন্থাগারের মধ্যে সস্তা দামে বিলি করা হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশেও অনুরূপ সমবায় যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দরকার মত বই লিখিয়ে ভাল করে ছেপে সেগুলি কম দামে বিক্রয় করতে পারা যায় কি না সে বিষয়ে দেখা দরকার।

গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার জন্য আমরা ক'বছর ধরে শিক্ষাকেন্দ্র চালিয়ে আসছি। কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশ গ্রন্থাগারিকই কাজ করবার উপযুক্ত সুযোগ পাননি শুনতে পাই। যাতে তাঁদের সহায়তায় আমরা জেলায় জেলায় আমাদের শাখা স্থাপন করে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি সে বিষয়ে অবহিত হতে হবে। এইভাবে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করে জনমত উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে—দেশের ও দশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে।

("বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা" বিশেষ সংখ্যা হইতে সংকলিত)

Library and Mass Education : Tincori Dutta

The Library Day

Since 1956, Bengal Library Association has been observing the 20th December of the year as the Library Day, in West Bengal. The 20th December of 1925, is a memorable day for the integrated library movement in the Country. It was resolved in the Belgaon Congress Conference in 1924, that each province should have a Library Association of its own, and to implement the same, on the 20th December of the following year, a General meeting was convened in the Albert Institute Hall under the Chairmanship of Mr. J. A Chapman, the then Librarian of the Imperial Library. In that meeting an ad-hoc executive committee was elected for the foundation of 'All Bengal Library Association' for Bengal. Rabindranath Tagore was elected the President and Sushil Kumar Ghosh, the Secretary of the Association. In 1928, the Association was renamed as "Bangiya Granthalaya Parishad" and in 1933, it was again renamed as "Bangiya Granthagar Parishad".

In the year 1953, the Executive Committee resolved that the Library Day in Bengal would be observed on the 19th August, being the date of Confirmation of the Legislation of the Association in 1935. But in 1956, again it was resolved that the foundation day of the Association should be observed as "Library Day" and since then it has still been continuing. The "Library Day" is a sacred day for the library minded people in Bengal and the week commencing from the "Library Day" is observed with high honour throughout the province to mark the date as a 'new era' to the library movement.

গ্রন্থাগার দিবসের ইতিহাস

১৯৫৬ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালন করে আসছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বেলগাঁও সহরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩য় অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে সুশীল কুমার ঘোষের সুপারিশে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার জন্য, ১৯২৫ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় আলবার্ট ইনষ্টিটিউট ভবনে, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত জে. এ. চ্যাপমান মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারানুরাগীদের এক সম্মেলন হয়। এই সভার সভাপতি বলেন যে গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহার, সুষ্ঠু পরিচালন

ও দেশের মধ্যে প্রসার সাধন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগসূত্র সাধন। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন হতে বলেন। এই সভায় সুশীল কুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব ক্রমে 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন' নামে বাঙলা দেশের গ্রন্থাগার সমূহের একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই নব প্রতিষ্ঠিত সমিতির অস্থায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি ও সুশীল কুমার ঘোষকে সম্পাদক নির্বাচিত করে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির নাম 'বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ' এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের এক সভায় 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' রাখা হয়। বাংলাদেশে নানা স্থানে ছোট বড় নানা ধরণের অনেক গ্রন্থাগার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হলেও, সংঘবদ্ধভাবে সমগ্র প্রদেশের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচেষ্টা, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের পূর্বে বিশেষ কিছু হয়নি। সুতরাং এই দিনটিই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তথা বাংলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্মদিন এবং সেইজন্য ঐদিনটিকে গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত করার যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির পুনর্গঠিত পরিষদের নিয়মতন্ত্র গৃহীত হবার তারিখ ১৯শে আগষ্টকে (১৯৩৫ খৃ:) প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে গণ্য করে ঐ দিনটি গ্রন্থাগার হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৯শে আগষ্টকে গ্রন্থাগার দিবসরূপে পালন করা হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ও কাউন্সিলের সভা পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ২০শে ডিসেম্বরকেই গ্রন্থাগার দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খৃ: থেকে আজ পর্যন্ত ২০শে ডিসেম্বর দিন থেকে সাতদিন গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপন করে পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনাকে স্মরণ করা হয়।

(দ্র: প্রমীলচন্দ্র বসু : সম্পাদীয় শ্রাবণ ১৩৬৩
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কথা বৈশাখ, ১৩৭৩
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন)

The Library Day

বই পড়া বিষয়ে

নারায়ণ চৌধুরী

[Shri Narayan Chaudhuri, one of the leading writers of Bengal, throws light on different aspects of book reading. It is the reader who classifies the books according to his own interest and taste, and whether the reading of a particular book is worth while, that solely depends upon the intuition of the reader. In that respect library is the ocean of knowledge, integrated within it the different sphere of knowledge, as per the reader's choice.

Shri Chaudhuri also discusses the different aspects of both classics and modern literature. According to him, the books of light reading or cheap subject are not at all the books of the era. The classics have always their outstanding value but not the books of light reading though they are the "best sellers"—and hence the "best sellers" are always not the best books.]

বই পড়া এমন একটি অভ্যাস যা নিয়ে অতীতে বহু লেখালেখি হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, কিন্তু যার আকর্ষণের রহস্য কোনোদিনই বোধ হয় পূর্ণ ব্যাখ্যাত হবে না। বইয়ের আবেদন এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম। কেউ বইকে দেখেন প্রধানতঃ তথ্য ও সংবাদের আকর হিসাবে, কারও চোখে বই মূলতঃ রসের উৎস। আবার তৃতীয় এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট বইয়ের তথ্যবাহী কিংবা রসবাহী রূপ অপেক্ষাও বড়ো তার জ্ঞানের আবেদন। এমন জ্ঞান, যা প্রজ্ঞায় বিধৃত, দার্শনিকতায় স্থিত। আরও নানা স্তরের ও ভঙ্গীর পাঠক আছেন, যাঁদের এক-এক জনার কাছে বইয়ের আবেদন এক এক রকমের।

এর থেকে এ কথাটারই প্রমাণ হয় যে, কে কী ভাবে বইকে নেবেন সেটা তাঁর স্বকীয় রুচি পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। তাঁর নিজের মানসিক গঠনটাই বইয়ের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে নিয়ন্ত্রিত করে। একই বই প্রবণতা ভেদে এক-এক জনার নিকট এক-এক মূর্তিতে দেখা দেয়। কেউ তার থেকে আহরণ করেন তথ্য, কেউ রস, কেউ জ্ঞান, কেউ আর কিছু। যাঁর গ্রহিষ্ণুতা বেশী অর্থাৎ এক সঙ্গে অনেক জিনিস গ্রহণ করবার যাঁর ক্ষমতা আছে, তিনি হয়তো একটি বই থেকে একই সঙ্গে একাধিক উপাদান আত্মগত করতে পারেন কিন্তু তেমন পাঠকের সংখ্যা কোনো সময়েই খুব বেশী থাকে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পাঠকভেদে বইয়ের চেহারা বদলায়।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক-মনীষী বেকনের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, কিছু বই আছে যা আস্বাদ্য, কিছু বই আছে যা গেলনীয়, আর কিছু বই আছে যা তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে হজম করবার যোগ্য (Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested)। এই থেকেক

বইয়ের প্রকৃতির ভিন্নতার তত্ত্বটি উপলব্ধি করা যায়। সব বই সকলের জন্য নয়, আবার সকল পাঠক সকল বইয়ের জন্য নয়।

লাইব্রেরীতে বহু ধরণের বই সাজানো থাকে। নানাধিক বিষয়ের ও ভাবের বই লাইব্রেরীর শেল্‌ফগুলিতে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। এক বিরাট বিশাল জ্ঞানবারিধি যেন তাঁর উত্তাল তরঙ্গমালাকে সংহত ক'রে গ্রন্থাগারের প্রকোষ্ঠ-মধ্যে থমকে আছে। কোন্ বই কোন্ পাঠকের মনে কী ঢেউ তুলবে সে শুধু সেই পাঠকই বলতে পারেন, অপরের পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে, লাইব্রেরী বা' গ্রন্থাগার আর কিছু নয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট অগণিত পাঠকের চাহিদার যোগানের একটি সংগঠিত চেষ্টা। অর্থাৎ লাইব্রেরী একটি 'মালটিপারপাস' পুস্তকভাণ্ডার। এখানে সকলেরই রুচিমাফিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন জ্ঞানের ও রসের সমাবেশ, কে কোন্ জ্ঞান বা রস গ্রহণে উদ্যত সেটা তাঁরই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বইকে রস, জ্ঞান, তথ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে যেমন শ্রেণীবিভক্ত করা যায়, তেমনি বিভক্ত করা যায় বিষয়ওয়ারী ভাবে। অর্থাৎ ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব. পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, (বিজ্ঞানেরও আবার বহুতর শাখা) অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি নানা ভাগে বইয়ের জগৎকে ভাগ করে দেখানো যায়। এ ছাড়া বইয়ের একটা কালগত বিভাগও আছে। কোনো বই ক্লাসিক বা ধ্রুপদ, কোনো বই মডার্ণ বা আধুনিক। এই দুই বিপরীত সীমার অন্তর্বর্তী স্তরে নানা বিভিন্ন ধরণের বই বর্তমান। এই ক্ষেত্রেও পাঠকদের রুচির ভিন্নতা অতি প্রকট।

যেমন, কিছু কিছু পাঠক আছেন যাঁরা অত্যাধুনিক বই ছাড়া আর কোনো বই পড়তে ভালোবাসেন না। হালের 'বেষ্ট সেলার' জাতীয় বই—তা যে বিষয়েরই উপরে হোক না কেন, তাঁরা সাগ্রহে লুফে নেন। যতো বড়ো প্রসিদ্ধ লেখকের লেখাই হোক, পুরনো বই পড়তে তাঁদের ভালো লাগে না। হালের লেখা বই পড়ার মধ্যে এক ধরণের সজীবতার স্বাদ আছে মানি, কিন্তু নতুন বই মাত্রই তো আর পাঠ্য বই নয়। বরং প্রকাশকদের বইয়ের কারখানা থেকে প্রতিনিয়ত যে সকল বই প্রস্তুত হয়ে বাজারে আসছে তাদের অধিকাংশই অসার বলতে পারা যায়। নতুন বই হলেই সেটা অসার এটা যেমন কোনো যুক্তি নয়, তেমনি এটাও এই সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, সাধারণ শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত পাঠকদের রুচি পূরণার্থে নিতান্তই অর্থকরী তাগিদে ক্ষেপে ক্ষেপে যে সকল বই বাজারে আসছে ও পাইকারী হারে বিক্রি হচ্ছে, তাদের একটা মোটা অংশই সারবান্ বই হওয়া সম্ভব নয়। জনপ্রিয় বই স্বতঃই মূল্যবান্ বই নয়। বরং বইয়ের জগতে 'জনপ্রিয়তার' লেবেলে যে সকল বই চিহ্নিত তাদের অধিকাংশের সারবত্তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলেই বোধ করি ঠিক কাজ করা হয়। 'বেষ্ট-সেলার' জাতীয় বই মরশুমী ফুলের মতো, কিছুকালের জন্য শোভা বিতরণ করেই দৃষ্টির অন্তরালবর্তী হয়, পাঠকের মনের উপর স্থায়ী কোনো ছাপ রাখে না। প্রকাশকের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা 'সফল' বই, সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা

সকল বই বলে গণ্য না-ও হতে পারে। বরং বিপরীত হওয়াই সম্ভব। টমাস ফুলারের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, সেটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য 'Learning hath gained most by those books by which the printers have lost'. অর্থাৎ সেই সব বই থেকেই মানুষ সমধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে যেগুলি ছেপে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কথা যে সত্য তাতে আর সন্দেহ কী। ভালো বই বাজারে কাটতে চায় না, কিন্তু মন্দ বই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি। জনৈক লেখক সখেদে বলেছেন, জনপ্রিয় সাহিত্য মানেই জোলো সাহিত্য। কথাটা অকারণে বলেননি।

অন্যপক্ষে একজাতের পাঠক আছেন যাঁরা সমসাময়িক কালের লিখিত বই সম্বন্ধে উৎসাহী নন, তাঁরা ভালোবাসেন ক্লাসিক বা ক্রুপদী সাহিত্য। অগণিত পাঠকের অনুরাগধন্য যে সকল গ্রন্থ যুগ থেকে যুগান্তরে বাহিত হয়ে কালজয়ী মহিমা অর্জন করেছে, সেইসব চিরায়ত বই বার বার পড়েও এঁদের আশ মেটে না, যতো বার পড়েন ততোই তাদের নতুন নতুন তাৎপর্য, নতুন নতুন অর্থব্যঞ্জনা খুঁজে পান। আর ওই সব বইয়ের এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই ওইগুলি ক্লাসিক মহিমায় ভূষিত হয়েছে, বইগুলি আগে ক্লাসিক ব'লে চিহ্নিত হয়ে পরে পাঠকের ভালো লেগেছে এমন তো নয়। যা-কিছু পুরাতন তা-ই শ্রদ্ধেয় নয়। পুরাতন বইয়ের মধ্যে ঝড়তি-পড়তি সব বই কালের নিয়মেই ঝরে গেছে, যেগুলির চিরন্তন মূল্য রয়েছে সেগুলিই শুধু অম্লান মহিমায় বিরাজ করছে।

ক্লাসিক বা চিরায়ত বই পড়ার মস্ত লাভ এই যে, অতীত যুগের মনীষী ভাবুক কবিরা কী ভেবে গেছেন কল্পনা করে গেছেন, এ যুগে বসেও স্বাদ আমরা পেতে পারি। তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তাঁদের সান্নিধ্য চর্চা করতে পারি। ক্রুপদী লেখকেরা বিগত হয়েছেন অনেক দিন, কিন্তু প্রত্যক্ষে তাঁরা বেঁচে না থাকলেও আমাদের মনে তাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের সহায়ে। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড অডিসি সংস্কৃত তথা গ্রীক কাব্য ও নাটক কতো পুরনো দিনের সৃষ্টি, কিন্তু সে-সবের আকর্ষণ বিচক্ষণ পাঠকের কাছে আজও মন্দীভূত হয়নি তার কারণ এগুলিতে এমন সব চরিত্রের ও পরিবেশের ছবি আছে, এমন সব ঘটনার রূপায়ণ আছে, সর্বোপরি চিত্রিত চরিত্রগুলির মুখে এমন সব জ্ঞানগর্ভ উক্তি ও তাদের স্রষ্টা লেখকের কলমে এমন সব রসঘন মন্তব্য আছে যে, সে সবের অনুষ্ঠানে আনন্দ এবং শিক্ষা দুই-ই প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু আনন্দ নয়, শুধু শিক্ষা নয়—আনন্দ ও শিক্ষার যুগ্ম পার্বতী-পরমেশ্বর রূপ প্রতিটি সার্থক চিরায়ত সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয়। তার উপর চিরায়ত সাহিত্যের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী কনটেন্ট ও ফর্ম, মর্ম ও আঙ্গিক—দুইয়েরই মর্যাদা সমান স্বীকৃত। পরবর্তীকালের রোমান্টিক সাহিত্যের ধরণধারণ থেকে তার জাতই আলাদা। রোমান্টিক কাব্যসাহিত্য ভাবসমৃদ্ধ কিন্তু অস্বচ্ছ প্রকাশশৈলীতে কুয়াসাচ্ছন্ন। ক্রুপদী সাহিত্যে সেরকম নয়। তার রচনারীতি স্বচ্ছ, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন। এ কথা অতীত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে

যেমন সত্য, তেমনি দূরাগত বা নিকটাগত মধ্য যুগের সাহিত্য সম্বন্ধেও সত্য। দান্তে, পেত্রার্কা, সেক্সপীয়র, গ্যেটে প্রমুখের রচনারীতিই সে কথার সাক্ষ্য বহন করছে।

পুস্তকপাঠ সৎসঙ্গ চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। বাস্তব জীবনে সৎ লোকের সঙ্গ খুব বেশী মেলে না, মিললেও তার পুরাপুরি উপযোগ করা যায় না—সময়গত ও অন্যান্য কারণে। পুস্তকপাঠের বেলায় সে অসুবিধা নেই। বরং নির্জনতা ও নিভৃতি পুস্তকপাঠককে সৎ সান্নিধ্য অনুশীলনের অপরিমিত সুযোগ এনে দেয়, যদি তাঁর থাকে পড়ার উপযুক্ত অবসর। শান্ত, অবিক্ষুব্ধ পরিবেশ—যা কেবলমাত্র ভিড় ও কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারলেই আয়ত্তগম্য হওয়া সম্ভব—পুস্তকপাঠের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন আর এ রকম পরিবেশেই কেবল সৎসাহিত্য পাঠের অর্থাৎ সৎসান্নিধ্য চর্চার শ্রেষ্ঠ সুফল লাভ করা যায়।

চিরায়ত সাহিত্য আর আধুনিক সাহিত্য এই দুইয়ের তুলনামূলক বিচার করতে গেলে, সৎসঙ্গের অনুশীলনের পক্ষে চিরায়ত সাহিত্য অনেক বেশী প্রশস্ত। আধুনিক সাহিত্যে আছে সজীবতা, প্রাণোচ্ছলতা, কিন্তু প্রজ্ঞাশীলতার দিক্ দিয়ে চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের কোনো তুলনাই হয় না। চিরায়ত সাহিত্যে topicality-র—সাময়িকতার—আকর্ষণ খুঁজতে গেলে নিরাশ হতে হবে, তার জন্য আধুনিক সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার পড়ে রয়েছে ; কিন্তু অর্বাচীন সাহিত্যে যেটা নেই প্রাচীন সাহিত্যে সেটা আছে—পরিণত চিন্তা ও উপলব্ধির সুপ্রচুর সুসমৃদ্ধ ফসল। জীবন জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে ধ্রুপদী লেখকদের সিদ্ধান্তসমূহ সত্যের অনেক বেশী কাছাকাছি। বৈজ্ঞানিক সত্যের হয়তো নয়, স্বজ্ঞা (intuition) প্রসূত সত্যের।

প্রাচীন সাহিত্যের আকর্ষণ যে কতো দুর্নিবার কবি ও মনীষীদের উক্তি থেকে তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। দু একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করছি। ইংরেজ কবি রবার্ট সাদে লিখেছেন—

> My days among the Dead are passed ;
> Around me I behold,
> Where'er these casual eyes are cast,
> The mighty minds of old ;
> My never-failing friends are they,
> With whom I converse day by day.

অর্থাৎ, মৃত মনীষীদের মধ্যেই আমার দিন কাটে। আমার চারপাশে যেখানেই আমার দৃষ্টি যায়, দেখতে পাই শক্তিশালী মনের অধিকারী ব্যক্তিরা আমাকে ঘিরে রয়েছেন। আমার নিত্য-সহযোগী বন্ধু তাঁরা, তাঁদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমার বাক্যালাপ চলে। মিল্টন তাঁর বিখ্যাত 'অ্যারিও প্যাগিটিকা' গ্রন্থে (যা লেখকদের চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল) লিখেছেন—A good book is the precious life blood of a master-spirit embalmed and treasured up on purpose to

a life beyond life. অর্থাৎ সৎ গ্রন্থ হচ্ছে একজন মহান্ চিন্তানায়কের অমূল্য জীবন-শোণিত, যা জীবন থেকে জীবনান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে বাহিত হবার জন্য ইচ্ছাপূর্বক সযত্ন-সঞ্চিত রাখা হয়েছে। প্রাচীন মিশরে মৃত দেহ সুগন্ধি মসল্লা ও তৈলাদি দ্বারা সুবাসিত করে সংরক্ষণের রীতি ছিল, এখানে সেই রূপকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। তার অর্থ, সৎ গ্রন্থ বলতে খুব সম্ভব মিল্টনের মনের পটভূমিতে ছিল ধ্রুপদী সৎ গ্রন্থ। (মিল্টনের স্বরচিত কাব্যাদিও আজ ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।) যে সব গ্রন্থে কোনো না কোনো আকারে ধ্রুব সত্যের ব্যঞ্জনা রয়েছে সেগুলিকেই আমরা ধ্রুপদী বা চিরায়ত সাহিত্য আখ্যা দিতে পারি।

About book reading
: Narayan Chaudhuri

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পত্রিকা

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

[In his letter to the Assistant Editor, Shri Prabhat Kumar Mukhopadhyay, the noted Librarian of Visva Bharati, emphasises on the fact that without the library not a single organisation, not even the military department could run smoothly. Library is the source of all references. An organised library is a treasury to a country.

Regarding the 'Granthagar' he suggests to incorporate the information to cope up with the present develoments of knowledge in different sphere.]

গ্রন্থাগার ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না—কী সাধারণ কলেজ, কী সামরিক বিভাগ। তথ্যের আকর এখানে। এই কথাটা জোর দিয়ে বলতেই হবে। রান্না ঘরে যারা আগুনে পুড়ে, গলদঘর্ম হয়ে রান্না করছে, তাদের কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু যে টেবিলে খাবার দেয় উর্দী পরে, সেই পায় বকশিষ! কোন বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের বা গবেষণা কেন্দ্রের কোনো কাজ সম্ভব হতো, যদি আমরা অন্তরাল থেকে রসদ না যোগাতাম।

২য় মহাযুদ্ধে আমেরিকা যোগদান করে প্রথম অনুভব করলো জ্ঞান-বিজ্ঞান কীভাবে অবিশ্লিষ্ট, disorganised আমাদের দেশের অবস্থা কি শোচনীয়—তা বিস্তারিয়া বলবার প্রয়োজন নেই। সমস্ত বিষয়কে democratize করতে পারবে—পারবে না কেবল brain-কে। আমরা জোর গলায় বলব—আমাদের নইলে তোমাদের কর্মের নৌকা ভরাডুবি হবে—কারণ সকল জ্ঞানের ভাণ্ডারী আমরা। আমরা যদি ভুল তথ্য সরবরাহ করি, তোমরা ভুল তথ্যে উপনীত হবে। অতএব আমাদের স্থান তোমাদের থেকে নীচে এ কথা মানব না।

কিন্তু এই কথা বলবার সাহস আছে কি আমাদের? আমি বহুবার বলেছি আমাদের content বাড়াতেই হবে। তাহলে জ্ঞানটা শুধু Bibliographical Reference-এ সীমিত থাকবে না। বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করবার পথও আমি বাংলাতে পারবো এমন দুঃসাহসিক উক্তি যেন করতে পারি।

পত্রিকাখানা জ্ঞানের খনি করে তুলতে হবে। কেবল ইংরেজি বা মার্কিনী পদ্ধতির তর্জমা নয়। তোমরা তো আবার Dewey-র হয় অন্ধ ভক্ত, না হয় বিরক্ত। সে কথা থাক। জ্ঞান কি ভাবে বিস্তার লাভ করছে কি ভাবে নূতন নূতন তথ্য আশ্রয় পাচ্ছে, দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য—তারও আলোচনা করতে পারো।

(সহ সম্পাদিকাকে লিখিত শ্রদ্ধেয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্র হইতে সংগৃহীত।)

—সম্পাদক

Library & the Granthagar : Prabhat Kumar Mukhopadhyay

রাষ্ট্রনেতা ও গ্রন্থাগার

ডঃ আদিত্য ওহদেদার

[Dr. Aditya Ohdedar, the Chief Librarian of Jadavpur University, Calcutta, cites a striking example that statesman sometimes thinks for the library, besides his multiferious assignments. Lenin was the Statesman of that exceptional quality. He thought deeply for the development of library and emphasised on the point that to develop a country, simultaneously the libraries of it should also be developed. He framed the rules and regulations about smooth running of the library system in the country from the administrative level, establishing the libraries of the USSR in a most conspicuous position]

গ্রন্থাগার নিয়ে রাষ্ট্রনেতা মাথা ঘামিয়েছেন এমন নজির দেখাবার জন্যে ইতিহাস নিজের মাথা খুঁড়বে। কারণ, ব্যাপারটা অঘটন। গ্রন্থাগার নিয়ে যাদের মাথাব্যথা তারা তো গ্রন্থাগারিক। নিজেদের পেশার মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যে গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগার সম্পর্কে ভাবিত হতে পারে। এবং সম্ভবত শিক্ষক ও ছাত্ররা গ্রন্থাগারিকদের চিন্তাভাবনার কিছুটা শরিক হতে পারেন। কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্রনেতারা গ্রন্থাগার নিয়ে মাথা ঘামাবেন—এটা কেমন করে আশা করা যায়। অবশ্য গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উৎসব-আয়োজনে নিমন্ত্রিত হলে রাষ্ট্রনেতা তাঁর অভিভাষণে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু ভালো ভালো কথা বলতে পাবেন এবং বলেও থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্রসম্পর্কিত তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও চিন্তার মধ্যে গ্রন্থাগারের স্থান কেমন ক'রে সম্ভব? কোথায় রাষ্ট্রনেতা আর কোথায় গ্রন্থাগার। রাষ্ট্রের গঠনমূলক কাজে গ্রন্থাগার কী এমন সমস্যা যার জন্যে রাষ্ট্রনেতাকে মাথা ঘামাতে হবে।

কিন্তু সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে। এক্ষেত্রেও আছে ব্যতিক্রম। তাই দেখি একজন রাষ্ট্রনেতা গ্রন্থাগার নিয়ে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। এই রাষ্ট্রনেতা হলেন লেনিন।

লেনিন তখন তাঁর দেশকে এক প্রচণ্ড বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে প্রয়াসী। অত বড় দেশ তাঁর নেতৃত্বে এক নতুন আদর্শে মেতে উঠবার মুখে। তিনি তখন কতখানি ব্যস্ত তা সহজেই অনুমান করা চলে। কিন্তু সেই সময়েই তিনি গ্রন্থাগার নিয়েও ভাবিত। একটি লেখায় তিনি যা লেখেন তার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়।—

"পশ্চিমের দেশগুলোয় এমন কতকগুলো পচা কুসংস্কার আছে যা থেকে আমাদের পবিত্র রুশজননী মুক্ত। যেমন, তারা মনে করে যে বড় বড় গ্রন্থাগার, যেখানে হাজার হাজার বইপত্র থাকে, তা কখনই শুধুমাত্র তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্যে নয়। তাদের এই লক্ষ্য—কী অদ্ভুত ও সভ্যতা পরিপন্থী লক্ষ্য - যে সেই সব বিপুল

গ্রন্থ-সম্ভার দেশের বিদগ্ধ-পণ্ডিতজনের গণ্ডী ছাড়িয়ে জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত রাখতে হবে। জনসাধারণ, অর্থাৎ আমরা যাকে বলি ইতরজনের ভীড়।

সুতরাং ঐ সব দেশে গ্রন্থাগারের কী শোচনীয় দশা! কোনো বাদ-বিচার নেই, নিয়মশৃঙ্খলা নেই—যে বাদ-বিচার, নিয়মশৃঙ্খলা আমাদের গর্বের বস্তু। কোথায় আমলাতান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলা, বাধানিষেধের বেড়াজাল বইপত্রকে জনতার স্থূলহস্তাবলেপ থেকে রক্ষা করবে, তা নয়, সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত মহামূল্য গ্রন্থসংগ্রহ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারে কত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে—দশম শতকের পুঁথি কিংবা ষষ্ঠদশ শতকের মুদ্রিত গ্রন্থ কী কী আছে—এসব নিয়ে তাদের তেমন গর্ব করার স্পৃহা নেই। তাদের গর্বের বস্তু হল, দেশে কত জনগ্রন্থাগার আছে, কত লোক সেখানে রোজ পড়তে আসে, কত বই বাড়ি নিয়ে যায় পড়বার জন্য, রোজ কত লোক গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠক হিসেবে নাম লেখাচ্ছে, কত অল্প সময়ে পাঠকের চাহিদা মেটানো হচ্ছে, কত শিশু গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পড়বার সুবিধা পাচ্ছে। এইসব অদ্ভুত মনোভাব পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলিতে জাঁকিয়ে আছে। সুখের বিষয় আমাদের ওপর খবরদারি করার ভার যাঁদের ওপর তাঁরা অতি সযত্নে আমাদের গ্রন্থাগারগুলিকে দেশের জনসাধারণের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করে আসছেন!"

এরপর লেনিন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। সে সময় প্রকাশিত ঐ লাইব্রেরির বাৎসরিক বিবরণ অনুসরণ ক'রে লেনিন লেখেন—"এই গ্রন্থাগারে প্রায় কুড়ি লক্ষ বই আছে। যে বছরের বিবরণী, সে বছর ১৬,৫৮,৩৭৫ জন লোক গ্রন্থাগারে এসেছে; বসে বই পড়েছে ২,৪৬,৯৫০ জন। এবং বাড়িতে পড়বার জন্যে এই গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়েছে ৯,১১,৮৯১।

"এ ছাড়া, এই গ্রন্থাগারের ৪২টি শাখা শহরের বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে। আরো শাখা খোলা হবে। উদ্দেশ্য, প্রত্যেক বাড়ির লোকেরা যাতে দশমিনিট পায়ে হাঁটা দূরত্বের মধ্যে গ্রন্থাগারের সুবিধা পায়।

"এই গ্রন্থাগার শিশুদের জন্যেও পড়বার ব্যবস্থা করেছে। আলাদা ঘরে তাদের পাঠ্য বই থরে থরে সাজানো। সেখানে শিশুরা এসে পড়ে, আবার বাড়িতে পড়বার জন্যেও বই নিয়ে যায়। এদের মনে যে সব প্রশ্ন জাগে তার উত্তর দেবার জন্যে এখানকার গ্রন্থাগারিক সর্বদা ব্যগ্র ও যত্নশীল। প্রায় ত্রিশ লক্ষ বই শিশুরা বাড়িতে পড়বার জন্যে নিয়ে গেছে। গ্রন্থাগারে এসেছে ১১,২০,৯১৫ শিশু।"

সবশেষে লেনিন লেখেন, নিউ ইয়র্ক শহরে এইভাবে কাজ হয়, আর রাশিয়ায়?

লেনিনের রচনা থেকে যতটুকু তর্জমা তুলে ধরেছি তা থেকে স্পষ্টই দেখছি গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর চিত্ত কতখানি সজাগ ছিল। তাঁর দেশে গ্রন্থাগারের অবস্থা যে পর্যায়ে ছিল তাতে তাঁর মন এতটা ব্যথা ও উষ্মায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যে তিনি তাঁর মনোভাব সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ব্যঙ্গের কশাঘাত অবশ্য তখনকার শাসনব্যবস্থার

প্রতি। জারতন্ত্র প্রভাবিত যে শাসনব্যবস্থা চালু ছিল তাতে গ্রন্থাগারকে রাখা হয়েছিল এক শ্রেণীর লোকের অধিকারভুক্ত সম্পদ হিসেবে। গ্রন্থাগারকে জনসাধারণে কাছে আনা হয়নি, অথবা ঘুরিয়ে বলা যায়, জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের কাছে আসতে দেওয়া হয়নি। গ্রন্থাগার ও জনসাধারণের মধ্যে এই যে বিচ্ছিন্নতা, এটাই লেনিনকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। নেতা হিসেবে তিনি তাঁর দেশকে যে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে উদ্যোগী ছিলেন সেই রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান যে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—এমন ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল বলেই গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর এই রচনা তিনি স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে লেখেন।

অবশ্য লেনিনের উক্ত রচনা নেতিমূলক। জারতন্ত্র শাসনের ফলে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে বিরাট নঞর্থকত্ব তার উন্মোচন ঘটাতে গিয়ে তাঁর রচনা স্বভাবতই নেতিমূলক হয়েছে। কিন্তু যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তিনি দেশকে নতুনভাবে গড়তে চাইছিলেন তাতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে শুধু নেতিমূলক চিন্তা করলে চলে না। ইতিকর্তব্য স্থির করতে হয়। লেনিন তা করেছিলেন। পেট্রোগ্রাড, অর্থাৎ এখন যাকে বলে লেনিনগ্রাড, সেখানকার পাবলিক লাইব্রেরী (আগে নাম ছিল ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরি) কীভাবে চলবে সে বিষয়ে লেনিন তাঁর অনুশাসন লিপিবদ্ধ করেন। প্রথমেই তিনি জানালেন যে বুদ্ধিবিবেচনা, লক্ষ্য ও সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবের অংশীদার হতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন। যেহেতু জারতন্ত্র বহুকাল যাবৎ দেশের জনগণের শিক্ষা নিয়ে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করেছে সেইহেতু পেট্রোগ্রাডের লাইব্রেরি আজ এত দুর্দশাগ্রস্ত। তারপর বললেন, পশ্চিম দেশের, বিশেষ করে সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকার দৃষ্টান্তে এই লাইব্রেরির কর্মপন্থা স্থির করতে হবে, এবং সে কারণে এখুনি যে পরিবর্তন আনতে হবে তা হল এই :—

(১) পেট্রোগ্রাডে যত সাধারণ গ্রন্থাগার ও সরকারি গ্রন্থাগার আছে তাদের মধ্যে বইয়ের আদানপ্রদান চালু করতে হবে। এই আদানপ্রদান অন্যান্য রাষ্ট্রের গ্রন্থাগারের সঙ্গেও চলবে। বিশেষ করে তাদের সঙ্গে, যেসব রাষ্ট্র কাছাকাছি অবস্থিত, যেমন ফিন্‌ল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ইত্যাদি।

(২) এক গ্রন্থাগার থেকে অন্য গ্রন্থাগারে বই পাঠানোর কাজ বিনা ডাকমাশুলে চলবে। এর জন্যে আইন করতে হবে।

(৩) লাইব্রেরির পাঠকক্ষ সকাল আটটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত প্রত্যহ খোলা রাখতে হবে—রবিবার তথা ছুটির দিনেও একই ব্যবস্থা।

(৪) এই ব্যবস্থার জন্যে যে লোক প্রয়োজন তা আসবে শিক্ষামন্ত্রকের বিভিন্ন দপ্তর থেকে যেখানে দশজনের মধ্যে ন'জন শুধু যে বৃথাই নিযুক্ত আছে তা নয়, রীতিমতো ক্ষতিসাধন করছে। তাদেরকে অবিলম্বে এই লাইব্রেরিতে বদলি করে দিতে হবে।

রাষ্ট্রনেতার ভূমিকায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে লেনিন যে সচেতনতা দেখিয়েছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। বলতে পারি এ বিষয়ে তিনি অনন্য। আজকের সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে-রূপ, তার মূলে আছে লেনিনের চিন্তা ও অনুশাসন। প্রায় অবধারিত প্রথার

দেখা যায় রাষ্ট্রনেতার কাছে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আবেদন নিবেদন অন্যের কাছ থেকে রাষ্ট্রনেতা চাপে পড়ে তা অনুমোদন করেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ থাকে না। লেনিনের জন্যে রাশিয়ায় ঘটনা হয়েছে উলটো। রাষ্ট্রনেতা স্বয়ং প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠু করতে উদ্যোগী হন। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ভালোভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়। একজন বিখ্যাত আমেরিকান গত মহাযুদ্ধের মুখোমুখী সময়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন সেখানকার অবস্থা দেখতে। আগে সাইবেরিয়ার যে সব অঞ্চল জনমানবহীন শূন্য প্রান্তর রূপে পড়ে থাকত সোভিয়েট সরকার সেখানে সুন্দর সুন্দর জনপদ সৃষ্টি করে। ইরাকুটস্ক এই রকমই এক জনপদ। আমেরিকান পর্যটক সেই শহর দেখতে এসে প্রথমেই বললেন, এখানে কোনো লাইব্রেরি আছে কি? তা আছে শুনে তিনি সেখানেই আগে গেলেন। লাইব্রেরিটি দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন, গ্রন্থাগারের প্রকৃত মূল্য না বুঝলে সেখানকার লোকেরা অমন গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারত না।

রাষ্ট্রনেতা লেনিন বিপ্লবে প্রথম অবস্থাতেই গ্রন্থাগার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন বলেই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গ্রন্থাগার অমন দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে।

Statesman & the library : Dr. Aditya Ohdedar

[লেনিন গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিশদ বিবরণ গত কার্তিক সংখ্যা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি সোভিয়েট দেশ থেকে পুনর্মুদ্রিত। : সম্পাদক]

গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

[Shri Chittaranjan Bandyopadhyay in his article, 'Status of the Librarians' suggests some definite ideas to uplift the status of the librarians. Librarians are not merely the mechanical human beings but they should have the intuitions to be the good librarians There is a strategic difference between the service of the Librarians and of the people of other professons. Besids the technical training in librarianship, the librarian should possess the vigour and imagination along with the administrattive qualifications to develop thc deteriorated condition in which he belongs to.]

পদমর্যাদার দাবী চাকরিজীবি সকলেই করেন। গ্রন্থাগারিকদের পক্ষেও এ দাবী স্বাভাবিক। পদমর্যাদার দাবী বিচার করবে সমাজ ও রাষ্ট্র। বিচারের জন্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাই। প্রথমতঃ, গ্রন্থাগারিক যে কাজ করেন তা সুসম্পন্ন করতে হলে কি কি গুণ চাই। অর্থাৎ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ কি ধরণের সেবা পায় গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে। এই সেবা কি অপরিহার্য এবং আর কোনো শ্রেণীর লোক পারে না? তৃতীয়তঃ, কি রকম মর্যাদা গ্রন্থাগারিকরা আশা করেন। কম হোক, বেশী হোক, কিছু মর্যাদা তো তাঁরা এখনও পেয়ে থাকেন। সেটা বৃদ্ধি পেয়ে কোন লক্ষ্যে পৌঁছবে?

মোটামুটি সাধারণ শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ—গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত। কিন্তু একটি মান নির্দেশ করা কঠিন। কারণ গ্রন্থাগার নানা শ্রেণীর এবং বিভিন্ন কাজের জন্য নানা শ্রেণীর কর্মী প্রয়োজন। শ্রেণীর বৈচিত্র্য স্বভাবতঃই যোগ্যতারও স্তরভেদ সৃষ্টি করে। যাই হোক্, শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত।

গ্রন্থাগারিকের কাজকে কি বলা যায়,—চাকরি না বৃত্তি? অর্থাৎ, অকুপেশান না প্রোফেশান? সব অকুপেশানের লোকই প্রোফেশানে উন্নীত হতে চায়। সব হোয়াইট কলার চাকুরেদেরই এই লক্ষ্য। কারণ, প্রোফেশানের লোকদের সম্মান ও উপার্জন দুই-ই বেশী। তবে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি প্রোফেশানে যাঁরা যান তাঁদের অনেক দিন পড়াশুনা করে বিশেষজ্ঞ হতে হয়। গ্রন্থাগারিককে কিন্তু তেমন করে পড়তে হয় না। এখনও বহু গ্রন্থাগারিক আছেন যাঁদের কোনো বিশেষ শিক্ষা নেই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে। অথচ গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি প্রভৃতি গ্রন্থাগারে যাঁরা সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন তাঁদের অনেকেরই কোনো তাত্ত্বিক শিক্ষা নেই, শিক্ষা যা-কিছু হাতে-কলমে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে নিয়মিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা বেশী দিনের নয়। এর রূপ ও বনিয়াদ এখনো সমাজের নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিদের মনে সম্ভ্রমের সৃষ্টি করতে পারেনি। বিগত কয়েক শতাব্দীর গ্রন্থাগারের ইতিহাস তাঁরা দেখতে পান যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা বই ভালোবাসতেন তাঁরাই গ্রন্থাগার পরিচালনা করেছেন। এবং এর জন্য পাঠকদের কোনো ক্ষতি হয়নি। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের গ্রন্থাগারিকরা টেকনিশিয়ান ছিলেন না; কিন্তু তাঁদের ছিল পাণ্ডিত্য। পাঠকদের পুস্তক নির্বাচনে তাঁরা সহায়তা করতেন নিজেদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্য। পুস্তক তালিকা অথবা সুষ্ঠু বর্গীকরণ পদ্ধতির আবশ্যকতা ছিল গৌণ। নানা কারণে সেই পরিস্থিতি আজ পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু পাঠকদের মন থেকে গ্রন্থাগারিক সম্বন্ধে পুরনো ধারণাটা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। তাই গ্রন্থাগারিক জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ দেখে তাঁরা হতাশ হন, তাঁরা যোগ্যতা নিয়ে পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে। পাঠকরা বোঝেন না যে আজকাল ব্যক্তিগত বিদ্যানুশীলনের স্থান ক্রমশঃ অধিকার করছে উন্নত বর্গীকরণ ও তালিকাকরণ পদ্ধতি। এই না-বোঝবার একটা কারণও অবশ্য আছে। পুস্তক বিন্যাসের পদ্ধতি যতই আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক হোক না কেন, পাঠকের পক্ষে তার সামগ্রিক উপলব্ধি সম্ভব নয়। আজকাল যে-সব জটিল পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে তা বিশেষ শিক্ষা ব্যতীত গ্রন্থাগারিক যেমন ব্যবহার করতে পারেন না, পাঠকও তেমনি তাদের সুযোগ নিতে পারেন না। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে নতুন নতুন যে-সব রীতিনীতি আবিষ্কৃত হচ্ছে তা গ্রন্থাগারিকের কাজ সহজ ও সুষ্ঠু করবার জন্য। পাঠক এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না, মূল্যও বুঝতে চান না। তাঁরা যথাসময়ে চাহিদা মতো বইটি পেলেই সন্তুষ্ট। এই সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই গ্রন্থাগারিক রয়েছেন।

সর্বজনস্বীকৃত প্রেফেশনের যাঁরা সভ্য তাঁরা নিজেদের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত করেন, লেখেন নতুন নতুন বই। গ্রন্থাগারিকের কাজ হলো সেই বইগুলি এমনভাবে সাজিয়ে রাখা যাতে পাঠক সহজে খুঁজে পান। গ্রন্থাগারবিজ্ঞান চর্চা করে এই সুষ্ঠু বিন্যাসের বিদ্যা। সুতরাং আমাদের বিদ্যা দ্বিতীয় সারির। অর্থাৎ, ডাক্তার চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই লিখলে কিভাবে সেগুলি সাজিয়ে রাখলে সুবিধা হয় আমরা সে বিষয়ে ভাবব। জ্ঞানের রাজ্যে আমাদের মৌলিক দান নেই বলে সমাজ আমাদের স্বীকৃতি দিতে চায় না। আমাদের দেশে তো গ্রন্থাগারবিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন এখনো অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। পাশ্চাত্ত্যের কোনো দেশে এখনো গ্রন্থাগারিকরা প্রোফেশানের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেননি।

গ্রন্থাগারিকের কাছে সমাজের দাবী কতটুকু? বইপত্র সংরক্ষণ করা এবং চাহিদা হলে তার যোগান দেওয়া। এখানে সাধারণ গ্রন্থাগারের কথাই বলা হচ্ছে। কারণ অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগারকে ঠিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। ডাক্তার, উকিল প্রভৃতির নিকট সমাজের সুনির্দিষ্ট এবং জরুরী দাবী আছে। গ্রন্থাগারিকের নিকট তেমন দাবী নেই। পুস্তকের মূল্যায়ণ ও নির্বাচনের জন্য পাঠকরা নির্ভর করেন বিশেষজ্ঞদের উপরে। এই কাজ পূর্বে প্রধানতঃ গ্রন্থাগারিকই করতেন। কিন্তু গ্রন্থাগারিক ক্রমশঃ টেকনিকের উপর জোর দেওয়ায় উপদেষ্টার ভূমিকা থেকে তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে। অবশ্য

ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। কিন্তু সেটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতার উপর।

সুতরাং গ্রন্থাগারিক সমাজের পক্ষে যে অপরিহার্য এই চেতনা পাঠকদের মধ্যে তেমন প্রবল হয়ে ওঠেনি। কেননা, পাঠকের হাতে বই তুলে দেবার আগে গ্রন্থাগারিক কি কি কাজ করেন তা তাঁর দেখবার সুযোগ হয় না। গ্রন্থাগারিকের কাজ সম্পন্ন হয় পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে। অন্যান্য প্রোফেশনের কাজ প্রত্যক্ষ। রোগীর জন্য ডাক্তার যা করেন রোগী তা সব দেখতে পায়। পাঠক পুস্তক-তালিকা দেখে বই নির্বাচন করেন, গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে একটি কথা না বলেও অধিকাংশ সময় কাজ চলে যায়। কোন খবর জানতে চেয়ে উত্তর পেলে পাঠক তা কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে প্রায়ই মনে করেন না। যেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এন্‌কোয়ারি আপিসের মতোই এখানে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, কি ধরণের মর্যাদা গ্রন্থাগারিক দাবী করেন। অধিকাংশ গ্রন্থাগারিকেরই আকাঙ্ক্ষা তাঁকে যেন বুদ্ধিজীবির শ্রেণীতে গণ্য করা হয়। কিন্তু পদমর্যাদা ও বেতন কেমন হবে, কোন প্রোফেশানের সঙ্গে তুলনীয় হবে, সে সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। শুধু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের লক্ষ্য স্থির আছে। তাঁরা শিক্ষকদের সমকক্ষতার দাবী করেন।

কোনো প্রোফেশান বা কর্ম্মীগোষ্ঠীর পদমর্যাদা স্থির করবার দায়িত্ব সমাজের। সমাজ যে গোষ্ঠীর কাছ থেকে যে ধরণের সেবা পাবে সেই অনুপাতে সেই গোষ্ঠীর মর্যাদা নির্দিষ্ট করে। পূর্বেই দেখিয়েছি অধ্যাপকদের, বিশেষ করে যাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের কোনো শাখায় বিশেষজ্ঞ, পশ্চাতের সারিতে গ্রন্থাগারিকদের স্থান। গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রধান উপায় হতে পারে পুথি-পত্রের সঙ্গে নিবিড় ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। এই যোগাযোগ স্থাপিত হলে গ্রন্থাগারিক সহজেই পুস্তক বিন্যাসকুশলীর স্তর থেকে উন্নীত হয়ে উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। অধ্যাপকদের তুলনায় গ্রন্থাগারিকদের এ বিষয়ে একটি বিশেষ সুবিধা আছে। তাঁরা সর্বাধুনিক বইপত্রের খবর পান সকলের আগে, তাঁদের হাতে প্রথম আসে নতুন নতুন বই।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে গ্রন্থাগারিককে কি পণ্ডিত হতে হবে? প্রচলিত অর্থে পণ্ডিত বলতে যা বোঝায় গ্রন্থাগারিকের পক্ষে নানা কারণে তা হওয়া হয়তো সম্ভব নয়। আর তিনি পণ্ডিত হলে গ্রন্থাগারে চাকরি করতে কেনই বা আসবেন! ডঃ জনসন দু'রকম পণ্ডিতের কথা বলেছেন :

> Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it."

গ্রন্থাগারিককে আয়ত্ত করতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান। গ্রন্থাগারিক হবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত। অর্থাৎ, তাঁর জানা চাই কোন্ বইয়ে কি ধরণের খবর পাওয়া যাবে, কোন বিষয়ের খবরের জন্য কোথায় খুঁজতে হবে। শুধু পুস্তক তালিকার উপর নির্ভর করলে এই জ্ঞান লাভ করা যায় না।

কিন্তু শুধু বইয়ের জ্ঞানই কি যথেষ্ট? মোটেই নয়। গ্রন্থাগারিক যদি তাঁর কাজে

সাফল্য লাভ করতে চান তাহলে তাঁকে আরও কতকগুলি গুণ আয়ত্ত করতে হবে। তাঁর চাই প্রশাসনিক দক্ষতা, পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কোন পথে হতে পারে সেই সম্পর্কে কল্পনার শক্তি। একটি প্রতিষ্ঠানকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনার জন্ত যে সব গুণাবলীর প্রয়োজন তার সবই থাকা চাই।

পুটনাম লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর এই পদে কাকে নিযুক্ত করা যায় সে সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে নির্বাচন করলেন আমেরিকান কবি আর্চিবল্ড ম্যাকলিশকে। রুজভেল্ট এ সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টারের মত জানতে চাইলেন। রুজভেল্ট ম্যাকলিশের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখলেন : "He is not a professional librarian nor is he a special student of incunabula or ancient manuscripts. Nevertheless, he has lots of qualifications that said specialists have not."

বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টার ম্যাকলিশের নিয়োগ সমর্থন করে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের শিক্ষা নেই বলে ম্যাক্‌লিশের দাবী তিনি অস্বীকার না করে লিখলেন : The danger of the technical librarian is that he over-emphasizes the collection and classification of books—the merely mechanical side of the library—and fails to see the library as the gateway to the development of culture." তাঁর সন্দেহ নেই যে ম্যাকলিশ নিযুক্ত হলে লাইব্রেরি কেমন হবে : "He would bring to the librarianship intellectual distinction, cultural recognition the world over, a persuasive personality and a delicacy of touch in dealing with others, and creative energy in making the Library of Congress the great centre of the cultural resources of the Nation in the technological setting of our time."

এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের শিক্ষার উপর মোটেই জোর দেওয়া হয়নি। শুধু যে ফ্রাঙ্কফুর্টারই একটি বিশেষ মতবাদ পোষণ করতেন, তা নয়। একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদ খালি হবে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। এই পদের প্রার্থীদের কাছ থেকে এর মধ্যেই আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি থেকে দেখা যাবে যে এই ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুঁথিগত জ্ঞান চাওয়া হয় নি :

"Applicants should have capacity to manage and to develop a a national institution with vigour and imagination. They must be capable of taking their place and communicating with administrators and scholars on a national level. Along with leading librarians applicants are expected to include other persons with high administrative and academic qualifications."

আমরা জোর দিই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের পুঁথিগত বিদ্যার উপরে। এর ফলে গ্রন্থাগারবৃত্তিরই স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা আছে।

—Status of the librarians : Chittaranjan Bandyopadhyay.

গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

অন্নদাশঙ্কর রায়

[The note-worthy writer Annada Sankar Ray, in his article, "About the Library" starts with the line that the writer and the library are so inter-related as if they are the two sides of a coin. The author prepares the books and the library preserves the same. Besides the institutional libraries, public library is the most important factor to cope up with the ever increasing education, which is a perinnial stream and to keep pace with it, spreading of public library is essential.]

গ্রন্থকার আর গ্রন্থাগার যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। গ্রন্থকার না থাকলে গ্রন্থাগার থাকে না। আর গ্রন্থাগার না থাকলে গ্রন্থকারের সৃষ্টি ধারণ করে রাখবে কে? বলা বাহুল্য ঘরোয়া গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগার। আবার শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগার।

তবে আমরা সাধারণত পাবলিক লাইব্রেরী অর্থেই গ্রন্থাগার শব্দটি ব্যবহার করি। পাবলিক লাইব্রেরী এদেশের মাটিতে নতুন। সব চেয়ে পুরাতন পাবলিক লাইব্রেরীর বয়সও দেড় শতাব্দীর বেশী নয়। এসব লাইব্রেরী দ্বারা পাঠক সাধারণের অশেষ উপকার হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয়। এখনো এদেশের বৃহত্তর জনসাধারণ পাবলিক লাইব্রেরীর সেবা থেকে বঞ্চিত।

গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একাজ বেশীদিন ফেলে রাখা যাবে না। কেবলমাত্র পাঠশালা বিদ্যালয় বা কলেজ থেকেই সকলে শিক্ষা লাভ করতে পারে না। করলেও তা বিশ বাইশ বছরে ফুরিয়ে যাবে। কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করে তারা শিক্ষিত বলে গণ্য হবে তা ঠিক। কিন্তু চর্চা না করলে প্রত্যেকটি বিদ্যাই বাসি হয়ে যায়। বিশেষ করে আজকের দিনে জ্ঞানবিজ্ঞান যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে শিক্ষিত ব্যক্তিও সেকেলে হয়ে হয়ে যান। সুতরাং তরুণ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা হারান।

কলেজের পড়াই যথেষ্ট নয়। তার পরেও আরো পড়াশুনা করতে হবে। আজীবন অধ্যয়ন করা চাই। রবীন্দ্রনাথকে তা করতে দেখেছি। মৃত্যুর একবছর আগেও তিনি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে "ম্যাথেমেটিকস ফর দি মিলিয়ন" নিয়ে পড়েছিলেন। আর একজন জ্ঞানতপস্বীর নিকট সংস্পর্শে এসেছি। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কখনো সংস্কৃত, কখনো প্রাকৃত, কখনো ফরাসী, কখনো জার্মান ভাষার বই হাতে নিয়ে বসেছেন বা শুয়েছেন। তাঁর তৃষ্ণার জল।

সাধারণ মানুষকে সারাজীবন এই তৃষ্ণার জল জোগাবে কে? পাবলিক লাইব্রেরী। দেশে অসংখ্য পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে আর তাতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রাখতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রথম প্রস্তাবটির চেয়েও কঠিন। সাহিত্যের রুচি এত নিচে নেমে গেছে যে তাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য পণ্ড। না দিলেও বিপদ। কেউ বই নেবে না, চাঁদা দেবে না। তখন লাইব্রেরীটাই সেকেলে হয়ে যাবে।

About the library : Annada Sankar Ray

গণশিক্ষা ও গ্রন্থাগার

ডক্টর বিমল কুমার দত্ত

[Dr. Bimal Kumar Dutta in his article "Mass education and the Library" throws light on the vital points of education system. Most of the people live in villages without any proper scope of education and this condition can only be improved by setting several schools and libraries in rural areas. The libraries should take some measures to create interest among the villagers to come to the library. The library should give some vital guidence about the solution of day to day problems of the rural people, such as the health services, duckery, appeary, cultivation, irrigation, abuses of untouchability, Family Planning etc. by publishing books in cheap rate and by postering and leaftets. Film show, Debating, cultural soiree may also be arranged by the library to make the people library minded.

Dr. Dutta also emphasises on the development of the condition of library personnels and the library itself. To allure the trained people to serve in the rural areas some incentives should also be given to the rural librarians.]

"নিরক্ষর ও অশিক্ষিত দেশবাসী ভারতের পাপ ও দৈন্তের প্রতীক। এই দীনতা ও পাপ দূর করা একান্ত প্রয়োজন।"

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর উপরোক্ত আবেদন আজ আমাদের আবার স্মরণ করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষা বিস্তারের জন্ত জাতীয় সরকার কৃতসংকল্প হইয়া ধনবণ্টন ও জ্ঞানবণ্টন যজ্ঞের সূত্রপাত করেন। কিন্তু আজিও ইহা পূর্ণ বাস্তবে রূপান্তরিত হয় নাই। এই যজ্ঞ সম্পাদনের পথে বাধাবিঘ্ন অনেক।

শুনিয়াছি প্রাচীনকালে দৈত্যগণ নানাভাবে ঋষি মুনিদিগের যজ্ঞকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। বর্তমানে দৈত্যগণের সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায় না কিন্তু জটিল স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ঘূর্ণি হাওয়া পদে পদে এই ধন ও জ্ঞানবণ্টন যজ্ঞের বাধা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

দেশের অশিক্ষিত ভাইবোনদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে জ্ঞানবণ্টন যজ্ঞ সার্থক ও সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের শতকরা ৮০% ভাগ মানুষ বাস করেন গ্রামে। গ্রামগুলির দুঃখ-দুর্দশার অবস্থা চরম; অশিক্ষার রূপ বিভীষিকাময়; স্বাস্থ্যের মান নিম্নগামী ও সুরুচির ভাবমূর্ত্তি বিকৃত। এই অবস্থা সম্যক বিবেচনা করিয়া দেশের ও দশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত জ্ঞানবণ্টন যজ্ঞের উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

জ্ঞানবণ্টন যজ্ঞ সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তা আমরা সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করেছি কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনা কালের শেষে ও জাতীয় সরকারের কাছ থেকে কোন সুচিন্তিত কার্য্যধারার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

১৯৫৫ সালের ৬ই জানুয়ারী গুজরাট বিদ্যাপীঠ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা উৎসবে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন—"It should be our endeavour to locate at least one library in every village in the country. The use of library should not be limited to a few scholars or pandits but the mass of people must begin to read. In fact every library should be a sort of University itself. পণ্ডিত নেহেরুর স্বপ্ন ও সাধনাকে সার্থক রূপদান করিতে হইলে প্রতি গ্রামে একটি করিয়া গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার-কেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার নিয়োজিত Library Advisory Committee প্রতি গ্রামের পরিবর্ত্তে ৪ কিম্বা ৫টি গ্রামের জন্য একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আর্থিক কারণে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য হইলে বিশ্বভারতীর চলন্তিকা বা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ন্যায় একটি গ্রন্থাগার-কেন্দ্র হইতে ৪ কিম্বা ৫টি গ্রামে নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট গ্রামসেবকের নিকট টিনের বা কাঠের বাক্সে করিয়া বইপত্র পাঠান যাইতে পারে। ভারপ্রাপ্তকর্মী ঐ সকল উপযোগী গ্রন্থাদি নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য গ্রামবাসিদিগের মধ্যে বিতরণ করেন এবং যথাসময়ে আবার ঐ সকল গ্রন্থ গ্রন্থাগার-কেন্দ্রে ফিরৎ করিয়া নূতন বাক্স-বোঝাই বইপত্রাদি লইয়া স্ব স্ব গ্রামে হাজির হন।

কিন্তু গ্রামের এই সকল গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার কেন্দ্রের একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য—চিন্তা থাকার প্রয়োজন। অন্যথায় অর্থ ও শ্রমের বৃথাই অপব্যয় হয়। অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত গ্রামবাসিদিগের মধ্যে তাহাদের জীবনধারা ও মান উন্নয়নের এবং চিত্তবিনোদনের প্রচেষ্টাই এই সকল গ্রন্থাগারের একমাত্র লক্ষ্য। মোটামুটিভাবে এই ধরণের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) স্বল্পশিক্ষিত গ্রামবাসীকে তাঁহার জানিবার ও শিখিবার ইচ্ছাকে জাগ্রত রাখিবার জন্য তাঁহাদের চাহিদা, প্রয়োজন ও শিক্ষাগত মান অনুযায়ী সহজ ভাষায় লেখা বইপত্র সরবরাহ করা।

(২) গ্রামবাসিদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ; পারস্পরিক সহযোগীতার উপকারীতা ; গো সেবা ; হাঁস মুরগী পালন ; খেতখামারের নানান কথা ; মহাপুরুষদিগের জীবনী ও বিভিন্ন ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আকর্ষণীয় তথ্যসমন্বিত গ্রন্থাদি পরিবেশন করা।

(৩) গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন সেকারণ জমির রূপ ও প্রকৃতি, বৃষ্টিপাতের ধারা ও জলনিকাশনের ব্যবস্থা, চাষ আবাদের বিভিন্ন পন্থা, বিভিন্ন ধরণের শস্য ও বৃক্ষাদি চাষ সম্বন্ধে গ্রামবাসিগণকে অধিকতর সচেতন করা।

(৪) গ্রন্থাদি, চিত্র বা পোষ্টার অথবা ফিল্মের সাহায্যে দেশের বৃহত্তম পরিকল্পনার কার্য্যধারা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিচয় করান।

(৫) অস্পৃশ্যতা, ধর্ম্মের গোঁড়ামী, জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের সু ও কু দিকগুলি সহজভাবে গ্রামের ভাইবোনদের বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(৬) দেশের বর্ত্তমান সমস্যা—অধিক খাদ্য উৎপাদন ও পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা জনসংখ্যা হ্রাস করার চেষ্টা সম্বন্ধে তাহাদিগকে ওয়াকিবহাল করিতে হইবে।

(৭) গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যাত্রা, তর্জ্জা, কবিগান, কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া গ্রামবাসিদিগের চিত্তবিনোদন করা কর্ত্তব্য।

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই সকল কার্য্যধারা রূপায়িত করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, সহজবোধ্য পুস্তকাদি সরবরাহ করা, পোষ্টার বা ছবি, সবাক ফিল্ম, বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, উপযোগী যাত্রাগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গ্রামের মানুষকে ধীরে ধীরে আত্মসচেতন করিয়া তুলিবার জন্য পুস্তকাদি অপেক্ষা পোষ্টার বা ছবি, ফিল্ম, আলোচনাচক্র প্রভৃতি অধিকতর ফলদায়ী। ইহা ব্যতীত হাটে গঞ্জে ও মেলায় উপযোগী পুস্তকাদির প্রদর্শনী ব্যবস্থা গ্রামচিত্তকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

গ্রামের সাধারণ মানুষ উদয়াস্ত জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যস্ত। তাহাদের সহিত যোগাযোগ করা এবং গ্রন্থাগারের উপকারীতা বুঝাইয়া তাহাদের আকৃষ্ট করা এক কঠিন কাজ। এই দুরূহ কাজ সমাধা করা একজন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। জন সংযোগ ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করিবার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন। সরকারী প্রচার বিভাগের, রেডিও, সংবাদপত্র, সিনেমা, বক্তৃতা ও পোষ্টার চিত্রাদির সাহায্যে এই প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। সুষ্ঠু প্রচার ব্যবস্থা ব্যতীত আমাদের দেশের গণশিক্ষা বিস্তার আন্দোলন সার্থক করা সম্ভব নয়।

পরিকল্পিত গ্রামের গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব বহন করিবার মত উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মীর একান্ত অভাব। উপরন্তু গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যয়সাধ্য সেকারণ এই দুরূহ জ্ঞান-বণ্টন যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মীদল গড়িয়া তোলা এক সমস্যা।

Library Advisory Committee এই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন :—

1. A national scheme of studies for training in librarianship should comprehend (i) the training of Semi-professional staff needed by all types of libraries, which requires training only in methods and routines, (ii) the training of the professional staff needed by most of the public libraries, which involves a sound training in general librarianship, and finally, (ii) advanced or specialised training... ... .

2. The training of semi-professional staff should be conducted at two levels :—

(a) training for village library worker··· } An honorarium of
(b) training library clerks ·· ··· ·· ······ } Rs. 15. per month.

3. Block librarians should give prospective village librarians in their jurisdiction a short course of 2 to 4 week's duration, which should prepare them for village library work, instruct them in the aims and scope of library service and the relation of village centre to other social egencies working in the field.

Advisory Committee-র প্রতিবেদন পাঠ করার পর আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে উক্ত কমিটি গ্রাম গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অবহিত নয় অথবা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করিয়া গ্রাম-গ্রন্থাগারগুলিকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়াছেন। কোন স্থাপত্য নিদর্শন দৃঢ় ও শক্তিশালী করিতে হইলে প্রথমেই প্রাথমিক ভিত্তিস্থাপন ব্যবস্থার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন অন্যথায় উহা দীর্ঘস্থায়ী এবং স্থাপত্যের উপরাংশ আদৌ শক্তিশালী ও কার্য্যকর হয় না। Advisory Committee-র প্রতিবেদনে এই সাধারণ জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি।

গ্রামের গ্রন্থাগারিককে একাকী সুদূর গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য বিপরীতমুখী শক্তির সহিত অহরহ সংগ্রাম করিয়া জ্ঞানবণ্টন যজ্ঞ চালাইতে হইবে। তাঁহার কাজের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া শিক্ষাদীক্ষা ও বেতনক্রম সুউন্নত করা উচিত। ইহা ব্যতীত এই কঠিন কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ করা সম্ভব নয় এবং আরম্ভ করিলেও সার্থকতার পথে চালনা করাও অসম্ভব। এই কারণেই আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত গ্রামের গ্রন্থাগারগুলি অক্রিয় হইয়া রহিয়াছে—সক্রিয় রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সরকার এবং শিক্ষিত জনসাধারণ যদি আন্তরিকভাবে একথা চিন্তা করেন তাহলেই ভবিষ্যতে এই মনোভাব পরিবর্ত্তন সম্ভব।

গ্রামের গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে—

(১) গ্রামের গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন প্রকার কার্য্যধারার গুরুত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজন।

(২) গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাদীক্ষার মান এই কার্য্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করা উচিত।

(৩) এই সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহার শিক্ষকদের বেতনহারের সমান অথবা কিঞ্চিতাধিক করা উচিত।

(৪) প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে গ্রামের গ্রন্থাগারে কাজ চালাইবার উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রয়োজন হইলে নূতন আদর্শে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো আমূল পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

(৫) গ্রামের গ্রন্থাগারে কাজ করিবেন বলিয়াই এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ ভাতার এবং কার্য্য অনুযায়ী জাতীয় পুরস্কার বা অনুরূপ স্বীকৃতিদানের প্রয়োজন।

আজ দেশের সর্বত্র শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বেকার সমস্যা এক জটিল রূপ ধারণ

করিয়াছে। এই বিভীষিকা ও অসন্তোষই ছাত্র সমাজের হাহাকার ও বিশৃঙ্খলার অন্যতম প্রধান কারণ। আমরা যদি গ্রাম-গ্রন্থাগার আন্দোলনকে একান্তভাবে স্বীকার করি এবং জাতীয় সরকারকে যদি এই গুরুদায়িত্ব বহনে বাধ্য করি তাহা হইলে দেশের অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানবণ্টন যজ্ঞে ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশকে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। এই আন্দোলনের সুপরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা জাতীয় যুবশক্তির গতিশীল ধারাকে গঠনমূলক কল্যানময়ী কাজে প্রবাহিত করা সম্ভব হইবে।

আমাদের দেশ এক বৈপ্লবিক যুগের মুখোমুখী। নিষ্ক্রিয়তা, দূরদৃষ্টিহীনতা ও আত্মতৃপ্তি আমাদের পথের বাঁধা। গতানুগতিক পথে অন্য দেশের অনুসরণ করিয়া আমাদের মুক্তি নাই। আমরা প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চাই এবং সেইজন্যই চাই দেশের সকলের অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা আর সারা দেশময় ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার। "সমস্ত পটজোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্য শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা।" এই দেশজোড়া ভূমিকায় শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ও দেশের মঙ্গলের জন্য গ্রাম গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু সংগঠনে আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। পরম কল্যাণময় কারুণিক আমাদের এই কল্যাণ কামনা এবং শুভ প্রতিজ্ঞা সার্থক করিতে সাহায্য করিবেন।

Mass education & Library
: Dr. Bimal Kumar Dutta

'আত্ম সমালোচনা'

'অপ্রিয়'

গ্রন্থাগার দিবসের এবারকার ইস্তাহারে বলা হয়েছে গ্রন্থাগার দিবস, আত্ম সমালোচনার দিবস। সেই আত্ম সমালোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রতি বছর গ্রন্থাগার দিবস 'আসে' এবং চলে যায়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কর্মব্যস্ত পরিষদ ভবনে এই দিনটিকে সার্থক করে তোলার জন্য কর্মীদের অনলস প্রচেষ্টা সুরু হয়। পোষ্টারের পর পোষ্টার লাগান হয়; গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে, 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিয়ে ইস্তাহার বিলি করা হয়; মেয়র বা সমাজের বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় সভা; নরম গরম বক্তৃতা চলে, উপদেশ বর্ষিত হয় পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর; গ্রন্থাগার কর্মীরাও সরকার বা কর্তৃপক্ষের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন, সরকারী পরিকল্পনার সাফল্য ও অসাফল্যের পরিমাণ নিয়ে বাক যুদ্ধ সুরু হয়; ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন এক পক্ষের আর এক পক্ষের দোষ দেখিয়ে দেওয়ায় সমালোচনা হয় কি আত্মসমালোচনা হয়—তা বক্তারাই বলতে পারেন। এই ভাবেই চলে আসছে বছরের পর বছর। গত কয়েক বছরের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি তা'হলে দেখব আমরা আগেও যা বলেছিলাম, যা করেছিলাম, আজও তাই বলছি, তাই করছি, যেখান থেকে সুরু করেছিলাম আজও সেখান থেকেই সুরু করছি। আগানো ত আমাদের হয়ই নি, বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে গিয়েছি। অনেক সময় কোন ক্ষেত্রে যাকে আমরা সাফল্য বলে মনে করেছি বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা অসাফল্য এনে দিয়েছে।

যেমন ধরা যাক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য হয়েছে এবং তার ফলে শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি আত্মতুষ্টি সম্পন্ন সংখ্যাতত্ত্বও আপনি দেখবেন, অন্য প্রদেশের তুলনায় তা অঙ্কের অক্ষরে বড় বলেই মনে হবে; খুসী হয়ে বলবেন খুব ভাল প্রোগ্রেস'! কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখবেন শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের তুলনায় কর্মক্ষেত্রের কিন্তু প্রসার হয় নি। আমাদের কত দুর শিক্ষণ প্রাপ্ত কতজন, কি রকম যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের প্রয়োজন তার কোন হিসেব নিকেশ না করেই বছর বছর শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়ানই হচ্ছে। তার ফলে, চতুর কর্তৃপক্ষ অনেক কম বেতনে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন লোক নিয়োগ করছেন। কম বেতনে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে কর্মীদের মনোবল নষ্ট হচ্ছে, যোগ্যতা ও দক্ষতার অবনতি ঘটছে। কর্মক্ষমতার এই অপচয় সমগ্র গ্রন্থাগারিক জগতের মানকে দ্রুত অবনতির পথেই নিয়ে যাচ্ছে।

কেউ কেউ বলবেন গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম এখন বেশ ভালই হয়েছে, কোথাও বা শিক্ষকদের সমতুল্য কোথাও বা তার চাইতেও বেশী, ইউ, জি, সি, প্রস্তাবিত বেতনক্রমও হচ্ছে। এগুলো সবই গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থার ক্রমবর্ধমান উন্নতিই প্রমাণ করছে। কিন্তু এখানেও মনে রাখা দরকার যে অনেকক্ষেত্রেই বেতন, পদমর্যাদা ও কর্মের সুযোগ ঠিক

সঙ্গতিপূর্ণ এবং এখানেও কর্মক্ষমতার অপব্যবহার হয়। Indexing, Documentation, Bibligraphy ইত্যাদি নানা বড় বড় very very technical জ্ঞান লাভ করে আমাকে যদি শুধুই হারমোনিয়মের সারে গামা সাধার মত কার্ড ফাইল করতে হয় কিংবা Documentationএর বিদ্যাকে গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে, পত্রিকার নাম আর সংখ্যা মিলিয়ে দেখাতেই, (কোন কোন ক্ষেত্রে রংও মেলাতে পারেন তাতে গ্রন্থাগারকের শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে) গ্রন্থাগারিক জীবন শেষ হয়, কিংবা গ্রন্থাগারে কাজ করি শুনলেই, সাধারণ লোকের কাছে বই দেওয়া ও নেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ থাকতে পারে বলে মনে না হয়, তবে তাকে নিশ্চয় গ্রন্থাগার কর্মীদের উন্নতশীল অবস্থা বলে না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অ আ ক খ কে ভুলে গিয়ে কেরানী সুলভ কাজ কর্মেই যদি গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োজিত থাকে, তবে বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন যতই সাফল্যলাভ করুক, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য তাতে প্রকাশিত হয় না। গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৃদ্ধিকে যারা গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির ক্রমোন্নতি মনে করেন, তাঁরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। বেতনের সঙ্গে পদমর্যাদা ও কর্ম দায়িত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে, গ্রন্থাগার আন্দোলন কোনদিনই সার্থক হতে পারে না।

গ্রন্থাগার বৃত্তির আর একটি দিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। সম্প্রসারণ নিশ্চয়ই হয়েছে, গ্রামীন গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি, ইত্যাদি কি সুন্দর সর্ব ক্ষেত্রে প্রসারিত সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। এই পিরামিড সদৃশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বনিম্নে গ্রামীন গ্রন্থাগারের অবস্থাটা কি? এখানে যা বই আছে তার পাঠক নেই, যে পাঠক আছে তার বই নেই। এখানকার লোক কি ধরণের বই পড়তে চায় বা প্রতি গ্রামের সমাজ, সংস্কৃতি, লোকেদের পেশা ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কি এখানে বই পাঠান হয়েছে? সেখানে কি কোন সমীক্ষা করা হয়েছে? জনগণের চাহিদাকে জানার জন্য? যে গ্রন্থাগারিক সেখানে রাখা হয়েছে তার যোগ্যতা, বেতন ও মর্যাদা কি কোন ভাবেই গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের আসল উদ্দেশ্যকে সার্থক করছে? স্বল্প বেতনে সংসার চালাতে অপারগ হয়ে, তিনি যদি অন্য কোন ভাবে উপার্জনের জন্য, তার গ্রন্থাগারিকতার আদর্শকে উপেক্ষা করেন, সে কি অন্যায়। ঐ অঞ্চলের জনগণকে গ্রন্থাগারমুখী করার জন্য, জনগণের চাহিদাকে জানা, ও তার চাহিদা অনুযায়ী বই বা তথ্য সরবরাহ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা কি বেশীর ভাগ গ্রামীন গ্রন্থাগারিকের আছে? সুতরাং ভিত্তি যেখানে দুর্বল; সেখানে পিরামিডের চুড়ো যতই মজবুত ও উজ্জ্বল হোক, একদিন ভেঙে যেতে পারে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠার, মৌলিক অধিকার থেকে যে গ্রামবাসীদের আমরা বঞ্চিত করে রেখেছি এবং গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের আমরা যেভাবে অভুক্ত রেখেছি সেই দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাবধান বাণীটি মনে পড়ছে;

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে, পশ্চাতে টানিছে।"

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার উৎকর্ষতার জন্য আমরা কি করেছি। বিশেষ কিছুই নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ নেই বললেই চলে, আর ইংরাজিতেও মুষ্টিমেয়। রেফারেন্সের বইএর ক্ষেত্রেও বাংলায় শিশু গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের পর আর উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই প্রকাশিত হয় নি। অবশ্যই সামগ্রিকভাবে শিক্ষা সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তথ্যবহুল গ্রন্থের প্রকাশের গতি কিছুটা রুদ্ধ। আমরা যে মূল্যবান বই ছাপাতে পারি না, সেই বইয়েরই কপিরাইট বিদেশীরা কিনে নিয়ে প্রকাশ করলে অনেক অধিক মূল্যে সেই গ্রন্থ কিনতে আমরা লজ্জিত বা দুঃখিত হই না। আমাদেরই পুরোন পত্র-পত্রিকার ফাইল microfilm করে নিয়ে গিয়ে, আমাদেরই দেশের ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে তথ্যবহুল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ বিদেশী প্রকাশক প্রকাশ করেন। আমরা আনন্দে নেচে উঠে, তার থেকে তর্জমা করে নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা গর্ব করে বলে বেড়াই। কিন্তু একবারও মনে করি না, যে সব পত্রিকা বিদেশীরা সংগ্রহ করে গবেষণা করছেন, সেই সব পত্রিকা ত বটেই আরও অনেক অবহেলিত পত্রিকা পুস্তিকা আমরা সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করে আমাদের গবেষণার জন্য প্রয়োজন মত কাজে লাগাতে পারি, এবং এই সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সময় মত সরবরাহের দায়িত্ব যে কোন গ্রন্থারিকের। একদিন আমাদের পূর্বপুরুষরা ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, আজ শহীদ মিনার করে সেই আন্দোলনের শত শত শহীদের উদ্দেশে স্মৃতি তর্পণ করি। কিন্তু এই সূক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবে যে Intellectual exploitation আমাদের দেশে চলছে, যেগুলিকে Intellectual Collaboration, Cultural exchange ইত্যাদির নামে ধামা চাপা দেওয়া হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে আমরা ত প্রতিবাদ করিই না, বরঞ্চ, বিদেশীর টাকায় বই, পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলে, দোকান খুলতে পারলে গর্ব অনুভব করি। এ হেন অবস্থায় গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও বাংলা ভাষায় তথ্যবহুল কোন গ্রন্থ প্রকাশ করা থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে রেখেছেন। এমন কি এই পেশায় প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ দিয়ে নিজেদের জ্ঞানবিদ্যা প্রকাশ করাকে নিছক সময় নষ্ট বা বিদ্যার অপব্যয় বলেই মনে করেন কেউ কেউ। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি ও অবনতির উপর গ্রন্থাগারিকতার মানের উন্নতি ও অবনতি যে নির্ভরশীল, সে কথা আমরা মনে রাখিনা। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উন্নতির দাবীতে আমরা উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা দাবী করি, কিন্তু সেই বৃত্তিতে নিজেদের যোগ্য করে তোলা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সম্রাটের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। আর আজ, আমরা অনেক শতবার্ষিকী, জন্মজয়ন্তী পালন করছি, কিন্তু কখন পাড়ায় পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত দুর্দশাগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সামান্যতম সাহায্য দানের কথা ভাবি না। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় তিন ঘণ্টা কিউ দিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অব্যবস্থাকে প্রতিদিন গালমন্দ করবেন, কিন্তু কখনই পাড়ার গ্রন্থাগারটিকে দু চারটি মূল্যবান তথ্য বহুল গ্রন্থ দিয়ে আকর্ষণীয় করতে সাহায্য করবেন না। শতবার্ষিকীতে স্মরণ

সংস্করণ গ্রন্থ প্রকাশ করেই আমরা মহাত্মা/মনীষীদের প্রতি স্মৃতি নিবেদনের কর্তব্য শেষ করেছি। কিন্তু গ্রন্থগুলিকে পড়বে না পড়বে তা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনগণকে এই সব বই পড়তে দেওয়ার আমাদের প্রচণ্ড আপত্তি। গ্রন্থাগার আইন এখনও অনেক দূরে।

বি, কে, কাউলের প্রবন্ধের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি "We, librarians, tend to denigrate the work of our profession. We are like the Hodja• who, in trying to count the nine donkeys entausted to him kept forgetting to count the one, he was sitting on. Thus we admire the work of formal educators and of artists, of social workers, psychologists and scientists, but we forget to account of the importance of the career we are sitting on ("Librarianship today", ILA bulletin January—March 1969 ; 53 P.)

আমাদের নিজেদের পেশার গুরুত্ব ত আমরা দিই না, বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে আমাদের বৃত্তিতেই আমরা অস্বস্তি অনুভব করি। নাক খ্যাঁদা কোন লোক যদি কোন দলে গিয়ে পড়ে, সে দলে হঠাৎ যদি নাকের গঠন সৌষ্ঠব্য নিয়ে আলোচনা সুরু হয়ে যায় তখন সে যেমন অসহায় বোধ করে, আমাদের অবস্থাটাও প্রায় সেই রকমই হয়, যখন আমরা কোন অপেশাদার মহলে গিয়ে পড়ি। কেননা সেখানে দেখবেন একবাক্যে সবাই বলবে লাইব্রেরীতে কোন কাজ হয় না, নয়ত লাইব্রেরীর কাজটা কি মশাই, বই দেওয়া আর নেওয়া, তার জন্য আবার এত শত কি। আপনি কিছুতেই তাদের বুঝিয়ে উঠতে পারবেন না এ ছাড়াও লাইব্রেরীতে অন্য কাজ আছে, আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি। কেননা আপনি গ্রন্থাগারের দিকপাল হয়েও, নিজের গ্রন্থাগারকেই হয়ত আধুনিকতার আলোকে আলোকিত করতে পারেন নি বা ঠিক মতন সাহায্যও আপনি পাঠকদের করতে পারেন নি। সুতরাং অতিরিক্ত প্রশ্নবানে জর্জরিত হওয়ার চাইতে সেই স্থান ত্যাগ করাই আপনি শ্রেয় মনে করবেন। সেখান থেকে আপনি আসুন আপনার কর্মক্ষেত্রে, সিনেমা জগৎ থেকে খেলার মাঠে। উলের প্যাটার্ণ থেকে মাছের মুড়ি ঘণ্ট পর্যন্ত সব আলোচনাই হবে কিন্তু গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন কথাই হয়ত আপনি বলতে পারবেন না। বড় জোর গ্রন্থাগারে কয়টা, নতুন পদ অনুমোদিত হলো, তার বেতনক্রম, ইউ, জি. সি, কবে আসছে, কোন গ্রন্থাগারিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কোণঠাসা হলেন—এবং সব শেষে অমুক গ্রন্থাগারে কোন কাজ হয় না—'শুধু আড্ডা'। অতএব এই রকম অবস্থায় আপনি খুবই অস্বস্তি বোধ করবেন এবং সেখান থেকে পালিয়ে চলে আসবেন গ্রন্থাগার জগতের কেন্দ্র বিন্দুতে—পরিষদ ভবনে। সেখানে আপনি অনেক বেশী অস্বস্তি বোধ করবেন যখন দেখবেন গ্রন্থাগার জগতে পর্বত প্রমাণ সমস্যায় ও শোচনীয় পরিস্থিতি আপনার অবদান যৎসামান্য। সুতরাং শ্রীকাউল যতই বলুন, আমরা সাধারণ মানুষের মতনই আমাদের দুর্বলতাকে ভুলে থাকতে চাই, ক্ষতস্থানকে সারিয়ে তোলার চাইতে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই। যে কোন পেশা বা বৃত্তির পক্ষে সেই পেশা বা বৃত্তিতে নিয়োজিত

ব্যক্তিদের এই পলায়নপর মনোবৃত্তিই তাদের বৃত্তির অবনতির কারণ।

এইভাবে পালিয়ে না থেকে আমরা কিন্তু চেষ্টা করলে, সমবেতভাবে গ্রন্থাগার বৃত্তিকে তার রাহুর দশা থেকে মুক্ত করতে পারি। সেই সমবেত চেষ্টার স্থান হচ্ছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অন্যান্য পরিষদ। পরিষদের অবস্থা কি? সভ্য/সভ্যার সংখ্যাল্পতা, যে কোন কর্ম প্রচেষ্টায় লোকবলের অভাব, সভা-সমিতি ও আলোচনা চক্রে হতাশাব্যঞ্জক উপস্থিতি, প্রকাশনার ক্ষেত্রে উৎসাহের অভাব, পত্রিকার গতানুগতিক ধারা ও আশানুরূপ মানের অভাব, ইত্যাদি পরিষদের অবনতি সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারিকতার শোচনীয় পরিস্থিতিকেই প্রতিফলিত করছে। অনেকেরই ধারণা পরিষদের কর্তব্য শুধু বছরের পর বছর কিছু সংখ্যক বৃত্তিধারী ব্যক্তি সৃষ্টি করা আর তাঁদেরও কর্তব্য যতদিন তাঁরা ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন বা বেকার ছিলেন পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও তারপর সম্পর্ক তুলে দেওয়া। যে যেখানে কাজ করেন মনে করেন তাঁদের প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নই তাদের বেতন ও পদমর্যাদার জন্য লড়াই করবে—এ বিষয়ে পরিষদের করণীয় কিছু নেই। কিন্তু ধারণাটা খুবই ভুল। সামগ্রিক ফলের জন্য আন্দোলন করতে হয় সমগ্রভাবে। যেমন ধরা যাক, ইউ, জি, সি, গ্রেড চালু করা কিংবা গ্রন্থাগারিককে শিক্ষকের তুল্য মর্যাদা দেওয়া এর আন্দোলন করবে গ্রন্থাগার পরিষদ আর তা বিশেষ স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানগত সংসদের। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকক্ষেত্রেই পরিষদের এই অবদান আমরা অস্বীকার করি তাই তার অবনতি বা উন্নতিতে অনেক গ্রন্থাগার কর্মীই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

পরিষদের কর্তব্যের সীমারেখা সম্বন্ধে যাদের যা ধারণাই থাকুক, পরিষদ কিন্তু নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু সে দায়িত্ব সে কিভাবে পালন করবে। তার শক্তি ত তার সভ্য/সভ্যারা। কিন্তু সেই সব সভ্য/সভ্যারা যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার দ্বন্দে নিজেদের দুর্বল করেন বা বিভেদপন্থী কর্তৃপক্ষের কারসাজিতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে নিজেদের মনোবল হারিয়ে ফেলেন বা স্বার্থান্বেষী চক্রের শিকার হয়ে গ্রন্থাগারিকতার স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেন তবে পরিষদ কোন দিনই শক্তিশালী হতে পারে না। তাই নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে গিয়ে, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করে না দেখে, পরিষদের পতাকা তলে আমাদের ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গ্রন্থাগার-বৃত্তির উন্নতির জন্য পরিষদকে আরও বলিষ্ঠ সক্রিয় ও কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। আমার আপনার ব্যক্তিগত উন্নতি, আমার আপনার চাকচিক্য ও জৌলুষ আনতে পারে কিন্তু মর্যাদা আনবে না। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি যুক্ত সেই প্রতিষ্ঠানে বেতনের বিনিময়ে আমার যেমন কর্তব্য আছে, পেশাগত ক্ষেত্রে যে পেশা আমি নিয়েছি তার প্রতিও আমার কিছু দায়িত্ব আছে, যে দায়িত্ব বৃহত্তর পর্যায়ে দেশের প্রতি আমার নাগরিক দায়িত্বকে প্রতিফলিত করবে।

Self criticism : Apriya

পরিষদ কথা

কাউন্সিল সভা

গত ১৪।১২।৬৯ তারিখে পরিষদের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায় ও সভা আরম্ভ হবার পর পরিষদ সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় এই সভার কার্যভার গ্রহণ করেন। গত সভার বিবরণ পাঠ ও অনুমোদিত হয়।

পরিষদের কার্যাবলী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে পরিষদ সম্পাদক বলেন—গ্রন্থাগার আইন ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। বাংলা দেশে বিভিন্ন শিক্ষা কর্মী ও শিক্ষক সংস্থা কতকগুলি দাবী নিয়ে এক সভা আহ্বান করেন—পরিষদের পক্ষ থেকে কয়েকজন এই সভায় যোগদান করেন। বেতন ও পদমর্যাদা সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয় যে জীতেন্দ্রনাথ নন্দীর পুনর্বহাল হয়েছে। প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, কুচবিহারের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সম্পর্কিত বিষয়টি, স্কুল কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীচঞ্চল সেন বলেন—এবার ১১১ জন পাশ করেছে—১০ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবারই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী চালু করা হয়। আর্থিক অনটনের জন্য বিল্ডিং কমিটির বিশেষ কোন কাজ হয়নি—পাঁচ হাজারের মত ব্যয় হয়েছে। বাজেট প্রসঙ্গে পরিষদ সম্পাদক বিভিন্ন উপসমিতিগুলিকে লিখিত রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ করেন।

বড় আন্দুলিয়া শিক্ষা সংসদ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ এসেছে। এই আমন্ত্রণ পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়—এই সম্মেলন ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

Association notes

গ্রন্থাগারিকের কৃতিত্ব

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি ডি. ফিল উপাধি পেয়েছেন। ডঃ রায়ের গবেষণার বিষয় ছিল Community Development Areas Village Level workers (Gram Sevak). তাঁহার এই সাফল্যে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

—গ্রন্থাগার দিবস—

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ তারিখে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিকাল ৫টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক কেন্দ্রীয় জনসভা আহ্বান করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পৌরপ্রধান শ্রীপ্রশান্ত শূর।

শ্রী শূর তাঁর সুললিত ভাষণে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও সামাজিক শিক্ষার উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারগুলোকে সুসংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন যাতে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামবাসী ও দরিদ্র কৃষকদের স্বাক্ষর করে তোলা যায়। বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের নতুন শিক্ষানীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আইনভিত্তিক বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন। গ্রন্থাগার ভবনের উপর পৌর করের অবসানের প্রস্তাবে আইনের দিক থেকে কোন বাধা না থাকলে এ বিষয়ে তিনি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি আরও বলেন কলিকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব পৌরসভার শিক্ষা-সমিতির বিবেচনাধীন। সভায় পৌরসভার সদস্য শ্রীঅশোক কুমার বসু, শ্রীবরেন দাঁ ও পরিষদ সচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরীও ভাষণ দেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। **প্রথম প্রস্তাব :—**

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কেন্দ্রীয় জনসভা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে এবং এই প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে :

(ক) পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০ হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবিত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা বিরোধী কর্মসূচী সফল করিয়া তুলিতে হইলে সাথে সাথে বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

(খ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অন্তত শতকরা ২ ৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

(গ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চাই।

(ঘ) কলিকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার ভবনের উপর পৌরকর আদায় ব্যবস্থার অবসান চাই।

(চ) স্পনসর্ড সমেত সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা, নিয়মিত মাসিক বেতন, প: ব: সরকারের কর্মীদের অনুরূপ ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, চাকুরীর নিরাপত্তা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(ছ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ, জি, সি, বেতনক্রম এবং বিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম প্রবর্তন করিতে হইবে।

(জ) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলোকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে।

২। **দ্বিতীয় প্রস্তাব :—**

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কেন্দ্রীয় জনসভা গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষার জন্য একজন মন্ত্রী নিয়োগের প্রতিশ্রুতি আজও কার্যকর হয় নাই বলিয়া গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। ইহার ফলে গ্রন্থাগারের অবহেলিত সমস্যাবলী সম্পর্কে অদ্যাবধি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এই সভা তাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে যে গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষার জন্য একজন মন্ত্রী অবিলম্বে নিয়োগ করা হউক এবং যুক্তফ্রন্টের সভায় গ্রন্থাগার ও সমাজশিক্ষা সম্পর্কে নীতি নির্ধারিত হউক।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উর্ধে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন কেন্দ্রীয় জনসভা, সংবাদ-পত্র ও বেতারভাষণাদির মাধ্যমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে জনসাধারণের কাছে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ও সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সুসংবদ্ধ হতে হবে।

The Library Day

প্রতিবেদক :— সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থাগার" আশ্বিন ১৩৭৬ সংখ্যায় আমাদের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট লাইব্রেরী সম্বন্ধে যে চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিত বিস্মিত হইয়াছি। আমরা আপনার পরিষদের পুরাতন সভ্য। সুতরাং সভ্য সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ থাকিলে তাঁহাকে সে সম্বন্ধে অবহিত করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য আপনি একত্রে প্রকাশ করিলে সুবিচার হইত বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক—অকারণ অভিযোগের সম্বন্ধে সত্য ঘটনা বিবৃত করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি।

(১) —লাইব্রেরী কর্মীদের সকলকেই সাধারণতঃ নিয়োগপত্র দেওয়া হইয়া থাকে। তবে এই দুইজন প্রাক্তন কর্ম্মচারীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে তাঁহাদের আবেদন পত্রে যথারীতি নিয়োগ ব্যবস্থা নথিবদ্ধ ছিল। আমি যতদূর জানি এ বিষয়ে কখন কোনো অনুরোধ করা হয় নাই।

(২ ও ৩)—শ্রীঅনিলকুমার ঘোষকে বিনা নোটিশে বরখাস্ত করা হয় নাই। তিনি লাইব্রেরীতে আংশিকভাবে কাজ করিতেন এবং গ্রন্থাগারের স্বার্থে তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিবার পূর্বে, তাঁহাকে এক মাসের অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকল্যাণকুমার রায় সারাক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারের কর্মী এবং এখানে গ্রন্থাগারের attendant-এর কাজ করিবার পূর্বে অন্যত্রও তাঁর এবিষয়ে কাজ করিবার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার শিক্ষার মান ঐ পদের জন্য সরকারী নিয়মমত ঠিক আছে।

(৪) আমাদের গ্রন্থাগারে দ্বিতীয় সহকর্ম্মী নামক কোনো পদ নাই। শ্রীমতী অনিমা ঘোষ আংশিকভাবে অন্যতম attendant-এর কাজ করিয়া থাকেন।

(৫) শ্রীকল্যাণকুমার রায়ের সরকারী মহার্ঘভাতা বিষয়ে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য নয়।

(৬) শ্রীঅজিতকুমার মুখার্জী গ্রন্থাগারের কর্মী নহেন। তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের অছি-সংসদের সম্পাদকের সহকারী হিসাবে কাজ করেন এবং সেজন্য বেতন পান।

(৭) সরকারী মহার্ঘভাতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা কর্ম্মচারীদের দিবার ব্যবস্থা করা আছে। অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৮) বিগত ৭ বৎসরের মধ্যে অনেক কর্ম্মীই নিজ নিজ সুবিধার্থে পদত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

(৯) কল্যাণবাবু শ্রীমতী গায়ত্রী সেনগুপ্তার প্রতি অশালীন ব্যবহার করিয়াছেন এমন কোনো অভিযোগ পাই নাই। সুতরাং এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নাই।

(১০) গ্রন্থাগারিক শ্রীনরেশচন্দ্র বসু প্রায় প্রথম হইতেই এখানে কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি কয়েকটি ব্যাপারে তাঁর গাফিলতি প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহাকে সে সম্বন্ধে কৈফিয়ত দিতে বলা হইয়াছে। তাঁহার কৈফিয়ত যথারীতি অছি-সংসদে বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে।

আশা করি আমার এ পত্রখানি, সম্ভব হইলে কার্ত্তিক ১৩৭৬ সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের ভুল ধারণা দুর করিতে সহায়তা করিবেন। ইতি

বিনীত
শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট,
৮৪ নং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড
কলিকাতা-৯

১০ নবেম্বর, ১৯৬৯

[গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্ম্মী ও গ্রন্থাগারের অব্যবস্থার সম্যক আলোচনাই থাকে। ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কাহারো কোন আক্রোশ প্রসূত বক্তব্য নয়। একই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে মতদ্বৈত থাকায় সংশ্লিষ্ট পত্রটিও প্রকাশিত হইল। এই সম্পর্কে আর কোন পত্র প্রকাশিত হইবে না।]

—সম্পাদক

Letters to the Editor

গ্রন্থাগার সংবাদ

চব্বিশ পরগণা

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগার, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা।

সাধুজন পাঠাগারের ৩৫তম বার্ষিকী উৎসব সাধুপাঠ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। সহ-সভাপতি রুক্মিণী সাহা সভার উদ্বোধন করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীজ্যোৎস্নারাণী সাধু কার্য বিবরণী পাঠ করেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা সাড়ে আট হাজার, গ্রাহক সংখ্যা ১৯৩৭ জন। গুণীজন সম্বর্ধনায় সংগীতশিল্পী জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে মানপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শিক্ষাব্রতী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

সাধুজন পাঠাগারে ৩৬শ কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই সমিতিতে নির্বাচিত হন যথাক্রমে সর্বশ্রী ইন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুক্মিণীকুমার সাহা (সহ-সভাপতি), গোপালচন্দ্র সাধু (অধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ), জ্যোৎস্না রাণী সাধু (সহ অধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগারিক), মণীষা সাধু, গায়ত্রী সাধু, দেবজ্যোতি সাধু, সাবিত্রী সাধু ও শ্যামসুন্দর (পৃষ্ঠপোষক), শিবশংকর চট্টোপাধ্যায় (কিশোর বিভাগ), অমিতারাণী সরকার (মহিলা বিভাগ), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কর্মী পরিষদ), নীলরতন রায় চৌধুরী (সরকারী প্রতিনিধি)।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক।

গত ১৪ই নভেম্বর, তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে বিশ্ব শিশু দিবস তথা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অশীতিতম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে পণ্ডিত নেহেরুর কর্মময় জীবন সম্পর্কে চিত্র, পত্র পত্রিকা ও পুস্তকাদির একটি সুন্দর প্রদর্শনী উদ্বোধন এবং তাঁহার জীবন ও বাণী আলোচনার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য এই সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং পণ্ডিত নেহেরুর জীবনাদর্শ, বহুমুখী প্রতিভা, ও বিশ্ব শিশু দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান।

গত ১৪ই নভেম্বর '৬৯ মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীতে "বিশ্ব শিশু দিবস" উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মানকর মহরাদেবী বাজাজ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিশুরা যোগদান করে। ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি ও বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করে। আবৃত্তি ও বক্তৃতায়

পর উক্ত বিদ্যালয়ের বালক বনাম বালিকাদের হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা হয়। এই খেলায় বালিকাদের দল টসে জয় লাভ করে। সবশেষে বালক ও বালিকাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বীরভুম

প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ, বোলপুর, বীরভুম।

গত ১২ই অক্টোবর প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ পরিচালিত সমস্ত বিভাগে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রী সেন নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী, বীরভুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি (আহম্মদ), সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ২৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত টাকা দান করেছেন।

* * *

দুবরাজপুরের শ্রীবিধুভূষণ দত্ত মুদি মহাশয় সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ১০০০ এক হাজার টাকা দান করেছেন।

রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি, সিউড়ী, বীরভুম।

গত ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে রবি পরিক্রমার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের তপতী নাটক। প্রধান বক্তা অধ্যাপক শ্রীঅজিত কুমার সরকার-নাটকটি সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত।

হাওড়া

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ, হাওড়া।

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের প্রাচীন পুস্তক সম্ভার।

সংকলয়িত্রী : শীলা গুপ্ত

News from Libraries

বিয়োগ পঞ্জী

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ঃ শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও একান্ত সচিব গত ১২ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ৫০ বৎসর ধরে তিনি বিশ্বভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'লক্ষবীর', 'কথার ফুল' ইত্যাদি শিশুগ্রন্থ, 'স্মৃতিকথা' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীর এক সংকলন গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার ঃ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অকস্মাৎ ৭০ বছর বয়সে গত ১৮ই নভেম্বর পাটনায় পরলোকগমন করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবদ্বীপ থেকে পাটনায় যান এবং ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা সুরু করেন। তিনি শুধু ঐতিহাসিক নন, বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি। যুগ্মলেখক হিসাবে তাঁর রচিত Congress and congressmen একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

"গ্রন্থাগার ও সাময়িক পত্রিকা"

'গ্রন্থাগারে'র 'গ্রন্থাগার ও সাময়িক পত্রিকা'—এই বিষয়ের এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারে সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, আদান-প্রদান, গবেষণার ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকাকে কত আধুনিকতম উপায়ে কাজে লাগান যায়, সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সমস্যা ও তার সমাধান ইত্যাদি গ্রন্থাগারের সাময়িক পত্রিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত প্রবন্ধ আগামী ২০।২।৭০ তারিখে গ্রন্থাগার' সম্পাদকের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের সংগৃহীত সাময়িক পত্রের তালিকা সালের উল্লেখসহ পত্রিকায় প্রকাশার্থে সম্পাদকের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। —সম্পাদক।

ভ্রম সংশোধন

কার্তিক সংখ্যা পৃঃ ২৪৩—রোল ৩৭ বিমলচন্দ্র চক্রবর্তীর স্থলে বিমলেন্দু চক্রবর্তী হইবে

—সম্পাদক।

দিলীপ কুমার সাহার নতুনতর অবদান

'মণিদীপা সেন'। প্রকাশক : শ্রীস্বপনকুমার সাহা, করুণা স্মৃতি প্রকাশনী, ২২২।১এ, বাগমারী রোড, কলকাতা ৫৪। পরিবেশক : শ্রীগোবিন্দলাল মল্লিক, ৩৪, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬। মূল্য : সাত টাকা।

সাম্প্রতিক কালের তরুণ কবিগণের মধ্যে কবি দিলীপ কুমার সাহা একটি পরিচিত নাম। বর্তমানে আধুনিকতার যে ভাবধারা বাংলা কাব্য সাহিত্যে যুগান্তর আনতে সমর্থ হয়েছে, শ্রীসাহার 'মণিদীপা সেন' কাব্যগ্রন্থখানায় সেই ভাবধারার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রশংসিত এবং অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভূমিকা সম্বলিত এই কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে ভাব-কল্পনার উত্তাল তরঙ্গের কলকল্লোল, নবযুগের যৌবনাবেগ, যুগ-যন্ত্রণায় কাতর সর্বহারার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস এবং ঐশ্বর্যময় শব্দ-সম্ভার। কবি উঁচুদরের শিল্পী বলেই কাব্যপ্রেরণার আবেশে, প্রকাশব্যাকুল ভাবকে কাব্যস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে পংক্তি থেকে পংক্তিতে স্বেচ্ছাবিহার করেছেন। আবার ছন্দকে স্পন্দিত করবার জন্য অনুপ্রাস-যমক-অলঙ্কার-যুক্তাক্ষর ইত্যাদিরও সুপ্রচুর প্রয়োগ করেছেন—সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব মধুর কাব্যগ্রন্থ 'মণিদীপা সেন'! ভাবের সৌন্দর্যে, কল্পনার সজীবতায় এবং বর্ণনানৈপুণ্যে এই কাব্যগ্রন্থখানি নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যের অগণিত পাঠকের কাছে অত্যন্ত আদৃত হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রত্যেকের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় গ্রন্থাগারিকতা সম্পর্কীত পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য কোন বিষয়ের পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করা হইবে না। —সম্পাদক।

সম্পাদকীয়

"গ্রন্থাগার দিবস" প্রসঙ্গে

পরিষদের মুখপত্রের বর্তমান 'গ্রন্থাগার দিবস' সংখ্যাটা শেষ পর্যন্ত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। যদিও গ্রন্থাগার দিবসের প্রাক্কালে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করারই আমাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে পত্রিকা প্রকাশ করতে কিছু বিলম্ব ঘটে গেল। এজন্য হয়তো অনেকে হতাশ হবেন। সান্ত্বনার কথা এই যে, আলোচ্য সংখ্যায় বাংলাদেশের কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা রয়েছে।

সকলেই জানেন, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা হচ্ছেন প্রধানত পরিষদেরই সদস্য-সদস্যাগণ। সচরাচর আমাদের পরিষদের এই মুখপত্রে পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণই লিখে থাকেন—তাও আবার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়েই। প্রতি মাসে যাঁদের লেখা নিয়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তাঁরা মোটামুটিভাবে আমাদের পরিচিত গণ্ডীরই লোক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘকাল যাবত দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য যেসব কথা বলে আসছেন তার সঙ্গে এঁরা মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া বৃহত্তর জনসমাজের কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার উপায় কী? সমাজের প্রতিটি স্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাণী পৌঁছে দেওয়া যাবে কি উপায়ে? গ্রন্থাগারকে প্রকৃতই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে কি ভাবে আমাদের কর্মপদ্ধতি স্থির করতে হবে?

আমাদের দেশে এখনও এমন অনেক শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যাঁরা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সভায় অনুরুদ্ধ হয়ে ভাষণ দিতে এসে এমন সব উক্তি করেন যাতে সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের দেশের শিক্ষিত, কৃতবিদ্য ও উচ্চ ডিগ্রিধারীদের একটা বিরাট অংশের গ্রন্থাগার আন্দোলনতো দূরের কথা, গ্রন্থাগার সম্পর্কেই জ্ঞান অতি সীমিত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও প্রসার দেশের কাছে কী বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে তা এঁদের কাছে অজ্ঞাত। জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ছাড়া যে দেশের অবস্থা ফেরানো যাবে না একথা আমরা রাষ্ট্রের কর্মধারদেরই কি বুঝিয়ে উঠতে পেরেছি?

অনেকেই ভেবে বিস্মিত হন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেই ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে জনচেতনা জাগ্রত হয়েছে কতটুকু? দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তেমন প্রসার ঘটেছে কই? জনসাধারণ কি আশানুরূপভাবে গ্রন্থাগার মুখী হয়েছেন? এর উত্তর দিতে হলে অনেক কথার অবতারণা করতে হয়। এই ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় নিবন্ধের পরিসরে তা করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে জনসাধারণ ও গ্রন্থাগারের কথায়ই আসা যাক। জনসাধারণ বলতে আমরা অবশ্য সেইসব লিখতে-পড়তে জানা জনসাধারণের কথাই এখানে বলছি। সমগ্র জনসাধারণের এঁরা

আবার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ—অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন এই ক্ষুদ্র অংশেরও সবার কাছে আমাদের আবেদন পৌঁছোচ্ছে না—বৃহত্তর নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে তো নয়ই। নিরক্ষর জনসাধারণ ও জানেন না যে গ্রন্থাগার তাঁদের জন্যও অনেক কিছু করতে পারে। আসলে গ্রন্থাগারে বই এবং অন্যান্য যে সকল বস্তু রক্ষিত হয় তা কোন না কোন বাণী বহন করে। থাকে। গ্রন্থকার চান অক্ষরের মাধ্যমে যা তিনি বিবৃত করেছেন তা পাঠকের কাছে পৌঁছে যাক। কিন্তু অক্ষরজ্ঞান বর্জিত হওয়ায় জনসাধারণের বিপুল অংশের কাছে সে বাণী আদপেই পৌঁছোচ্ছে না।

তাই সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে আইন প্রণয়নের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান চালানোর প্রয়োজনীয়তাও পরিষদ উপলব্ধি করে। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় যে কালে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করেছিলেন তা ঠিক উপযুক্ত সময় ছিলনা বলেই হয়তো তিনি সফল হতে পারেন নি। সম্ভবত তিনি সময়ের আগে জন্মেছিলেন। কিন্তু এখন তো সময় উপস্থিত হয়েছে। ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশে যখন ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে তখন যে বাংলাদেশে প্রথম গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠেছিল সেই বাংলাদেশই কি সবার পেছনে পড়ে থাকবে? আজ সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলনকে একটি জাতীয় আন্দোলন রূপেই গণ্য করতে হবে।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগে কিছু কিছু জনসাধারণের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ঘোষিত আদর্শ এবং লক্ষ্যের থেকে এগুলি এখনো অনেক দূরে রয়েছে। তথাকথিত শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই কি গ্রন্থপাঠের চাহিদা আশানুরূপ ভাবে বেড়েছে?

এবার গ্রন্থাগার দিবসে আত্মসমালোচনার কথা উঠেছে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনা জাগ্রত করতে হলে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে জনসাধারণের মধ্যে। আর বুদ্ধিজীবি সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষক ও মেহনতী মানুষকে সাথী করতে হবে আমাদের এগিয়ে চলার পথে।

Editorial.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়　　　সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৯-১০ } বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিশেষ সংখ্যা { ১৩৭৬, পৌষ-মাঘ

॥ সরকার প্রবর্তিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা ॥

অমলাংশু সেনগুপ্ত

প্রকৃত ইতিহাস জানা নেই। পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তব চেতনার দ্বারা চালিত হোক, প্রাক স্বাধীন যুগে জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের ফলশ্রুতিই হোক কিংবা জাগ্রত জনমতের চাপেই হোক—স্বাধীন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও অনেক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর সংগে গ্রন্থাগার উন্নয়ণ পরিকল্পনাটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর দ্বারা ভারতে আধুনিক যুগের গ্রন্থাগার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হোল। কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ, নির্দেশ এবং সহযোগিতায় রাজ্য সরকারগুলি কতকগুলি বিশেষ ধরণের সাধারণ (public) গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হন। ফলে গড়ে ওঠে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার, বড় বড় শহরে এবং মহকুমায় শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার, অঞ্চল বিশেষে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এতদিন দেশে গ্রন্থাগারের ব্যাপারে বে-সরকারী উদ্যোগই প্রধান ছিল, এবার সরকারী কর্ম তৎপরতাও যুক্ত হোল। সরকারী ঘোষণায় বলা হোল "......Let not any body say : I should have liked to study this or that book, but the book was not available, and that in short is the basic object of the State Library planning." কোনরূপ বাহুল্য না করেই বলা যায় স্বাধীন ভারতে এই গ্রন্থাগার উন্নয়ণ পরিকল্পনা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর এক অতীব সার্থক সংযোজন। গ্রন্থাগারের ব্যবহার, পরিচয় এবং বিস্তৃতি জনসাধারণের গভীরে প্রবেশ করানোর সুমহান দায়িত্ব নিয়েই এই পরিকল্পনা। জেলা সদরে সদরে জেলা গ্রন্থাগার আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। ভ্রাম্যমান গ্রন্থযান, সমাজ জীবনে ভ্রাম্যমান প্রেরণা। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি দীর্ঘ অবহেলিত গ্রামজীবনে আশার আলোকবর্তিকা। বহু শিক্ষিত, সমাজসেবী যুবক গ্রন্থাগার বৃত্তি গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন। দেশে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থাগারের প্রতি সাধারণের ভয় দূর হয়েছে। সৎসাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছে লেখকদের। পুস্তক প্রকাশে প্রকাশকদের অনেকটা নিশ্চিন্ত করেছে ক্রমবর্দ্ধমান গ্রন্থাগার ও পাঠক শ্রেণী। গ্রন্থাগারের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে আজকের সমাজ জীবন। প্রমাণ আরো কত কি।

এত সাফল্য এনে দিয়েছে যে পরিকল্পনা, তার বর্তমান রূপটি কিন্তু অত্যন্ত শোচনীয়। যে আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল এবং চলেছিল কিছুদিন, অচিরেই অযত্ন অবহেলায় পথভ্রষ্ট হয়ে পড়লো। কেন যে বেগবান নদীটি মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেললো সে আলোচনা করতে গেলেই এর ব্যর্থতার দিকটি এসে পড়বে। দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের দাবী ছিল সে দাবী মেনে নিয়েছেন সরকার। কিন্তু এর পরের ইতিহাসটা কি? শিশুকে জন্ম দিলেই হোল না। তাকে বড় করে তুলতে হলে চাই গভীর মমত্ববোধ, উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ এবং ভরণ পোষণের আয়োজন। এখানে সামান্য অবহেলা চলবে না। অবহেলায় মানুষ আর হবে না, হবে অমানুষ ; শিব গড়তে বানর। হয়তো এত বড় কঠোর বাক্য প্রয়োগ করার সময় এখনো আসেনি কিন্তু তাই বলে এই সব গ্রন্থাগারের সমস্যা ত বড় কম করে তোলা হয়নি। কর্তব্যে ত্রুটী এবং অবহেলার ফলে এগুলির বর্তমান হাল কি হয়েছে দেখা যাক :

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল সারা রাজ্যে এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Integrated Library system) গড়ে তোলা হবে। এই ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সর্বনিম্নস্তরে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। "The State Central Library is intended to be controlling and co-ordinating authority for library service in the state······ The District libraries are intended to develop and co-ordinate library service in the districts···" অথচ এই সব গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র আজ পর্যন্ত স্থাপিত হয় নি। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন আয়োজন নেই বর্তমান ব্যবস্থাপনায়। নেই ভারসাম্য বা নিয়ন্ত্রণ রক্ষার কোন দায়িত্বভার। প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারই স্বতন্ত্র-একক। আবার State Central Library পুরোপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান, অপর গ্রন্থাগারগুলি sponsored scheme এর অন্তর্গত।

স্পনসর্ড ব্যবস্থা : এই sponsored system টা যে কি সেটা বোঝা দুষ্কর। রাজ্যের ১৮টি জেলা গ্রন্থাগার (১টি আবার সরকারী), ২০টি শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার, ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং প্রায় ৫৫০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার এই scheme এর অন্তর্ভুক্ত। সরকারী ভাষ্যে প্রকাশ পেয়েছিল পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গেলে এই সব গ্রন্থাগার বে-সরকারী উদ্যোগ হারাবে। তাই হয়তো সরকারী অর্থ ও উদ্যোগের সংগে বে-সরকারী উদ্যোগের সংযুক্তি কামনা করা হয়েছিল। যদি এটাকে Experiment হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে আজ আর অস্বীকার করে লাভ নেই সে পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। এবং এজন্য দায়ী সরকার নিজেই।

জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ : পরিকল্পনামত সমগ্র জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ (District Library Association) অচিরেই রহস্যজনকভাবে এই পরিষদের কর্মক্ষেত্র সংকোচন করা হোল। আর একটি অনুরূপ সংস্থা District Advisory Council of Social Education গঠন করে তাদের উপর গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ভার অর্পন করা হোল। . শহর এবং মহকুমা গ্রন্থাগারের পরিচালন ভার সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কমিটির। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের আর কাজ করার সুযোগ রইলো না। তাই আজ এ পরিষদ নামসর্বস্ব, আলংকারিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। প্রকৃত পক্ষে আজকের জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ, জেলা গ্রন্থাগার কমিটি ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। আবার এই পরিষদ বা কমিটি যে নামেই পরিচিত হোক—দীর্ঘদিন ধরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে (যতটুক নিয়ম রয়েছে) গঠিত নয়। সুমহান পরিকল্পনার কি করুণ পরিণতি !

গ্রামীণ গ্রন্থাগার : গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ভার গ্রামীণ গ্রন্থাগার কমিটিগুলির হাতে। এই কমিটিগুলি জানেনা তাদের ক্ষমতা কতখানি। পরোক্ষ সরকারী নিয়ন্ত্রণধাকায় (যেহেতু সরকারী অর্থে চলে) এদের নিজস্ব কোন উদ্যোগ নেই। গ্রামজীবনে যাদের প্রভাব বেশী তারাই এর সভাপতি, সম্পাদক। কর্মীরা এদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। সরকারী পরোক্ষ প্রভাব এরা সুনিপুণভাবে কাজে লাগায় নিজেদের স্বার্থে। গ্রাম জীবনের দলাদলি, রাজনীতি থেকে মুক্ত হতে পারেনি এই সব গ্রন্থাগার। আশার আলোক বর্তিকার তেল শুকিয়ে আসছে। প্রদীপ নিবু নিবু।

এই সব স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সুদীর্ঘ ১৬ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এর মধ্যে প্রণীত হোল না কোন সুষ্ঠু নিয়মকানুন যা সব গ্রন্থাগারের প্রতি প্রযোজ্য। সরকার অক্ষমতায় না উদারতায় জানিনা ফতোয়া দিয়েছেন গ্রন্থাগার কমিটীগুলিই এগুলি প্রণয়ন করে কাজ করবেন। ফলে ৬০০ স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের ৬০০ নিয়ম। এক জায়গায় যে নীতি বর্জনীয় অপরস্থলে পরম আদরণীয়। এ যেন খেয়াল-খুশীর রাজ্যে 'আমরা রাজা সবাই রাজা.... ।'

গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক নন : "The District Librarian will be the Secretary of the District Library Committee."

"The District Librarian will occupy a key position in the District Library system···he will be responsible for the working of all Urban-Cum-Rural libraries in his District···. It is the responsibility of the District Librarian to knit the library service into lives of the people in his district and to see that the reading habit is assimilated in their culture. He will have librarians under him (the Block librarians and a number of honorary and semi-honorary librarians) and Social Education workers in the District to help him in his task. He should

also maintain contact and liason with other officers at the District level...”

হঠাৎ মনে হতে পারে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি গ্রন্থাগার কর্মীদের কোন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব। ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির (Report of the Advisory Committee for Libraries. Ministry of Education, Govt. of India, 1961) সুপারিশের অংশ বিশেষ। আর পশ্চিম বাংলায় জেলা গ্রন্থাগারিকদের অবস্থাটা দেখুন। কোন জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ বা কমিটির সম্পাদক এরা নন। অনেক জেলায় কমিটির সদস্যও নয়। এদের কার্যক্ষমতার কোনরূপ লিখিত power নেই। কাজ করতে হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ অফিসারদের অধীনে। বিগত ১৬ বছরের মধ্যে অন্ততঃ ১৬ জন জেলা গ্রন্থাগারিক কাজে ইস্তফা দিয়েছেন। সবাই যে Better chance পেয়ে কাজ ছেড়েছেন তা নয় এই গুরুত্বপূর্ণ পদটির অমর্যাদা সহ্য করতে না পেরে অনেকেই বেদনাহত হয়ে দূরে সরে গেছেন। এ সব খোঁজ কে নেয়? আরো অবাক করে দিচ্ছি। অবাক নয় হতবাক। অধিকাংশ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ যে Constitution দ্বারা পরিচালিত সেই Constitution তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখুন কোথাও 'Librarian' শব্দটি পাবেন না। বহু বিচিত্র এই দেশের কথা সেলিউকসকে আর ডেকে শোনাতে হয় না!

সার্ভিস রুল: প্রায় দেড় যুগ অতিক্রান্ত। এ পর্যন্ত এই সব গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কর্মীদের (এদের বেতনাদি সব সরকার থেকে দেওয়া হয়) জন্য কোন Service Rule তৈরী হল না। এরা আজও সঠিকভাবে জানেনা কার অধীনে কাজ করছে; ১৬ বছর চাকরী করেও স্থায়ী কি অস্থায়ী। পাওনা ছুটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সংগে নিত্য নতুন বিতর্ক সংঘর্ষ। কোনও গ্রন্থাগারে পূজোর থাকে ৪ দিন ছুটি কোথায়ও বা ১০ দিন। ধ্যান গম্ভীর সরকার নিশ্চল, নির্বিকার।

বেতন বৃদ্ধি: অভাব অনটনের সংসারও কালের গতিতে বেড়ে চলে। আর যদি না বাড়ে তাহলে কি হয়? ১৬ বছর আগে যে পরিবারের আয় ছিল ১০০ টাকা তার যদি বর্তমান আয়ও একই থাকে সে পরিবার বাঁচতে পারে না। যেমন পারছে না এই গ্রন্থাগারগুলি। উদাহরণ দিয়ে বলি—জেলা গ্রন্থাগারে পুস্তক, পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য বার্ষিক বরাদ্দের অর্থ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ৩০০০টাকা। এটা ১৯৫৪খ্রীঃ কথা। ১৯৬৯তেও ঐ একই বরাদ্দ। অথচ পুস্তকের মূল্য বেড়েছে অনেক, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা কয়েকগুণ। অনুরূপভাবে Contingent expenses ও জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান (Book Mobile Van) দেওয়া হয়েছে অথচ পেট্রল খরচা বা গাড়ী মেরামত খরচা দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় না, বই বাঁধাই, আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থ। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য কোন বরাদ্দ নেই।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযান: পরিকল্পনামত প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারে একটি করে Book

Mobil Van দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই গ্রন্থযানের দ্বারা সারা জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুস্তক আদান প্রদান এবং গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তোলা। কাজও শুরু হয়েছিল সেভাবে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ঐ গ্রন্থযান আর গ্রন্থাগারের কাজে আসছে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট অফিসার আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজে ঐ গ্রন্থযান ব্যবহার করছে। কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় পেট্রল খরচ অবশ্য জেলা গ্রন্থাগারের Fund থেকেই নেওয়া হয়েছে। এমনি চলছে বছরের পর বছর। সম্প্রতি যে সব খবর এসে পৌঁছেছে তাতে জানা যায় অধিকাংশ জেলা গ্রন্থাগারই তাদের সেই বহু কামনার ধন গ্রন্থযানটি আবার নিজের অধিকারে ফিরে পেয়েছে। তবে কি সেই সব অফিসারেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন কিংবা গ্রন্থাগারের স্বার্থ এতদিনে উপলব্ধি করেছেন অথবা সরকারী তরফে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মোটেও তা নয়। অধিকাংশ গাড়ীগুলি অচল হয়ে পড়েছে। যৌবন তাদের শেষ হয়েছে।

মহার্ঘ ভাতা ও অন্যান্য ভাতা : এই সব গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কর্মীদের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য প্রথম থেকেই। অপর্যাপ্ত বেতনহার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাবে কর্মীরা প্রথম থেকেই দিশেহারা। অবিচারের প্রতিবিধান হবে এ আশায় বুক বেঁধে তারা কাজ করছে। বেতন হারের পরিবর্তনের বিষয়টি বর্তমান সরকারের পে-কমিশনের বিবেচনাধীন। অতএব এসব নিয়ে আলোচনা নয়। কিন্তু মহার্ঘ ভাতার বৈষম্য, বাড়ী ভাড়া, মেডিক্যাল ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদির একেবারে অনুপস্থিতি চরম অবহেলার নামান্তর। এত অবহেলার মধ্যে কোন পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। পারছেও না।

অনিয়মিত বেতন প্রদান : বর্তমান ব্যবস্থার সবচেয়ে করুণ এবং অদ্ভুত দিকটি হোল কর্মীদের অনিয়মিত বেতন প্রদান। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রায় ১১০০ কর্মী জানেনা তারা কবে তাদের মাসিক বেতন পাবে। পূর্ণ সময়ের কর্মী এরা, এদেরও পরিবার আছে, পারিবারিক বাজেট আছে। ফলে বাধ্য হয়ে এরা গ্রাম্য মহাজনদের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার নেন, মাইনে পেলে এর এক বড় অংশ এভাবে জলে যায়। বর্তমান ব্যবস্থায় সরকার এই সব কর্মীদের দিনের পর দিন ঋণগ্রস্ত করে তুলছেন আর পরোক্ষভাবে বাঁচিয়ে রাখছেন—লোভী থেকে আরো লোভী ঐ মহাজন সম্প্রদায়কে!

গ্রন্থাগারের দেখাশুনা কার দায়িত্ব? এই স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি সরকারীভাবে দেখাশুনা করার দায়িত্ব রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সমাজ শিক্ষা বিভাগের। এরজন্য কোন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয় নি। তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের জন্যও পূর্ণ সময়ের কোন কর্মী বা বিশেষজ্ঞ নেই। গ্রামীণ গ্রন্থাগাগুলি পরিদর্শন করেন সাধারণতঃ Social Education Organiser (অধুনা Extention Officer নামে আখ্যাত) এবং মুখ্য সেবিকাগণ। নীতিগত ভাবে তো বটেই কাজের দিক দিয়ে এ ব্যবস্থা আপত্তিজনক। দীর্ঘ দিন ধরে শুনে আসছি Inspector of Libraries পদটি সৃষ্টি করা হবে। Director of Libraries এর Sanctioned পদটিই বা কি হোল? সরকার অর্থ বাচানোর মিথ্যা ছলনায়

তুলে অন্ত অফিসারদের দিয়ে গ্রন্থাগারের এই সব জরুরী কাজগুলি করাচ্ছেন বটে ফল যে কি হয়েছে তা একবার ভেবে দেখুন। একবার হিসাব করুন কত অর্থ বেচেছে এবং কত অর্থের অপব্যয় হয়েছে।

অপর্যাপ্ত কর্মী সংখ্যা : জেলা গ্রন্থাগারের কাজ দিনের পর দিন বাড়ছে। অথচ কর্মী সংখ্যা আগেও যা ছিল, এখনও তাই। একজন Assistant Librarian এবং একজন Accountant এর অভাবে কাজে নানান ব্যাঘাত ঘটছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে গ্রন্থাগার

দেশে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। চলছে সরকারী এবং বেসরকারী তরফে নানান উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা। সরকার এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, প্রতিযোগিতামূলক ট্রফি উপহার দিচ্ছেন। সরকারী তরফে এই বিষয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থাগার এই কাজে লাগান হোল না। সন্ত সাক্ষরদের জ্ঞানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গ্রন্থাগারের সাহায্য অপরিহার্য। গ্রন্থাগারে ন মাসে ছ মাসে ২/৪ খানা বই পাঠালেই সরকারী কর্তব্য শেষ হয় না। দরকার কর্মীদের উপযুক্ত করে তোলা, সুস্পষ্ট সরকারী নীতি ঘোষণা। সে সব কই? আন্তরিকতার অভাবটাই এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থাগার শুধু পুস্তক পাঠের কেন্দ্র নয়। লোকের রুচিবোধকে উন্নত করতে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতিমূলক কাজ কর্মের আয়োজন রাখতে হয়। চিত্ত বিনোদনের উপকরণ অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই অনুপস্থিত। প্রথম দিকে কিছু কিছু কাজ কর্ম হয়েছে। বর্তমানে এদিকে আর খেয়াল নেই কারো।

সমস্যার সমাধান কোন পথে?

পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সন্দেহ ও হতাশা এসে গভীরভাবে বাসা বেঁধেছে। আজ আর নেই তাদের মধ্যে কাজ করার আগ্রহ ও উৎসাহ। কোন রকমে নিয়ম রক্ষা করে চাকরী বজায় রাখছে তারা। অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার। ক্ষতি হয়েছে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতির।

সমস্যা আরও আছে। অসংখ্য। সমস্যার সমস্যায় জর্জরিত করে তুলেছে এই সব গ্রন্থাগারগুলিকে। এত সমস্যা নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলি চলছে তাদের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু অস্তিত্বকে অস্বীকার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই এগুলি আবার পুনর্গঠিত হোক, পরিকল্পনামত কাজ করুক। সেটা কি সম্ভব? নিশ্চয়ই সম্ভব। রোগে ভুগে ভুগে যোজনা কমিশনের মানসপুত্র ১৬ বছরের সম্ভাবনাময় যুবকটি এখন শীর্ণকায়, অস্থিচর্মসার। অত্যাচারে জর্জরিত সারা দেহ। অপমানে নতশির। আসলে রোগটা কি ধরতে হবে। অত্যাচারীকে খুঁজে বার করতে হবে। কাজটি কঠিন কিন্তু অসম্ভব বা দুরূহ নয়। আসলে বর্তমানে গোটা সমাজ ব্যবস্থায় এক সামাজিক অবক্ষয়

চলছে। সরকারী প্রশাসন যন্ত্রও এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় নি। তাই তাদের কর্মে এসেছে শৈথিল্য। চিন্তার গুরুভার এড়িয়ে গেছে সযত্নে। আর সেই ফাঁকে সমস্যার ঘিরে ধরেছে আরো অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির মত পরম প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগারগুলিকেও। কিন্তু আমরা আশাবাদী। আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটান সম্ভব। এবং সে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই গ্রন্থাগার-সমস্যার সমাধানে কয়েকটি প্রস্তাব তুলছি :

সুপারিশ সমূহ :

(১) বর্তমান অরাজকতা দূর করা ; সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ এবং সর্ব শ্রেণীর সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির (Public Library) মধ্যে সমন্বয় সাধন। এটা হতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগার আইনের দ্বারা। যোজনা কমিশনের বিশেষজ্ঞদের অভিমতই তুলে ধরি : "On one point, however, the group is unanimous and firm : namely, that there is no alternative to library legislation···our people are being deprived of the full fruits of our educational advance. In the absence of social and political pressures on behalf of Public Libraries, therefore, the Government on their own must accept a measure of self discipline in the matter of providing the machinary and the resources to build an adequate public library service. Library Legislation provides this self discipline."

(Report of the working group on Libraries. Planning Commission, Govt. of India. 1966)

(২) অনেক দেরী হয়ে গেছে আর নয়। বহু সমস্যা সৃষ্টিকারী এই Sponsored System অবিলম্বে বাতিল করে দেওয়া হোক। সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনা হোক। প্রতিষ্ঠা হোক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত Library Directorate. এ বিষয়েও বিশেষজ্ঞদের অভিমত তুলে ধরি—"The Govt. machinary itself may be of two types, either a new and Independent Department (or Directorate) of libraries may be created specifically for organising library services, or an existing Department, almost invariably the Education Department, may organise the services. So far the later has been the invariable practice in India. Here, again, the working group, dissatisfied with the way the Education Deptts. have discharged their Public Library Functions, has preferred that these functions be discharged by an Independent Department called the Directorate of Libraries."

(৩) গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি আর অবহেলা নয়। এদের উপযুক্ত মর্যাদা দান এবং চাকরীর সর্তাবলী নিরূপিত হোক অবিলম্বে। এ বিষয়েও ঐ বিশেষজ্ঞদের অভিমত তুলে ধরা যাক—The Public Library machinary in any country must provided for the competance and morale of the personnel manning the service.

In the existing set up in India only Government can provide proper terms and conditions of the personnel. In fact, that is one main reason why we have accepted of the principle of the Covernment's taking up direct responsibility in this field. Further, it may be observed, that since Public Library services are essentially educational services, the terms and conditions of the service of library personnel at different levels of responsibility must correspond to those of educational personnel. The two cadres may be seperate or unified into a single cadre."

(৪) গ্রন্থাগার কমিটিগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠন। এই কমিটিগুলি হবে পরামর্শদানের জন্য (Advisory Committee)। বে-সরকারী উদ্যোগ এভাবেই সবচেয়ে ভাল কাজ করবে।

(৫) জেলা গ্রন্থাগারিকের উপযুক্ত মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা। মহকুমা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।

(৬) কর্মীদের যোগ্যতার মাপকাঠি নিরূপন। সুপারিশের জোরে কারো নিয়োগ চলবে না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা ছাড়া গ্রন্থাগারিকপদে আর নিয়োগ নয়। গ্রন্থাগারিকদের উচ্চতর পদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের বন্দোবস্ত। প্রমোশনের সুযোগ।

(৭) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ প্রয়োগ। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সরকারী নীতি ঘোষণা। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী তথ্য কেন্দ্ররূপে (Information & Reference Service) সম্প্রসারিত করা। চিত্ত বিনোদনের পর্যাপ্ত আয়োজন।

(৮) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। অর্থ নেই, অর্থ নেই—এ অতি পরিচিত শব্দ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর বিপরীত শব্দটি সরকার কোনদিন ব্যবহার করেছেন এমন নজীর বোধহয় নেই। কিন্তু তাই বলে কি অর্থাভাবে কোন কাজকর্ম পড়ে থেকেছে। যদি থাকেও অন্ততঃ শিক্ষাবিস্তারে থাকা উচিৎ নয়। বিশেষজ্ঞরা Library Cess এর কথা বলেছেন। সরকার এ বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন। কিভাবে অর্থ আসবে সেটা আমাদের বিচার্য নয়। একান্তভাবেই সরকারের। অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণ-মূলক কাজ—গ্রন্থাগারের উন্নয়ন এবং প্রয়োজন ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ সরকার যে ভাবেই হোক করবেন এটাই আমাদের কথা। সাধারণ নাগরিকের দাবীও তাই।

(৯) সর্বশেষে বললেও সর্বপ্রথম যেটা বলা উচিৎ ছিল সেটা হোল রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখার জন্য সরকারকে এই বিষয়ে একটা তদন্ত কমিটি বসানোর অনুরোধ। ১৯৫৪ থেকে আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগার উন্নয়নে, পরিচালনে কতটা সরকারী অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং সে তুলনায় অগ্রগতি কতটা হয়েছে সেগুলি তলিয়ে দেখা দরকার। দরকার ভবিষ্যতের জন্যও।

বর্তমান প্রবন্ধে সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির প্রধান প্রধান সমস্যার দিকগুলি এবং সমাধানের কিছু ইংগিত তুলে ধরা হোল। এখন যেটা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সেটা হোল সরকারের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা। স্পষ্টতঃই তাদের ঘোষণা করতে হবে এই সব গ্রন্থাগার তারা প্রকৃতই চালু রাখতে চান কিনা! ভেবে দেখতে হবে এই সব গ্রন্থাগার সমাজের কতটা প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং সুযোগ পেলে কতটা মেটাতে পারে। সরকার যখন নিজেই ঐই সব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বাইরে বাধ্য হয়ে কোলকাতার ট্রাম কোম্পানীর মত, এদেরও ঢিমেতালে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে এমন কোন কথা হতে পারে না। গ্রন্থাগার নিয়ে কোন সভ্য দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ছেলেখেলা করতে পারে না। যদি সরকারী চিন্তা ও নীতিতে এই সব গ্রন্থাগার অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, সরকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুক্ত হোন। মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিক ৬০০ গ্রন্থাগারকে। আর যদি এর প্রয়োজন স্বীকৃত হয় তা হলে দেশের শিক্ষা প্রসারে, সংস্কৃতি বাঁচাতে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বর্তমান গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হোক।

(চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সুপারিশ ঃ

তুষারকান্তি সান্যাল

[এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব সরকারী, স্পনসর্ড কলেজ গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার বাদ দেওয়া হয়েছে।]

পশ্চিমবঙ্গে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, যার ফলে এদের পক্ষে উন্নত ধরণের সেবা দান করার পক্ষে অসুবিধে দেখা যাচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, গ্রন্থাগারের উন্নত ধরণের সেবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় গ্রন্থাগার কর্মীরাই। এই দোষ চাপানোর প্রবণতা হয় ঈর্ষাসঞ্জাত আর না হয় গ্রন্থাগার কর্মীরা যে বিশেষ ধরনের বৃত্তিকুশলী কর্মী সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব।

খুব দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে, যদিও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন, শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে যথাযোগ্য সুপারিশ করেছেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ মহলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভংগির জন্য সেই সুপারিশগুলো কার্যকর করার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না।

গ্রন্থাগারগুলোর যে ত্রুটির জন্য বর্তমান অসুবিধে দেখা যাচ্ছে, সেই ত্রুটিগুলো মৌলিকভাবে সমাধানের দিকে তাঁরা মোটেই দৃষ্টিপাত করছেন না। ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এমন কী ছাত্রদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির এর বিষময় পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারগুলোর সমস্যা খুব সংক্ষেপে নিম্নলিখিত দিকের উপর আলোচনা করা যেতে পারে এবং সেইমত সুপারিশের উল্লেখ করা হোল :—

(ক) সংগঠন ও প্রশাসনিক দিক, (খ) সেবামূলক দিক, (গ) বেতন ও পদমর্যাদার দিক।

(ক) সংগঠন ও প্রশাসনিক দিক

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারগুলোর সংগঠন ও প্রশাসনিক দিকে কোনও মিল নেই। বর্তমান পাঠকসংখ্যা ও আগামী ২০ বছরের সম্ভাব্য পাঠকসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের যে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, সে দিকে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের কোনও দৃষ্টিই থাকে না।

এছাড়াও গ্রন্থাগারে যে বিশেষ ধরণের আসবাবপত্রের প্রয়োজন, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া হয় না। গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মী ব্যক্তিগত চেষ্টা, প্রভাব প্রয়োগ করে যেমন ব্যবস্থা করতে পারছেন, সেইরকম আসবাবপত্রের ব্যবস্থা হচ্ছে।

কর্মী নিয়োগের ব্যাপারটার মধ্যেও কোনও সমতা নেই। পাঠকসংখ্যা, গ্রন্থাগারের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে যে যথাসংখ্যক কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন আছে—সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। গ্রন্থাগারেকের পুস্তক ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের ব্যাপারে যে পৌনঃপৌনিক অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা অনেকক্ষেত্রেই অপ্রতুল। সে ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীকেও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহের প্রার্থী হতে হয়।

যেহেতু পাঠকদের সংগে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের—সুতরাং—পাঠকদের অসন্তুষ্টির প্রথম (স্থান বিশেষে সবটাই) ধাক্কাটা সামলাতে হয় গ্রন্থাগার কর্মীদের। তাঁদের হাতে থাকে না প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম—কিন্তু তাঁদের উপর দায়িত্ব থাকে এসব বিষয়ে পাঠকদের সন্তুষ্ট করবার।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারিরা যদি গ্রন্থাগার সম্পর্কে যথোচিত মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলেন—তাহলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সবসময়েই কর্তৃপক্ষের দাবাখেলার খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। আর তা না হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত প্রয়াসের মাধ্যমে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানে গ্রন্থাগার কর্মীদের ওপর যে ধরণের উদাসীনতা, অবজ্ঞা ও সময় সময় আক্রমণ আসছে—তাকে প্রতিহত করবার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদেরই বৃত্তিগত সংস্থার মাধ্যমে সংগঠিতভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে।

(খ) সেবামূলক দিক

গ্রন্থাগার কর্মীরা শুধুমাত্র পুস্তক লেনদেন করবেন তাই নয়, তাঁদের বৃত্তিকুশলী কর্মী হিসেবে পাঠকদের বিশেষ ধরণের সেবা দিতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি তাঁদের বিশেষ ধরণের সেবা পাঠকদের কাছে অপরিহার্য করে তুলতে পারেন তবে সেটা পাঠকদের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনে বিশেষ সহায়ক হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে যে ধরণের উপকরণ, সরঞ্জাম ও কর্মীর ব্যবস্থা থাকে, তাতে বিশেষ ধরণের সেবা প্রদানের কোনও সুযোগ থাকে না। অথচ এইসব কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারগুলোর প্রয়োজন পর্যালোচনা করে বাস্তবক্ষেত্রে যদি যথোপযুক্ত উপকরণ, সরঞ্জাম ও কর্মীর ব্যবস্থা করা হয়, তবে যথেষ্ট উন্নত ধরণের সেবা প্রদান করা মোটেই অসাধ্য ব্যাপার নয়। এইসব ব্যাপারে Standardisation এর প্রয়োজন আছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যে বিশেষ অপরিহার্য ভূমিকা আছে এ কথা শুধুমাত্র তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করলেই হবে না, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের দৃষ্টিভংগিও সেইমত পরিবর্তন করে নিতে হবে।

(গ) বেতন ও পদমর্যাদার দিক

(১) পদমর্যাদা—কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিকের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার

কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও পদমর্যাদা একটি ন্যায্য কিন্তু দীর্ঘ দিনের উপেক্ষিত দাবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিককে Academic Council এবং কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে Teachers' Council এর সদস্য করবার দাবী একটি ন্যায়সংগত দাবী। পশ্চিমবংগের বহু কলেজে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে Professor-in-chargeএর উপর। তিনি অনেক ক্ষেত্রে কলেজের গ্রন্থাগারিক থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের কাজ তত্ত্বাবধান করেন। আবার অনেক কলেজে এমনও দেখা গেছে যে, গ্রন্থাগারিক পদে কাউকে নিয়োগ না করেই, সহঃ গ্রন্থাগারিককে নিয়ে গ্রন্থাগারের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এটা অন্যায় ও সর্বরকমের ন্যায় ও নীতি বিরুদ্ধ।

(২) **বেতন**—বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও বৃত্তিকুশলী অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য UGC যে বেতনক্রম সুপারিশ করেছেন যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক চালু করবার সিদ্ধান্ত করা হলেও আজ পর্যন্ত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বেতনক্রম চালু করা হয় নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই যুক্তফ্রণ্ট এর শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য যথাযোগ্য পদস্থ কর্মচারীর কাছে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পন্ন সকল গ্রন্থাগার কর্মীকেই এই বেতনক্রমের আওতায় আনা হয়। একমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নতধরণের বেতনক্রম চালু করা হয় নি।

কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযোগ্য বেতনক্রম চালু করবার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে আন্দোলন চালান হচ্ছে। সরকারী লাল ফিতের কল্যাণে আজ UGC বেতনক্রমের সরকারী আদেশ বিভিন্ন কলেজে প্রেরণ করা হোল না। যুক্তফ্রণ্টের শিক্ষামন্ত্রীকেও এ বিষয়ে যথাবিহিত অবহিত করা হয়েছে। কলেজে কর্মরত এক বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মী UGC বেতনক্রমের আওতায় আসছেন না। পরিষদের দাবী, এই সমস্ত কর্মীদের জন্য সারা পশ্চিম বাংলায় প্রতিটি কলেজে একই ধরণের বেতনক্রম, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হউক। তাদের উন্নত বেতনক্রমের আওতায় আনা যেমন পরিষদের পক্ষে এক পবিত্র কর্তব্য, সংগে সংগে এই ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের আরও বেশী করে পরিষদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন আছে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি ২৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কর্তৃক গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান হচ্ছে :—

(ক) সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়

(১) পাঠক সংখ্যার ও ভবিষ্যৎ ২০ বছরের প্রয়োজন এর দিকে নজর রেখে গ্রন্থাগার কক্ষের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা হউক।

এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিক এর পরামর্শ নেবার ব্যবস্থা থাকবে।

(২) নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব থাকবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

(৩) নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হউক।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের বাজেটের ৬% গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা হউক।

(খ) সেবামূলক দিক

শুধুমাত্র পুস্তক লেন দেন নয়, গ্রন্থাগার কর্মীরা যাতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকারীদের উন্নত ধরণের সেবা প্রদান করতে পারেন তার জন্য যথোপযুক্ত উপকরণ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়

(১) **পদমর্যাদা :**

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে Academic Council এর সদস্য হবার অধিকার দিতে হবে। এর জন্য University Act এ প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিককে College Council এর সদস্য হবার অধিকার দিতে হবে। College Code এ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে হবে।

(গ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিক এর কাছ থেকে কোনও রূপ Security deposit রাখা চলবে না।

(ঘ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে Professor-in-Charge এর প্রথা বিলোপ করতে হবে।

(২) **বেতন :**

(১) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে UGC বেতনক্রম চালু করতে হবে।

(২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পন্ন সকলগ্রন্থাগার কর্মীদেরই এর আওতায় আনতে হবে।

(৩) পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হবে।

(৪) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে কর্মরত অন্যান্য বিরাট সংখ্যক আবৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সারা পশ্চিম বাঙলায় একই ধরণের উন্নত বেতনক্রমের সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের সরকারী হারে মহার্ঘ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ দিতে হবে।

(চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ)

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সত্যব্রত সেন

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করবার আগে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ শিক্ষাগত অবস্থার কথা ভেবে নিতে হয়। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন ভারতে এগোতে পারেনি বরঞ্চ পেছিয়ে পড়েছে। এই পেছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে দেশে ব্যাপক শিক্ষা প্রসার রাষ্ট্রকর্ণধাররা এতদিন অভিপ্রেত মনে করেন নি। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ যদি সমাজ ও সমাজে আপন অস্তিত্ব সচেতন হয় এবং নিজ নিজ ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা বুঝতে শেখে, তবে কায়েমী স্বার্থ বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। তাই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা প্রসার রক্ষণশীল মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রসারিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার জগতটিও একই রোগের শিকার। সরকারী অর্থানুকূল্যে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে তা ক্রমবর্দ্ধনশীল হওয়ার পথ পায়নি। দিন দিন পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে।

কাজেই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে আলোচনার সূচনায় এই পটভূমি যদি মনে রাখি তবে, পশ্চিমবঙ্গে ২৫০০০ টাকা ব্যয়ে ১১টি ভ্রাম্যমান পুস্তকযান, প্রায় ৫৫০ সাইকেলের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের স্বাদ পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা গত ১৪ বছর বুঝতে পারে নি।

অথচ বলা বাহুল্য ভ্রামামান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি যেখানে গ্রন্থাগারহীন ছোট ছোট জনবসতি ও স্বল্পজতি সম্পন্ন আধা সহরাঞ্চলে পরিপূরক গ্রন্থাগার হিসাবে পুস্তক ধার দেওয়া এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফেরত নেওয়ার মাধ্যমে সাধারণভাবে অল্প সময়ের জন্য পড়বার সুযোগ দিয়ে, খবরাখবর দিয়ে গ্রাম সমাজকে তথা সাধারণ দেশবাসীকে সমুন্নত করার কাজে ব্যাপক সহায়তা করার কথা, সেখানে এখনও আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না।

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের প্রয়োজন (১) প্রধানত যে সব লোকালয়ে গ্রন্থাগার প্রবর্তনের অসুবিধা রয়েছে অথচ, ব্যাপক সমাজশিক্ষার বিস্তারের মৌলিক উদ্দেশ্যের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সুযোগ নেই এমন অঞ্চলের বাসিন্দাদের সমাজশিক্ষার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত না করা। (২) দ্বিতীয়ত, গ্রন্থাগারের প্রতি তথা পুস্তকের প্রতি বয়স নির্বিশেষে আকর্ষণ সৃষ্টি করা ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সাহায্যে যথাসময়ে সম্ভাব্যক্ষেত্রে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা, (৩) তৃতীয়ত গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলেও যথেষ্ট সংখ্যক ও যথেষ্ট রকমের মূল্যবান পুস্তক সব গ্রন্থাগারেই রাখা যখন সম্ভব নয় তখন মূল্যবান পুস্তকাদি ও বিবিধ রকমের পুস্তকাদি একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে ছোট ছোট গ্রন্থাগারে সাময়িকভাবে সরবরাহ করা এবং (৪) চতুর্থত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির সহযোগিতা দেশের সব অঞ্চলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের অন্যতম যান হিসাবে মোটর ও সাইকেল ব্যবহারের মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকলেও অটোরিক্সা, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, নৌকো বা ট্রেনকেও সহায়ক যান হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা চালানো অবাস্তব কিছু হওয়ার কথা নয়।

তবে পশ্চিমবঙ্গে এখনও মোটর ও সাইকেলই সুবিধাজনক। কেননা রাস্তাঘাট এই যান নির্বাচনটিকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করে। পশ্চিমবঙ্গে আলাদা কোন ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার নেই। তবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকেও প্রত্যেকটি জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি ভ্রাম্যমান পুস্তকযান দেওয়া হয়েছে যাতে দূর. দূর অঞ্চলে পুস্তক সরবরাহ করতে পারে। পুস্তক সরবরাহ এক্ষেত্রে দু'রকমভাবে হতে পারে (১) সরাসরি পাঠককে (২) কোন ছোট গ্রন্থাগার বা প্রতিষ্ঠানকে। তবে পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোন পাঠককে সরাসরি পুস্তক দিয়ে সাহায্য এই ভ্রাম্যমান মোটর যানগুলির মারফৎ হচ্ছে না। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থযানটি আদৌ গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না। জেলা গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থযানটি অবশ্য (মাঝে মাঝে) গ্রামে যায় এবং নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান সদস্যভুক্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা ঐ জাতীয় ছোট ছোট গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারযুক্ত ক্লাবগুলিকে সাধারণত প্রতিমাসে বা প্রতি দুমাসে বা প্রতি তিনমাসে বা প্রতি বছরে কিছু সংখ্যক পুস্তক দিয়ে আসে এবং পরবর্তী কোন সময়ে ঐ পুস্তকগুলো বদলিয়ে দিয়ে আসে। সরবরাহের জন্য পুস্তক নির্বাচন কোথাও কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বা কর্মীদের ইচ্ছা অনুযায়ী, কোথাও পুস্তক গ্রহনকারী গ্রন্থাগারের প্রতিনিধির রুচি অনুযায়ী। পুস্তক গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানেরা তালিকার সাহায্য থেকে বঞ্চিত, মজার কথা এই পুস্তক সাহায্য পাবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জামিন স্বরূপ অর্থ জমা রাখার রেওয়াজ আছে এবং বার্ষিক বা মাসিক চাঁদাও কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগারকে দিতে হয়। এই দুটিই কিন্তু গ্রন্থাগার প্রসার পরিকল্পনার পরিপন্থী। যার ফলে ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যায় ঘাটতিপূরণে সামান্য পরিমাণ সহায়তা হলেও এই গ্রন্থাগারটির উপর পশ্চিমবঙ্গে এখনও বিশেষ আকর্ষণ গড়ে ওঠেনি। জনপ্রিয়তা খুবই স্বল্প। অবশ্য এই স্বল্পতার জন্য কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যার স্বল্পতাও দায়ী।

পশ্চিমবঙ্গে আরও দুটি দৃষ্টিকটু বিষয় এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বা গ্রন্থযানটিকে ঘিরে আচ্ছন্ন রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়।

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারটিকে গ্রন্থাগার হিসাবে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে গ্রন্থাগার হিসাবেই ভাবা দরকার এবং সে অনুযায়ী যত বেশী রকমে সম্ভব গ্রন্থাগারের কাজেই ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, এই গ্রন্থযানটি, সরকারী পুস্তক বিক্রয়ের জন্য, ধানচাল সংগ্রহের জন্য, স্কুলের প্রশ্নপত্র বা খাতাপত্র আনা নেওয়া বা সরকারী বেসরকারী পদস্থ ব্যক্তিবর্গের ভ্রমণের জন্য সাধারণ মোটরযান হিসাবেই অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই গ্রন্থযানটি পেট্রল খরচের সীমাবদ্ধতার জন্য চাহিদা অনুযায়ী চালু করা যায় না। অসীম বরাদ্দ চাওয়া হউক একথা বলছি না, তবে, পেট্রলের দাম বাড়ার সঙ্গে তাল রাখার

মত বন্দোবস্ত এবং পথ পরিক্রমার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার ব্যবস্থা হলেই চলে। এইসব কারণে গ্রন্থাগার কর্মীরা যত্নহীনতাকে অজানতেই প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন।

সাইকেলে পুস্তক সরবরাহের কাজ অধুনা পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের তরফ থেকে কিছু কিছু করা হলেও কর্মসংস্থান ও অর্থসংস্থান উপযুক্ত না হওয়ার দরুণ প্রসারের পরিবর্তে দিন দিন গ্রন্থাগারের কাজ সঙ্কুচিত হচ্ছে, যদিও সরকারী খাতাপত্রে অর্থব্যয়ের অঙ্ক দিন দিন বড় হয়ে উঠছে। অর্থব্যয় হলেই শ্রীবৃদ্ধির কারণ ঘটে না, অপব্যয় হলে সমাজে পঙ্গুত্ব দেখা দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে রাস্তাঘাটের প্রসার ও জলপথের যা ব্যবস্থা হয়েছে এবং হবার সুযোগ আছে তাতে মোটর, সাইকেল ছাড়া নৌকোও ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ী সুবিধাজনক মনে করা চলে না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি জনস্বার্থমুখী করে সমুন্নতির জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ রাখতে চাই :—

(ক) জনসাধারণ কি করবে (খ) সরকার কি করবে (গ) গ্রন্থাগার কর্মী কি করবে।

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

(১) জনসাধারণকে প্রতি গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার কমিটি তৈরী করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে—যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভ্রাম্যমান পুস্তকযান মারফৎ পুস্তক সরবরাহের সুযোগ নিতে হবে।

(২) সংগঠিতভাবে রাজ্য গ্রন্থাগারের পরিষদের সাথে হাত মিলিয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে, আরও সাইকেল, অটোরিক্সা, মোটর, নৌকার মাধ্যমে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার মারফৎ পুস্তক সরবরাহ বর্দ্ধিত করে।

(৩) জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যাতে পুস্তক সরবরাহে সহায়তার জন্য পুস্তকতালিকা সরবরাহ করে এবং ভ্রাম্যমান পুস্তকযান মারফৎ অন্তত মাসে একবার নিয়মিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তক সরবরাহ করে সেইজন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

(৪) গ্রামবাসীদের মধ্যে গ্রাম্য ঝগড়াঝাটি পরিহার করতে ও দারিদ্র্য ও সামাজিক অবাঞ্ছিত অবস্থা পরিহারে কিভাবে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সাহায্য করতে পারে এই সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আলোচনা সভা বৈঠক ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য গ্রামে গ্রামে সুন্দর ও সুবিধাজনক যত্ন নিতে হবে।

(৬) গ্রন্থযান থেকে পুস্তক সরবরাহের সুবিধার জন্য এবং পাঠকের ও স্থানীয় সংগঠনের সহযোগিতা বর্দ্ধিত হারে পাবার জন্য পুস্তক তালিকা প্রণয়নে উদ্যোগ নিতে হবে।

(৭) বার্ষিক চাঁদা বা জমা প্রথা বিলোপ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে—যদিও এই কাজটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাজ, তবুও মূলতঃ গ্রন্থাকারিকেব সুপারিশ এখানে খুব ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা। (চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ)

বইপত্র হারানোর সমস্যা

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারকে একটি গতিশীল সজীব প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। প্রাণীর দেহের মতো গ্রন্থাগারেরও বৃদ্ধি ও ক্ষয় ঘটে। গ্রন্থাগারের ক্ষয়ক্ষতি মোটামুটি তিন ধরণের :

১. গ্রন্থাগারের প্রধান বস্তু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার উপাদান কাগজের আয়ুষ্কাল সীমিত বলে এবং বহুজনের ব্যবহারের ফলে বইপত্রের স্বাভাবিক ক্ষয় ও আবহাওয়াজনিত জীর্ণতা অনিবার্য।

২. জৈবদেহে রোগ আক্রমণের মতো গ্রন্থাদিও পোকামাকড় ইঁদুর ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

৩. ক্ষয়ক্ষতির শেষ কারণ হল বইপত্রের ছবি ও পৃষ্ঠা চুরি যাওয়া এবং বই হারিয়ে যাওয়া।

ক্ষয়ক্ষতির উপরোক্ত প্রথম দুটী সমস্যা বিজ্ঞানসম্মত নানা উপায়ে নিবারণের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় কারণ অর্থাৎ বইপত্র হারানোর সমস্যাটি একটী সমাজতাত্ত্বিক বিষয়; সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে সমস্যাটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এর আশু কোনো সমাধান নেই।

বইপত্র গ্রন্থাগার থেকে দু'ভাবে খোয়া যায় :

১. যার নথিপত্র থাকে অর্থাৎ যেসব বইপত্র সদস্যদের কাছ থেকে অনাদায়ীকৃত রয়েছে ;

২. গ্রন্থাগার থেকে অজ্ঞাতসারে বইপত্র হারিয়ে যাওয়া অর্থাৎ চুরি যাওয়া।

সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের কাছেই শেষোক্ত বিষয়টী এক দুশ্চিন্তার কারণ। সমস্যাটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিরোধের সৃষ্টি করে। গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র চুরি যাওয়ার কারণ ও তৎসম্পর্কে যুক্তিসম্মত নীতি নির্দ্ধারণই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অধিকাংশ গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মোট বইপত্রের হিসাবনিকাশ করা হয়ে থাকে। হিসাব গ্রহণের পর কিছু বইয়ের কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। সেগুলিকেই চুরি হিসেবে গণ্য করা হয়।

১. গ্রন্থাগার থেকে বই চুরি যায় কেন ?

পৃথিবীর সব দেশেই এমন গ্রন্থাগার বিরল যেখান থেকে বই হারায় না। ষ্টকের সম্পূর্ণ হিসাব নেওয়া সম্ভব হলে দেখা যাবে কিছু সংখ্যক বইয়ের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রন্থাগার অনেকটা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মতো, যেখান থেকে মানুষের মন আলোকিত

হয়ে থাকে। গ্রন্থই আলোক শক্তির আধার। প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রেও উৎপন্ন শক্তি সরবরাহের পথে কিছু পরিমাণে বিনষ্ট হয়। যে কোনো বস্তুরই ব্যবহার ও বিনিময়ের ফলে তার কিছু পরিমাণ বিনষ্ট হয়। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে মূলত অসামাজিক ব্যক্তিদের দুষ্ক্রিয়ার ফলে বইপত্র খোয়া যায়। এই শ্রেণীর মানুষের উৎপাতে শুধু গ্রন্থাগারই নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা মূলত একটি সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা।

এই অবস্থা সত্ত্বেও অনেক গ্রন্থাগারে যথোচিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গৃহীত হয় না, অর্থাৎ গ্রন্থাগারে রক্ষণকর্মে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয় না। রক্ষণাবেক্ষণের উপযোগী ব্যবস্থার অভাবে চুরির আশঙ্কা বর্ধিত হয়।

২. মুক্তদ্বার ব্যবস্থাই কি তার প্রধান কারণ ?

সমস্যাটি যে কেবল মুক্তদ্বার (open access) ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ সেকথা মনে করা ভুল। রুদ্ধদ্বার (closed access) ব্যবস্থাতেও সমস্যাটি যথেষ্ট বিদ্যমান। কাজেই বই হারানোর জন্য মুক্তদ্বার ব্যবস্থা রদ করা সমীচীন নয়। এই ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের সর্বপ্রকার গ্রন্থের ব্যবহার ঘটে, পাঠকদের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় এবং পাঠস্পৃহার বৃদ্ধি ঘটে। এছাড়াও এই ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কর্মীর সাহায্যে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্ভব হয়। তবে নিরাপত্তার যথোচিত ব্যবস্থা ব্যতিরেকে মুক্তদ্বার প্রবর্তিত না হওয়াই সঙ্গত।

৩. গ্রন্থাগারের স্তরভেদে চুরির তারতম্য

গ্রন্থাগারের প্রকৃতিভেদে চুরির তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ সাধারণ গ্রন্থাগার, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় ও বিশেষ গ্রন্থাগারের পাঠকবর্গের বয়স, শিক্ষা, প্রবণতা, দায়িত্বজ্ঞান ইত্যাদির মধ্যে তারতম্য থাকার ফলে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে সমস্যাটির পরিমাণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৪. বই চুরির জন্য গ্রন্থাগারিককে দায়ী করা কি সঙ্গত ?

গ্রন্থাদি চুরি যাওয়ার জন্য অনেক সময় গ্রন্থাগারিককে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগের সময় গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে 'সিকিউরিটি ডিপজিট' চাওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে বই হারানোর জন্যে গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা আদায় করা হয়। এমনও দেখা যায় যে কর্তৃপক্ষ নিছক ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে গ্রন্থাগারিককে হেয় প্রতিপন্ন করে শাস্তিদানের জন্যে বই চুরির বিষয়টিকে বড় করে দেখান।

বইপত্র হারানোর জন্য গ্রন্থাগারিককে অভিযুক্ত করা একটি নীতি বিগর্হিত আচরণ। তাতে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সম্পর্কে চেতনার অভাব এবং তার প্রতি অবমাননা প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিচালনা ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মী; সর্ববিধ কাজকর্মের চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। তিনি গ্রন্থাগারের রক্ষী নন; বইপত্র আগলানোই তাঁর কাজ নয়। গ্রন্থাগারে নানা চরিত্রের বিভিন্ন ধরণের মানুষের আনাগোনা ঘটে।

সেজন্য কোনো কিছু খোয়া গেলে তাঁর প্রতি দোষারোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। স্কুল কলেজ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে জিনিসপত্র হারালে নিশ্চয় তার অধ্যক্ষ বা প্রধানকে দোষী সাব্যস্ত করা করা হয় না। গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য ঘটে ?

গ্রন্থাগারে চুরির জন্য গ্রন্থাগারিককে অভিযুক্ত করলে তিনি নিজেকে রক্ষার জন্য গ্রন্থাগারের নিয়মকানুনকে বড় কঠিন করে তোলেন। তাতে গ্রন্থাগারের ব্যবহার সংকুচিত হয়ে পড়ে, সদস্যদের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় না।

গ্রন্থাগারিকের কাজেকর্মে অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রমাণিত হলে নিশ্চয় তাঁর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে পারে। এখানে ভারত সরকার নিয়োজিত লাইব্রেরি অ্যাডভাইসরি কমিটির অভিমত উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

"...it is also necessary to abolish practices which adversely affect librarians' morale. For example, some library authorities require the librarian to furnish 'adequate security" for his being in charge of the book stock. In many places he is even held responsible for paying the cost of books lost during the time he was in charge of the library. We have no hesitation in saying that such practices are iniquitous and unheard of in the library practice of any advanced country in the world, In the first place, the safety of library books depends on the moral tone of its users and no librarian, unless he is to restrict severely the use of books can prevent the depradations of unsocial elements. Secondly, since no librarian is adequately paid, the effect of asking him to pay for the loss of books would be that he will place all books in his charge under lock and key and thus nulify the fundamentals of a good public library. We, therefore, strongly recommend that the practice mentioned here should be put an end to, and no State Government should require a librarian to furnish security or to pay for the loss of books unless gross negligence or dishonesty is proved against him."

৫. বই চুরি নিবারণের কয়েকটি উপায়

১ গ্রন্থাগারের পাঠকদের ব্যক্তিগতভাবে ও সমবেতভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করে তোলা।

২ গ্রন্থাগারের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর সংস্থান করা।

৩ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তক স্বতন্ত্রস্থানে রাখার ব্যবস্থা করা, যেখানে পাঠকদের অবাধ অধিগম্য সুবিধা থাকবে না।

৬. স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হলে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ সংখ্যা

গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র খোয়া যাওয়াটা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। সেজন্য বইপত্র হারানোর একটা যুক্তিসম্মত সংখ্যা নির্ধারিত

হয়ে থাকে। ডঃ রঙ্গনাথনের মতে বছরে হাজার প্রতি সর্বাধিক তিনটি বই অপহৃত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনও এই সংখ্যাটি সুপারিশ করেছেন। তদতিরিক্ত সংখ্যক বই হারালে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রেও এইরূপ একটি নীতি গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ গ্রন্থাগারে বিশেষত যেখানে অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেখানে সমস্যাটি অধিকতর বিবেচনা করে পুস্তক হারানোর গ্রহণযোগ্য সংখ্যাটি কিছু বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খসড়া প্রস্তাব

১. (ক) এই সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগারে বই হারানোর জন্য গ্রন্থাগারিককে অভিযুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

(খ) এই যুক্তিতেই গ্রন্থাগারিকের নিকট হইতে 'সিকিউরিটি ডিপজিট' আদায়ের রীতিও ন্যায়সঙ্গত নয়।

২. (ক) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগারে বছরে হাজার প্রতি সর্বাধিক তিনটি করিয়া পুস্তক হারাইলে তাহা write off করা যাইতে পারে।

(খ) সাধারণ গ্রন্থাগারে বছরে হাজার প্রতি পাঁচটি করিয়া পুস্তক হারানোর জন্য write off করা যাইতে পারে।

৩. গ্রন্থাগারের সর্বজাতীয় পুস্তকের ব্যবহার ও পাঠকদের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারে অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া বিধেয়।

৪. স্থান সংকুলান ও সংরক্ষণ সমস্যা হ্রাস করিবার সুবিধার্থে গ্রন্থাগার হইতে প্রতি বৎসর অব্যবহার্য ও জীর্ণ পুস্তক বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত।

৫. গ্রন্থাগারের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ক্ষেত্র অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

(চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ)

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

২৭শে মার্চ—২৯শে মার্চ, ১৯৭০

বড়আন্দুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার

পোঃ বড়আন্দুলিয়া, জেলা নদীয়া।

—ঃ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—

১। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বড়আন্দুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় আগামী চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৭শে মার্চ হইতে ২৯শে মার্চ, তারিখে উক্ত গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন শ্রীজীবানন্দ সাহা।

২। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে ২৭শে মার্চ বিকাল ৪-৩০মিঃ সময়ে। উক্ত দিবসে বিকাল পাঁচ ঘটিকায় মূল সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে। উদ্বোধন করিবেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রতিনিধি ও দর্শকদের উক্তদিবসে অবশ্যই বিকাল ৪-ঘটিকার পূর্বে সম্মেলন-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া নাম তালিকাভুক্ত (রেজিস্ট্রেশন) করিতে হইবে। নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য পরিষদ কার্যালয় ২৭শে মার্চ সকাল ১০ ঘটিকা হইতে সম্মেলন মণ্ডপে খোলা থাকিবে।

৩। সম্মেলনে স্পনসর্ড কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সমূহের সমস্যাবলী এবং গ্রন্থযান ও পুস্তক হারানোর সমস্যা সম্পর্কে আলোচিত হইবে। উক্ত প্রবন্ধ ভিত্তিক প্রস্তাব সমূহ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার পৌষ-মাঘ, ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সম্মেলনে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিলে তাহা অবশ্যই ৭ই মার্চের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। মূল সভাপতির ভাষণ ও অভ্যর্থনা সমিতির ভাষণ পরে দেওয়া হইবে। পরিষদের সভ্যরা সম্মেলন সংখ্যা গ্রন্থাগার লইয়া সম্মেলনে আসিবেন।

৪। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের (প্রতিষ্ঠানগত সদস্যেরা ২ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন) কোন ডেলিগেট ফি লাগিবে না। যাহারা সদস্য নন তাহাদের ৪ (চারটাকা) হিসাবে ডেলিগেট/দর্শক ফি দিতে হইবে। ডেলিগেট/দর্শক ফি সম্মেলন কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

৫। অভ্যর্থনা সমিতি ২৭শে মার্চ শুক্রবার অপরাহ্ণ হইতে ২৯শে মার্চ রবিবার অপরাহ্ণ পর্যন্ত আহারাদি ও থাকিবার বন্দোবস্ত করিবে। আহারাদির জন্য প্রতি ব্যক্তিকে (ছয় টাকা) করিয়া অভ্যর্থনা সমিতিকে দিতে হইবে। ২৭ তারিখে মধ্যাহ্নে যাহারা আহারাদি করিবেন তাহাদের পূর্বে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে।

এইজন্ত ১ (এক টাকা) অতিরিক্ত দিতে হইবে এবং উক্ত দিবসে বেলা ১টার পূর্বে সম্মেলন স্থানে আসিতে হইবে।

৬। সম্মেলনে যাহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদের নাম ২৪শে মার্চের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে এবং অভ্যর্থনা সমিতির নিকট (উভয় স্থানেই) প্রেরণ করিতে হইবে।

৭। প্রতিনিধি/দর্শকদের সঙ্গে মশারী, বিছানা ইত্যাদি লইয়া আসিতে হইবে।

৮। বড়আন্দুলিয়া যাইবার পথ :

কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর সিটি ট্রেনে (১০০ কি. মি.), ষ্টেশন হইতে রিক্সায় কৃষ্ণনগর বাস ষ্ট্যাণ্ডে আসিতে হইবে। (কৃষ্ণনগর হইতে বাসে কৃষ্ণনগর-শিকারপুর লাইনে বড়আন্দুলিয়া ১৮ মাইল। সুবিধাজনক তিনটি ট্রেনের নাম উল্লেখ করা হইল : (অন্যান্ত ট্রেনের জন্ত টাইম টেবিল দেখুন)।

শিয়ালদহ (ছাড়িবে)	কৃষ্ণনগর (পৌঁছাইবে)
সকাল ৬-৩৫ মিঃ (কৃষ্ণনগরসিটি লোকাল)—	৯-১৫ মিঃ ,,
সকাল ৮-১০ মিঃ (লালগোলা প্যাসেঞ্জার)—	১০-৪৬ ,, ,,
সকাল ১১-০৫ মিঃ (কৃষ্ণনগর সিটি) —	১-৩০ ,, ,,

ট্রেনের ভাড়া		বাসের ভাড়া
প্রথম শ্রেণী—	৯·৯০ পঃ	
২য় ,, —	৪·৮৫ পঃ	
তৃতীয় ,, —	২·৫০ পঃ	০৯০ পয়সা !

৯। ১-৩০ মিঃ এ যে গাড়ী কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর পৌঁছাইবে সেই গাড়ীর যাত্রীদের জন্ত ষ্টেশন হইতে বাস রিজার্ভ করার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার জন্ত বাস ভাড়া কিছু বেশী লাগিতে পারে।

১০। সম্মেলন সম্পর্কে অন্যান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্ত সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, পোঃ বড়আন্দুলিয়া, নদীয়া অথবা কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম নং ৫২, কলিকাতা-১৪ (ফোন ৪৪-৮৫৬৬, বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টার মধ্যে) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

১১। সম্মেলনের বিস্তারিত কর্মসূচী পরে জানানো হইবে।

ডাঃ অবনী মোহন দে
সম্পাদক,
অভ্যর্থনা সমিতি,
চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগার, ১৮ এফ, পীতাম্বর ঘটক লেন, কলি ২৭

গত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ রবিবার পাঠাগারের সহঃ সভাপতি শ্রীদেবকুমার ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার কক্ষে পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ১৯৬৯-৭০ সালের কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়েছে। সর্বশ্রী মনি সান্যাল, এম, এল এ, অমল কুমার গোস্বামী এবং কল্যাণ কুমার রায় যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হন।

বরানগর পিপলস লাইব্রেরী, কুটিঘাট রোড, কলি-৩৬

২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ গ্রন্থাগার দিবসে পাঠাগার কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা বিরোধী কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। রাজ্য বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২'৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার চাই। কলিকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। গ্রন্থাগার ভবনের উপর পৌর কর আদায় ব্যবস্থার অবসান চাই। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা চাই। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নিয়মিত মাসিক বেতন, সার্ভিস রুল প্রবর্তন এবং পশ্চিমবংগ সরকারী কর্মীদের অনুরূপ ভাতাদি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

দি বয়েজ ওন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ং মেন্‌স ইনষ্টিটিউট, পি ২৯, ডালিমতলা লেন, কলি-৬

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় এই গ্রন্থাগারটির ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২১শে ডিসেম্বর থেকে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এক সপ্তাহব্যাপী হীরক জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উদ্বোধনী সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। সাংস্কৃতিক সভায় পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীনারায়ণ সান্যাল।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার, ৩২ এ হরিসভা ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা

শিশিরস্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৭শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। গ্রন্থাগার সম্পাদক বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা

সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন—নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা বিরোধী কর্মসূচী সফল করে তোলা। রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ ২'৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়, ক'লকাতায় জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার প্রবর্তন, সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা ও বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সরকারী সাহায্য প্রদান।

বাগমারী শ্রীকল্যাণ সাধারণ পাঠাগার, বাগমারী

গত ২৬শে ডিসেম্বর '৬৯ বাগমারী শ্রীকল্যাণ সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক সমাজশিক্ষা সপ্তাহ ও গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে এক জনসভার আয়োজন করা হয়—সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাস। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী গ্রন্থাগার সপ্তাহের তাৎপর্য ও সমাজশিক্ষায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সংশোধনী

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী :

পূর্ব প্রকাশিত তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী প্রবন্ধের কয়েকটি বক্তব্য সংশোধন করে উক্ত গ্রন্থাগারের কর্মসচিব শ্রীযুক্ত অপূর্ব মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটি পত্র দিয়েছেন, সেই পত্রের উপর নির্ভর করে প্রবন্ধের কয়েকটি তথ্য সংশোধন করা হলো। ১৯৫৭ সালে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ আছে কিন্তু তিনি অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁর পরিবর্তে দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ১৯১০ খৃঃ লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য যে আইন করা হয় তা কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে এবং বর্তমানে ১৯৬৪ সালের সংশোধিত আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগারটি পরিচালিত। পাঠাগারের গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাটি শুধু অর্থাভাবে নয়, আশানুরূপ চাহিদা না থাকায়, নতুন তালিকা মুদ্রণ বন্ধ রাখা হয়েছে। লাইব্রেরীর সম্পাদক জানিয়েছেন যে এই গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "সাহিত্য সম্মেলন" বিশেষ মহল থেকে উপযুক্ত সাড়ার অভাবেই বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আমার প্রবন্ধটির উপরোক্ত সংশোধন করতে পারায় জন্য লাইব্রেরীর কর্মসচিবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—গীতা মিত্র।

চব্বিশ পরগণা

নেহরু স্মৃতি পাঠাগার, সুভাষনগর, বনগ্রাম

১৯৬৯ এর ১১ই অক্টোবর সাতজন আজীবন সদস্য নিয়ে এক অছি পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের সদস্যভুক্ত হ'ন যথাক্রমে সর্বশ্রী হেমেন্দ্রনাথ স্মৃতি কাব্য, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, বলাইদাস ঘোষ, মনোহর কুমার সুর, জগদীশ গোলদার, ব্রজেন্দ্র কুমার ঘটক ও সুধীর কুমার নাথ।

সাধুজন পাঠাগার বনগ্রাম

নিখিলভারত সমাজশিক্ষা দিবস

বিগত ১লা ডিসেম্বর 'সাধু পাঠমন্দিরে' শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত সমাজশিক্ষা দিবস' প্রতিপালিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী

পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে, সাধুজন পাঠাগারের উদ্যোগে 'সাধু পাঠমন্দিরে' স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮তম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রারম্ভে সমবেতকণ্ঠে সাধুজন পাঠাগার সঙ্গীত 'জনগুঞ্জন স্বাগতম্' গীত হয়। শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র ঘটক শাস্ত্র শিরোমণি আস্তোত্র পাঠ করেন। সমাজশিক্ষা সংগঠক শ্রীনীলমণি রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

নেতাজী জয়ন্তী ও নেতাজী প্রদর্শনী

সাধুজন পাঠাগারের উদ্যোগে 'সাধু পাঠমন্দিরে' ৯ই মাঘ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৭৪তম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে অবিস্মরণীয় সংগ্রহ সমৃদ্ধ 'নেতাজী প্রদর্শনী'র উদ্বোধনী করেন শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় কবিতিলক। শিক্ষাব্রতী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

মেদিনীপুর

চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার, চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর

গত ২০শে ডিসেম্বর চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিভিন্ন বক্তা সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা, বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার প্রবর্তন ও সুসংবাদ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তমলুক

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর '৬৯ গ্রন্থাগার ভবনে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন

হয়। ২১শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এক সভায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মাণী ও রাশিয়ার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস তথা ভারতে বরোদা, মাদ্রাজ, মহীশূর ও বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচিত হয়। এই সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হয়।

নদীয়া

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদ, নদীয়া

বিগত ২৬শে নভেম্বর নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরুলিয়া

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির (রুর‍্যাল লাইব্রেরী) গড়জয়পুর

গত ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের ত্রয়োবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্য বাসর ও সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা শ্রীকমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন অধিকার করেন শ্রীতুহিন কান্তি মহাপাত্র।

বর্ধমান

অপর জেলা গ্রন্থাগার, আসানসোল

গত ২১শে ডিসেম্বর আসানসোলে অবস্থিত অপর জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে এক প্রদর্শনী, বিচিত্রানুষ্ঠান ও শিশু উপযোগী চলচ্চিত্রের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীপদ্মিনী সেনগুপ্তা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ কোলে। তিনি গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগারের বর্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম

গত ১লা ডিসেম্বর এই গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সমাজশিক্ষা দিবস পালিত হয়। বিগত ২০শে ডিসম্বর '৬৯ জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগার ভবনে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামশংকর মজুমদারের সভাপতিত্বে এক আলোচনাচক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্পর্কে সমস্যা আলোচিত হয়। গ্রন্থাগারিক ও সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকড়, বর্ধমান

গত ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০, মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীতে সাড়ম্বরে "সাধারণতন্ত্র দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। সকাল ৭-৩০ মিঃ জাতীয় সঙ্গীত সহকারে জাতীয় পতাকা

উত্তোলিত হয়। বিকাল ৩-৩০ মিঃ শ্রীসন্তোষ কুমার অগ্নিহোত্রীর পৌরোহিত্যে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি, শ্রীখণ্ড

গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতির উদ্যোগে গ্রন্থাগারদিবস উদ্‌যাপিত হয়।

সুভাষ পাঠাগার, ফটকদ্বার, কালনা

সুভাষ পাঠাগারের উদ্যোগে কালনা রবীন্দ্রসদনে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে 'জনশিক্ষার প্রসারে, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা হয় ও প্রায় ১২৫টি পুস্তক ও প্রচ্ছদপটের এক প্রদর্শনীর আলোচনা করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে ৭৫০ টাকা দান করেছেন। গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রবসুর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। গত ২৯শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার, হাওড়া

গত ২০শে ডিসেম্বর (১৯৬৯) সবুজ গ্রন্থাগারে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। উক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু মান্না মহাশয়। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক "গ্রন্থাগার দিবসের" তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এইদিনের সভায় যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল :

(১) গ্রামে গ্রামে সভা সমিতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সঙ্গে জনসাধারণের যোগবৃদ্ধি।

(২) প্রাচীর পত্রের ও পুস্তকের প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণকে গ্রন্থাগার মুখী করা।

(৩) গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের সাহায্য বই আদান-প্রদান করা।

(৪) নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী করা।

সঙ্কলয়িত্রী : শীলা গুপ্ত

News from the Libraries.

বিয়োগ পঞ্জী

নিরঞ্জন মৈত্রেয়—নিরঞ্জনচন্দ্র মৈত্রেয় (১৯০৯-১৯৭০) সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৫ই জানুয়ারী, হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি কলিকাতার বিখ্যাত মৈত্রেয় পরিবারের সন্তান। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ছিলেন তাঁর পিতার খুল্লতাত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি ডিগ্রী লাভ করে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ, এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চাকুরী জীবনে প্রথমার্দ্ধে তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও সেন্ট্রাল গ্লাস সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের যথাক্রমে সহ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সংগঠনে ও উন্নয়নে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জার্মান ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা জানতেন। প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি 'ভাষা শিক্ষা' পরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করেছিলেন। আর্থিক অপ্রতুলতার মধ্যে যে সব অমূল্য গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার অনেক তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। বহু দরিদ্র ও দুস্থদের তিনি আর্থিক সাহায্য দিতেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি ছিলেন শিক্ষক ও পরীক্ষক এবং একজন উৎসাহী সদস্য। ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থার তিনি ছিলেন প্রথম কোষাধ্যক্ষ। সুদীর্ঘকাল চাকুরী জীবনে তাঁর অমায়িক ব্যবহার, নিরভিমান ব্যক্তিত্ব, ছাত্র ছাত্রী, অধ্যাপক, গবেষক, গ্রন্থাগারের কর্মী ও পাঠক সকলকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাই।

লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল—প্রখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁর ওয়েলস্ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বৎসর। গণিতবিদ এবং সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' বিজয়ী লর্ড রাসেল পারমাণবিক যুদ্ধ এবং বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামের জন্য বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

১৮৭২ সালের ১৮ই মে বেডফোর্ডের ডিউক পরিবারে আর্ল রাসেলের জন্ম হয়। তিনি ৪০ খানিরও বেশী পুস্তক রচনা করেছেন। প্রায় শতাব্দীকালের জীবদ্দশায় রাসেল একদিকে যেমন দর্শন, গণিত, ইতিহাসের বিভিন্ন বিভাগ পাণ্ডিত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ও জনশিক্ষার চিরায়ত বাতাবরণ সরিয়ে দিয়েছিলেন নতুন পথের নিশানা। 'বলশেভিকবাদ' এবং 'আউট লাইন অব ফিলসফি' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু কেবলমাত্র চিন্তাবিদ মনীষীই ছিলেন না রাসেল, তিনি ছিলেন আজন্ম বিপ্লবীও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর কণ্ঠে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় আর তার ফলে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কারাগারে বসেই তিনি তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা' লেখেন। ১৯০৮ সালে তিনি 'রয়াল হিউম্যান সোসাইটির ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বাঙলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রদেশের প্রত্যন্তভাগ থেকে সম্মিলিত হন বিভিন্ন গ্রন্থাগার দরদী ও কর্মী; সামাজিক জীবন যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা করতে। সামগ্রিক ভাবে জনমানসে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকট করে তুলতে এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, অন্যান্য দেশের তুলনায় তো বটেই, ভারতেরই অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশ থেকেও বিশৃঙ্খল। ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বাঙলা দেশ, আজও উন্নতির মাপকাঠিতে রয়েছে অনেক পশ্চাতে। এ এক চরম লজ্জার কথা! কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের কাল থেকে আজ পর্যন্ত বাঙলা দেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কীত আন্দোলনের প্রায় প্রত্যেকটিতেই মূল প্রস্তাব রাখা হয়েছে, বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন এবং সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা।

কিন্তু আজও সেই দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়নি পশ্চিমবঙ্গে, গড়ে ওঠেনি সরকারী পরিচালনাধীনে রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। বর্তমান সম্মেলনে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবী ছাড়াও, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারীগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারের গ্রন্থ চুরি বা হারানো সম্পর্কে আলোচনা হবে। সমস্যা সম্পর্কে সম্যকরূপে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিগণ এই সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন ও রেখেছেন নানা সুপারিশ। এই প্রবন্ধের ভিত্তিতে আরও আলোচনা হবে, আরও সুপারিশ আসবে তারপর সম্মেলন শেষে বিভিন্ন প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হবে। আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও পরিচালকবর্গ। এক মধুর সমাপ্তিতে আনন্দিত হবেন বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ, দরদী ও মরমী দর্শক। কিন্তু সম্মেলন পরিক্রমা করে দেখা যায় যে অধিকাংশ সম্মেলনেরই গৃহীত প্রস্তাবাদি কার্যকর করা হয়না। প্রস্তুতি চলে পরবর্তী সম্মেলনের, নেওয়া হয় নতুন প্রস্তাব। কিন্তু এই যদি সম্মেলনের ফলশ্রুতি হয় তবে সে সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে কতটুকু? প্রাথমিক চমক ও কাগজে প্রস্তাবাদি ক্রমান্বয়ে গ্রন্থাগার সচেতন জনসাধারণকে সম্মেলন সম্পর্কেই বীতরাগী করে তুলবে।

তাই বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আমাদের কেবলমাত্র সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ করলেই চলবে না, সেই প্রস্তাবকে কার্যকর করেও তুলতে হবে। এই সম্পর্কে দুটি দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এক, সম্মেলনে অযথা অসংখ্য প্রস্তাব

পাশ করে সম্মেলনের কার্যসূচীকে ভারাক্রান্ত না করা আর প্রত্যেক সম্মেলনে গত সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচীর কার্যে রূপায়নের সমীক্ষা। কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করলেই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, প্রস্তাব সমূহকে কার্যে রূপান্তরিত করা অবশ্য কর্তব্য আর সে দায়িত্ব সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী এবং অন্যান্য প্রত্যেকের। তাই সময় এসেছে আমাদের সমস্যাকে তুলে ধরে আশু এর সমাধানের দাবীকে সোচ্চার করে তোলার। জনগণতান্ত্রিক সরকারী শাসন ব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ জন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোক, এ নির্দেশ নিশ্চয়ই কোথাও নেই। তবু কেন এই অবহেলা? এক প্রয়োজনীয় সমাজ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু রূপে পরিচালনায় সরকারী ক্ষেত্রে কেন এই অনীহা? দেশে শিক্ষা প্রসারের ঢেউ উঠেছে কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের পথকে অপরিষ্কার রেখে তো মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না কোনদিনই। গ্রন্থাগার শিক্ষা বিস্তারের অনন্ত সোপান। এই প্রাথমিক স্তরকে উপেক্ষা করলে তো শিক্ষার মূল বনিয়াদই থাকবে কাঁচা, যার ফলে সার্বিক শিক্ষার কল্পসৌধ ধূলিস্যাৎ হবে অচিরেই।

দেশের মানুষকে আজ আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে গ্রন্থাগার কেবলমাত্র বিলাসী ব্যক্তিদের অবসর বিনোদনেরই স্থান নয়, উত্তর পুরুষকে আলোর পথ দেখিয়ে দেবার আলোক বর্তিকাও। গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রাঙ্গনে আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে এই সম্মেলনের প্রস্তাব কার্যকর করে তুলতে আমরা সক্রিয় হব। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে হাতিয়ার করে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সকলে সামিল হব। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের দায়িত্ব কেবল অন্যের উপর না চাপিয়ে সকলকেই অগ্রণী হতে হবে—না হলে এ অবস্থার মুক্তি নেই, এ সমস্যার সমাধান নেই। এই সম্মেলন তাই আমার আপনার সকলের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

Editorial.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১১ ১৩৭৬, ফাল্গুন

বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের সমস্যা

প্রবীর দে

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে সিউড়ী, বারহাট্টা ও উত্তরপাড়া সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে মুদালিয়র কমিশন রিপোর্ট (১৯৫২-৫৩), ভারত সরকার নিয়োজিত Library Advisory Committee রিপোর্ট (১৯৫৯), National Council of Educational Research and Training এর পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্যাটিস্টিকস বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট (Educational Facilities available in the Higher Secondary Schools of West Bengal, 1963 64) ও ভারত সরকার নিয়োজিত কোঠারী কমিশন (Education Commission, 1964 66) রিপোর্টে লিখিত সুপারিশগুলির কথাও আমরা বারংবার উল্লেখ করেছি। শিক্ষা সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এই সব কমিটি এবং কমিশন একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা বলতে গিয়ে সেই উন্নতির পথপ্রদর্শক, ধারক ও বাহক হিসাবে সর্বক্ষণের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগের কথা বলতেও এঁরা কুণ্ঠাবোধ করেননি। এঁদের আলোচনা থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থার যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় সেটাও অত্যন্ত দুঃখজনক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করে আসছে একথা সবাই জানেন। বারহাট্টা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ও তৎকালীন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতির সভাপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্নাবলীর সাহায্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা জানবার জন্যে একটি সমীক্ষার ব্যবস্থা করেন। সেই সমীক্ষায় যে চিত্র পাওয়া যায় সেটাকেও অত্যন্ত শোচনীয় বলা চলে। বারহাট্টা সম্মেলনে সেবিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কতকগুলি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সব প্রস্তাবের কোনটিই আজ পর্যন্ত কার্যকরী করা যায়নি।

গত বছর উত্তরপাড়ায় যে সম্মেলন হয়ে গেল সেখানেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর একটা সমীক্ষা করে সেই সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনের আলোচ্য প্রবন্ধ প্রস্তুত করা হয়। সেই প্রবন্ধ থেকে যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় তাতেও কোন উন্নতির লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিনের অবহেলিত এই সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ক্রমাগতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। আমরা কংগ্রেস আমল থেকে শুরু করে যুক্তফ্রন্ট আমলে কয়েকবার শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেছি এবং সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের সমস্যাবলী নানা ভাবে তাঁদের কর্ণগোচর ক'রবার চেষ্টা করেছি কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয়নি। আজ সমগ্র পশ্চিমবাংলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করে দেবার কথাও আমরা চিন্তা করছি। কালে কালে এই অষ্টম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্তও হয়ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। আমরা সর্বান্তঃকরণে শিক্ষার এই সুযোগ জনসাধারণের মধ্যে এনে দেবার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাচ্ছি। কিন্তু এই সাথে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে না, শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেই শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে না, শুধুমাত্র মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত বা তার চেয়েও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবৈতনিক করলেই শিক্ষা সম্প্রসারণের সমস্যার সমাধান হবে না। শিক্ষা সম্প্রসারণ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে হলে এই সব প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিপূরক গ্রন্থাগারের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অনতিবিলম্বে বিদ্যালয় থেকেই গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। সেইজন্য প্রয়োজনমত পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার করে নিতে হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কিছুদিন আগে এক sample survey করেছিল। সেই sample survey-র মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় খুব সামান্য কয়েকটা স্কুলে বর্তমানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থাও খুবই ভয়াবহ। এদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই আলাদা গ্রন্থাগার কক্ষ, গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা Budget, সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগের কথা ত দূরের কথা। যে কয়েকটা স্কুলে আলাদা গ্রন্থাগার কক্ষ আছে তাদের মধ্যে এমন গ্রন্থাগারও আছে যার ঘরের পরিমাপ ৭'×১২' ও পুস্তকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য বলে কিছু পাওয়া যায় না। এই প্রসংগে আরও বলা যায় যে এই তথ্যও পাওয়া গেছে যে মেদিনীপুর জেলার একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল গ্রন্থাগারের জন্য মাত্র ৬০ টাকার বই কিনেছেন এক বছরে। তা'ছাড়া বর্তমানে এক আধটি স্কুল ছাড়া অনেক স্কুল গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য নেই সর্বক্ষণের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক আর যে দু একটি স্কুলে বৃত্তিকুশলী

গ্রন্থাগারিক আছে তাদের সমযোগ্যতাসম্পন্ন স্কুল শিক্ষকের মত বেতন দেওয়াও হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Library hour ও নির্দিষ্ট করা নেই প্রায় সব জায়গাতেই। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যাকেও জাতীয় সমস্যারূপে চিন্তা করতে হবে। তাই আজ আমরা সমগ্র দেশবাসীর কাছে আমাদের ন্যূনতম দাবী পেশ করছি। সত্যিকারের শিক্ষার সম্প্রসারণ যদি জনসাধারণ চান তাহলে আমাদের এই দাবী আজ প্রত্যেককে মেনে নিতে হবে।

আমাদের দাবী

(ক) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবিলম্বে সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে স্বীকৃতির জন্য এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করা আশু প্রয়োজন।

(খ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার কক্ষ থাকা প্রয়োজন।

(গ) বিদ্যালয় বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা প্রয়োজন।

(ঘ) বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিবর্তে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার শিক্ষক দ্বারা স্বল্পক্ষণের জন্য পরিচালনা ব্যবস্থা অবিলম্বে বাতিল করা আশু প্রয়োজন, কারণ এর ফলে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

(ঙ) ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ড নির্দ্ধারনের প্রয়োজন আছে।

(চ) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পদমর্যাদার জন্য সুপারিশ অনুযায়ী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের মত বেতন ও মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন।

(ছ) গ্রন্থাগারিককে স্কুল Governing Body-র সদস্য করা প্রয়োজন।

Problems of School Libraries
: Prabir Dey

হাকিমপাড়ার—কিশোর গ্রন্থাগারের একটি যুগ

ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়

আজকের "কিশোর গ্রন্থাগারের" দিকে তাকিয়ে মনে পড়ছে সেই ১৩৬৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের সকালের কথা—পাড়ার কয়েকটি কিশোর এবং বাড়ীর একটি কিশোর এসে আমায় বললো, আমরা হাকিমপাড়ায় একটি গ্রন্থাগার করতে চাই, আপনাকে সাহায্য করতে হবে. আমি বল্লাম "এ খুব কঠিন কাজ, তোরা কি পারবি বাবা? বয়স ছোদের ১১।১২, বিদ্যায় কেউ ষষ্ঠ কেউ সপ্তম শ্রেণী, আচ্ছা এক কাজ কর্ কাল থেকে তোরা চাঁদা তোল্, দেখি কি করতে পারি।"

কিশোররা অনেক পরিশ্রম করে মাত্র ১০টি টাকা তুলে হতাশ হোল। কিন্তু এক মহৎ উদ্দেশ্যকে বিফল করা যায় না। চেষ্টা সুরু হলো। বাড়ী বাড়ী ঘুরে কিছু পুরোন বই সাহায্য পাওয়া গেল, আর সবেধন নীলমণি সেই ১০টি টাকায় চারআনা সিরিজের মনিষীদের জীবনী কেনা হোল। তারপর দেখা দিল ঘর সমস্যা। সহৃদয়া এক ঠাকুমা ৺শ্রীযুক্ত শশিকান্ত মজুমদার মহাশয়ের একখানি ঘর দিলেন। ঘর তো পেলাম, কিন্তু বই রাখা হবে কোথায়?

আমাদের নিজেদের হাতে গড়া মহিলা সর্ব্বোদয় সমিতি এককালে ভালভাবে চলে, পরে নানা সমস্যায় বন্ধ হয়ে যায়। তারই কিছু টাকা (১৫৭ টাঃ ।৶০) ও একটি আলমারী পড়েছিল, তাদের কাছে গিয়ে ঐ দানটী চেয়ে নিয়ে আসা হোল।

এরপর আরম্ভ হোল গ্রন্থাগার গড়ার নতুন পর্ব। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা বিখ্যাত সমাজসেবক ডাঃ শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়—অধুনা রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত (রাজবংশী অফ নর্থবেঙ্গল বই লিখে) উনি এসে গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করে আনন্দ করে বললেন, এই প্রতিষ্ঠান একদিন খুবই বড় হয়ে উঠবে। তাঁর সেই প্রার্থনা সত্যিই আজ সফল হয়েছে।

ছেলেরাই "কিশোর গ্রন্থাগার নাম" দিয়েছিল গ্রন্থাগারের। চাঁদা মাত্র ।০ আনা। প্রথম মাসেই সদস্য ২৫ জন হয়, তারপর বেড়ে বেড়ে ৬০।৭০ জনে দাঁড়ায়। এক বছর পরে দেখা গেল গ্রন্থাগারে কিছু টাকা পয়সা জমা হয়েছে, ঐ টাকায় বই কেনা যেতে পারে। কিন্তু আবার একটি আলমারী দরকার হবে। তখন ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে আবারও বেরুতে হোল। হাকিমপাড়ার শ্রীপবিত্র কুমার মুখার্জ্জি আমাদের দান করলেন তাঁর ৺পিতার নামে একটা আলমারী, ৩০ খানি বই ও কিছু টাকা।

গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ১৩৬৬ সালের বৈশাখ মাসে আমরা পাড়ার ভদ্রলোক ও মহিলাদের নিয়ে এক সভা ডাকি এবং তাঁদের সাহায্য চাই। তাঁরা সকলেই রাজী হোলেন। তার পরের সভায় একজিকিউটিভ সভা গঠিত হয়। ৪ জন কিশোর, ৪ জন

ভদ্রমহিলা এবং ৭ জন বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি নিয়ে। গ্রন্থাগার চালনায় কিশোরদের সঙ্গে বড়রাও এগিয়ে আসেন এবং এ কাজে বিনা বেতনেই চালিয়ে যাচ্ছেন সবাই।

জলপাইগুড়ির চা বাগান হতে সাহায্য পাবার ব্যবস্থা কমিটি ও পাড়ার ভদ্রমহোদয়গণ করেন, তাছাড়া পাড়ার আরও কয়েকজন সহৃদয়া মহিলা এগিয়ে আসেন নানা সাহায্য নিয়ে। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় সান্যাল মহাশয় আনুমানিক ১০০০ (এক হাজার) টাকার মত ইংরাজী বই দান করেছিলেন এই গ্রন্থাগারে। এইভাবে গ্রন্থাগারটী বেশ বড় হয়ে উঠে, নিজেদের টাকায় আলমারী ও ফার্ণিচারে ভরে উঠে, বইএর সংখ্যা প্রায় দুহাজারের কাছে দাঁড়ায়। ঘরে তখন জায়গার অভাব হয়ে উঠে, হাকিমপাড়ার বাসিন্দা শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমরা একখানি বড় ঘর সাহায্য পাই এবং ৫ বছর সেখানে থাকার পর, আবারও ঘর বদল করা হয়। বর্তমানে আমাদের গ্রন্থাগারটি, হাকিমপাড়ার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে প্রায় ৫ বছর বিনা ভাড়ায় আছে এবং তাঁরা তাঁদের ৺মায়ের নামে বছরে ৫০ টাকা কিশোরদের বইএর জন্য দান করে থাকেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ৺বাবার উদ্দেশ্যে ২৫ টাকা বছরে দান করে আসছেন। তাছাড়া চা বাগানে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। সরকারী সাহায্য সোস্যাল এডুকেশন অফিসার মারফত প্রতিবছর ১০০ টাকা পেয়ে থাকি। আমাদের গ্রন্থাগার স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগারের সদস্য। আমরা সৌজন্য সংখ্যা হিসাবে কয়েকটি পত্রিকা পেয়ে থাকি, যথা—"তথ্য পত্রিকা, Common wealth Today and American Reporter ইত্যাদি। গ্রন্থাগারে জন্মদিবস পালন করা ও মনিষীদের স্মরণে বা বিশেষ দিনে উৎসব করা হয়।

ইং ১৯৬৭তে (বাং ১৩৭৪ সালে) নেতাজী সুভাষের জন্মদিনে, কিশোর গ্রন্থাগার থেকে সিনেমায় চ্যারিটী শো করা হয়।

১৩৭৫ সালের প্রথম দিকে কার্যকরী সভায় আমরা ঠিক করি এবার গ্রন্থাগারের গৃহ সমস্যা মেটাতে, চেষ্টা করতে হবে।

এমনি আশা নিয়ে মনের আনন্দে চলছি আমরা, এমন সময় এল প্রলয় ধ্বংস নিয়ে ১৭ই আশ্বিন, ১৩৭৫ সালের বন্যা, তিস্তানদী যেন রাক্ষসীর ক্ষুধা নিয়ে দেখা দিল এবং নিমেষে শুষে নিল কিছু মানুষের প্রাণ আর মানুষের তিল তিল করে গড়া কোটী কোটী টাকার সম্পত্তি। আমাদের সেই সাধের গ্রন্থাগার—যাকে গড়তে সময় নিয়েছিল ১১ বছর, ১০টী টাকা হতে হাজার হাজার টাকা এসেছিল, সেই সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

কিশোর গ্রন্থাগার আবার খুলতে পারবো, আমরা কোনদিন এ আশা করিনি। মাননীয় সম্পাদক মহাশয় ও মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের চেষ্টায়, প্রাক্তন রাজ্যপাল ধর্ম্মবীরা মহাশয়ের, উত্তরবঙ্গে বন্যার ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির যে সাহায্য আসে ৫০ হাজার টাকার, সেই সাহায্য হতেই, কিশোর গ্রন্থাগার ২৮০০ শত টাকা পায়। গ্রন্থাগার খোলার জন্য এবারও মহিলারা এগিয়ে এলেন নতুন উদ্যম নিয়ে।

২।০ জন কিশোর ও ২।৪ জন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাহয্য আমরা গ্রন্থাগারের কাজ

শুরু করেছি। যদি বিভিন্ন জায়গার সাহায্য ও সহযোগিতা পাই, আমারও আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবো এই গ্রন্থাগার।

সভ্যতার যাত্রাপথে মানুষের তিনটি সঙ্গীর প্রয়োজন—মানুষ, প্রকৃতি ও গ্রন্থ। এদের মধ্যে এক হিসেবে পুস্তকই বোধকরি সবচেয়ে বড় সঙ্গী।

আশাকরি আমাদের কিশোর গ্রন্থাগার হাকিমপাড়ার মানুষদের শ্রেষ্ঠ সাথী হতে পারবে।

॥ বর্তমান কমিটির সদস্যগণ ॥

সর্বশ্রী ধরণীকান্ত মজুমদার (সভাপতি), বীরেন্দ্র প্রসাদ বসু (সহঃ সভাপতি), সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), প্রবোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ রায়, পূর্ণেন্দু পাল, অভয়কুমার মজুমদার, কল্যাণ মজুমদার, তরণীকান্ত চৌধুরী, শ্যামল প্রসাদ বসু, দেবাশীষ ঘোষ, সরযূবালা চক্রবর্তী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়।

"কিশোর গ্রন্থাগার গঠন করেছিল যারা"

সর্বশ্রী কল্যাণ মজুমদার, আশীষ মজুমদার, সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল বসু, বাবুয়া মুখার্জি, অনিল ভট্টাচার্য, পুলক চন্দ, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

Hakimpara Kishore Granthagar
: Indira Chattopadhyay

আলোচনা

একজন গ্রন্থাগারিকের কৈফিয়ৎ

ফণিভূষণ রায়

অগ্রহায়ণের গ্রন্থাগার পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কতকগুলি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন যে গ্রন্থাগারিক হিসাবে যে প্রতিষ্ঠা মর্যাদা ইত্যাদি আমরা দাবী করে থাকি তা কতদূর পর্যন্ত কী পরিমাণে যুক্তিসহ। মূলতঃ তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রথম, গ্রন্থাগারিকের কী ধরণের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়, সমাজের কাছে গ্রন্থাগারিকের সেবা কিরূপ এবং তা অপরিহার্য কিনা। তৃতীয়, গ্রন্থাগারিক কি রকম মর্যাদা আশা করেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা যে খুব বেশী কিছু দরকার হয় না তার স্বপক্ষে বলা হয়েছে ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মত তাঁদের দীর্ঘ দিন পড়তে হয় না এবং কোনও কোনও খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যতিরেকেও সুনামের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের কাজ করে গেছেন।

সাধারণভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমের দিকে তাকালে উপরের প্রথম বক্তব্যটিকে ঠিক বলে বোধ হতে পারে। কারণ পাঠ্যক্রম প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এক বছরের। তার ত্রুটি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির। কারণ তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঐ সময়ের মধ্যে যেটুকু শিখিয়ে ছেড়ে দেন সেইটুকু মাত্র সম্বল করে কোনও বৃত্তিধারীর পক্ষেই সব কাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সেইজন্য এই সদ্য পাশ করা বৃত্তিধারীদের কমপক্ষে বছর তিনেক ধরে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে হয় কাজের মধ্য দিয়ে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরের মধ্যে ছাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেও বছর চারেকের আগে কারো পক্ষেই গ্রন্থাগারের কাজে সবদিক দিয়ে যোগ্য হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। অথচ চার বছর বাদেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছরের ছাপটাই জ্বল জ্বল করতে থাকে, বাকি কয়েক বছরের পরিশ্রমের কথা কারোই চোখে পড়ে না। আমার কথা যে সত্য তা কোনও প্রথম কর্মপ্রার্থীকে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে। তাকে একটি সম্পূর্ণ কাজের ভার দিলেও তাইই জানা যাবে।

এও একজনকে সাধারণ ভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত এবং কর্মপটু করার কাহিনী মাত্র। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা ঐখানেই নিশ্চয়ই থেমে যায় না। কারণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত অল্পদিনে গড়ে ওঠা বিষয় হলেও তা' তীব্র গতিতে বেড়ে চলেছে। তার সবটুকুকেই শুধু টেক্‌নিকাল কচ্‌কচি বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ যে কোনও বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য তার সাহায্যে কোনও প্রার্থিত কাজকে সহজে সম্পন্ন করা। সেই কাজে নানারকমের নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্ট হয় বলেই সেই বিজ্ঞানে নিয়মিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন ঘটে। কাজেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নানা ধরণের

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য তার সাহায্যকে আরও কর্মসহায়ক করে তোলা। সেইজন্য এই বিজ্ঞানের আলোচনা, প্রয়োগ, নতুন আলোচনা, নতুন প্রয়োগ সবই আবশ্যিক, তা অপ্রয়োজনীয় নয়।

প্রশ্ন উঠবে তার সাহায্য ছাড়াও তো অনেক গ্রন্থাগারের কার্য সুসম্পন্ন হয়। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মোটামুটি কাজ মোটামুটি জ্ঞানের সাহায্যে নিশ্চয়ই করা যায়। কিন্তু সেটা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অসারতার বা গ্রন্থাগারিকের অপ্রয়োজনীয়তার প্রমাণ নয়। তা যদি হোত তবে টোটকা ওষুধ সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিরর্থক প্রমাণ করে দিতে পারতো, সমস্ত চিকিৎসককেই সমাজের অপ্রয়োজনীয় জীব বলে ঘোষণা করতে পারতো।

উপরের উপমাকে শুধু উপমা বলে না ধরে আর একটু তলিয়ে ভাবা যায়। টোটকা শাস্ত্রের বা স্বল্পজ্ঞানীর দুর্বলতার প্রমাণ তখনই পাই যখন তাকে নূতন বা কোনও জটিল অসুখের সম্মুখে উপায়হীন দেখি। বহুদিনের জানাশোনা ব্যাধির ক্ষেত্রে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতেও পারে, কিন্তু জটিলতা দেখা দিলেই চিকিৎসাবিজ্ঞান তার কাজে এগিয়ে আসে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্বল্পশিক্ষিত গ্রন্থাগারিকেরাও তাই সেই সব গ্রন্থাগারই চালাতে পারবেন যার ব্যাধি দীর্ঘদিনের রুটিনের ছকে কম বেশী নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। দাবীদারদের চাহিদার রূপও যেখানে দীর্ঘদিনের মধ্য দিয়ে কমবেশী স্থিরীকৃত। কিন্তু যেখানে তথ্য বা তত্ত্বের পরিবেশিত রূপ বা দাবীদারদের দাবী নিত্য নূতন চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে সেখানে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের সম্যক জ্ঞান না থাকলে কোনও কিছুই কাজে আসবে না। আসল নাবিকের পরিচয় কোথায়, নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্রে জাহাজ চালানোর, না তরঙ্গ সঙ্কুল অবস্থায় তীরে উত্তীর্ণ করে দেওয়ায়?

কিন্তু যে সব গ্রন্থাগারে গ্রন্থের ভিতর ও বাহিরের রূপ অর্থাৎ বিষয় ও আকার প্রায় নিত্য পরিবর্তনশীল এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদাও তাই, সেখানে নিজেকে উপযুক্ত করে রাখতে হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আরও গভীর ভাবে নিজেকে মগ্ন রাখতে হয়। প্রকৃত পক্ষে এই স্থানেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রকৃত সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায়, সমাধানের পথও। এই স্থানই গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীর গবেষণার শ্রেষ্ঠ স্থান। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীর প্রকৃত সামাজিক ভূমিকাও এই পটভূমিকায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীর সামাজিক ভূমিকাকে পরিমাপ করবার জন্য অতি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করা হয়েছে যে গ্রন্থাগারিক সমাজের পক্ষে অপরিহার্য কি না। এর উত্তর প্রতিপ্রশ্ন তুলে করা যায় চিকিৎসকই (বর্তমান কালের সংজ্ঞামত) বা সমাজের পক্ষে অপরিহার্য কি সে, যদি অনেক অনুন্নত দেশে চিকিৎসকবিহীন অনেক অংশ টিকে থাকতে পারে? উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, সুকুমার শিল্পেও তো এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের জীবনে সানন্দে পরিহার-যোগ্য তাহলে? বস্তুতঃ সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে অপরিহার্য কেউই নন কারণ কারোর জন্যই কালের বিবর্তন আটকে থাকেনি। সকলেই সমস্যাসঙ্কুল জীবনকে

কিছুটা সমস্যামুক্ত করবার মধ্য দিয়ে জীবনকে আরও সুন্দর সুসহ করবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে সামগ্রিক জীবনস্রোতের এক এক জায়গায় দেখা দিয়েছেন মাত্র।

সমাজে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর প্রাদুর্ভাবও একইভাবে ঘটেছে। গ্রন্থ যখন শ্রুতি ক্ষমতা বা স্মৃতিশক্তিকে অতিক্রম করে বাহ্যিক রূপ পেতে থাকলো এবং তার সংখ্যাও এক বা একাধিক পণ্ডিতের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে লাগলো, তখনই পণ্ডিতদের প্রয়োজনীয় এই পুঁথি-পত্রের হদিস রাখবার জন্য গ্রন্থাগার বিদ্যায় পারদর্শী এক ভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিতদের দেখা পাওয়া যেতে থাকলো। এ কাজ গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই সবচেয়ে ভালো করতে পারবেন এই আশায় পণ্ডিতদের কেউ কেউ অন্য বিদ্যার সঙ্গেই এই কাজটিও আয়ত্ত করতে থাকলেন। বোধহয় প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির সর্বত্রই প্রথম যুগে এই পণ্ডিত-গ্রন্থাগারিকদেরই দেখা মিলবে।

বিষয়, আকার, সংখ্যা ইত্যাদি সবদিক দিয়েই গ্রন্থজগতের সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলতে থাকলো এবং একই সঙ্গে দুই মনিবকে সন্তুষ্ট রাখা সম্ভবপর নয় বলে উত্তরকালে উচ্চস্তরের পণ্ডিতেরা নিজেদের জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত রেখে তাঁদের তত্ত্বাবধানে নিম্নস্তরের পণ্ডিতদের একাজে নিযুক্ত করে কাজ চালাতে থাকেন। গ্রন্থজগতের সমস্যা আরো অনেক বেড়ে গেছে প্রথম যুগের সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে চালানো জগৎ আজ বিশেষ জ্ঞানের দাবী করছে, কিন্তু সেই বিশেষ জ্ঞানকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে সমাজের জ্ঞানজগতের রক্ষণশীল অংশ আজও অনিচ্ছুক।

অবশ্য এ অনিচ্ছার প্রকাশ সোজাপথে এবং বাঁকাপথে উভয় পথেই হয়। কোনও বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক অবসর গ্রহণ করায় একজন খ্যাতনামা কবিকে গ্রন্থাগারিক করা হয় তাতে কি গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান উপকৃত হয়েছে না তাঁর খ্যাতিকে অপহরণ করে অন্য কাজে লাগানো হয়েছে? নিয়োগকারীদের কথাবার্তায় কি তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই?

এ ধরণের চিন্তার আরোও নজির মেলে কোনও বিশেষ বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারিকের পদে রেখে তাঁর নীচের প্রয়োজনীয় পদে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীদের রেখে কাজ চালিয়ে নেওয়ায়। এইভাবে কর্মী নিয়োগে গ্রন্থাগারের আকর্ষণ বাড়ে কি না জানিনা, কর্মনৈপুণ্য বাড়তেই পারে না। কারণ কোনও সংগঠনের প্রধানের ভূমিকা তো শুধু বাইরের লোকের শ্রদ্ধা বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়। তাঁর আবশ্যিক কর্তব্য হবে সংগঠনকে উন্নততর নিপুণতর অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতৃত্ব দেওয়া। যিনি নিজে যে বিষয়ে অজ্ঞ সে বিষয়ে তিনি এই অতি প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দেবেন কীভাবে? বর্তমান জগতে গ্রন্থাগার কারোও ব্যক্তিগত প্রতিভায় গড়ে ওঠেও না, বাড়েও না। তার সেবার ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সাংগঠনিক উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে। উত্তরোত্তর এই সাংগঠনিক উৎকর্ষের বৃদ্ধি করাই যে কোনও গ্রন্থাগারিকের প্রাথমিক কর্তব্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে কিম্বা তার প্রাথমিক জ্ঞানমাত্রকে সম্বল করে এ কর্তব্য সুসম্পন্ন

কর্ম নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের যা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা সে তো এই নৈপুণ্যকে নিপুণতর করার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য। কাজেই এ বিজ্ঞানের নতুন চিন্তার যিনি অংশীদার নন নতুন পথের ইঙ্গিত তিনি কি ভাবে দেবেন ?

তবুও এই ধরণের কাজ কেন ঘটে তার সমর্থনে একটিমাত্র যুক্তি থাকে যে একজন জ্ঞানসন্ধানী আর একজন জ্ঞানান্বেষীর সমস্যা উপযুক্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বুঝতে পারবেন। না হলে, একজন জ্ঞানী তো সব বিষয়ে জ্ঞানী হতেই পারেন না। কিন্তু এ সম্পর্কিত যাচাই তো কোনও গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠার পটভূমিকায়ও করা যেতে পারে। করা যে হয় না এবং সমগ্র গ্রন্থাগারবিজ্ঞানকে শ্রেণী বিভাগ বা তালিকা প্রণয়নের সমস্যা মাত্র বলে অবজ্ঞার সঙ্গে ভাবা হয় তারও অন্য সামাজিক কারণ আছে।

সমাজের ইতিহাসে সেটাও কিছু নতুন ব্যাপার নয়। জ্ঞানরাজ্যের সবগুলি বিষয়কেই বোধহয় সমকালীন পণ্ডিতদের উন্নাসিক উপেক্ষাকে জয় করে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছে। Alchemyর অবজ্ঞাত অবস্থা থেকে Chemistry হিসাবে সম্মানিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কি বিনা দ্বন্দ্বে সম্ভব হয়েছিল ? প্রযুক্তিবিদ্যার অনেকগুলিকেই কি Occupation থেকে Profession-এ উঠতে হয়নি ? কালের বিচারে সমকালীন অনেকের মতামত শেষ কথা নয় ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। জ্ঞানী-গুণীরাও এ বিষয়ে ভুল করেন এইটাই ঐতিহাসিক সত্য।

আর একটি কথা একটু রূঢ় শোনালেও বিচারের সময় যে কোন বিচার্য বিষয়কেই সব দিক দেখা উচিত বলেই উল্লেখ করছি। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি যতদিন কমবেশী অবহেলিত ছিল ততদিন এই 'পণ্ডিত বা গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী' প্রশ্নটি এত বড় হ'য়ে দেখা দেয়নি। এ প্রশ্ন বিশেষ করে আলোচিত হতে সুরু হয়েছে যখন অন্য ক্ষেত্রে "স্বীকৃত" জ্ঞানীদের প্রাপ্য উচ্চপদের সংখ্যা প্রার্থীদের তুলনায় সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে এবং অপরদিকে বাঙ্গালোরের এক গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের সাধকের সারাজীবনের চেষ্টায় কতকগুলি উচ্চধরণের পদ গ্রন্থাগারিকদের লভ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজেই আদর্শের চেয়ে অর্থনীতির দ্বন্দ্বই বোধহয় এ ক্ষেত্রে প্রকট ! দ্বন্দ্ব শুধু উপরের পদগুলির জন্যই, নীচের জন্য নয়।

এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ের জ্ঞানীদের মতৈক্য থাকলেও তার গুরুত্ব দেওয়া দুরূহ। কারণ, এক, নতুন বিষয়কে স্বীকৃতি দেওয়ায় রক্ষণশীল চিন্তাধারার স্বাভাবিক অনিচ্ছা। দুই, অর্থনীতির প্রচ্ছন্ন প্রেরণা। এর সমর্থনে বলা যায় যে কোনও "স্বীকৃত" বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে সাহিত্যের জ্ঞানী নিশ্চয়ই অনধিকার প্রবেশ করতে সাহস করবেন না। অপরপক্ষে বিজ্ঞানের জ্ঞানীও সাহিত্যের বিশেষ ক্ষেত্রকে সমীহ করেই চলবেন। না হ'লে সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা। কিন্তু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে যদি গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ছাড়া অপর যে কোনও বিষয়ে পণ্ডিত হ'লে চলে তবে ওঁদের সকলের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা কোথায় ? তাই বিচার করতে হলে সকল দিক ভেবে সুবিচার হওয়াই কাম্য।

অবশ্য এ কথা হাজার বার মানতেই হবে যে পরিপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি পেতে, প্রতিষ্ঠা পেতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের অনলসভাবে মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে রচনাবলীর মধ্য দিয়ে নিজেদের বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। সে কাজ আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও হচ্ছে। বাঙ্গালোরের একজন বৃদ্ধ জ্ঞান সাধক এখনও এ বিষয়ে নেতৃত্ব করছেন এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় কি? এ বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট সাধনা এখনও জোয়ারের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি তার কিছুটা দোষ আমাদের নিজেদের মধ্যে সত্য কিন্তু অনেকটাই পরিবেশের প্রতিকূলতার মধ্যেও। প্রয়োজন হলে এই প্রতিকূলতাকে বিশ্লেষণ করে সহজেই তা দেখানো যায়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের মর্যাদার প্রশ্নটি এই সামাজিক চাহিদা পূরণ ও তার জন্য নিজেদের গড়ে তোলায় মস্তিষ্কের শ্রম ও তার প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মোটমাপের দিকটা পাঠকের সুস্পষ্ট প্রকাশিত চাহিদা মেটানোয় লাগে। এই দিকটার দিকে তাকিয়ে গ্রন্থাগারিককে একজন বিশেষ ধরণের বিক্রয় ব্যবসায়ী বলে মনে হ'তেও পারে। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আর একটা দিক আছে যেখানে গ্রন্থাগারিক সমাজের সম্ভাব্য বিকাশের পথটিকে উপলব্ধি করে সমাজের চিন্তাশীল অংশের যাত্রাপথের সহগামীর কাজ করেন। আগেই বক্তব্য পেশ করেছি যে এর জন্য তাঁকে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে তাঁর কাজই এ শিক্ষার দাবী করবে। তবে এ শিক্ষা বিশেষ করে তাঁর বিজ্ঞানের শিক্ষা বা তাঁর বিষয়ের দিক থেকে অন্য বিষয়গুলিকে দেখার শিক্ষা। পাণ্ডিত্যে তাঁকে উপযুক্ত হয়ে উঠতেই হবে যদি তিনি সমাজের এই জ্ঞানসন্ধানী অংশের উপযুক্ত সরিক হয়ে উঠতে চান। নিজের বিষয় পরিত্যাগ করে অপর বিষয়ে পণ্ডিত হবার দুর্বলতা কোনও কাজের নয়। এরজন্য সমকালীন মূল্যায়নও শেষ কথা নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মত, সুরেশ সমাজপতির মত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভুল করেছিলেন এ ঘটনা খুব বেশী পুরানো দিনের ইতিহাস নয়। কাজেই এক বিষয়ের লোকেরাই যদি নিজেদের বিচারে এত সহজেই ভুল করেন, তবে ভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞের মতামতকে যে কোনও বিষয়ের লোকের পক্ষে গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো।

এ বিজ্ঞানে বিশেষ কিছু জানবার নেই একথাও যদি কেউ বলেন তবে তাঁকেও সবিনয়ে উপেক্ষা করতেই হবে। হোমিওপ্যাথ আর এলোপ্যাথরা পরস্পর পরস্পরকে নস্যাৎ করেন এতো দৈনন্দিন ঘটনাই তাতে কারোও কিছুই যায় আসে কি? দুদলই তো নিজেদের বৈজ্ঞানিক বলে দাবী করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসেই কিছুদিন আগেও চণ্ডীদাস সমস্যা নিয়ে একজন অধ্যাপক আর একজনকে প্রায় ধরাশায়ী করে ছেড়েছেন। কাজেই কোনও পণ্ডিতই যখন শেষকথা বলবার মত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নন তখন নিজেদের লক্ষ্য, নিষ্ঠা ঠিক থাকলে অপর বিষয়ে পণ্ডিতদের মতামতে আমাদের বিচলিত হবার কারণ নেই।

আমি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে যে চোখে দেখি তার বক্তব্যকে একটু সুন্দরভাবে বলবার

জন্ত রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হচ্ছি। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে কবিতাটি লিখেছিলেন আমার অর্থে আমি চুরি করেই চালাচ্ছি। আমার জ্ঞানান্বেষণে যাত্রী বন্ধুদের তাই বলবো—

দূর মন্দিরে সিন্ধু কিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি
আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি।

হে তীর্থগামী তব সাধনার
অংশ কিছু বা রহিল আমার

পথ পাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধ ধূপে।

কাজেই তীর্থপথে তত্ত্ব বা তথ্য অনুসন্ধানের কাজে যদি কারো সহায়তায় সময় বা শ্রম বেঁচে থাকে তবে সকলের পক্ষেই তা স্বীকার করাই ভালো। নিজেই সব কিছু খুঁজে নিয়ে কাজ করা আর খোঁজার কাজে অপরের সাহায্য নিয়ে নিজে নতুন তত্ত্বের অনুসন্ধান করা দুয়ের ভিতর প্রভেদ কি খুবই সামান্ত? অবশ্য ভুক্তভোগীরাই এর সঠিক জবাব দিতে পারবেন।

বোধহয় গ্রন্থাগারিকের এই অনুসন্ধানী সরিক এর রূপটাই সঠিক রূপ। অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য এবং তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই যে কোনও বিষয়ে অগ্রগমন সম্ভব, তার গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। কাজেই এই কাজের যিনি মূল সহায়ক তাঁর যোগ্যতা ও মর্যাদা কি একেবারেই অবজ্ঞা করার মত হওয়া ঠিক? গ্রন্থাগারের রূপ ও তার ব্যবহারের পটভূমিকায়, গ্রন্থাগারিকের এই রূপটি সর্বত্র সুপ্রকাশিত হয় না। তাও খুবই স্বাভাবিক। তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে ছাড়া অন্যত্র সুনাবিকের আসল চেহারার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। গঙ্গার নিস্তরঙ্গ অবস্থায় একজন জাহাজ পরিচালকের কাজকে অলস আরামের কাজ বলে মনে হতেই পারে।

সমাজ যে এখনও এ মর্যাদা দেয় না বা দিতে ইচ্ছুক নয়, তার কারণও কিছু দুজ্ঞে'র নয়। সমাজের এই স্বীকৃতি বা মর্যাদা দান সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বদলিয়ে থাকেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও পরের সমাজ কি একই শ্রেণীকে একই ভাবে মর্যাদা দিয়ে চলেছে? মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করলে অনেক নজিরই চোখে পড়বে যখন সামাজিক স্বীকৃতি পেতে এক একটী বিষয়কে এবং সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিন পরিশ্রম করতে হয়েছে, অপেক্ষা করতে হয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও তো তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের তাই এই মর্যাদা অনলস শ্রম দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়েই অর্জন করতে হবে। অন্ত পথ নাই।

An Apology of a Librarian : Phanibhusan Roy

পরিষদ কথা

সুশীল কুমার ঘোষ স্মারকী বক্তৃতা

গত ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী পরিষদ ভবনে পরিষদের প্রথম সম্পাদক স্বর্গত সুশীল কুমার ঘোষ স্মরণে এক বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসুর দুদিনব্যাপী তথ্যবহুল কালানুক্রমিক ভাষণের পর সর্বশ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায় প্রভৃতি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাটিকে আরও ঘটনায় সম্মিলিত করে তথ্যবহুল করতে অনুরোধ করেন। শ্রীফণিভূষণ রায় তথ্যগুলি কালানুসারে সাজিয়ে অবিলম্বে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় তাঁর ভাষণে বলেন যে ইতিহাসের সঠিক সাল তারিখের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইতিহাসটি প্রচারের জন্য মুদ্রিত হোক। সাল তারিখের অপেক্ষা গ্রন্থাগার আন্দোলন কি ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, গ্রন্থাগারের প্রভাবই বা সমাজে কি ভাবে বিস্তৃত ইত্যাদির বিস্তৃত আলোচনাই বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থাগার বিদ্যাকে অতিরিক্ত টেকনিক্যাল ও বিজ্ঞান আশ্রয় না করে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের মত কাজে লাগান উচিত। বিদেশের ধার করা বিদ্যাকে সেই দেশের মতন করে এখানে চালু না করে, আমাদের দেশের মত করে তাকে পরিবর্তিত করে ব্যবহার করা দরকার। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগারকে প্রয়োজনীয় করে তুলতে যেন আমরা চেষ্টা করি। এই সঙ্গে তিনি বারংবার স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিনা বেতনে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে, গ্রন্থাগার আইন করলেও, আইনের আসল উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দাবীর পূর্বে আমাদের দাবী করতে হবে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে পড়ার সুযোগ না পেয়ে, পড়তে ভুলে যায়। তাই তাদের শিক্ষাকে সার্থক করতে প্রয়োজন গ্রন্থাগার। এ কারণ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করতে গ্রন্থাগারের চাহিদা সৃষ্টি হলে, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন অনেক সহজ হবে। সভার শেষে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের গণঅবস্থানের সমর্থনে

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষকরা গত ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবার দাবিতে

বিধানসভার সমানে গণ-অবস্থানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল অবস্থানরত প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষা আন্দোলনে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকার প্রতি অকুণ্ঠ অভিনন্দ জানান। এই প্রসংগে পরিষদ প্রতিটি জেলার সদস্য ও প্রগতিশীল, শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের কাছে এই আবেদন করছে যে, জেলায় জেলায় শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য যুক্ত সংগ্রাম কমিটি যে কর্মসূচী গ্রহণ করবে তাকে সফল করে তুলবেন।

শিক্ষামন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎকার

গত ১৩।২।৭০ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল তাঁদের সাক্ষাৎকারে কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য UGC বেতনক্রমের সরকারী আদেশ প্রেরণের বিলম্বের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী একজন অন্যতম সহ-শিক্ষাসচিবকে এ বিষয়ে ত্বরান্বিত হবার নির্দেশ দেন। এরপর প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবশ্যিক পূর্ণাংগ গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যাপারে অবিলম্বে সরকারী নীতির ঘোষণার ও কর্মসূচী গ্রহণের অনুরোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিকদের জন্য এখন পর্যন্ত ১৯৬১ সালের বেতন কমিশন সুপারিশযুক্ত বেতনক্রম চালু করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বীরভূম জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগে আলোচনা

পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল ১৭।২।৭০ তারিখে বীরভূম জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগে বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়, শিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত সংগ্রাম কমিটির কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ, আসন্ন ২৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ও বীরভূম জেলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করেন। জেলার উপস্থিত গ্রন্থাগার কর্মীরা সমস্ত বক্তব্য আগ্রহের সংগে শোনেন এবং উপরোক্ত বিষয়ে সক্রিয় সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতিবেদক : তুষারকান্তি সান্ন্যাল

Association Notes

বার্তা-বিচিত্রা ঃ গ্রন্থকার ঃ গ্রন্থ

বিশ্বভারতীর এবারকার সমাবর্তন উৎসবে প্রবীন কবি কালিদাস রায়কে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

* * *

বাংলা ভাষায় এ বছরের সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করেছে মণীন্দ্র রায়ের কাব্যগ্রন্থ 'মোহিনী আড়াল।' ইংরাজী ভাষায় 'অ্যান আর্টিষ্ট ইন লাইফ' গ্রন্থের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়।

* * *

সুবিখ্যাত উর্দু কবি স্বর্গত মকদুম মহীউদ্দিন এ বছরের সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার লাভ করেছেন। শান্তি ও মৈত্রীর প্রতীক মহীউদ্দিনের অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থগুলির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। চারটি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন বাংলা দেশের কবি বিষ্ণু দে, হিন্দী সাহিত্যিক ইয়াস পাল, কেরালার ভিলোপিল্লীল শ্রীধারা মেনন, মহারাষ্ট্রের ভিন্দা কারাণধিকার।

* * *

ইউনোস্কো থেকে নব্য সাক্ষরদের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সতেরটি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ডঃ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ রচিত "বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা" পুরস্কৃত হয়েছে। ডঃ গুহের আর একটি গ্রন্থ 'আকাশ ও পৃথিবী' ১৯৬৪ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছে।

* * *

ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক হিন্দী ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশ করবেন স্থির করেছেন। এইসব গ্রন্থ প্রকাশের জন্য লেখকদের একটি নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তার মধ্যে সবশ্রী বি. ভি. রাঘবেন্দ্র রাও, এস বসিরুদ্দীন, পি. এন. কাউলা, এ. পি. শ্রীবাস্তব প্রভৃতি আছেন।

* * *

উত্তর প্রদেশের সরকার এক সমবায় গ্রন্থ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছেন। ১০ লাখ টাকায় ক্রীত গ্রন্থ দিয়ে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাঙ্ক, ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক ও অন্যান্য মূল্যবান পুস্তক মাত্র এক টাকা চাঁদার বিনিময়ে এক বছরের জন্য ধার দেবে।

* * *

আমেরিকার জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় পকেট কোষগ্রন্থ প্রকাশ করবেন। প্রায় ৯০০০ হাজার পৃষ্ঠাকে ২"×২" ইঞ্চি ফিল্ম কার্ডে রূপান্তরিত করে পৃথিবীর বিখ্যাত

কোষগ্রন্থগুলি ক্ষুদ্র কারা করা হবে। মাইক্রোফিল্মের সাহায্যে ক্ষুদ্রাকৃতি কোষগ্রন্থগুলি কারিগরী কৌশলে জ্ঞান বিস্তারের সর্বাধুনিক পদ্ধতি।

* * *

ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ শীঘ্রই একাধিক খণ্ডে ভারতীয় বিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশ করবেন। এই উদ্দেশ্যে শতাধিক প্রাচ্য বিদ্যা পরিষদ থেকে সংস্কৃত, বাংলা, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় রচিত পুঁথি সংগ্রহ করা হচ্ছে। মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কীত ১৫,০০০ তথ্য ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে।

সঙ্কলয়িত্রী : গীতা মিত্র

Notes & News

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে বিশেষ বক্তৃতা

লিভারপুলের সিটি লাইব্রেরিয়ান ডঃ জর্জ চ্যানৃডলার আগামী ১০ই এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন, পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪) 'গ্রেটব্রিটেনের সাধারণ গ্রন্থাগার' সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। ডঃ চ্যানৃডলার গ্রন্থাগার সম্পর্কীত ৮ খণ্ডে প্রণীত গ্রন্থ ব্যতীত বহু পত্র পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি মিউনিসিপ্যাল ও কাউন্টি চীফ্ লাইব্রেরিয়ান সোসাইটির সভাপতি, শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, লিভারপুল স্কুল অব লাইব্রেরিয়ানশীপের অ্যাডভাইসরি কমিটির সভাপতি প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

এই বক্তৃতা সভায় গ্রন্থাগারানুরাগী প্রত্যেকের উপস্থিতি আন্তরিক ভাবে কাম্য।

—সম্পাদক।

সম্পাদকীয়

বর্তমান সম্মেলন ও তার বৈশিষ্ট্য

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বড় আন্দুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, আগামী ২৭শে—২৯শে মার্চ। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন শ্রীজীবানন্দ সাহা। এবারকার সম্মেলন অন্যান্যবারের তুলনায় নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ অন্যান্যবার সম্মেলনে সাধারনতঃ একটি প্রধান প্রবন্ধ নিয়েই আলোচনা হয় কখনও বা সঙ্গে দু একটি আংশিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনার অবতারনা করা হয়। কিন্তু এবারে সমপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ চারটি প্রবন্ধ নিয়েই আলোচনা হবে। সমস্যা ও গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কোন প্রবন্ধই ন্যূন নহে। এজন্য সম্মেলনের স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বিশেষ চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই চিন্তা সাপেক্ষ। সম্মেলনের সভাপতিকেও তাই গুরুতর দায়িত্ব বহন করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী বক্তাগণকে বারবার সময়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর কার্যে রূপায়ণ। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সক্রিয়তাও বেড়েছে অনেক। তাই দায়িত্বও এসেছে প্রভুত পরিমাণে। সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, কারীগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ভ্রাম্যমান গ্রন্থযান ও গ্রন্থাগারে বই হারান প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই পরিষদের দায়িত্ব শেষ হবে না সঙ্গে সঙ্গে এই সুপারিশ সমূহ কার্যে রূপায়ণের দায়িত্বও পরিষদের উপরই বর্তাবে। এর জন্য পরিষদের আন্দোলনের ধারা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান যুগের সাথে তাল মিশিয়ে চলতে তাকে আরও সক্রিয় ভুমিকা পালন করতে হবে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাই নয়, প্রয়োজনে প্রথম সারির আন্দোলনও গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থাগারিকেরা আজ আর তাঁদের ন্যায্য দাবী আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠতে সঙ্কুচিত হন না। তাদের সমগোত্রীয় শিক্ষক মহাশয়রা যখন দৃঢ়পায়ে তাদের দাবীর কথা সমস্যার কথা বলতে পেরেছেন তবে গ্রন্থাগার কর্মীরাই বা পিছিয়ে পড়বেন কেন? এবং এই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছেও কয়েকবার।

বর্তমান সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই সম্মেলন শুরু হবে। অনিশ্চিত থাকবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক মূল আন্দোলনের রূপও; পশ্চিমবঙ্গে 'গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন'। রাজ্যের দৈনন্দিন কাজকর্মের

প্রয়োজনীয় বাজেট যেখানে পাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, সেখানে গ্রন্থাগার আইন পাশ করা যে সহজসাধ্য নয় তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমান সম্মেলন বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। খুবই গর্বের কথা আগামী-সম্মেলন হবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী সম্মেলন। অভিজ্ঞতার ভারে এই আগামী সম্মেলন পরিচয় দেবে এক নতুন দিগন্তের। আগামী সম্মেলনের রূপ ও কার্যক্রমের আভাষ পাওয়া যাবে এই চতুর্বিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলনে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে সম্মেলনের মূল কাঠামোই হয়তো পরিবর্তিত হবে কিংবা নিয়ে আসবে কোন নতুন ডাকের ইশারা। বাঙলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই সম্মেলন অধিকার করবে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আর সেই অনাগত সম্মেলনের শিলান্যাস হবে বর্তমান সম্মেলনেই।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ও বৈশিষ্ট্যে চতুর্বিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলন তাই বিশেষ তাৎপর্যময়। এই সম্মেলনের সাফল্য তাই আমাদের প্রত্যেকেরই কাম্য।

This Conference and its Characteristics—Editorial.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১২ } { ১৩৭৬, চৈত্র

সার্বদশমিক বর্গীকরণ

বিমলকান্তি সেন

U.D.C. বা Universal Decimal Classification এর বাংলা কোন প্রতিশব্দ আমার চোখে পড়েনি। তাই উপরোক্ত প্রতিশব্দ। শব্দটি কতটা সার্থক হল তার বিচার করবেন সহৃদয় পাঠকবৃন্দ।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ নিয়ে আলোচনা গ্রন্থাগারের পাতায় বড় একটা দেখিনি। আর তাছাড়া এই বর্গীকরণ পদ্ধতি বাংলাদেশে খুব একটা প্রচলিতও নয়। তাই এই পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকদের সম্যক পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনা কেবলমাত্র আলোচ্য পদ্ধতির ব্যবহারিক দিক দিয়ে, তত্ত্বগত দিক দিয়ে নয়।

এই পদ্ধতির ব্যবহারিক দিক দিয়ে আলোচনা British Standards Institution কর্তৃক প্রকাশিত Guide to Universal Decimal Classification ; Philips, Mills, Sayers প্রভৃতি লেখকদের বইয়ে থাকতেও আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা কেন, এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগতে পারে। উত্তরে সবিনয়ে জানাতে চাই যে আলোচ্য পদ্ধতির সাহায্যে বর্গীকরণ করতে করতে অনেক সময় এমন সব সমস্যার উদ্ভব হয় যে গুলির সদুত্তর উপরোক্ত বইগুলো তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেও পাওয়া যায় না। আর তাছাড়া নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে উপরোক্ত বইগুলোতে যা দেওয়া আছে তা এই পদ্ধতিকে যথাযথভাবে জানবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের মতই সার্বদশমিক বর্গীকরণের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে সংখ্যাকে নির্ভর করে। এর কারণ হল, ডিউই দশমিক বর্গীকরণের (৫ম সংস্করণ) ভিতকে নিয়েই Paul Otlet এবং Henri La Fontain বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে গড়ে তুলেছেন সার্বদশমিক বর্গীকরণের ইমারৎ। তাই উপরোক্ত উভয় পদ্ধতিরই প্রথম

তিন অংক অব্দি উপবিভাগ আজও প্রায় অভিন্নই রয়ে গেছে। উপরোক্ত পদ্ধতি দুটোতে মিল যেমন, তফাৎও তেমনি। ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে যেখানে তিন অংকের কম কোন বর্গসংখ্যার কল্পনাই করা যায় না, সেখানে সার্বদশমিক বর্গীকরণে একটি সংখ্যাই বর্গসংখ্যা হতে পারে। যেমন ডিউই দশমিক বর্গীকরণে 500 হচ্ছে বিজ্ঞান, সার্বদশমিক বর্গীকরণে শুধু 5 হচ্ছে বিজ্ঞান। আবার ডিউই দশমিক বর্গীকরণে কেবলমাত্র প্রথম তিনটি অংকের পরে একটি বিন্দু বসে, সার্বদশমিক বর্গীকরণে কিন্তু প্রায় প্রতিটি সাধারণ বর্গসংখ্যার বেলায় প্রতি তিনটি অংকের পর একটি করে বিন্দু বসে। যেমন 616. 921.5 (ইনফ্লুয়েঞ্জা)।

মানবসভ্যতা এগিয়ে চলার সাথে সাথে একদিকে জ্ঞানের পরিধি যেমন বেড়েছে, অন্যদিকে জ্ঞানের অভিব্যক্তিও হয়ে উঠেছে তেমনি বহুদিশারী এবং জটিল। জ্ঞানের এই জটিল অভিব্যক্তির মোকাবিলা করবার জন্য সার্বদশমিক বর্গীকরণে সাহায্য নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু অতিরিক্ত চিহ্নের। যেগুলো ডিউইতে অনুপস্থিত। সার্বদশমিক বর্গীকরণকে জানতে হলে এই চিহ্নগুলোর যথাযথ ব্যবহার জানা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

+ (যোগচিহ্ন)

আলোচ্য বর্গীকরণে ব্যবহৃত চিহ্নের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় '+' বা যোগ চিহ্নের কথা। একাধিক বিষয়বস্তুসম্পন্ন প্রকাশন বর্গীকরণ করার সময় এই চিহ্নটির প্রয়োজন পড়ে। যেমন F.D. Powerয়ের Pocketbook for Miners and Metallurgists বইটির বর্গসংখ্যা হয় 622+669 [622=Minings ; 669=Metallurgy]. অনুরূপভাবে Kent এবং Lancour সংকলিত Encyclopaedia of Library and Information Scienceয়ের বর্গসংখ্যা হবে 02+002(03) ; Hans Rauয়ের Dictionary of Nuclear Physics and Nuclear Chemistryর বর্গসংখ্যা হবে 539·1+541·28(038). যখনই বর্গসংখ্যায় '+' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তখনই দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্গসংখ্যাটি থেকে ক্যাটালগে আরও এক বা একাধিক সংলেখ see reference হিসাবে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। যেমন উপরোক্ত প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বইটির মুখ্য সংলেখ ফাইল হবে যথাক্রমে 622+669 ; 02+002(03) এবং 539·1+541 28(038)য়ে আর see reference থাকবে যথাক্রমে 669 ; 02(03), 002(03) ; 539·1(038), 541·28(038) থেকে। এর মস্তবড় সুবিধা এই যে পাঠক যেদিক থেকেই বইগুলোর খোঁজ করুন না কেন, সেদিক থেকেই তিনি বইগুলোর সন্ধান পেয়ে যাবেন। তাঁর নজর এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

কোন প্রকাশনে যখন একাধিক বিষয় স্থান পায়, তখন সমস্যা দেখা দেয় বর্গীকরণে কোন বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তা নিয়ে। এ স্থির করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রথমেই ভাবতে হবে পাঠকের কথা। উপরোক্ত Powerয়ের বইখানির কথাই ধরা যাক। Tisco গ্রন্থাগারে বইটি বর্গীকরণ করার সময় বলাই বাহুল্য Metallurgyকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ সেখানকার বেশীর ভাগ পাঠকের বিষয়ই হচ্ছে ঐ। কিন্তু ঐ একই বই যখন Central Mining Research Stationয়ের গ্রন্থাগারে বর্গীকৃত হবে, তখন সেখানে Metallurgyর বদলে Miningকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এখানেও সেই পাঠকের বিচার।

এই বইটি যখন কোন সাধারণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারে কিংবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কিংবা এমন কোন গ্রন্থাগারে বর্গীকৃত হবে যেখানে Mining এবং Metallurgy দু'দিক থেকেই বইটির চাহিদা সমান সেখানে কিন্তু দেখতে হবে কোন বিষয়ের উপর বইটিতে জোর দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু এমনও অনেক বইপত্র আছে, যেখানে কোন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বইয়ের প্রথম দিকে আছে, তাকেই প্রথমে এবং পরের বিষয়ের স্থান বর্গসংখ্যায় পরে দিতে হবে। অথবা তালিকার (schedule) অনুক্রমে যে বিষয়টি আগে আসছে, সেটিকে আগে দিয়ে, যে বিষয়টি পরে আসছে সেটি পরে দিতে হবে।

বর্গীকরণিকের হাতে অনেক সময় এমন সব বই আসে যে বইকে সূক্ষ্মভাবে বর্গীকরণ করলে বর্গসংখ্যা অসাধারণভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়ে। L.R.M Ghoseয়ের Rice in India বইটির কথাই ধরা যাক। বইটির প্রথম অংশে রয়েছে ধানের ইতিহাস; ধানের উপযোগী জলবায়ু, জমি ও সেচব্যবস্থা; ধানের রোগ; ধান বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ; ধানের উদ্ভিদতত্ত্ব; প্রজননতত্ত্ব ইত্যাদি। বইটির দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ধানের জোগান, চাহিদা, দাম, শ্রেণীকরণ, সংরক্ষণ, বণ্টন, প্রভৃতির আলোচনা। এবং তৃতীয় অংশে রয়েছে চাল উৎপাদনের বিভিন্ন উপায়, ধানের খাদ্যমূল্য ইত্যাদির আলোচনা। এতগুলো বিষয়ের প্রত্যেকটির বর্গসংখ্যা যদি বইয়ের বর্গসংখ্যায় স্থান পায়, তবে বর্গসংখ্যাটি যে কত বড় হবে, একথা সহজেই অনুমান করা চলে। এরূপ ক্ষেত্রে যে বর্গসংখ্যায় বইটিকে রাখলে বেশীর ভাগ পাঠকের সুবিধা হবে, বইটিকে সেই বর্গসংখ্যায় রেখে বর্গসংখ্যার পরে পরে শুধু '+' চিহ্নটি বসিয়ে দিতে হবে। যেমন উপরোক্ত বইটির বর্গসংখ্যা হবে 633·18+ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো থেকে see reference দিতে হবে।

১৯৫২ সালে F.I.D. কর্তৃপক্ষ সার্বদশমিক বর্গীকরণে '+' চিহ্ন ব্যবহারের পরিবর্তে প্রকাশনের অন্তর্গত বিবিধ বিষয়কে এক একটি আলাদা প্রকাশন হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। সোজা কথায় বইয়ের অন্তর্গত যে বিষয়টি গ্রন্থাগারে অগ্রাধিকার পাচ্ছে, বইটির সেইটি হবে বর্গসংখ্যা। অন্যান্য বর্গসংখ্যাগুলি থেকে see reference দিতে হবে এবং মুখ্য বর্গসংখ্যার নীচে লিখতে হবে, যেমন Gunter Richterয়ের Dictionary

of Optics, photography and photogrammetry এর বর্গসংখ্যা নিম্নোক্ত উপায়ে লিখতে হবে।

535(038) Gun

Additional entries : 77(038)

528·7(038)

কি কারণে F.I.D. এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা সহজেই অনুমেয়। একটি বইয়ের অন্তর্গত একাধিক বিষয়কে '+' দিয়ে জুড়ে দিলেও বিষয় অনুযায়ী বইটিকে আলাদা আলাদা ভাবে একাধিক জায়গায় কোনমতেই রাখা সম্ভবপর নয়। একটি বই কেবলমাত্র একটি জায়গাতেই রাখা সম্ভব। তাই বইয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের বর্গসংখ্যা '+' দিয়ে জুড়ে বইয়ের বর্গসংখ্যাকে অযথা দীর্ঘ করে কী লাভ! যে বর্গসংখ্যাতে বইটিকে রাখলে পাঠকের সুবিধা সব চাইতে বেশী, বইটিতে সেই বর্গসংখ্যা বসিয়ে, অন্যান্য বর্গসংখ্যা থেকে ক্যাটালগে see reference দিলেই সব ঝামেলা চুকে যায়।

F.I.D.র এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সার্বদশমিক বর্গীকরণের ব্যবহারকারীদের ক'জন কর্ণপাত করেছেন সেটা ভাববার বিষয়। কারণ সোভিয়েৎ দেশের প্রত্যেকটি প্রকাশনেই যে সার্বদশমিক বর্গসংখ্যা দেওয়া থাকে, তার থেকে দেখা যায় যে সেখানে '+'য়ের ব্যবহার বর্জিত হয় নি। বিশ্বের বেশ কিছু সারপত্রেও (উদা:—Abstracts of Photographic Science and Engineering Literature ; Referationery Zhurnal ইত্যাদি) সার্বদশনিক বর্গীকরণের ব্যবহার আছে। সে গুলোতেও '+'য়ের ব্যবহার অব্যাহত। বিশ্বের প্রতিটি দেশের জাতীয় মান সংস্থাও (National Standards Institution) তাদের প্রকাশন সার্বদশমিক বর্গীকরণের সাহায্যে বর্গীকৃত করেন। সেই সংস্থাগুলোরও অনেকগুলি (উদা: Indian Standards Institution ; British Standards Institution ; Nederlands Normalisatic-Instituent ইত্যাদি) আজও দ্বিধাহীন-ভাবে '+' চিহ্ন ব্যবহার করে চলেছেন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন? '+' চিহ্নে এমন কি আছে, যার বলে FIDর নির্দেশকে উপেক্ষা করে '+' চিহ্ন আজও সার্বদশমিক কর্গীকরণে টিকে আছে। '+' চিহ্নের ব্যবহারে বর্গসংখ্যা অনেক সময় বেশ কিছুটা দীর্ঘ হয়ে পড়ে সত্য, কিন্তু '+' চিহ্নের উপযোগিতাও কম নয়। বিশেষ করে মুদ্রিত প্রকাশনে। একাধিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন একটি প্রকাশনের বর্গসংখ্যা '+' দিয়ে জুড়ে দিলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক লাইনেই ধরে যায়। কিন্তু FIDর নির্দেশ অনুযায়ী বর্গসংখ্যাগুলিকে একটির নীচে আর একটি লিখলে একাধিক লাইন লেগে যাবে। যার জন্য ছাপার জায়গা লাগবে অনেকটা।

'+' চিহ্ন ব্যবহারের আরও একটি সুবিধা আছে। একটি ভূতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাগারের কথা ভাবা যাক, যে গ্রন্থাগারে ভূতত্ত্ব বিষয়ক, ভূগোল বিষয়ক এবং ভূতত্ত্ব ও ভূগোল বিষয়ক পত্রপত্রিকা আসে। ক্যাটালগের বর্গীকৃত অংশে শেষোক্তশ্রেণীর সাময়িকপত্রগুলোর সংলেখ যদি 55+91য়ে স্থান পায় এবং 91 থেকে 55+91য়ে একটি see reference

দেওয়া হয়, তবে যিনি ভূগোলের সাময়িকপত্র খুঁজছেন, তাকে শুধু 91 এবং 55+91য়ের সংলেখ দেখে নিলেই চলবে। আর + চিহ্নের ব্যবহার না করে 55+91য়ের কার্ডগুলি যদি 55য়েই রাখা হয়, এবং 91 থেকে 55য়ের see reference দেওয়া হয়, তাহলে সন্ধানকারীকে ভূগোলের সাময়িকপত্র খুঁজে বার করার জন্য 55য়ের সমস্ত সংলেখগুলি দেখতে হবে, যার জন্য অনেক বেশী সময় লাগবে।

এ সব উপযোগিতার জন্যই '+' চিহ্ন সার্বদশমিক বর্গীকরণে আজও টিকে আছে এবং আমার বিশ্বাস থাকবেও।

'+' চিহ্নের ব্যবহারে একটি সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেই এই চিহ্নটির আলোচনা শেষ করবো। বইয়ের নামে and শব্দটি অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন Norman Kaplanয়ের Science and Society ; Richard L. Meirয়ের Science and Economic Development ; M, S. Thackerয়ের Science and Culture ; James A. McCamyর Science and Public Administration প্রভৃতি নামগুলো সহজেই বর্গকরণিককে '+' চিহ্ন ব্যবহারে প্রলুব্ধ করতে পারে। বইগুলোর পাতা কয়েকের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেই দেখা যাবে যে বইগুলোতে সমাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, জনশাসন প্রভৃতির উপর বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সব বই বর্গীকরণের বেলায় '+'য়ের পরিবর্তে : (কোলন) চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। যা নিয়ে আলোচনা পরে হবে।

অনেক সময় একাধিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন বইয়ের বর্গীকরণে '+' চিহ্নের আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। যেমন 215 ধর্ম এবং বিজ্ঞান ; 669.1 লৌহ এবং ইস্পাত ; 63 কৃষি, পশুপালন, গব্যবিদ্যা, বনবিদ্যা ইত্যাদি। কাজেই প্রত্যেকটি বইপত্র বর্গীকরণ করার বেলায় তালিকায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

Universal Decimal Classification (1)—Bimal Kanti Sen

বইতরণী

বৈদেহ

সাম্প্রতিক কালে গ্রন্থাগার কর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা জানিনা, তবে একদিক থেকে মনে হয় পূর্বতন স্বর্ণদিনেরই অবসান ঘটেছে। কথাটা শুনে হয়ত আপনারা হাসবেন কি কাঁদবেন।- স্বর্ণদিনের অবসান কি মশাই? সে তো সবেমাত্র আসব আসব করছে। তা হয়ত হবে। তবে ভেবে দেখুন, কিছুকাল পূর্বে যখন গ্রন্থাগার বলতে দেশে তেমন কিছু প্রায় ছিলই না, মুষ্টিমেয় গুটিকতক সরকারী বেসরকারী গ্রন্থ গৃহই ছিল দেশটার যা কিছু পুঁজিপাট্টা, তখন সেই গ্রন্থ সঞ্চয়গুলির কী জৌলুষ আর রবরবাই না ছিল। রাজা মহারাজাই বলুন আর বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতদের কথাই ধরুন, কী অপরিসীম যত্নেই না তাঁরা বইগুলি, রাখতেন, পড়তেন, পড়বার সুবন্দোবস্ত করতেন। (বিদ্যেসাগর মশায়ের কথাই বিবেচনা করুন, পড়বার নাম শুনলেই হুম করে টাকা ঢেলে দিতেন। বহু খরচা করে নিজের বইগুলি বাঁধাতেন। সেই গল্পও আপনারা জানেন, এক বাবু দামী শালটাল গায়ে দিয়ে এসে তাঁকে বলেছিলেন—খামকা এত পয়সা দণ্ড দিয়ে বইগুলি বাঁধাবার কী প্রয়োজন যখন সাদামাটা ভাবে রাখলেই কাজ চলে। শুনে তিনি বলেন—একখানা চাদরে চটি জুতোতেই যখন বেঁচেবর্তে বহাল তবিয়তে থাকা চলে তখন খামকা অত দামী শালটাল জুতো জামা পরার বেহিসেবী খরচারই বা কোন প্রয়োজন।)

আজকাল আপনারা সে জাতীয় পুস্তক সঞ্চয় গড়ে তুলতে পারবেন না। অর্থে সামর্থে কুলোলেও সময়ে মেজাজে কুলোবে না। এখন রেক্সিন-টেক্সিন পাঁচটা চটকদার মালমশলা চালু হয়েছে, চোখ ভোলানো পলকা পুঁথির প্রকাশন দেখা যাচ্ছে আকছার। একেলে অট্টালিকার সরল সারিবদ্ধ গড়নের মতো, সৈন্য সমাবেশের অনড় বূ্যহবদ্ধতার মতো, বস্ত্রবাস চর্চিত-বদন কেতাদুরস্ত ভদ্রতার মতো কেতাবের বাজারও যেন কুচকাওয়াজে নেমে পড়েছে। সেই রাজকীয় সমারোহ নেই, নেই সেই রাজসিক মমতা। তাই সেই সকল গুণীদের গ্রন্থ সংগ্রহ ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যের মতো, মহান ঐতিহ্যের মতো কেবলমাত্র দেশজোড়া বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে 'বিশিষ্ট সঞ্চয়'—অর্থাৎ special collection হিসেবে রেখেই আমরা কৃতার্থ হই। ভেবে দেখুন সেকালের সব বাঘা বাঘা গ্রন্থদরদী গ্রন্থাগার কর্মীদের কথা। শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল, হরিনাথ দে। বিদেশের কথা আমি ধরছি না, কেননা সেখানকার মানচিত্রটাই অন্য রকমের। এতদ্দেশে গ্রন্থাগারগুলি বেঁচেবর্তে ছিল কিছু পরিমাণ সাধারণ ও অসাধারণের চেষ্টায়। তাঁরা কেউ গবেষণা করেছেন, কেউ বা নানাবিধ ভাষা রপ্ত করেছেন, নানান বই লিখেছেন। গ্রন্থাগারিক হিসেবে। একেবারে হাল আমলের প্রভাত মুখুজ্জে পর্যন্ত।

তবু তাঁদের মর্যাদাতেও গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা বাড়েনি। আপনি হয়ত আবার চক্ষু কুঞ্চিত করে বলবেন, সেকি মশাই, মর্যাদার তো সবে শুরু, সেকালে উক্ত

কর্মের মানমর্যাদার প্রশ্নটাই অবান্তর ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তলিয়ে ঘুরে দেখুন একবার। আজকাল আপনারা কিনা কথায় কথায় 'শ্রমের মর্যাদা'—অর্থাৎ dignity of labour নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, কিন্তু সেকালের রথী-মহারথীরা গ্রন্থাগার কর্মে লিপ্ত থাকতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। আজকাল মর্যাদার লড়াইটা প্রায় ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কাঞ্চন মর্যাদা। বিদেশে বৃত্তিগত বা সামাজিক যে সম্মান এঁরা পেয়ে থাকেন তজ্জন্যই আপনারা হাহুতাশ করতে পারেন। সেখানে এঁরা যে কেবলমাত্র বেতনে উচ্চপর্যায়ের এবং বৃত্তিতে উচ্চমানের ব্যক্তি বলে গণ্য হন তাই নয়, সমাজেও এঁরা মান্যগণ্য ব্যক্তি। আমদেশে সরকারী চাকুরে বা ডাকসাইটে উকিল ডাক্তার না হলে আপনার চারিত্রিক কুশলতা বা নির্মলতা স্বীকৃত হয় না। মন্ত্রী-টন্ত্রী সদস্য-টদস্য হবেন তবে তো দু'কথা বলবার হক জন্মাবে,—'সব দীনতা মলিনতা' ধুয়ে যাবে। গ্রন্থাগারিক তো কোন ছার। শিক্ষকদের সমতুল হবার তো প্রশ্নই ওঠে না, কেরানির গৌরবও জুটবার কথা নয়। ইস্কুল-কলেজ বা সাধারণ গ্রন্থাগারাধ্যক্ষের কথা তো বলাই বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়াদির গ্রন্থাগারিকদেরও খুব বেশি একটা কৃতিত্ব আছে বলে কি হর্তাকর্তারা মনে করেন? আপনি কোনো চাকুরি প্রার্থীর চারিত্রিক অভিজ্ঞানপত্র দিলে বোধকরি সেটিরও প্রামাণিকতার সাফাই বা attestation প্রয়োজন হবে। নইলে গ্রাহ্য হবে না। অথচ কর্তারা ওদিকে রায় দিয়ে খালাস, গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষক অধ্যাপকের মতো মর্যাদা দিতে হবে। হবে তো, কিন্তু মানছে কে। গ্রন্থাগার নাকি আবার শিক্ষা বিভাগের সমতুল। এমন কথা কে কবে শুনেছে! আরে বাপু বই থাকলেই যদি শিক্ষাকেন্দ্র হয় তাহলে তো সব কটা বইএর দোকানই তাবড় তাবড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান! পুস্তক বিক্রেতারাই শিক্ষক! শিক্ষা বিভাগের যাঁরা হোমরা-চোমরা, অধ্যাপক-টধ্যাপক, তাঁরা গ্রন্থাগার কর্মীদের তাঁদের সমান আসন দিতে যেমন গররাজি, পরিচালনার দাপ্তরিক মাতব্বরেরাও এঁদের তুল্যমূল্য আসনে বসাতে তেমনি নারাজ। এই টানা পোড়েনের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো চাকরির চুটকিটুকুর সদাশঙ্কিত অবলম্বনে আপনি কায়ক্লেশে আন্দোলিত, বিভ্রান্ত। ওসব দেশে নাকি নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকায় গ্রন্থাগারিকও অন্যতম। সাধারণ গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ কেউ-কেটা নন—বিশেষ কেউ। তাঁর বাক্য আপ্তবাক্য, মতামত অগ্রগণ্য।

কিন্তু আপনার মতামত বলতে কিছু থাকা আর না থাকা সমান। সাধারণ গ্রন্থাগার হলে আপনার উপরে,—শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মে স্মর্তব্য ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষের মতোই,—ঊর্ধ্বতন সরকারী পুরুষোত্তমদের প্রত্যাদেশের জন্য হত্যে দিতে হয়। ইস্কুল-কলেজ বা এবম্বিধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি করে উপদেশক বা উপনির্দেশক চক্র থাকে। সেই চক্রীরা আপনার প্রয়োজনের পরোয়া করেন না। আপনি উপস্থাপক মাত্র। তাঁরা স্থপতি। এবং আপনি—যাকে বলে—হাড়ে হাড়েই জানেন, আমদেশে গ্রন্থপরদ কোন পথে ধাবিত, কোন চিন্তায় বিকৃত। কোনো গ্রন্থভবনের ভিত্তিস্থাপন বা দ্বারোদ্ঘাটনে এসে প্রধান অতিথিরা শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির প্রসারে গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট স্থান এবং অবদান সম্পর্কে

'আলামরী' ভাষণ দিয়ে যাবেন। গ্রন্থাগারসেবাই যে প্রকৃত দেশসেবার কাজ সেই ধ্রুব বাণীর উদার স্বীকৃতি ধ্বনিত হবে। কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজনের সময় আপনাকে মদত দিতে কেউ নেই কর্মক্ষেত্রে আপনি একা, নিরর্থ, অসহায়। আপনার প্রয়োজন বলতে আপনি যে নিজের কোলে ঝোল টানবার চেষ্টা করবেন, নিজের সুবিধে-অসুবিধের কথাই শুধু এক কাহন বলবেন সেটা তো জানা কথাই। ঘরের খেয়ে কেউ কি খামকা বনের মোষ তাড়ায়? নিশ্চয় কোনো অভিসন্ধি আছে। সুতরাং ওদিকে নজর দিতে গেলে চলে না। আপনার কাজ বইগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা, ছিঁড়ে-খুঁড়ে হারিয়ে-টারিয়ে না যায় সেটা দেখা, আর চাহিদা মতো এনে হাতে তুলে দেওয়া। একাজের জন্য আবার অত বায়নাক্কা কিসের। আপনি যে কোনো ধরণের গ্রন্থাগারেই কাজ ক'রে থাকুন না কেন, হেন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছেন নিঃসন্দেহ যাঁরা হামেশাই বলেন,—ঐতো বর্গীকরণের যে ছক কাটা আছে তাই থেকে নম্বর বসিয়ে দেওয়া আর কতকগুলো কার্ড লেখা, এইটুকু ব্যাপার। মাছি মারা নকল নবিশী। এ নাকি আবার 'বিজ্ঞান'। এর মধ্যে কঠিনটা কী বাপু! বিশেষজ্ঞ-ফিশেষজ্ঞ সব শুধু কথার কথা। বই বাছাই করার জন্য তো শিক্ষক আছেন, অধ্যাপক আছেন, আছেন সরকারী শিরবর্তীরা, বেসরকারী শির্ষীবৃন্দ। তাঁরাই বাৎলে দেবেন ছেলেমেয়েরা কী পড়বে না পড়বে, সাধারণ ব্যক্তিদের কী পড়া উচিত অনুচিত। আপনার মাথার সেজন্য কোনো ব্যথাই থাকার কথা নয়।

আজকাল আবার গণতন্ত্রের যুগ। জনগণ সর্ববিষয়ে কুশলী। সর্বকর্মে বিশারদ। তারা যেমন তামাম মুলুকের যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য ক'রে থাকে তেমনি সর্ববিদ্যা বিশারদ,—সব বিষয়েই কথা বলবার উপদেশ দেবারও হকদার। কী শিল্প সংগীত, কী শিক্ষা কৃষি অর্থনীতি রাজনীতি সব ব্যাপারেই তারা ওয়াকিবহাল, এবং সমঝদার। সুতরাং গ্রন্থাগার সম্পর্কে দুকথা বলবে সে তো অতি সহজ কাজ। দুরূহ সব তত্ত্বেই যখন মাথা গলাতে পারে তখন লাইব্রেরি কোন ছার। আপনাকে এঁরা জনে জনে এসে বলে যাবে গ্রন্থাগার কিভাবে চলা উচিত, চালানো উচিত, কোন বিভাগে কোন কাজ হওয়া সঙ্গত, কিভাবে বইপত্তর আলমারি টেবিল সব সাজানো উচিত। এমনকি কর্মীদের কাজের পদ্ধতি, তদুপরি কর্মী নিয়োগ প্রকরণও বাৎলে দিয়ে যাবে। আপনি তো জানেনই জনগণের সেবার কাজে আপনি লিপ্ত এবং গ্রন্থাগারে আগত প্রতিটি পড়ুয়াই আপনার প্রভু। সুতরাং আপনার আর বলবার কী আছে। ধরুণ না রেল বিভাগের কথা। রেল কর্মীরাও তো যাত্রীসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাত-পাঁচ ভেবে চলেন। কিন্তু জনগণ ভেবে চলেনা। নালিশ জমা হলে 'অভিযোগ বহি' খুঁজে দেখেনা, 'মুষ্টিযোগ' প্রয়োগ করে। রেল কামরাগুলিকে তারা জনগণের সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য করে এবং নির্দ্বিধায় আত্মসাৎ করে। অথবা অবরোধ, অগ্নি-সংযোগ। গ্রন্থাগারেও আপনার সেই হাল হতে আর আর দেরি নেই। বইগুলিকে জনগণ তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ধরলেও আপনার করবার কিছু নেই। হেন গ্রন্থাগার কি এতদ্দেশে আছে যেখানে পত্রকর্তন

কাজটার মধ্যে যে কিছুমাত্র বৃত্তিগত কুশলতার বালাই থাকতে পারে তা কেউ মনে করেন না। ফলে আপনারাও নিরুপায় আপ্যায়নে যোগবিষ্ট ডালটির গোড়া স্বহস্তে কর্তন করেন।

এহ বাহ্য। গ্রন্থাগারে কাজ করেন, সুতরাং পড়াশোনা ক'রে সময়টা কাটিয়ে দেবার নিঃসন্দেহ সুযোগ আপনি পেয়ে থাকেন নিশ্চয়। বই আপনার জীবন-নদী পারাপারের উত্তম তরণী।—'বেশ কাজ মশাই, টেবিলে বসে বইপত্তর নাড়াচাড়া করে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া।' আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যিনি এবম্বিধ বয়ান কর্মান্বেষী প্রমুখাৎ শোনেন নি—'লেখাপড়া করতে ভালবাসি, তাই গ্রন্থাগারে একটা চাকরি পেলে বড় ভাল হয়, নিরিবিলি একটু পড়তে-টড়তে পারি।' এঁরা স্বর্ণমৃগান্বেষী হলে কর্মসূত্রে আপনি নিশ্চয় টের পাচ্ছেন কেন বলছিলাম সে স্বর্ণযুগ আর নেই। সেকালে নির্দিষ্ট পরিধি ও পরিবেশের মধ্যে থেকে গ্রন্থাধ্যক্ষরা কত ভাষা চর্চা করেছেন, সংকলনাদি প্রস্তুত করেছেন, গ্রন্থরচনা করেছেন। যদিচ চাকরির সূত্রে বিদ্যার্জন চিন্তা আকাশকুসুমবৎ, এবং যদিচ একথা সত্য যে উৎসাহীর কখনো সময় বা সুযোগের অভাব হয় না, তবু গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা হাতের কাছে মেলে নিঃসন্দেহ। কিন্তু আজকাল গ্রন্থাগার যে কেবলমাত্র আকৃতিতে বেড়েছে প্রকৃতিতে বিচিত্র হয়েছে তাই নয়, আপনার চিত্ত মন্ত্রীমহল থেকে সুরু করে যেরাও দখল পর্যন্ত নানান চিন্তায় বিভ্রান্ত। অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত বুঝিবা এমন দাঁড়ায় যে গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য সর্ব বিষয়ে—সকল দিকে লক্ষ্য রাখাই হবে আপনার করণীয়। আধুনিক গ্রন্থাগারিকের নাকি শুধু ভাল 'মাথা' থাকলেই চলেনা, তৎপর 'পা' থাকাও প্রয়োজন। মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে পদ চালনাও সমান তালে রাখতে হয়। না, পলায়নের জন্যই নয়,—সারা গ্রন্থাগারে চরকির মতো ঘুরে বেড়াতে হয়, উপর-তলা নিচ-তলা করতে হয়, এক পায়ে খাড়া থেকে তদারকি করতে হয়, এবং এমন কি উপর-মহলে হাঁটাহাঁটি করতে হয়,—যে কর্মটি সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, এবং বিদ্যালয়াদির বেলাতেও প্রযোজ্য। শুধু পা কেন, কব্জির জোরও প্রয়োজন। না, হাতাহাতির জন্যই নয়, হাতেনাতে কাজের জন্য। বইপত্তর ওঠাতে নামাতে টানাটানি করতে হিমসিম। ধুলো ঝাড়তে না পারলে ধুলোয় লোটাতে হবে আপনাকে। সবই করবেন, সর্বাঙ্গ দিয়ে করবেন, শুধু পেটের প্রসঙ্গ তুলবেন না। পেট আছে ভুলে যাবেন। ভুলে যাবেন আপনারও ঘর-সংসার আছে। ঐ সঙ্গে মাথা যে আছে সেটাও ভুলে থাকতে পারলেই মঙ্গল।

Book-vossel : 'Baideha'

গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত কাজ ও তার স্তরবিভাগ

জয়ন্তী রায়

কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারিকদের কাছে "কার্য্যসমীক্ষা" একটা বিরাট সমস্যার রূপ নিয়েছে। যদি (১) কাজের মাত্রা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা থাকে এবং তার স্পষ্ট শ্রেণী বিভাগ করা থাকে, (২) কর্মী ও তাঁদের কাজের কার্য্যকরণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে কর্মীদেরও ঠিক একইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা থাকে, (৩) কাজের মান নির্দ্ধারণ এবং কোন বিশেষ ধরণের কাজ করতে গেলে ঠিক কতটা সময় দেওয়ার প্রয়োজন তারও সঠিক মাপ নির্দ্ধারণ করা থাকে, (৪) কোন কাজ করার জন্য একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতাকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মাংশে ভাগ করা থাকে, (৫) প্রত্যেক কর্ম্মাংশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কাজ করার সঠিক সময় নির্ভুলভাবে হিসাব করা সম্ভব হওয়া প্রয়োজন হয়। একটী সংস্থার কাজের মান ও যোগ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে এই "কার্য্যসমীক্ষা" অপরিহার্য্য হবে—একথা অনস্বীকার্য্য কিন্তু তা কতকগুলি সর্ত্তসাপেক্ষ। তা হলো—

কার্য্য বিশ্লেষণের পুর্ব্বসর্ত—

যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করার সময় সেই কাজের ধারাবাহিকতাকে তার প্রয়োজনীয় elements এ ভাগ করা যায় কিন্তু যেখানে প্রায় সমগ্র কার্য্য পদ্ধতিটি আংশিক ভাবে শ্রমসাধ্য (manual) এবং আংশিক ভাবে বুদ্ধি নির্ভর (intellectual) সেক্ষেত্রে পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মাপ নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এর ফলে, কাজের 'মান নির্দ্ধারণ' অথবা 'কার্য্য সমীক্ষা' কার্য্য সময়ের সঠিক সীমা নির্দ্ধারণ করতে না পারলেও কাজটি কিভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে তার নির্দ্দেশনা দেয়।

কাজ ও কর্ম্মীর বিশ্লেষণ এবং শ্রেণী বিভাগ—

কাজের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ যে কর্ম্মী করবেন তাঁরও শ্রেণী বিভাগ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। তাঁর কাছ থেকে বেশী কাজ পেতে হলে কোন দায়ীত্ব পালনের জন্য তাঁর কতটুকু যোগ্যতা আছে তারই উপর নির্ভর করে তাঁর কাজের মান নির্দ্ধারণ উচিত। যে কাজ করার জন্য কোন বিশেষ ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন সে ধরণের কাজ যে ব্যক্তির সেই বিষয়ের ট্রেনিং নেই তাঁকে দিয়ে করানো উচিৎ নয়। "প্রত্যক্ষ পরিচয়" এবং "অভিজ্ঞতা"—এই দুটিকে এক পর্য্যায়ে ফেলা উচিৎ নয়। কোন কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে একদিকে যেমন শ্রমিকদের অপরদিকে তেমন শ্রমেরও সঠিক বিশ্লেষণ ও শ্রেণীভাগ করার প্রয়োজন। অন্যথায় ভুল বিশ্লেষণ উভয় ক্ষেত্রেই বিপদ্‌জনক।

কিন্তু এই আলোচনা আমরা শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের কার্য্য বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই—কারণ এ পর্য্যন্ত এই সমস্যার প্রতি ঠিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি।

গ্রন্থাগার কর্মীদের শ্রেণী বিভাগ—প্রচলিত বিভ্রান্তি :

এ পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের যে শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে তা যথেষ্ট ভ্রান্তিপূর্ণ। সাধারণতঃ এই সমস্যাকে সহজ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা হয় এবং সহজতর উপায়ে সমাধানের জন্য সমগ্র গ্রন্থাগার কর্মীদের দুটি স্থূলভাগে ভাগ করা হয়—(১) বৃত্তি কুশল কর্মী (Professional workers) এবং (২) বৃত্তিজ্ঞানহীন অকুশল কর্মী। এই ধরণের বিশ্লেষণকে "white collar" এবং "non-white collar" এবং যান্ত্রিক শ্রমিক ও অযান্ত্রিক শ্রমিকের বিশ্লেষণের ক্রটির মতই ক্রটিপূর্ণ বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে। অবশ্য প্রথমোক্ত বিভ্রান্তি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং দেখা যাক "বৃত্তি" কাকে বলে এবং

(১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে কি বৃত্তিগত শিক্ষা বলা হবে ?

(২) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায় পাঠ্যসূচীর মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলিকে বৃত্তিগত হিসেবে ধরা হবে ?

(৩) যে সমস্ত ব্যক্তি বৃত্তিগত শিক্ষালাভ করবেন এবং পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন—তাঁদের সকলকেই কি বৃত্তিগত অথবা পেশাদারী গ্রন্থাগারিক বলা হবে ?

(৪) যদি ধরা না হয়, তবে শ্রেণী বিভাগে বৃত্তি শব্দটি সংশোধন করার কতদূর প্রয়োজন ?

ওয়েবষ্টার ও অক্সফোর্ডের অভিধানে "বৃত্তি" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে বর্ণনা করা আছে। ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী বইটিতে "Profession" (বৃত্তি) এই শব্দটির বিভিন্ন অর্থ দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটি গ্রন্থাগার বৃত্তিকে সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারে কেবল সেটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই বৃত্তির জ্ঞান এমন বিশেষ ধরণের জিনিষ যা আয়ত্ত্ব করে বৃত্তিকুশলেরা অপরকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে বা নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারে অথবা, এই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা তাদের কাজ করে দিতে পারে। এই অর্থে একজন বৃত্তিকুশলীকে (Profession) আমরা একজন সৌখিন বা সখের কর্মী থেকে আলাদা করে দেখি। এই বৃত্তি কোন কষ্টসাধ্য কাজ বা খেলাধূলা যাই হোক না কেন তাতে আসে যায় না।

Oxford English Dictionary-তে এই ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে। তাঁরা এই বিশেষ জ্ঞানের কথাই বলেছেন যে জ্ঞান একজনকে আয়ত্ত্ব করতে হয় এবং তাকে কাছে লাগানোর উপায় জেনে কাজে প্রয়োগ করতে হয়।

Encyclopaedia of Social Science-এ এই "বৃত্তিকে" বুদ্ধির সাহায্যে গ্রহণীয় কোন বিশেষ জ্ঞান বা জীবনের কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রয়োগ করা যায় এমন জ্ঞানকে বোঝাতে চেয়েছেন।

সুতরাং মূল বিষয়েই বলা আছে যে বৃত্তি-জ্ঞানে কোনও বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রয়োজন যেটা সাধারণ শিক্ষার মধ্যে পড়ানো হয় না।

গ্রন্থাগারিকতাকে কি তাহলে বৃত্তি বলা হবে ?

এখন প্রশ্ন উঠবে গ্রন্থাগারিকতাকে কি বৃত্তিগত বলা হবে ? বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগারিকতাশিক্ষাকে নিয়মিত ট্রেনিং বলে গ্রহণ করেছেন। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই ট্রেনিংএ শিক্ষকতা করেন।

Encyclopaedia of Librarianship এর ১৯৮-৯৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থাগারিকতার বর্ণনা করা আছে। এতে বলা হয়েছে যে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির মূল উপাদান হল (১) সংগ্রহ, (২) সংরক্ষণ, (৩) সংগঠন ও লিপিবদ্ধ নথিপত্রের ব্যবহার। বর্তমানে গ্রন্থাগারিকতাকে বৃত্তি বা পেশা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যার জন্ম বিশেষ ধরণের ট্রেনিং নেওয়ার প্রয়োজন। এর পিছনে দুটি কারণ আছে।

প্রথমতঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে অধিক সংখ্যক সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে গবেষণার কাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকার ক্রমোন্নতি। গ্রন্থাগারের প্রসারণ একদিকে যেমন কর্ম্মবিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে অপরদিকে প্রায়োগিক পদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধির জন্যে বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলির কাজ আরও সহজ করার প্রয়োজন। এর ফলে কোন নতুন পদে নিয়োগের জন্যে শুধুমাত্র শিক্ষানবিশি বা apprentice হলেই চলবে না এইসব পদের প্রার্থীকে সর্ব্বজন স্বীকৃত কারিগরি বিদ্যার ট্রেনিং নিতে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এবং এই পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই তাকে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। যখন এই ধরণের নিয়োগ বর্দ্ধিত হয় তখনই সেই পেশা বা চাকুরীকে "বৃত্তি"র পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

এই সমস্ত সংজ্ঞা থেকে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে গ্রন্থাগারিকতা নিঃসন্দেহে অন্যান্য যে কোন বৃত্তির মতই একটী বৃত্তি।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ও ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রকের নির্দ্দেশ—

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বর্তমানের সর্বপ্রকার বৃত্তিকে খুব সূক্ষ্মভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। এই শ্রেণী বিভাগে গ্রন্থাগারিকতাকে যে গ্রুপে ফেলা হয়েছে সেই গ্রুপে কেবলমাত্র বৃত্তিগত, কারিগরী কাজগুলিকে ফেলা হয়। এই সংস্থা শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কাজগুলি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই শ্রেণী বিভাগের উপর নির্ভর করে, ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রক বিভিন্ন বৃত্তির শ্রেণী বিভাগ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা নির্দ্দেশিত গ্রন্থাগারিকের কাজগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্ম্মীদের কার্য্য বণ্টনের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রক ও গ্রন্থাগারিকের কাজ আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার অনুরূপ ভাবেই বণ্টন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পর্য্যবেক্ষণ সমিতির অভিমত—(U.G.C. Review Committee)

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার উন্নতির কাজে গ্রন্থাগারের

বা অপহরণ ঘটেনি ? এর পরে আপনার নাসিকাগ্রভাগে সরাসরি ও ব্যাপার ঘটতে থাকলেও হতবাক্ বর্তুলাক্ষ হবেন না।

গ্রন্থাগারগুলি যে দোকানেরই সামিল তার নিদর্শনও পাবেন। বইএর দোকানের নামগুলিও যে মশাই আজকাল গ্রন্থাগার ঘেঁষা হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয় এমন মক্কেলের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকবেন যারা এখানে বই কিনবার জন্য আসে, অথবা পত্রযোগে বরাত ও দিয়ে থাকে। এরপরে বোধকরি আর কিনতে বা পড়তেও আসবে না, নিজস্থানে স্রেফ তুলে নিয়ে যাবে। তবে কিনবার জন্য আধুনিক গ্রন্থাগারিক সাহায্য করতে পারেন বৈকি। শুধু তালিকা দিয়েই নয়, কোন বিষয়ে কোন বই নির্ভরযোগ্য তার নির্দেশ ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা সহজেই পেতে পারেন গ্রন্থাগারে। কিন্তু যেহেতু নানাবিধ বই বাছাই ও নাড়াচাড়া করবার সুবাদে এঁরা বই সম্পর্কে নানান খবর-তত্ত্ব ও তথ্য জানেন, বোধকরি তারই ফলে অনেকের মনে এমন একটি ধারণা বিদ্যমান যে গ্রন্থাগারের কাজ বড়ই আরামের। রাজ্যের বই বসে বসে পড়বার এমন সুবর্ণ সুযোগ বুঝি কুত্রাপি নেই। তাঁরা মনে করেন, বই পড়তে আর লিখতে যদি হয় তো এই চাকরিটিই শ্রেষ্ঠতম। ময়রারা মিষ্টি খায় কিনা কেউ বড় একটা পরখ করে দেখেনি, কিন্তু বইএর দোকানদার বই না কিনেও পড়ে। গ্রন্থাগারিকের তো আরো পোয়াবারো, দোকানীর মত লাভ লোকসানের ঝক্কি পোয়াতে হয়না অথচ তামাম দুনিয়ার বই পড়বার ঢালাও সুযোগ ও সময়। এককালে এজাতীয় কর্মের কিপ্রকার সুবিধে ছিল জানিনা, তবে এখন যে নেই তা আপনারা টের পাচ্ছেন। সন্নিবিষ্ট মনে কিছু পড়বার সময় পাওয়া যে প্রশ্নাতীত তা আপনি বোঝাবেন কাকে ? বই মোটামুটিভাবে পড়তে আপনাকে হ ই. ভূমিকা-টুমিকা সূচীপত্তর বা মলাটের লিখন পড়তে গিয়ে আপনার ললাটের লিখন কিন্তু উলটে যাবার দাখিল। কাজকর্ম নেই, বসে বসে কেতাব পড়ছেন। নিজের আখের গুছাচ্ছেন। অথচ নিজের তো দূরস্থ, পরের কাজটুকু গুছিয়ে দিয়েও পার পাবেন না। আপনি হয়ত কোনো গ্রন্থসেবীকে তাঁর অতীব জরুরি প্রয়োজনের তাগিদ বুঝে আর পাঁচটা কাজ এড়িয়ে একটু আগেভাগে তাঁর আকাঙ্ক্ষা মেটালেন। তারপরেই হয়ত শুনতে পাবেন বলা হচ্ছে - ওসব কাজের চাপ-টাপ ঝামেলা-ঝক্কি সব কথার কথা, ইচ্ছে করলেই আরো তাড়াতাড়ি আরো বেশি কাজ করতে পাবেন। বই বাড়ছে ? বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংগতি রেখে কর্মী সংখ্যা বাড়ানো দরকার ? কেন মশাই, আমরা যখন ক্লাস নিই তখন কি দশটি ছেলে বাড়লেই আরেকজন করে মাষ্টার লাগে ? তারপরে ধরুন, আপনার কাছে কোনো প্রশ্ন এল,—সেটা মন্ত্রীমহোদয়ের ঠিকানা বা পশু পালনের পদ্ধতি থেকে শুরু করে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ বা পারমানবিক প্রসঙ্গ পর্যন্ত যা কিছু সম্ভব তাই হতে পারে। আপনি খেটেখুটে বইপত্তর ঘেঁটেঘুঁটে উত্তরটা জুগিয়ে দিলেন। তাতেই বা হলটা কী ? 'টুকলিফাই' করেই তো দিলেন ? . তাই বলি, অধ্যাপকদের বিদ্যার ব্যাস জ্ঞানের পরিধি আছে, অফিসারদের অভিজ্ঞতার বৃত্ত তৎপরতার জৌলুষ আছে, কিন্তু আপনার ঝুলিতে সে সবের কোনো বালাই নেই। আপনার হাতে 'নাই ভুবনের ভার'।

বরঞ্চ বইগুলি যদি নিরেট না হয়ে সরব হত তাহলে মজদুরদের মতো আপত্তি জানাত, বলত—আমাদের জন্যই তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির যত বড়াই, আমাদের প্রতি এই অবহেলা চলবে না চলবে না।

বই তা পারে না। কিন্তু আপনি তাদের অছি হিসেবে এবম্বিধ দাবি পেশ করতে পারেন। বলতে পারেন, বইএর সঙ্গে রকমারি পাঠকদেরও 'ঝাপা' সামলাতে হয় আপনাকে। বইগুলি 'মঞ্চস্থ' করে রাখাই শুধু নয়, সুষ্ঠু সহজ এবং সুসম্বদ্ধ পদ্ধতিতে রাখা দরকার। কিন্তু দরকারটা বোধকরি কেবল আপনারই, অপর কারো নয়। তাই পড়ুয়ারা যেমন ব্যাপারটা তত গ্রাহ্য করেন না, কর্তা ব্যক্তিরাও তেমনি এর মর্ম উপলব্ধি করেন না। মঞ্চ সংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গমাত্রেই ঊর্ধ্বনেত্র হন। একটা তাকের উপরে বা টেবিলের উপরে কত বই রাখি মশাই আমরা বাড়িতে আর আপনার এততেও আঁটছে না! বড় মাপের ঘরের দাবি যদি পেশ করেন তাহলেও অনুরূপ বক্তব্য শুনতে পারেন। গ্রন্থগৃহ এবং মঞ্চ সংখ্যা নিয়ে নাজেহাল আপনারাও হয়ে থাকেন তাতে সন্দেহ কী। তারপরে—অথবা তারও আগে—আছে কর্মী সংখ্যা। আপনার যদি রুদ্ধমঞ্চ গ্রন্থাগার হয় তাহলে বরাতমতো বই বার করতে করতে মুষ্টিমেয় পরিবেষক যে হিমসিম খেয়ে যায় এবং বিড়ম্বিত পাঠক বিলম্বে অধৈর্য হয়ে ওঠে সে যুক্তি আপনি দেখাতে পারেন। পাঠক সংখ্যা, পরিচারক সংখ্যা, পুস্তক সংখ্যা এবং কার্যকালের আনুপাতিক হিসাব বা পরিসংখ্যান পেশ করতে পারেন আপনি। স্থান বা মান সম্পর্কে দাবি-দাওয়া দাখিল করতেও পারেন। কিন্তু ওপক্ষ সেয়ানা। তাঁরা আপনার বেলায় বোধকরি সেই বয়েৎ স্মরণ করেন,—অনৃত ভাষণের তিন শ্রেণী—মিথ্যা, ডাঁহা মিথ্যা এবং পরিসংখ্যান। আপনার ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচের এই বিহ্বলতায় আপনি পুলকিত রোমাঞ্চিত বোধ করবেন। শিক্ষকদের কার্যক্রমে যদি পাঠপর্বের বৃদ্ধি ঘটে তাহলে 'শিক্ষাধমনীতে নয়া রক্ত' এসে যায়, নথির বোঝা বাড়লে সেই অনুপাতে করণিক নিয়োগও নিয়মানুগ ব্যাপার কিন্তু গ্রন্থ তদারকির ক্ষেত্রে বোধকরি কখনোই 'অচল অবস্থার সৃষ্টি' হয় না। মুক্তমঞ্চ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তো আপনার বলবার কিছু থাকতেই পারে না। পড়ুয়ারাই বই বেছে নিচ্ছেন, রাখছেন, খুঁজে বার করছেন,—আপনার আবার ঝামেলাটা কোথায়? আপনি বলতে পারেন যে এসব ক্ষেত্রে প্রত্যর্পিত পুস্তক পুণরায় মঞ্চস্থ করবার ঝক্কি আছে, মঞ্চ এলোমেলো হয়ে থাকলে,—এবং পড়ুয়াদের হস্তক্ষেপে তা নিয়মিতই হয়ে থাকে,—সেগুলি গুছিয়ে রাখবার ঝামেলা আছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রাহকদের বই বাছাই কর্মে ব্যক্তিগত সাহায্যও দিতে হয়, এবং এছাড়া পুস্তক লেন-দেনাদির যাবতীয় প্রাসঙ্গিক কাজ তো আছেই,—অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত বইটি মঞ্চমুক্ত করা ব্যতিরেকে আর কোনো ব্যাপারেই কাজের কমতি নেই। কিন্তু তাতেও হালে পানি পাবেন না। শিক্ষার এই বহু বিজ্ঞাপিত পীঠস্থানে কার্যকালে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ছাড়া আর কোনো ক্রিয়া দেখতে পাবেন না।

তাই বলে আপনাকে উপদেশ দেবার কেউ নেই মনে করবেন না। মন্দিরের

বেওয়ারিশ ঘন্টাটা যেমন সকলেই একবার করে দড়ি টেনে বাজিয়ে যায় তেমনি গ্রন্থাধ্যক্ষকেও সকলেই এসে কিছু না কিছু 'জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ' দিয়ে যায়। গোপাল ভাঁড় নাকি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন পৃথিবীতে চিকিৎসকের সংখ্যাই সর্বাধিক, আপনি অক্লেশেই প্রমাণ করতে পারবেন গ্রন্থাগারে যাঁরই পদার্পণ ঘটে তিনিই গ্রন্থাগারিক। আপনি হয়ত দুষ্প্রাপ্য কোনো গ্রন্থ অথবা পত্রিকা কিম্বা চাহিদার অনুপাতে স্বল্পসংখ্যক কোনো বই আলাদা করে রেখেছেন, দরকার মতো গ্রন্থগৃহে বসে পড়বার নির্দেশ রেখেছেন,—বাড়িতে নিয়ে যাওয়া বারণ। কিন্তু কোনো পড়ুয়া এসে হম্বিতম্বি জুড়ে দিলেন,—বই কেন আটকে রাখা হবে, সকলকে একদিন দুদিনের জন্য পরিবেষণে আপত্তি করার কী আছে, এটা কি গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না কি যে তিনি যেমন ইচ্ছে হুকুম জারি করবেন, ইত্যাদি। আপনি বলতে পারেন এ জাতীয় বই সম্পর্কে আপনার বিশেষ দায়িত্ব আছে, হারিয়ে গেলে বা ছিঁড়েখুঁড়ে নষ্ট হলে আর সংগ্রহ করা যাবেনা। বলতে পারেন, সকলেই যাতে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে তাই এই ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার তো সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকছে—তার মধ্যে সুবিধে মতো এসে পড়ে গেলেই হয়, ইত্যাদি। কিন্তু তাতে অপরপক্ষ সন্তুষ্ট হবেন না। আপনি যদি সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী হন তো শুনবেন, গ্রাহক মহাশয়ের সকালে এসে পড়বার সময় কোথায়—তৈরি হয়ে কাজে বেরোতেই সময় কাবার, সারাদিন খাটা-খাটুনির পর সন্ধ্যেবেলা কি মশাই এসে চমড়ি খেয়ে পড়াশোনা করা যায়—রাত্তিরে ইজিচেয়ারে বসে আরাম করে পড়া দরকার, চা টা সিগারেটটা সেই সঙ্গে চলা দরকার। আর আপনি যদি কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মী হন তাহলেও শুনবেন, পাঠপর্বের মধ্যে পড়ার সময় কোথায়, যদি বা বিশ্রামপর্ব জোটে তো পড়ার মেজাজ হয় না, ক্লান্তিও আসে,—রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে পড়তে পারলে তবেই না পড়া হয়। অর্থাৎ জাতীয়—যার মানে 'নিজস্ব' সম্পত্তি তো, তাই মালিকবৃন্দ যখন খুশি অনুগ্রহ করে আসবেন, পড়বেন। মনে হয়, তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে বই বয়ে নিয়ে গিয়ে রাতবিরেতে যদি আপনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন তাহলে আরো ভালো হত, কাজের মতো কাজ হত। অবশ্য সেজাতীয় কর্মও গ্রন্থাগার করে থাকে। শহর থেকে দূরে বই বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, বিলি করা হয়। অথচ এদের মনের খোরাক জোটাবার মানবিক দায়িত্ব আপনি বহন করলেও আপনার প্রতি মনোযোগ বা সহায়তা আশা করতে পারবেন না।

বিদ্যাকেন্দ্রের গ্রন্থাগারে আপনি ছাত্রছাত্রীদের যদিবা সামলাতে পারেন তো অধ্যাপক বা গবেষকদের বাগ মানানো দায়। তাঁরা শিক্ষার্থীদের চেয়েও বেশি করে বইএর মর্ম উপলব্ধি করেছেন কিনা। তাই বইগুলো যে উই আর পণ্ডিতদের মুষ্টি থেকে রক্ষা করাই আপনার সমস্যাসঙ্কুল দায়িত্ব তা পদে পদে টের পাবেন। অধ্যাপকদের পক্কতা বা গবেষকদের আসক্তি আপনাকে দেহে মনে পর্যুদস্ত করবে। তাঁদের যে সর্বত্র অবাধ সঞ্চরণ। শুধু তাই নয়, অযাচিত জ্ঞান বিতরণও তাঁদের মজ্জাগত। কারো কারো আবার কোলের ছেলেটির মতো সব কিছুই আগে-ভাগে কুক্ষিগত করবার বায়না, কেউ বা বাচ্চার

হাতের রসগোল্লার মতো মূল বইটি বজ্রমুষ্টিতে রেখে অন্যান্ত বইএর গড়ানে রস লেহন করেন। সঙ্গতি রেখে চলতে গেলে এর কোনোটাতেই অন্যায় কিছু নেই। গ্রন্থসম্পদ তো তাঁদেরই জন্য। এইটেই তাঁদের পারাপারের বৈতরণী ;—বই তরণী ভিন্ন জ্ঞান-যমুনা লঙ্ঘনের তাঁদের আর কোনো গতি নেই। ফলত কিন্তু অপেনাকে ক্রমাগত বই নিয়ে তাড়া খেতে হবে। বিদ্যা ব্যতিরেকেও পণ্ডিতদের চারণভূমি বিস্তৃত। তাই কেউ আপনাকে ক্রমাগত পরামর্শ দিতে থাকবে বই কেমন করে সাজাতে হয়, কোন বইটি কোথায় রাখা উচিত, চটপট বই জোগান দেবার কী পদ্ধতি, ইত্যাদি। 'হাঁ মশাই, আমি অর্থনীতির সূত্রে অমুক বইটা আনালুম আর আপনি কিনা সেটা গণিতের তাকে তুললেন ?' 'পদার্থবিদ্যা ও দর্শন সম্পর্কিত বইটা কিনা আপনি বিজ্ঞানের মঞ্চে রাখলেন ?' ইত্যাদি। আপনি বৃথাই কতকগুলি উপযোগী পত্রক তৈরি করে পত্রাধার ভারি করলেন। আপনার বিবিধ 'পথ্য' পত্রের কেরামতি মাঠে মারা গেল। একটা বই যে আপনি যুগপৎ দুই মঞ্চে রাখতে পারেন না—এমন কি ছিঁড়ে দু'ভাগ করেও না, কোনো বিশেষ একটি শ্রেণীভুক্ত করতেই হয় সেই যুক্তির জবাব দিহি করে আপনি হয়রান। খুব কম পাঠকই খেটেখুটে পত্রকাধার ঘেঁটে তথ্য স্থির করেন। সুতরাং আপনার কাজের একটা যে ধারা ও পদ্ধতি থাকতে পারে সেটা হামেশাই মহাশয়েরা বিস্মৃত হন। আলুপটলের দোকানে গিয়ে অথবা মাছের দরদস্তুর করে যে কষ্টটুকু সকলে স্বীকার করতে পারেন,—এমন কি বইএর দোকানে গিয়েও,—সেটুকুও এতদঞ্চলে তাঁরা করতে চাননা।

একটু আগে মুখ ফসকে বলে ফেলেছি যে ছাত্রছাত্রীদের আপনি হয়ত সামলাতে পারেন। আসলে কিন্তু পারেন না। তারাই নবযুগের প্রকৃত জনগন। আপনার সমস্ত অসুবিধা সর্বপ্রকার বাধা দূরীকরণে সোৎসাহী অগ্রণী। আপনি যখন নানাবিধ চাপে জেরবার হবার দাখিল এরা তখন এসে বলবে—আমাদের হাতে ছেড়ে দিন না, সব ঠিক করে দিচ্ছি। বই নিয়ে ফেরৎ দিচ্ছে না ? বই লোপাট হয়ে যাচ্ছে ? ইচ্ছেমতো পাতা কেটে নিচ্ছে ? তা আপনি যখন এর কোনো উপায় করতে পারছেনইনা তখন আমাদের হাতেই ছেড়ে দিলে আর ক্ষতিটা কী ? আমরাই দেওয়া নেওয়া সব দেখব, শুধু গ্রন্থগুলির বিধি-বিধান তারিখ-তদারকিটা আপনারা করুন। রহস্য নয়,—অনেক কর্তাব্যক্তি নিজেদের গা বাঁচাতে এরূপ সুপারিশ করে থাকেন। নিজেদের ঘাড়ে পড়ছেনা যখন। আর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ তো বলেইছে যে ছাত্রদের এই ধরণের কাজে-কর্মে লাগিয়ে দেওয়া হোক, তাহলে হয়ত আর ছাত্র অসন্তোষ ঘটবেনা। কর্মে লিপ্ত রাখলে আর ক্ষিপ্ত হবার অবকাশ পাবে না। সাধু প্রস্তাব। শুধু গ্রন্থাগার কেন, আমার মনে হয় অধ্যাপনার অবান্তর অংশটুকু বাদ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা-পর্যালোচনা প্রশাসন-অনুশাসন সব কিছুই ছাত্ররঞ্জক হলে অনেক ল্যাঠা চুকে যায়। আর শুধু কি ছাত্র, কর্তাব্যক্তিরা অম্লানবদনে কর্মী জাতীয় ছাই গ্রন্থাগারের ভাঙা কুলোয় চালান করে দেন। অনুরোধ-উপরোধে এবম্বিধ ঢেঁকি গিলতে হয়নি এমন গ্রন্থাগারিক আপনাদের মধ্যে অবশ্যই বিরল।

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিচার করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটী পর্য্যবেক্ষণ সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার সমূহকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ দান করাই কাজ ছিল। এই সমিতি ১৯৬৫ সালে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে দৃঢ়তর করার ও গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদানের জন্য সুপারিশ করে। এই সমিতি গ্রন্থাগার শিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

"আমরা ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত জীবিকা হিসাবে গ্রন্থাগার শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করায় পিছিয়ে আছি। বহু বছর ধরে গ্রন্থাগারে কর্ম্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষানবিশীকেই যথেষ্ট মনে করা হত। নানাবিধ কারণের জন্য গ্রন্থাগার বৃত্তির প্রতি মেধাবী ছাত্রের কোন আকর্ষণ ছিল না। গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধাও যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হত না। সাম্প্রতিককালে এই দেশে গ্রন্থাগার চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণও গ্রন্থাগার বিদ্যার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের মান নির্ণয় করতে শুরু করেছে। গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিগত যোগ্যতা না থাকলে গ্রন্থাগারিক পাঠকের সমস্যা সমাধানের সহজ পথ খুঁজে পাবেন না এবং পাঠককে গ্রন্থাগারের উপযোগীতা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না। সেই কারণেই গ্রন্থাগারের কাজ পরিচালনার জন্য একজন সুশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর প্রয়োজন।

ভূমিকাতেই বলা হয়েছে যে গ্রন্থাগার শিক্ষা নিয়মিত ধারার শিক্ষা এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা এই বিষয়ে শিক্ষা দেন। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এর পাঠ্যক্রম স্থির করা হয়। এই পাঠ্যসূচী বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, সামান্য পরিবর্ত্তন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই পাঠ্যক্রমে কি কি বিষয় পাঠ্য হবে তার সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বৃত্তিগত ও বৃত্তিহীন বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। একথা সত্য যে শিক্ষার মধ্যে স্তরভেদ আছে, যেমন—(১) সার্টিফিকেট কোর্স (২) ডিপ্লোমা কোর্স (৩) স্নাতক (B. Lib. Sc.) এবং (৪) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স (M. Lib. Sc.)

পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিগত বিষয়—

যদি গ্রন্থাগার বিদ্যাকে বৃত্তিগত হিসেবে গণ্য করা হয় তবে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ্যসূচীকেও বৃত্তিগত পাঠ্যসূচী বলা উচিৎ। বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারিত পাঠ্যক্রমে কিছু বিষয় থাকবেই যা সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিগত তবে কিছু বৃত্তি বহির্গত বিষয়ও থাকতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন লক্ষ্য করেছেন যে কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায় বৃত্তিগত বিষয়ের সঙ্গে একটী অথবা দুটি বৃত্তি বহির্গত বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত

করেছেন। যেমন, সাধারণ জ্ঞান, মাতৃভাষা ছাড়া যে কোন একটী বিদেশী ভাষা শিক্ষা, সংস্কৃতির ইতিহাস বিষয় ইত্যাদি।

মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রন্থাগার শিক্ষার বৃত্তিগত ওঅবৃত্তিক বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের বিশ্লেষিত বৃত্তিগত ও অবৃত্তিক বিষয়গুলি নিম্নরূপ :—

পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বৃত্তিগত পাঠ্যবিষয় :—

(১) গ্রন্থাগার পরিচালনা
(২) গ্রন্থাগার সংগঠন
(৩) বর্গীকরণ
(৪) সূচীকরণ (৫) গ্রন্থসূচী
(৬) পুস্তক নির্ব্বাচন (৭) সহায়ক সেবা
(৮) তথ্য সংগ্রহ কাজে সাহায্য করা

পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অবৃত্তিক পাঠ্যবিষয় :—

(১) সাধারণ জ্ঞান
(২) বিদেশী ভাষা শিক্ষা
(৩) সংস্কৃতির ইতিহাস

উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে যে কোন বিষয়ে কোন বৃত্তিগত শিক্ষার আবশ্যিক অংশ হিসাবে গণ্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন পর্য্যবেক্ষণ সমিতির মতে সে বিষয়গুলিই বৃত্তিগত বিষয়। এটা একদিক থেকে আশার কথা যে বিষয়টির জটিলতা ও বিশেষজ্ঞতার মান নির্বিশেষে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। বৃত্তিগত কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যে সমস্ত নিত্যকর্ম আছে, তাদেরও সবক্ষেত্রেই বৃত্তিগত কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। বৃত্তিগত কাজগুলির জন্য সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তির এবং বিষয়টি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। কোন কাজ করতে গেলে তার জন্য যে বৃত্তিগত যোগ্যতা ও প্রয়োগিক দক্ষতার প্রয়োজন সেই হিসাবে বৃত্তিগত কাজের স্তরবিভাগ করা উচিৎ। কোন প্রয়োগিক কাজ করতে গেলে তার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন সেই কাজ সহজ হলে প্রয়োগনৈপুণ্যের প্রয়োজন কমবেই তার জন্য তাকে আবৃত্তিক বলা সম্পূর্ণ ভুল।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পর্য্যবেক্ষণ সমিতি বিভিন্ন বৃত্তিগত বিষয় নির্ব্বাচন করে দিয়েছেন যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু নিয়মমাফিক কাজ থাকবে। পর্য্যবেক্ষণ সমিতির বিশ্লেষণ থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

পাঠ্যসূচীর পরিকল্প—Scheme of the papers.

সার্টিফিকেট পাঠ্যসূচী :

(১) লাইব্রেরী রুটীন; (২) গ্রন্থাগার কাজ ও সংগঠন; (৩) বর্গীকরণ; (৪) সূচীকরণ।

স্নাতক অথবা ডিপ্লোমা পাঠ্যসূচী :

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিভাগের নিজস্ব প্রয়োজন অথবা বিশেষ সুযোগের দিকে লক্ষ্য রেখে এ ধরণের বিভিন্ন স্তরভাগ হওয়া সম্ভব।

পাঠ্যসূচীর পরিকল্প :

(১) গ্রন্থাগার সংগঠন, (২) গ্রন্থাগার পরিচালনা, (৩) গ্রন্থসূচী ও গ্রন্থনির্ব্বাচন, (৪) দলিল গ্রন্থসূচী ও সহায়ক সেবা, (৫) বর্গীকরণ (তত্ত্ববিষয়ক), (৬) বর্গীকরণ (ব্যবহারিক), (৭) সূচীকরণ (তত্ত্ববিষয়ক), (৮) সূচীকরণ (ব্যবহারিক)।

দ্বিতীয়পত্রকে আবার বিভিন্নভাগে ভাগ করা হয়—(১) পুস্তক নির্ব্বাচন, (২) ক্রয়ানুজ্ঞা (ordering), (৩) পরিগ্রহণ-সংলেখন, (৪) পুস্তক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রত্যাহার করা, (৫) গ্রন্থ বিন্যাস (arrangement), (৬) গ্রন্থভাণ্ডার নির্দেশনা (stock room guidance), (৭) গ্রন্থ সংগ্রহের হিসাব রাখা (stock verification), (৮) সঞ্চালন কাজ ও পরিবেশন (circulation and issue), (৯) গ্রন্থাগারে ফরম্ (forms), রেজিষ্টার (registers), বাজেট ও হিসাব রক্ষার কাজ, (১০) গ্রন্থাগার সমিতির কাজ, গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের বাৎসরিক রিপোর্ট লেখা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এইখানেই বিভ্রান্তির সূচনা এবং এই বিভ্রান্তি এতই জোরালো যে এর দ্বারা শুধুমাত্র সাধারণ প্রশাসকরাই ভ্রান্ত হন না কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরাও বিভ্রান্ত হন। এর ফলে, কিছু কিছু নিয়মমাফিক কাজ যেগুলি স্পষ্টতঃ বৃত্তিগত বিষয়ের একটা অংশ হিসাবে গণ্য হয় সেগুলিকেও বৃত্তিহীন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যে কাজগুলি বৃত্তিহীন সেগুলি করণিক পর্য্যায়ে ফেলা হয়। খুব বেশী হলে যাঁদের এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে অথবা কোন বিশেষজ্ঞের বৃত্তিগত নির্দেশনার কাজ করছেন এসমস্ত ব্যক্তিকে এসব কাজের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এটা আদৌ সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ, কোন কাজ করতে গেলে তার সমস্যা সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান না থাকলে সে কাজ করার মধ্যে ত্রুটি থেকে যায়। গ্রন্থাগারের সমস্ত কাজকে যদি মাত্র দুটি বৃত্তিগত ও অবৃত্তিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়, তবে সেটা ভুলই। এখানে একটা তৃতীয় শ্রেণীর উপলব্ধি করা যায় যেটা আংশিকভাবে বৃত্তিগত এবং আংশিকভাবে অবৃত্তিক এবং এ সমস্ত কাজগুলি অপর একটা অখণ্ড কাজ হিসাবে ধরা উচিৎ। এই সমস্ত কাজগুলির জন্যে ও মৌলিক বৃত্তিগত শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন,—গ্রন্থাগার কর্মীদের শ্রেণী বিভাগ ও দেখা যাক কতগুলি কাজকে বৃত্তিগত কাজ বলা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের শ্রেণী বিভাগের সমস্যা বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে উদ্বিগ্ন করেছে। নানা উপায়ে তাঁরা এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন।

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির বক্তব্য—

ভারত সরকার নিযুক্ত কমিটি এই সমস্যা সমাধানের যে উপায়ের কথা বলেছেন তাকে

আমরা পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞান সম্মত বলতে পারি না। তাঁরা গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্মীকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম বৃত্তিগত কর্মী, দ্বিতীয় আংশিকভাবে বৃত্তিগত কর্মী।

এই শ্রেণীর বাইরে একদল গ্রন্থাগার কর্মী থাকেন যাঁদের কাজ হল বইএর অন্যান্য নথীপত্র তাক থেকে নিয়ে আসা এবং কাজের শেষে সেগুলি যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা— এছাড়া গ্রন্থাগার ভবন সংরক্ষণ করা। আংশিকভাবে বৃত্তিগত কর্মীর মধ্যে তাঁরাই পড়বেন যাঁরা বৃত্তিগত কর্মীর নির্দেশমত সাধারণ রুটিন কাজ করবেন। তবে তার জন্য তাঁকে সহজতর প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। এই শ্রেণীর মধ্যে সেই সমস্ত কর্মীকেও ধরা যেতে পারে যাঁরা সমস্ত গ্রন্থাগারে নিয়মিত (Relative) কাজগুলি করে থাকেন। এই কমিটির মতে এইসব কর্মীকে কেরাণী বলা উচিৎ তবে কাজের প্রকার ভেদে তাঁদের পরিচয় হবে যেমন সূচীকরণ কেরাণী, সঞ্চালন কাজের কেরাণী ইত্যাদি।

শিক্ষাপ্রাপ্ত নব এইরূপ সহকারী কর্ম্মী এবং ক্লার্করা বৃত্তিগত কর্ম্মীর নির্দ্দেশনাধীনে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাজ করবেন। যাইহোক, আংশিক বৃত্তিগত কর্ম্মী হিসেবে কাজ করতে গেলে এই দুই প্রকার কর্ম্মীকেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। কর্ম্ম-বিনিয়োগের পরে এই আংশিক বৃত্তিগত কর্ম্মীদের শিক্ষানবীশি সময়ের (Probationary Period) মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতে হবে। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁরা গ্রন্থাগারের কাজের প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ না করবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ পদে স্থায়ী বলে বিবেচিত হবেন না। তাঁদের মধ্যে আবার অনেককে মধ্যম ও ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার-গুলির পূর্ণভার দেওয়া হয়।

যাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নেই তাঁদের ওপর ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকৃতির গ্রন্থাগারগুলির পূর্ণভার দেবার সিদ্ধান্তের পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে বোঝা কঠিন। যে ব্যক্তি বৃত্তিকুশল বলে গণ্য হন না তাঁকে অল্পদিনের জন্য হলেও জোর করে বৃত্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে বাধ্য করার সিদ্ধান্তের পিছনে কি যুক্তি আছে ?

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসংস্থা ও ভারত সরকারের শ্রম ও পুনর্ব্বাসন মন্ত্রকের নির্দ্দেশিত কার্য্য তালিকায় এ যুক্তির সমর্থন মেলে। এর থেকে এই প্রমাণিত হয় যে বৃত্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং এরূপ শিক্ষা যে ব্যক্তির নেই তাদের কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ আছে। এর মধ্যে বিভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। যদিও বৃত্তিগত কাজের মৌলিক সূচী সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকায় এই বিভ্রান্তি আরও খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমস্ত কাজের শ্রেণী বিভাগে অনুসিদ্ধান্ত যোগ্যতাও পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য তাঁদের মধ্যে পদমর্য্যাদা হিসাবে ভাগ থাকবে। যেমন (১) মুখ্য গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থাগার বিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। (২) গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থবিদ্যায় স্নাতক অথবা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (৩) সহকারী গ্রন্থাগার কর্ম্মী—অন্তত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তি। এটি খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে বর্ত্তমান যুগেও গ্রন্থাগারের কাজের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে এই

বিভ্রান্তি রয়েছে। বিশ্বের কোন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতক অথবা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের মান নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং যে সমস্ত কাজ তাঁদের করতে হয় সেগুলিকে সহজভাবেই বৃত্তিগত কাজ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু, আমাদের দেশে এক শ্রেণীর কর্ম্মী আছেন যাঁরা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা অর্জন করতে পারেন নি কিন্তু গ্রন্থাগার বিদ্যায় স্বীকৃত সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশ করেছেন এবং সাধারণত যোগ্যতার সঙ্গে বৃত্তিগত কাজ করে থাকেন, তাঁরাই এই বিভ্রান্তির "বলি"। নিজেদের কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রথম থেকেই তাঁদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সমস্ত জুনিয়র শিক্ষিত কর্ম্মীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্ম্মীকে প্রয়োজনীয় বৃত্তিগত কাজ করতেও হয় অথচ তাঁদের দুঃখ দুর্দ্দশা বা সমস্যা মোচনের কোন প্রতিকারই হয় না।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, IASLIC প্রভৃতি সংস্থা বৃত্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্ম্মীর এই বৈষম্য দূরীকরণ কাজে অগ্রণী হতে পারেন। বিভিন্ন দেশের মত এদেশেও এই এই বৃত্তির উন্নতি বিভিন্নস্তরের কর্ম্মীদের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত বিচারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এক শ্রেণী কর্ম্মচারীর ক্লেশ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বৃত্তির উন্নতির জন্যেই দূর করা প্রয়োজন। এই বৈষম্য যদি দূর হয় তবেই তরুণ সমাজ নৈপুণ্যের সঙ্গে এই বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হবে। ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর প্রকাশিত Guide to Careerএ বলা হয়েছে—

"ভারতে গ্রন্থাগার বিদ্যা ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় বৃত্তি হিসাবে উৎসাহ দান করছে যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তরুণদের গ্রন্থাগার বিদ্যাকে জীবনের বৃত্তিহিসেবে গ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্ম্মী, গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার বৃত্তির বিশেষজ্ঞদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে আসুন আমরা সকলে মিলে এই সমস্যা সমাধানের পথ স্থির করি যাতে আমাদের এই জুনিয়র সহকর্ম্মীরা তাঁদের উপযুক্ত সম্মান পান ও তাঁদের দুর্ভাগ্যের শেষ হয়।*

*১৯৬৯এ IASLICএর বার্ষিক সম্মেলনে (বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত) আলোচিত।

নির্দ্দেশিকা :

(1) Encyclopaedia of Librarianship ; 2nd rev. ed. Cal. [by] Thomas Landau, 1961.

(2) Encyclopadia of Social Sciences. ed. [by] E. R. Selignan, 1930.

(3) India. Advisory Committee for Librarians. Report of the···1959·

(4) India. Directorate General of Resettlement and Employment Guide to Careers.

(5) India. Directorate General of Resettle and Employment. National Classification of Occupation.

(6) International Labour Office, Geneva. International Standard Classification of Occupations, 1958.

(7) Library Association, London.
Professional duties in Libraries, 1963.

(8) U.G.C. Review Committee.
Library Science in Indian Universities, 1961.

Whether librarianship is a profession ?
: Jayati Roy

পরিষদ-কথা

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের গণঅবস্থান :

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির নেতৃত্বে ঐ শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীরা বিগত ১৯—২১শে জানুয়ারী '৭০ মহাকরণের সামনে এক গণ-অবস্থান করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে অবস্থানকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের অভিনন্দন জানানো হয় এবং বিভিন্ন ভাবে পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ এই অবস্থান কর্মসূচীর অংশিদার হন ও তাঁদের সাহায্য করেন। আগামী দিনের প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের এই ধরণের কর্মসূচী নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির এক প্রতিনিধিদল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়ের সংগে দেখা করে স্পনসর্ড প্রথার অবসান, মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই বেতন প্রদান (প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের এক বিরাট সংখ্যক কর্মীরা ৩।৪ মাসের বেতন পান নাই), সরকারী হারে মহার্ঘ ও অন্যান্য ভাতা প্রভৃতি দাবির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিনিধি দলকে বিশেষ কোনও আশ্বাস দেন নি। বিস্তৃত আলোচনা করবার জন্য শিক্ষাসচিব গত ২৭শে জানুয়ারী '৭০ যে দিন স্থির করেছিলেন সেইমত নির্দ্ধারিত তারিখে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আলোচনার বিবরণী শিক্ষাসচিব মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জন্যে পাঠিয়েছিলেন, যার সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায় নি।

ডঃ জর্জ চ্যাণ্ডলারের বক্তৃতা :

গত ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে যুক্তরাজ্যের প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক ডঃ জর্জ চ্যাণ্ডলার "গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো" সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এই আলোচনায় বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকবৃন্দ ও শিক্ষানুরাগীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডঃ চ্যাণ্ডেলারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ঐ দিনের আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক : তুষারকান্তি সান্যাল

ssociation Notes

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৬৯ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। প্রদর্শনীতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রাচীর পত্র, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ও ত্রিপুরায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও পাঠাগারের কিছু অমূল্য পুস্তকের নিদর্শন উপস্থাপিত করা হয়। প্রাচীর পত্র ও চিত্রের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী, মহামতি লেনিন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভাপতি গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

কাশীপুর ইনষ্টিটিউট, কাশীপুর রোড, কলি-৩৬

গত ১৭ই জানুয়ারী কাশীপুর ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী এই পাঠাগারের সাহায্যকল্পে একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান।

১৯৭০ এর ১৪ই মার্চ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন—বর্ধমানের জেলা শাসক শ্রীতরুণ দত্ত ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জেলা শিক্ষাধিকারিক শ্রীকামিনী কুমার রায়। প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহাশয় যথাক্রমে সমাজ সেবা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, সতীনন্দী, বর্ধমান।

বাণী বন্দনা উপলক্ষে এই পাঠাগারে বিচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও চিত্র, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও সর্প, পাঠাগারের শতাধিক বৎসরের প্রাচীন পত্র পত্রিকা ও পুস্তক ও বিদ্যায়তনের ভাই বোনের হাতের কাজ বিশেষভাবে দর্শককে আকর্ষণ করে।

সুভাষ পাঠাগার, কটকঘার, কালনা।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ এই পাঠাগারের দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ লাহা তার বিবৃতিতে পাঠাগারের উন্নতি ও

সমস্যার কথা বলেন ও রাজ্যব্যাপী অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ী।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে তাঁর Discretionary fund এবং All purpose benevolent fund থেকে যথাক্রমে এক হাজার এবং দুইশত পঞ্চাশ টাকা দান করেছেন।

* * * *

নলহাটীর শ্রীকিশোরীলাল মোদীও ঐ গ্রন্থাগারে পাঁচশত এক টাকা দান করেছেন।

বীরভুম জেলা গ্রন্থাগার, বীরভুম।

বিগত ২রা মার্চ বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এক শোক সভার আয়োজন করা হয়।

মেদিনীপুর

তরুণ সংঘ, মধ্যহিংলা, মেদিনীপুর।

তরুণ সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত সদস্য নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে নির্বাচিত হন—সর্বশ্রী পশুপতি দাশ অধিকারী (সভাপতি), সন্তোষ কুমার মিধ্যা (সহ-সভাপতি), শরৎচন্দ্র মেট্যা (শিক্ষা-সম্পাদক), প্রদীপ কুমার মিত্র (স্বাস্থ্য ও আমোদ প্রমোদ বিভাগীয় সম্পাদক), জনার্দন দাশ অধিকারী (সমাজ কল্যাণ সম্পাদক), অসীম কুমার দত্ত (কোষাধ্যক্ষ), অজিত কুমার দত্ত (গ্রন্থাগারিক), লক্ষ্মণচন্দ্র মাঝি (সাধারণ সম্পাদক) ও অন্যান্য ৭ জন সদস্য।

সঙ্কলয়িত্রী : লীলা গুপ্ত
News from the libraries

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

স্থান : বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবির, নদীয়া।

তারিখ : ২৭শে মার্চ, ১৯৭০ সময় — অপরাহ্ণ ৪½ ঘটিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবির প্রাঙ্গণে এক শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশে চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন শুরু হয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বৃটিশ কাউন্সিল (কলকাতা) আয়োজিত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের মাধ্যমে। স্থানীয় বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক কালের গ্রন্থরাজি এবং গ্রন্থাগার ক্রমোন্নতির আন্দোলনের ধারাবাহিক প্রাচীরচিত্র উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। বৈকালিক জলযোগের জন্য সাময়িক বিরতির পর শুরু হয় সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশন।

স্থানীয় বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের সম্মিলিত আবাহন গীতির পর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানান। উদ্বোধনের প্রারম্ভে সদ্য পরলোকগত নিরঞ্জন মৈত্রেয়, নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং ডঃ এন, ভি, ভাজিফদারের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অতঃপর সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। (ভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত)

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় অত্যন্ত নগণ্য। তারমধ্যে গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে আরও কম। কোঠারী কমিশন যদিও সুপারিশ করেছেন শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগারে ব্যয় করা উচিত তথাপি এই সুপারিশ কার্যকর হয়নি। এর একমাত্র কারণ অর্থাভাব নয়, সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার অভাববোধই অন্যতম কারণ। বিদেশের তুলনায় এদেশের গ্রন্থাগার সমূহের অনেক অব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য পড়ে—কিন্তু এজন্য কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীই দায়ী নয়, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠকের পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীন পুস্তক সংরক্ষণ ও সংগ্রহের জন্য সরকারী প্রচেষ্টাকে কার্যকর করার দিকে লক্ষ্য রাখতে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানান ডঃ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণে যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি কাজ করছে তা প্রতিহত করার জন্য ডঃ মুখোপাধ্যায় আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগার সমূহ যাতে আরও অধিক পরিমাণে ক্রীত পুস্তকে মূল্য ছাড় (Commission) পায় তার জন্য ব্যবস্থা করা

প্রয়োজন। পুস্তকের মূল্যের ক্রমবর্ধমান হার গ্রন্থাগার সংগঠনের এক অন্তরায়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি রাশিয়ার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে অতি অল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে প্রত্যেক গ্রন্থাগারে সরকারী প্রচেষ্টায় পুস্তক সরবরাহ করা হয়। এই মূল্যস্তরে কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত মোট পুস্তক সংখ্যার $\frac{1}{8}$ অংশ ক্রয় করলেও বাৎসরিক চার কোটি টাকার প্রয়োজন। যা ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে ব্যবস্থা করা দুরূহ।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকতায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন ডঃ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক না থাকলে পুস্তক পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও ঠিকমত পুস্তক পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন গ্রন্থাগার বড় হলেই সম্পদ হয়ে দাঁড়ায় না যদি না তা পাঠকের প্রয়োজনে লাগে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণারও সুযোগ রয়েছে অনেক। গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং জনসাধারণকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করে তোলা গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব।

সম্মেলনে ভাষণ দিতে উঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সম্মেলনের সংখ্যার দিকে। হিসাবানুসারে বর্তমান সম্মেলনকে ২৭তম এবং পরবর্তী সম্মেলনকে সেই সংখ্যানুসারে সংশোধন করে নিতে তিনি পরিষদকে অনুরোধ জানান। শ্রী বসু বলেন গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র পুস্তক সংগ্রহ নয়, অন্যান্য Andio-Visual সাজ-সরঞ্জামাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাই শিক্ষার উন্নতি হয়নি বলে গ্রন্থাগারের উন্নতিকে ব্যহত করা চলে না। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের পরিমাণের চেয়ে পদমর্যাদার দিকে অধিক লক্ষ্য রাখতে বলেন, যদিও কাঞ্চন মূল্যই বর্তমান সামাজিক অবস্থার মূল্যায়নের মাপকাঠি তবুও পদমর্যাদা সেই তুলনায় অনেক বেশী সম্মানজনক।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানান স্থানীয় বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সম্মেলন উপলক্ষে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন শ্রীতুষার কান্তি সান্যাল। শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন সর্বশ্রী শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন, জাতীয় অধ্যাপক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ; ত্রিগুণা সেন, মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম, ক্যামিক্যাল এবং মাইনস ও মেটালস ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপালের পক্ষে সহকারী সচিব ; পি, সি, মহলানবীশ ; হেমচন্দ্র গুহ, উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; ডঃ রমা চৌধুরী, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ; মুজাফর আহমদ, সম্পাদক, নন্দন ; এছাড়াও ইউনেস্কোর লাইব্রেরীজ অ্যাণ্ড আরকাইভস সারভিসেস ; ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশনাল দ্য ডকুমেণ্টেশন ; ব্রিটিশ মিউজিয়াম ; অ্যামেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ; ঘানা লাইব্রেরী বোর্ড ; অ্যাসলিব ; লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, ওয়াশিংটন ; স্কুল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডন ; লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া ; স্পেশাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন, নিউইয়র্ক ; অ্যাসোসিয়েশন অব রিসার্চ লাইব্রেরীজ, ওয়াশিংটন।

অতঃপর সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীজীবানন্দ সাহা তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন।

(ভাষণ অন্যত্র মুদ্রিত)। সভাপতির ভাষণ শেষে চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কার্যসূচী ঘোষণা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী। বিগত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের (২৩তম) সিদ্ধান্ত রূপায়ণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে যে প্রচেষ্টা চালান হয়েছে তারও বিবরণ দেন। তিনি জানান যে উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিধান সভার সদস্য, রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও সমাজশিক্ষা বিভাগের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে ৬ই আগষ্ট, ১৯৭০ তারিখে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন ও অন্যান্য দাবী নিয়ে বিধান সভার নিকট একটি গণডেপুটেশনের আয়োজন করা করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দুঃখের বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবিষয় আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়নি এবং দাবীগুলি পূরণের বিশেষ কোন চেষ্টাও হয়নি।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে UGC বেতনক্রম চালু করা, প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিকসহ পূর্ণাংগ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা, সরকারের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ১৯৬১ সালের বেতন কমিশন ঘোষিত বেতনক্রম চালু করা প্রভৃতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকেও সুবিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হয়। এই ন্যায্য দাবিগুলি আদায়ের জন্য বর্তমানেও পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের বিভাগীয় কর্মসচিবদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা হচ্ছে।

কুচবিহারের গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীজিতেন নন্দীকে অন্যায়ভাবে সাসপেণ্ড করার প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, সহকারী মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ করে অবিলম্বে তাঁকে কাজে যোগদান করবার দাবি জানান হয়। এবং এরই ফলে শ্রীজিতেন নন্দী বর্তমানে কাজে যোগদান করেছেন এবং সরকার থেকে আদেশ হয়েছে যে, তিনি Suspension Period এর সম্পূর্ণ বেতন পাবেন। কুচবিহারের বর্তমান রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের কাজে কুচবিহারের DSEO যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করছেন তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসচিবের নিকট এক স্মারকলিপিতে DSEOকে সংযত হবার দাবি জানান হয়েছে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট (প্রাতঃকালীন) এর গ্রন্থাগারিককে অন্যায়ভাবে অপসারিত করবার এক প্রচেষ্টা পরিষদের সময়োচিত হস্তক্ষেপে বানচাল হয়ে যায়।

কলকাতার প্রতাপ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার এর গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের

সমস্যার প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষাসচিবের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা, সার্বিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দাবির ভিত্তিতে পরিষদ্ শিক্ষা আন্দোলনের সামিল হয়েছে। যুক্তসংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচীকে সফল করবার জন্য পরিষদ বিভিন্ন জেলায় সদস্য ও অনুরাগীদের যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচীকে সফল করবার আবেদন জানিয়েছে।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার কর্মীদের ১৯-২১শে জানুয়ারী তারিখে যে ঐতিহাসিক কর্মসূচী পালন করা হয়, পরিষদ তাতে সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

শিক্ষার দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষকরা নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে বিধানসভার সামনে যে গণঅবস্থানের কর্মসূচী পালন করেন পরিষদের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়।

বিভিন্ন শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পরিষদ এই সিদ্ধান্তেই এসেছে যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজেদের স্বার্থেই আরো বেশী করে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন এসেছে। সুতরাং গ্রন্থাগার কর্মীরা আগামী দিনের কঠিন সংগ্রামের অংশীদার হবার জন্য নিজেদেরকে মানসিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রস্তুত করুন।

অধিবেশনের সমাপ্তিতে উপস্থিত প্রত্যেককে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। শ্রীমতি মুক্তি মৈত্রের সমাপ্তি সঙ্গীতের পর উদ্বোধনী অধিবেশন শেষ হয়।

প্রতিবেদক : বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Proceedings of the inaugural session.

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

সমাগত সুধীবৃন্দ,

পল্লীর প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। দূরদূরান্তর থেকে জ্ঞানীগুণী আপনারা এই অখ্যাত পল্লীতে এসেছেন। আমরা কৃতার্থ। আমাদের ডাকে আপনারা সানন্দে সাড়া দিয়েছেন। এরজন্য পল্লীবাসী হিসাবে আমরা কৃতজ্ঞ।

ভারতবর্ষের প্রয়োজনের তাগিদেই পল্লীর অধিবাসীদের দেহের, মনের এবং আত্মার খোরাকের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেই হবে। আমাদের প্রধান শিল্প কৃষি। দেশের শতকরা পঁচাশি জন গ্রামে বাস করে। স্বাস্থ্যে, সম্পদে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে পল্লী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলে তবেই ভারতের চেহারা পাল্টাবে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা জীবনযাত্রার শুরুতে বেশ চটপটেই থাকে। বাঁচবার এবং শিখবার উৎসাহ তাদের মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু উৎসাহ থাকলে হবে কি! তাদের পরিবেশের মধ্যে প্রাণবসন্তের সে হাওয়া কই? তাদের জীবন-ধারায় সে গতিবেগ কই? ফলে ছেলেমেয়েগুলো একটু বড় হ'লেই কেমন যেন ম্যাদাটে হয়ে যায়। গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে সামনের দিকে চলতে চায় না।

জীবন আমরা সকলেই চাই। আর বাঁচার মতো করে বাঁচতে গেলে জীবনে যা যা দরকার গ্রামীণ ভারতবর্ষে সেগুলি অবহেলিত হয়েছে। মুষ্টিমেয় অতিকায় সহরে দেখছি প্রাণের ফেনিল উচ্ছাস এবং লক্ষ লক্ষ গ্রামে দেখছি, জীবনের প্রবাহ থেমে গেছে। জড়ের রাজত্বে গ্রামগুলো মৃত্যুর ছায়ায় ধুঁকছে।

এই যে একটা তামসিক নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পল্লী অঞ্চল ঘুমে ঢুলছে—এ নিশ্চেষ্টতার মধ্যে উৎসাহের আগুন জ্বালানো যায় কেমন ক'রে? এতদঞ্চলে তখন নতুন এসেছি আমরা সহর থেকে। কলরবমুখর আজিকার এই প্রাণচঞ্চল প্রান্তর ছিল সেদিন জনহীন। রাখালেরা আসতো গরু চরাতে। এখন থেকে প্রায় বাইশ বছর আগে এই প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল লোক-সেবা-শিবির শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায়। শিবিরের কর্মীরা সংখ্যায় ছিলেন খুবই অল্প। নেপথ্যের আড়াল থেকে যিনি কর্মীদের কাজে প্রেরণা দিতেন, পরামর্শ দিয়ে তাদের সংশয় দূর করতেন, তিনি ছিলেন এক মঞ্জুভাষিনী, নম্রনীরব নারী। জনসাধারণের প্রতি তাঁর হৃদয়ে ছিল বিপুল সহানুভূতি, বুদ্ধিতে তাঁর মন ছিল উজ্জ্বল, অপরাজেয় আশায় তাঁর চিত্ত ছিল পরিপূর্ণ। নিষ্প্রাণ পল্লীতে নবজীবনের প্রবাহ আনতে উদ্যত যারা তাদের সম্মুখীন হতেই হবে বাধার পর বাধার—এ কথা তিনি জানতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেই তিনি এই পরিবেশের মধ্যে এসেছিলেন। নিদারুণ নিঃসঙ্গতা, প্রচণ্ড বাধা, দুঃসহ দারিদ্র্য, নিন্দার শরজাল—কিছুই তাঁর জীবন থেকে বাদ যায়নি। এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এক অদ্ভুত নারী এবং বঙ্গদেশের এক নগণ্য কবি একদা স্বপ্ন দেখতো কি ক'রে আশাহত গ্রামবাসীদের অবসাদগ্রস্ত হৃদয়ে একটা নতুন উৎসাহ সঞ্চার করা যায়। সেই স্বপ্ন প্রথম রূপ নিল রামকৃষ্ণ পাঠাগারে। যারা বিক্ষিপ্ত হয়েছিল তারা শিবিরকে কেন্দ্র ক'রে প্রথম

বাঁধলো দানা এবং একটা ছোট আলমারির গুটি পঞ্চাশ বই নিয়ে যাত্রা শুরু হ'ল পাঠাগারের। যিনি নিরন্তর স্নেহবারিসিঞ্চনে সেদিনের সেই গ্রন্থাগারের বীজটিকে অঙ্কুরিত ক'রে এই পল্লবিত কুসুমিত রামকৃষ্ণ পাঠাগারে পরিণত করলেন তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। এই ভাষণের প্রথমে তাঁর উদ্দেশে শিবিরের এবং এতদঞ্চলের গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করি।

লোক-সেবা-শিবিরের উদ্যোগেই এখানে বেসিক কলেজটা গড়ে ওঠে। শিবিরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সারদামণি-ইলাকন্যা বিদ্যাপীঠ, একটী শিশু বিদ্যালয়, একটী নৈশবিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের কিছু সেবা করবার আমরা সুযোগ পাচ্ছি। এখানকার মাদার ট্রেনিং শিক্ষা নিয়ে অনেক মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বছরে বছরে এখানে গদাধরের মেলায় বহু লোক সমাগম হয়। এই মেলাও শিবিরের নানা কাজের একটি অঙ্গ। তা ছাড়া পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় "সব মানিদের মজলিস"-এ আমরা একত্রিত হ'য়ে সাহিত্য আলোচনা করি। গানেরও বৈঠক হয়।

নির্ম্মলসলিলা জলাঙ্গীর তীরে বড় আন্দুলিয়া গ্রামের ঐতিহ্যে সংস্কৃতির পরিচয় কি আছে জানতে পারিনি। এখান থেকে কিছু দূরে হাঁটরার ঘাট যেখানে, কথিত আছে, অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া-নৌকায় নদীপার হয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যে বাগুয়ান পরগণার আন্দুলিয়া গ্রামের উল্লেখ আছে। অন্নপূর্ণার খেয়া পার হওয়ারও বর্ণনা আছে। কবি ভারতচন্দ্র আমাদের এই নদীতীরবর্ত্তী গ্রামখানিকে তাঁর কাব্যে ঠাঁই দিয়েছেন।

এমন একটা পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সম্মেলনে মিলিত হয়েছি যাকে আশার আলোকে উজ্জ্বল বলতে আমাদের সাহস হয় না। বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, এই ভাবটাকে কিছুতেই আমরা মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছিনে। আমাদের আশ্রয়-গুলো যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আমরা যেন একটা পাগলা, "অরাজক, অনীশ্বর, ভয়ার্ত্ত জগতে" বাস করছি। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই শুনতে পাচ্ছি বিরোধের কোলাহল। দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্রই নিষ্ঠুরতার এবং বিদ্বেষবুদ্ধির প্রকাশ চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রকেই আজ ভাবিয়ে তুলেছে। প্রকৃতির উপরে এত আধিপত্য বিস্তার ক'রেও আজ আমরা নিজেদের কত নিঃসহায় বোধ করছি। মধ্যযুগের লোকেরা কি নিজেদের এত অসহায় ভাবতো? এই সমস্ত অশুভের উৎস কিন্তু বাহিরের জগতের কোথাও নেই। অমঙ্গলের উৎস আমাদের ভিতরেই। যৌবনেই এমন কতকগুলো sentiment আমাদের মনের মধ্যে যা মেরে মেরে বসিয়ে দেওয়া হয় যারা অবচেতনায় ঘোরাফেরা করে এবং ধ্বংসাত্মক কাজে আমাদিগকে উস্কানি দেয়। আমাদের শৈশবের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমেও এমন সব প্রবণতা আমাদের মর্ম্মমূলে বাসা বাঁধে যারা শাণিত ক'রে তোলে দলগত অথবা জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে, কিছুতেই আমাদিগকে মিলতে দেয়না পরস্পরের সঙ্গে। আজ সমস্ত বঙ্গদেশে কি গ্রামের, কি সহরের মানুষগুলি একটা আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। রাষ্ট্রতরীর

হালে ছিলেন যাঁরা তাঁদের ঐক্য চুরমার হ'য়ে গেলো ভেদবুদ্ধির পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে। দেশের কল্যাণের চেয়ে দলের কল্যাণ হোলো বড়ো। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আজ এতই আড়ষ্ট হ'য়ে উঠেছে, চারিদিকের আবহাওয়ায় আজ এত বেশী উত্তাপ, জগৎ জুড়ে মানুষের দুঃখ-দুর্গতি আজ এতই দুঃসহ যে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য যে পরিচ্ছন্ন শুভবুদ্ধির দরকার সেই বুদ্ধিও লোকে হারিয়ে ফেলেছে।

'কিন্তু হতাশ হবার যুক্তিসঙ্গত কোনই কারণ নেই। মানবজাতির সুখের পথ নিশ্চয়ই খোলা আছে। মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজন ঐ পথগুলিকে বরণ ক'রে সুখী হওয়ার উপায়গুলিকে কাজে লাগানো।" হিংসায় উন্মত্ত ইউরোপের মহাযুদ্ধের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আশাহত মানবপরিবারের কানে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন পরলোকগত মহাপ্রেমিক এবং মহাজ্ঞানী বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল। আশার আলো তিনি দেখেছিলেন শিক্ষার মধ্যে। Education and the Social Order পুস্তকে যেখানে সমাপ্তির রেখা টেনেছেন সেখানে আছে: The cure for our problems is to make men sane, and to make men sane they must be educated sanely." অর্থাৎ "আমাদের সমস্যাগুলির প্রতিকারের উপায় হ'চ্ছে মানুষগুলিকে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ ক'রে তোলা। আর মানুষগুলিকে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ করতে হ'লে তাদের এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে যার মধ্যে মূঢ়তার লেশমাত্র নেই।"

একটা উন্মাদ জগৎকে আবার শুভবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রাসেল প্রতিকারের যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন অর্থাৎ শিক্ষাই যদি পরম আশ্রয় হয় তবে এই গ্রন্থাগার সম্মেলনের সার্থকতা সম্পর্কে আমাদের মনের মধ্যে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো বিকীরণের কাজে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনের বিচিত্র কর্মধারা থেকে পোলিটিক্সকে বাদ দেওয়ার কথা ওঠেই না। জীবনকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে সেই খণ্ডিত সীমিত জীবনে আমরা বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতে পারিনে। কিন্তু পোলিটিক্সকে আমরা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে বসেছি। আমাদের চেতনার ক্ষেত্রের বারো আনা আজ পোলিটিক্সের দখলে। আমাদের সহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের বিরাম নেই, শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ মুখর, বিভিন্ন পোলিটিক্যাল পার্টির প্রতীক চিহ্নগুলিতে দেয়ালগুলি ভর্তি, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট লেগেই আছে, ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হ'য়ে পার্টি পোলিটিক্সের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এমন কি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা পর্যন্ত পার্টি-পোলিটিক্সের প্রভাবে আমাদের বিদ্যামন্দিরগুলির শান্ত আবহাওয়াকে উত্তপ্ত ক'রে তুলতে দ্বিধাবোধ করছেন না।

পোলিটিক্স নিয়ে এত ঘাঁটাঘাটির ফলে যা ঘটবার তাই ঘটেছে অর্থাৎ নর-নারীর চিন্তারাশি জাতির মর্মের গভীর থেকে একদম উপরে চলে আসতে চাইছে। যেখান থেকে জাতি তার সমস্ত প্রাণরস আহরণ করবে সেই আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র হ'তে জীবন স'রে এসেছে

প্রত্যন্ত সীমায়। আমাদের পিছনে এমন কিছু নেই যাকে আমরা আশ্রয় করতে পারি। মনের জীবনকে এমন দরিদ্র রেখে যেখানে আমাদের পৌঁছানোর কথা সেখানেই পৌঁছেছি। দারিদ্র্যে আমরা অভিশপ্ত, ভেদ-বুদ্ধির প্রাবল্যে আমরা একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন, আমরা পিতৃহারা শিশুর মতোই পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—নিঃসহায় এবং ভয়ার্ত।

রাসেলের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে আবার বলি, The cure for our prolems is to make men sane, and to make men sane, they must be educated sanely. মানুষগুলিকে এমনভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে যাতে তাদের মনে মূঢ়তা বাসা বাঁধবার সুযোগ না পায়, হিংসা থেকে তাদের মন যাতে মুক্ত থাকে। শিক্ষার উপরে এতটা জোর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষির কোন গুরুত্ব নেই। শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর এই জন্যই দেওয়া হয়েছে, কারণ যে মানুষ শিক্ষার আলো পেয়েছে তার পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। অশিক্ষিত লোকের কাছে কল্যাণের সকল দুয়ার অবরুদ্ধ। আমাদের মেয়েদের জন্য শিক্ষা চাই, ছেলেদের জন্যও। আমাদের ধর্মশিক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, কারিগরী শিক্ষারও তেমনি প্রয়োজন আছে। কিন্তু, নিবেদিতার ভাষায়, আমাদের প্রায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে জনশিক্ষার উপরে, We must have education of the people.

গ্রাম থেকে গ্রাম পেরিয়ে চলে যান বঙ্গদেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত। কি দেখতে পাবেন? পল্লীতে শ্রী বলতে কিছু নেই। রাস্তাঘাট নোংরা। বাতাসে দুর্গন্ধ। সমাজ-চেতনার অভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হবে। কোনরূপ অত্যুক্তি না ক'রে বলা যেতে পারে গ্রামগুলো এক একটা নরককুণ্ড হ'য়ে আছে। আর এতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই। জাতির আত্মার এবং চরিত্রেরই তো বহিঃপ্রকাশ তার বাহিরের পরিবেশের মধ্যে। জন-সাধারণের মনের জীবনেরই প্রতিফলন তার বাহিরের আবেষ্টনীতে- এমন কথা নিঃসংশয়ে অকুণ্ঠ ভাষায় বলা যেতে পারে। সুন্দরকে যে ভালোবেসেছে সে কখনোই হৃষ্টচিত্তে বাস করতে পারবে না এমন গৃহে যেখানে কোথাও রুচিবোধের কোনো ছাপ নেই। তাই যখনই গ্রামের মানুষগুলির আচ্ছন্ন চেতনাকে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির আলোকে আমরা আলোকিত ক'রে তুলতে পারবো, গণ-মানসে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারবো এমন জীবনের যা কল্যাণশ্রীতে উজ্জ্বল, তখনই শুরু হবে পরিবর্তনের পালা, পালটাতে আরম্ভ করবে গ্রাম্যজীবনের চেহারা। জাতীয় চেতনাকে মরু-প্রান্তরের শূন্য পাণ্ডুরতার মধ্যে রেখে আমরা তো দেশকে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারবো না। একটা বলিষ্ঠ চিন্তার জগতে জনসাধারণকে জাগরিত ক'রে তুলতে না পারলে মনুমেন্টের পাদদেশে বক্তৃতার পর বক্তৃতায় জনতার মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে তুলে দেশকে নিঃসন্দেহে আমরা আরও পাগল ক'রে তুলবো। যারা সংবাদপত্রের বাহিরে আর কিছুই পড়ে না তারা মর্ত্য লোকের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্পর্কে কি জানবে?

প্রায় পঁচিশ বছর ধরে গ্রামে বাস করছি, আর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, একটা বিরাট তামসিকতার আমরা যেন জড়ভরত হয়ে আছি। একটা গতানুগতিকতার মধ্যে আমাদের দেহ, মন, আত্মা নিশ্চল হয়ে আছে। আত্মবিশ্বাস নেই, উৎসাহ নেই। বিবেকানন্দ এই তামসিকতা দূর করবার জন্য অবসাদগ্রস্ত জাতিকে শুনিয়েছিলেন উপনিষদের অগ্নিগর্ভ বাণী। জনসাধারণ জানুক, তারা আত্মা, অনন্ত শক্তির আধার। তারা ইচ্ছা করলে সব করতে পারে। আমারও মনে হয়েছে, গ্রাম্যজীবনের জড়ত্বের মধ্যে উৎসাহের প্লাবন আনতে হলে গ্রামবাসীদের বৌদ্ধিক অথবা মনের জীবনের বিকাশসাধনের দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। আর জনসাধারণের মনগুলিকে নাড়া দিতে হ'লে গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্বকে আমরা একটুও অবহেলা করতে পারিনে।

গ্রামে লেখা-পড়া-জানা ছেলে মেয়ের সংখ্যা বেশী না হ'লেও তারা আগের মতো দুর্লভ নয়। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। গ্রাম্য সভ্যতাকে নতুন ক'রে গড়ে তুলবার নাট্যলীলায় প্রধান ভূমিকা নেবেন কারা, তার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে। গ্রামে যাঁরা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তাঁরাই হবেন "আলো হাতে আঁধারের যাত্রী"। তাঁরাই এবং তাঁদের মতো আরও যাঁরা আছেন গ্রামে লেখা-পড়া-জানা মানুষ তাঁরাই নেবেন পথিকৃৎ-এর ভূমিকা।

এঁরা যদি হাতের মাথায় ভালো ভালো বই পান সেই সকল বই প'ড়ে এঁদের চিন্তার ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হতে পারে এবং তার ফলে এঁদের প্রেরণায় এবং নেতৃত্বে গ্রামে নূতন প্রাণের বন্যা আসা অসম্ভব নয়। যত রকমের মানবীয় শক্তি আছে তাদের মধ্যে আখেরে চিন্তার শক্তিই প্রবলতম, এতে কোনো সংশয় আছে? কেজো লোকেরা যাই বলুক, পৃথিবীতে শ্রদ্ধার, বিশ্বাসের, আইডিয়ার আধিপত্যকে কে অস্বীকার করবে? জীবন-স্মৃতিতে The Magic Spell of a Book অধ্যায়টিতে গান্ধীজী লিখেছেন রাস্কিনের Unto This Last বইখানি প'ড়ে কি ক'রে তাঁর জীবন রাতারাতি রূপান্তরিত হ'য়ে গেল। সমুদ্র পারে উপনিবেশ স্থাপনের দুঃসাহসিক অভিযানে ইংরেজ জাতিকে প্রেরণা দিয়েছে ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিন্সন ক্রুসো'। ইংরেজবাচ্চার মনের উপরে রবিন্সন ক্রুসোর ছাপ কিছুতেই মুছে যেতে চায় না এবং অজ্ঞাতসারে ক্রুসোকে অনুকরণ করবার প্রেরণা সে রক্তের মধ্যে অনুভব করে। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নর নারীর মনের উপর রামায়ণ এবং মহাভারত—এই দুইখানি মহাকাব্যের প্রভাব অপরিমেয়। রাম, সীতা মহাকবিদের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। একজন মহামানবের অথবা মহীয়সী নারীর চরিত্র কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় তারই আদর্শ তাঁরা তৈরী ক'রে গেছেন গণমানসে। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের জনগণ ঐ আদর্শের ছাঁচে নিজেদের মনগুলিকে ঢালাই করবার চেষ্টা ক'রে আসছে। আজকের দিনের কবিরা মহাকবিদের শোভাযাত্রা থেকে নিজেদের সরিয়ে এনেছে। আধুনিক কবিদের কবিতা প'ড়ে কেউ দিব্য জীবন-যাপনে অনুপ্রাণিত হয় না।

সাহিত্যে চারিত্রিক আভিজাত্যের দিকে কোনো আঙুলি সঙ্কেত না পেয়ে আমাদের গণতন্ত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদের প্রতিনিধিত্বে বরণ করে তাদের কেউ কোর্টের উকীল, কেউ কোম্পানীর ডিরেকটর, কেউ নিছক ভাগ্যান্বেষী। এর ফলে বহুরূপী নেতারা কখন কোন্ রঙ নেবেন, আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না এবং জনসাধারণের মন সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত।

জাতির মর্মের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে একটা গরিমাময় ভাবরাজ্য এবং এই কাজ সুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাহিরের সব-কিছুতেই ফুটে উঠবে সৌন্দর্যের পরিচয়, নতুন প্রাচীন ভারতবর্ষ একটা মহাজাতির যোগ্যবাসস্থানে পরিণত হবে। আর মানুষকে একটা ঋজুশুভ্র মহৎ জীবনযাপনে প্রেরণা সরবরাহ করতে গ্রন্থের কোনো জুড়ি আছে পৃথিবীতে? এ যুগের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Sir Percy Nunn তাঁর Education পুস্তকের উপসংহারে লিখেছেন, মহৎ সাহিত্যগুলি মানুষের মর্মের গভীরে এমন একটা আসন পাতে যাকে কিছুতেই টলানো যায় না। বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতে, বড়ো বড়ো আদর্শগুলির প্রতি মনে একটা গভীর অনুরাগের সঞ্চার করতে সাহিত্য যতটা ক্ষমতা রাখে এত ক্ষমতা সাধুসঙ্গ ছাড়া আর কার আছে?

সুতরাং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যাঁরা জোরদার করার চেষ্টা করছেন এই দুর্ভাগা দিশেহারা বঙ্গদেশে, তাঁদের অন্তর থেকে অভিনন্দিত করি। আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী দরকার মানুষকে ভালো ভালো বই পড়াবার, যাতে একটা বলিষ্ঠ মন তার মধ্যে গড়ে উঠতে পারে, যাতে একটা বৌদ্ধিক জীবন বা intellectual life তার মধ্যে বিকশিত হবার সুযোগ পায়, যাতে এই moral nihilism বা আদর্শহীনতার যুগে সে বিরাট আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জনপদের পর জনপদ, রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে গ্রামের পর গ্রাম। রামায়ণ নেই, মহাভারত নেই, বঙ্কিমের, বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের রচনাবলী নেই কোথাও। জাতির চেতনায় মরুর শূন্যতা হাহাকার করছে। গ্রামে গ্রামে প্রাণ-বসন্তের আবির্ভাব কেমন ক'রে আমরা আশা করতে পারি? জীবন আমাদের এইজন্যই ক্ষুদ্র হ'য়ে আছে।

এইবার দু-একটী খুঁটিনাটি, কিন্তু অত্যন্ত জরুরী বিষয়ের প্রতি প্রতিনিধিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই লাইব্রেরীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একজন হিসাবে আমাকে অনেক সময়ে শুনতে হয়, লাইব্রেরীয়ানের বা পিয়নের বেতন বেশ কিছুদিন ধরে আসছে না। অথচ এই অবস্থার মধ্যে লাইব্রেরীর দৈনন্দিন কাজকর্ম তাঁদের চালিয়ে যেতে হয়। কেন এমন হবে? যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করেন তাঁরা মর্ত্যলোকের বাসিন্দা এবং মর্ত্যলোক, বার্ণার্ডশ'য়ের ভাষায় 'বাস্তবের ক্রীতদাসদের বাসভূমি'। প্রত্যেক মানুষকে দিনে তিনবার খেতে হয়, এর চেয়ে বাস্তব সত্য আর নেই। একজন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কলেজের অধ্যাপক যদি মাসের প্রথমে নিয়মিত বেতন পান তবে একজন লাইব্রেরীয়ান বা তাঁর পিয়ন সে অধিকারে বঞ্চিত থাকবেন কেন? এই গণতন্ত্রের যুগে মানবজীবনের প্রতি এই অশ্রদ্ধা নিঃসন্দেহে একটা অমার্জনীয় অপরাধ।

আর একটী কথা। লাইব্রেরীয়ানের বা পিয়নের পদে যাঁরা বাহাল হবেন তাঁদের বাছাই করার জন্য দুই দফা interview এর ব্যবস্থা কেন? একবার স্থানীয় কমিটী interview নিয়ে তিনজনকে গুণানুসারে বাছেন এবং তাঁদের নাম জেলাকর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। জেলাকর্তৃপক্ষ সরকারী চালুনীতে আর একবার ছাঁকেন এবং তিনজনের একজনকে মনোনীত করেন। এই দুই দফা interview-তে এত সময় যায়। মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগপত্র পাঠাতে এত বিলম্ব হয়। ফলে লাইব্রেরীর কাজ দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকে। প্রথম interview-তে সরকারী কর্তৃপক্ষের কেউ উপস্থিত থাকলে ল্যাঠা সহজেই চুকে যায়। কিন্তু লালফিতের বাঁধন সাতপাকের বাঁধনের চেয়েও দুঃশ্ছেদ্য! কর্তৃপক্ষের কোনো হুঁসই নেই। ওঁরা অন্যের ছিদ্রান্বেষণে যতটা উৎসাহী আত্মসমীক্ষায় তার শতভাগের একভাগ উৎসাহও যদি প্রদর্শন করতেন তবে দেশটা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতো।

আর নয়। সকলকে পুনরায় স্বাগত জানিয়ে এই ভাষণ শেষ করি। নমস্কার।

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মিবৃন্দ, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও সমবেত সুধিগণ,

অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচ নিয়ে আমি আপনাদের এখানে উপস্থিত হয়েছি। তিরিশ বছরেরও বেশী পেশায় ও পরিচয়ে আমি গ্রন্থাগার কর্মী, কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারে ও প্রচারে আমার কোন সেবা বা অবদান নেই বল্লেই চলে। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই অনেক বিষয়ে এবং নানাভাবে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার প্রসারে আমার চেয়ে অধিকতর সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন; তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুষ্ঠু পরিচালনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ আপনারা আমাকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন এ আমার প্রাপ্য নয়। এ কথা আমি অন্তরের সঙ্গে বলছি, কেবলমাত্র মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ নয়।

আমার বক্তব্য আরম্ভের আগে আজ স্মরণ করি সেই সব বিদ্বজ্জনকে যাঁরা এই গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠানের সূচনায় এবং পরে বহুদিন বহুভাবে সেবা করে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই পরিষদকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বিশেষ করে স্মরণ করি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, সুশীল কুমার ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত মহাশয়কে যাঁরা পেশায় গ্রন্থাগারিক ছিলেন না তবুও যে কোন গ্রন্থাগার কর্মীর চেয়ে গ্রন্থাগারকে ভালবেসেছিলেন এবং জীবনে শেষদিন পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারে নিজেদের ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁদের আদর্শ, তাঁদের অকুণ্ঠিত সেবা এই পরিষদের সর্বকালের পাথেয়।

পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণে বলেছিলেন "বড় বড় লাইব্রেরী মুখ্যতঃ ভাণ্ডার; ছোট ছোট লাইব্রেরী ভোজনশালা তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে, ভোগের ব্যবহারে লাগে"। এই ছোট লাইব্রেরী কেমন হবে সে কথায় তিনি বলেছেন—"ছোট লাইব্রেরী বলতে আমি বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য জোগাবার কাজে একটা বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে—এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য; আর লাইব্রেরীয়ানের থাকবে আতিথ্য পালনের যোগ্যতা"। এই ছোট লাইব্রেরী গঠন ও পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি কিছু বলবো।

অর্থের আনুকূল্য থাকলে বড় লাইব্রেরী গড়া এবং তার পরিচালনা সাধারণভাবে এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক এবং সুনিপুণ কর্মী নিয়োগ, এবং গ্রন্থ নির্বাচন ব্যাপক হলেও অর্থের আনুকূল্য হেতু সে কাজ কঠিন হয় না। কিন্তু ছোট লাইব্রেরী গঠন ও পরিচালনে পরিচালককে নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর শিক্ষা, রুচি অনুযায়ী

তার সীমিত অর্থের মধ্যে পুস্তক, পত্রিকা নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে হয়। অর্থ যত কম, নির্বাচনও তত কঠিন হয়ে পড়ে—যাতে একটি পুস্তকও অপঠিত না থাকে অর্থাৎ তার অপচয় না হয়। ছোট লাইব্রেরীর পরিচালকের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে কবি ঐ ভাষণেই বলেছিলেন "প্রত্যেক লাইব্রেরীর অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটা বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। লাইব্রেরীয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরী করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝবো তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরীর মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। তাঁর উপর ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্য পালন—তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন"। ৪২ বছর আগে কবি এই লাইব্রেরী গঠন ও পরিচালন সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন। কিন্তু আজও সমাজের মনে লাইব্রেরীয়ান সম্বন্ধে সেই বহুলোকের মামুলী ধারণাই আছে যে তাঁর কাজ শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বই দেওয়া এবং ফেরৎ নেওয়া। তাঁর কাজ শুধু যান্ত্রিক নয়, অনেকখানি সৃষ্টিমূলক—পাঠকশ্রেণীর জ্ঞানবৃদ্ধি, রুচি সৃষ্টির আগ্রহকে গড়ে তোলবার দায়িত্বও অনেকখানি তাঁর একথা শিক্ষিত সমাজেরও অতি অল্প সংখ্যক লোকই মনে করেন। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন আজও দানা বাঁধেনি এবং এই আন্দোলন শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে এটাই তার মূল বা প্রধান কারণ।

পশ্চিমবাংলার সাড়ে তিনকোটি জনসংখ্যার মধ্যে আড়াই কোটিরও বেশী জনসংখ্যা হলো গ্রামীণ; ছাত্রসংখ্যা চুয়ান্ন লক্ষের উপর; শতকরা ৩৫ জন শিক্ষিত—এ সব সংখ্যাতত্ত্ব সহজেই মেলে কিন্তু এই পশ্চিমবাংলায় মোট কত লাইব্রেরী আছে এবং কোন শ্রেণীর কত লাইব্রেরী তার সঠিক সংখ্যা কারও জানা নেই। ১৯৬৩ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বারা সংকলিত West Bengal Library Directoryই একমাত্র তালিকা যাতে ৩৬২০টি পাব্লিক লাইব্রেরীর পরিচয় আছে। এর বাইরে কত লাইব্রেরী কি পরিবেশে এবং কি অবস্থায় আছে তা না জানতে পারলে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার প্রসারের একটি সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতালাভের পরে দেশে সর্বস্তরের বিদ্যালয় সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় শিক্ষার যথার্থ ভিত্তি যদিও স্থাপন করা সম্ভব হয় নি তবুও বলবো শিক্ষার বহুমুখী প্রসার হয়েছে। এখানেই আমার প্রশ্ন—দেশে শিক্ষা প্রসারের সমান তালে কি গ্রন্থাগার সংখ্যা বেড়েছে বা বেড়ে চলেছে? ক'টি মহাবিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ে ভাল লাইব্রেরী এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা আছে বা সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী সচেষ্ট এবং যত্নবান? বইএর প্রতি অনুরাগ, লাইব্রেরীর প্রতি আকর্ষণ এই সব সৎবৃত্তি বাল্য বয়সেই জাগিয়ে তুলতে হয়। আমাদের দেশে শিশু পাঠাগার নেই বললেই চলে। অতি আধুনিক পাশ্চাত্য কায়দায় বড় বড় শহরে দু'চারটি শিশু পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের পরিচালনা বিজ্ঞানসম্মত, কোথাও ত্রুটি নেই। দেখলে সুন্দর ফুলগাছের সাজানো বাগান মনে হয়। এ প্রসঙ্গে একথাও মনে হয় যে দেশের জনসাধারণের আর্থিক সঙ্গতির

পরিপ্রেক্ষিতে এ অসম্ভব ছোট সহর বা গ্রামে এ ধাঁচের লাইব্রেরী গড়ে উঠবে না কারণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। তাই আমি বার বার বলবো দেশে public library system গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ভাল লাইব্রেরী এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেক সাধারণ লাইব্রেরীর সঙ্গে শিশুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে শৈশবেই বই এবং লাইব্রেরী শিশুমনকে আকর্ষণ করতে পারে। শৈশবেই তারা জানতে শিখুক, ভালবাসতে শিখুক—এ আমার লাইব্রেরী বলে। ছোট বয়সেই ভালবাসতে শিখলে বড় বয়সে তা অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

এবার Public Library system সম্বন্ধে দু'একটা বলি কারণ আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত প্রায় সব সাধারণ লাইব্রেরীই ছোট লাইব্রেরী শ্রেণীর অন্তর্গত। স্বাধীন ভারতে অনেক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর সঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়ণ পরিকল্পনাটিও গৃহীত হয়। এরই ফলস্বরূপ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, প্রতি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার, শহরে এবং মহকুমায় শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার, অঞ্চল বিশেষে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। সরকারী তথ্যে দেখতে পাই বাংলাদেশে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার, ১৮টি জেলা গ্রন্থাগার ২০টি শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার, ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং প্রায় ৫৫০টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। গত ১৬ বছরে এই সব স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সরকারী অর্থে গড়ে উঠলো কিন্তু এ কথা কি বলতে পারি এই সব গ্রন্থাগার এক নুতন আদর্শের সূচনা করতে পেরেছে যাতে দেশের জনসাধারণ লাইব্রেরী মুখী হয়েছে এবং আরও বহু নুতন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে? আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য-জ্ঞান আনন্দ পরিবেশন এবং সর্বাঙ্গীন মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য লাইব্রেরী অপরিহার্য-এ কতজন বলছে? উপস্থিত যেভাবে আমাদের সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী লাইব্রেরীগুলি পরিচালিত হচ্ছে তাতে জনসাধারণের মনে সেই উৎসাহ জাগছে না। এ যেন হলেও চলে না হলেও ক্ষতি নেই। দৈনন্দিন জীবনে লাইব্রেরী এক অপরিহার্য অঙ্গ এ উপলব্ধি না হলে সাধারণের কাছে লাইব্রেরী সার্থক হোল কোথায়?

প্রায় ৪০ বছর ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করবার জন্য আন্দোলন করে আসছে। ১৯৩২ সালে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন পরিষদে ভারতের সর্বপ্রথম Library bill পেশ করেন। Bill-টি গৃহীত হয়নি। এর ১৬ বছর পরে ১৯৪৮ সালে Madras Public Libraries Act-ই প্রথম আইন যা সুষ্ঠু লাইব্রেরী ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পথ সুগম করে। এরপর ১৯৫৫ সালে Hyderabad Public Libraries Act (যা পরে ১৯৬০ সালে Andhra Public Libraries Act বলে প্রচলিত হয়) ১৯৬৫ সালে Mysore এবং ১৯৬৮ সালে Maharashtra Public Libraries Act বলবৎ হয়েছে। উপস্থিত কেরেলা সরকারের একটি Library bill বিবেচনাধীন। ভারতবর্ষে বাংলাদেশ

গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রগামী হলেও বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোন আইন প্রচলন সম্ভব হোল না। পরিষদ একাধিকবার সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, বিলের খসড়া উপস্থিত করেছেন। সরকার মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করেছেন, আশার বাণী শুনিয়েছেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই করেন নি।

গ্রন্থাগার বিল পাশ হলে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যয়ভারের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন ১৯৫৭ সালে সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি এই সুপারিশ করেছিলেন। পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রাজ্যে বিনা চাঁদার সাধারণ লাইব্রেরী চালু করবার যে কাঠামো দিয়েছেন তাতে যে ১২/১৫ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হবে তা সমাজ শিক্ষা খাতের বরাদ্দ থেকে পাওয়া হয়তো মোটেই কঠিন নয়। পরিষদের প্রস্তাবে গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সংস্থানের জন্য রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের ২½ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় সমেত সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের বাজেটের ৬½ শতাংশ ঐ সব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য বরাদ্দ করে গ্রন্থাগারগুলির সুপরিচালনার ব্যবস্থা করবেন।

দেশে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য আইন প্রণয়ন অপরিহার্য। সরকারী আইন দ্বারা সকল স্তরের গ্রন্থাগারগুলি যদি এক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় এক সূত্রে বাঁধা যায় যাকে বিদেশে integrated Library system বলে তবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় কিছুটা সুব্যবস্থা হবে সন্দেহ নেই। তবে যদি আমরা মনে করি সরকারী ব্যবস্থায় অর্থের অনুকূল অবস্থা হলেই গ্রন্থাগার পরিচালনা সুষ্ঠু হবে এবং আদর্শ গ্রন্থাগার সৃষ্ট হবে তা হলে নিতান্তই ভুল করা হবে। গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট মান এবং তাকে রূপায়িত করতে গ্রন্থাগার পরিষদের দায়িত্ব চিরদিনই সমভাবে থাকবে। সরকারী ব্যবস্থায়, সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে সমাজের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠা এবং পরিচালনার দিক থেকে তা কতটা উন্নত হতে পারে তা আলোচনা সাপেক্ষ। একদিকে সরকারী ব্যবস্থা ও আর্থিক সাহায্য এবং অপরদিকে শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগ ও ঐকান্তিকতা এই দুয়ের সুসমত সংযোগ সকল স্তরের গ্রন্থাগার পরিচালনার সঠিক নির্দেশ দিতে পারবে যার ফলে সেগুলি ক্রমে ক্রমে আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত হবে। রাষ্ট্র যদি অর্থের সংস্থান ও সুসম বণ্টনের ভার নেন এবং গ্রন্থাগার পরিষদকে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করবার সুযোগ দিয়ে নিজে শুধু পরোক্ষভাবে জড়িত থাকেন তা হলে গ্রন্থাগারের উন্নতি দ্রুততর হবে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে পরিষদ তার কর্মব্যবস্থা ও পরিকল্পনার দ্বারা সরকারকে সচেতন করতে যত্নবান হবেন আশা করছি।

এবার পরিষদের এই সম্মেলনে পরিষদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবো। ভারতের সকল প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদগুলির কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে নিসঙ্কোচে বলতে পারা যায় প্রতিষ্ঠা, সুপরিচালনা এবং প্রগতিশীলতার দিক থেকে আমাদের এই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অগ্রগণ্য। ভারতের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা অন্য কোন প্রাদেশিক

পরিষদের নিজস্ব গৃহ নেই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে ১৯৬৮ সালে—এ আমাদের গৌরব। পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' ২০ বছর গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিয়োজিত। পরিষদের শিক্ষণ কেন্দ্রে বহু শত ছাত্র গ্রন্থাগার শিক্ষা লাভ করে গ্রন্থাগার পরিচালনায় নিযুক্ত। তবু দ্বিধা না করে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে বা পরিষদ পরিচালিত পাঠ্যক্রমে আমরা যাকে Library Science বা techniques বলি শুধু এই সব বিষয়েই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রন্থাগারিকের কাজ বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারে কাজ করতে গেলে সমাজকে জানা প্রয়োজন। সমাজতত্ত্বকে বাদ দিয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যা সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে কোন পরিবর্তন আনা সময় সাপেক্ষ। আমার মনে হয় পরিষদ অতি সহজেই সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাঁদের পরিচালিত পাঠ্যক্রমকে আরও ব্যাপক ও সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

এরপর আমি বলবো পরিষদ তার তত্ত্বাবধানে দু'একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরিকল্পনা করুন যাকে আমরা আদর্শ বা model লাইব্রেরী বলতে পারবো। কবির ভাষায় বলবো 'ভোজনশালা'। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাকবে তা সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য; আর পরিচালক থাকবেন আতিথ্য পালনের সকল যোগ্যতা নিয়ে। খুব বিরাট বা ব্যাপক কিছু নয়, ব্যবস্থা এমন হবে যে দেশের জনসাধারণ তা প্রয়োজন মতো সামান্য অদল বদল করে তার নিজের পরিবেশের মধ্যে গড়ে তোলবার অনুপ্রেরণা পেতে পারে এবং নিজেদের উপযোগী একটা গ্রন্থাগারের কাঠামো অতি সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। এই আদর্শ লাইব্রেরীই হবে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাকেন্দ্র যেখানে শিক্ষার্থীরা যথার্থই হাতে কলমে শিক্ষা পাবে; একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং লাইব্রেরী পরিচালনে সঠিক নির্দেশ পাবে। আর সরকার সু-সম গ্রন্থাগার পরিচালনার একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাবে, যার ফলে গ্রন্থাগার বিল প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হতে কোন সংশয় থাকবে না।

আমার আর একটি প্রস্তাব—পরিষদ একটি গ্রন্থ ভাণ্ডার (Book house) গড়ে তুলুন। যে ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন ও চাহিদা মতো ছোট ছোট লাইব্রেরীতে পুস্তক ও পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করবেন। বহুলোক আছেন যাঁরা-তাঁদের ভাল ভাল বই যা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আর লাগছে না তা দান করে দিতে চান কিন্তু জানেন না কোন বই কোন লাইব্রেরীকে দিলে যথোপযুক্ত সমাদরে গৃহীত হবে এবং ব্যবহৃত হবে। অর্থনৈতিক চাপে বহুলোক স্থান সঙ্কুলানের অভাবে তাদের বইএর ভাণ্ডার দান করে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেন। এ কথা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। গ্রন্থাগার পরিষদ যদি এক ভাণ্ডার সৃষ্টি করেন এবং জনসাধারণের কাছে ভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্য আবেদন করেন তবে আমার বিশ্বাস অল্প সময়েই ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। "আমার ভাণ্ডার আছে

তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।" এই সঙ্গে পরিষদ যদি গ্রন্থাগার সপ্তাহে একটা প্রোগ্রাম নিতে পারেন—'ছোট লাইব্রেরীর জন্য একটি বই দান করুন—তা নূতন বা পুরাতন হোক'—প্রতি বছর যদি ১০০০ বইও এইভাবে সংগ্রহ করা যায় এবং তা এক নির্দিষ্ট প্রথায় বিতরণের ব্যবস্থা হয় তবে পরিষদের জনসংযোগ বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং পরিষদের প্রতিষ্ঠা বিস্তার লাভ করবে।

পরিষদকে আর একটি বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করি। এটি হচ্ছে ভাল বই চয়নের নির্দেশ। প্রতি বছর প্রকাশিত বইএর সংখ্যা যেমন বেড়ে যাচ্ছে তার দামও প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে; কিন্তু সেই অনুপাতে লাইব্রেরীগুলিতে বই সংগ্রহের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বাড়ছে না। এইজন্য উপযুক্ত বই নির্বাচন ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রন্থ নির্বাচনে সহায়তা করবার দায়িত্ব নিতেই হবে। প্রতি সংখ্যা 'গ্রন্থাগার'-এ নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা, যাকে বলবো recommended books by Library Association, তা প্রকাশ করা হলে বহু সাধারণ লাইব্রেরী উপকৃত হবে। সাধারণ লাইব্রেরীগুলি নির্দিষ্ট মানের এবং উপযোগী পুস্তক চয়নের জন্য পরিষদের উপর নির্ভর করবে—এতে সাধারণ ভাবে শুধু কাজই সহজ হবে না লাইব্রেরীগুলি ক্রমে ক্রমে উন্নত মানের পাঠ্য পরিবেশন করে সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

পরিষদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এই আমার বক্তব্য—আশা করি কর্মীর অভাবেও কাজে বাধা পড়বে না। পরিষদকে মনে রাখতে হবে গ্রন্থাগার আন্দোলন গ্রন্থাগার কর্মীদের বাইরে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে না পারা পর্যন্ত তা ব্যাপক হবে না। ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আকার না নিলে কোন সরকারই এ আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন হবেন না। জনসাধারণকে এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যে টানতে হলে তাদেরকে উপলব্ধি করাতে হবে লাইব্রেরী কেমন হবে এবং সেই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হলে তার কি প্রাপ্য। সহরে গ্রামে মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা গড়ে ওঠে স্থানীয় লোকেদের তাগিদে এবং আর্থিক আনুকূল্যে। সেইভাবে যে দিন স্থানীয় লোকেদের তাগিদে এবং সরকারী সাহায্যে বহু ছোট আদর্শ লাইব্রেরী গড়ে উঠবে, জনসাধারণ লাইব্রেরীকে তার প্রতিদিনের সঙ্গী হিসাবে দেখতে শিখবে, সেদিনই গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থক হবে।

ভাল কথা বারবার বল্লেও পুরানো হয় না তাই পূর্ববর্তী একাধিক সম্মেলনের সভাপতি যে কথা বলেছেন সে কথা আবার বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 'সরকারের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ, জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন, পরিষদ কর্মীদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও তৎপরতা একসঙ্গে যুক্ত হলেই সকল সমস্যার সমাধান ও বাংলার গ্রন্থাগার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা সম্ভব হবে'।

জীবানন্দ সাহা

Presidential address

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন : ২৮শে মার্চ, সকাল ৮ ঘটিকা

সরকার প্রবর্তিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা

(সম্মেলনে আলোচিত প্রথম প্রবন্ধ)

প্রবন্ধকার : **শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত**

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন শুরু হয় ২৮শে মার্চ, সকাল ৮টায়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মূল সভাপতি শ্রীজীবানন্দ সাহা। প্রবন্ধকার শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করার পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন **শ্রীসত্যব্রত সেন**। তিনি বলেন জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার কমিটিগুলির সম্পাদক হবেন সংশ্লিষ্ট জেলা গ্রন্থাগারিক এবং উচ্চতর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না রেখে চাকুরীর মেয়াদের ভিত্তিতে পদোন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। **শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**, গ্রন্থাগার কমিটিগুলির কার্যে অবহেলার অভিযোগ আনেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন এবং গ্রন্থাগারে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী তোলেন **শ্রীপ্রণত মুখোপাধ্যায়**। জেলা গ্রন্থাগারিককে 'গ্রন্থাগার পরিদর্শক' পদে নিয়োগের জন্যও তিনি সুপারিশ করেন। **শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী**, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হলেও দেশে কোন সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির অব্যবস্থার জন্য কোন তদন্ত কমিটি গঠন না করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই সম্পর্কে দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। সারা বাঙলায় একই ধরণের গ্রন্থাগার নিয়ম প্রবর্তন এবং সমস্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী তত্ত্বাবধানে আনার জন্য সুপারিশ করেন, **শ্রীমহিমাময় বন্দ্যোপাধ্যায়**। **শ্রীবিশ্বনাথ কোলে** প্রবন্ধ সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের কোন উল্লেখ নেই, উল্লেখ নেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের অভাবের কথা। প্রবন্ধের বিভিন্ন সুপারিশ সম্পর্কে শ্রী কোলে বলেন সমস্ত সুপারিশই অন্তবর্তী কালীন সুপারিশ, একমাত্র সুপারিশ হবে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক ক্রয়ের জন্য এককালীন সাহায্য দেওয়ার কথাও তিনি বলেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের অনিয়মিত বেতন প্রদান এবং রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ঔদাসীন্যে জেলা পরিষদের কার্যে গাফিলতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যথাক্রমে **শ্রীতুষারকান্তি লাঙ্গাল ও শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে **শ্রীমঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য** বলেন গ্রন্থাগারিকতার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়েই Library Directorate গঠন

করতে হবে এবং গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ দিতে হবে—বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তিনি গ্রন্থাগারিকতায় স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম গ্রহণে জেলা গ্রন্থাগারিকদের Deputation এ যাওয়ারও দাবী জানান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে **সর্বশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ রায়, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, কেশবলাল চক্রবর্তী, নেপাল চক্রবর্তী, মধুসূদন ভাণ্ডারী** স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। শ্রীভাণ্ডারী গ্রামীণ গ্রন্থাগারে 'সাইকেল পিওন' পদটিকে 'গ্রন্থাগারিক সহায়ক' (Library attendent) আখ্যা দিতে সুপারিশ করেন। **শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়** বলেন, প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে পূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে, তাই প্রয়োজন নতুন দিক নির্দেশ। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যকারিতার এক তদন্তের কথাও তিনি বলেন। **শ্রীফণিভূষণ রায়** বলেন প্রবন্ধে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কেই বক্তব্য রাখা হয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন উন্নতির কথা বলা হয়নি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, এজন্য গ্রন্থাগারিককেও সচেষ্ট হতে হবে, জনচেতনা বাড়িয়ে তুলতে হবে। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার সমীক্ষায় নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করার প্রয়োজন নেই, কারণ তা বহু পূর্বেই হয়েছে, এখন প্রয়োজন আইন প্রবর্তন ও তা কার্যকর করা। **শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়** পাঠক-সমীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাঠককুলকে সচেতন না করে তুলতে পারলে আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাবে না। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেরও এক সমীক্ষার কথা বলেন। Deputed Candidate-দের ক্ষেত্রে ভিন্নরকম সরকারী মনোভাবের সমালোচনা করতে যেয়ে **শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী** বলেন, রহড়া শিক্ষা শিবিরে গ্রন্থাগারিকতার শিক্ষণে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয় কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত শিক্ষা গ্রহণে কোনরূপ বৃত্তি দেওয়া হয় না, যদিও দুইটিই সরকারী অনুমোদিত শিক্ষাক্রম। মহিলা গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের সঙ্গে যথারীতি যোগাযোগ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। আলোচনার ভিত্তিতে উত্তর দিতে উঠে **শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত** বলেন, বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারে চিঠি লিখেও কোনরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। আলোচনার পরিসমাপ্তিতে সভাপতি **শ্রীজীবানন্দ সাহা** বলেন বাঙলা দেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। এজন্য পরিষদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তবে পরিষদের কেবলমাত্র কলকাতাতেই কেন্দ্রীয় অফিস থাকলে চলবে না, প্রতিটি জেলায় জেলায় শাখা স্থাপন করে ব্যাপকতর গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য এই সব শাখা পরিষদ কোন বিচ্ছিন্ন সংস্থা নয়, সমস্ত অংশই পরিষদের এক পূর্ণাঙ্গ রূপের অংশ মাত্র।

সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্য শেষ হয়।

প্রতিবেদক : বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Proceedings of the 1st Session

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন : ২৮শে মার্চ : সকাল ১০-৩০মিঃ

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

(সম্মেলনে আলোচিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

প্রবন্ধকার : শ্রীসত্যব্রত সেন

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১০-২টায়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। শ্রীসত্যব্রত সেনের প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন **শ্রীশিবানীকুমার রাহা**। গ্রন্থযানটিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন সকলেই কিন্তু মেরামতির দায়িত্ব কেউই নেন না, তাই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। **শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** বলেন গ্রন্থযান সম্পর্কে বিভিন্ন দুর্নীতি প্রকাশের জন্য পত্রিকায় প্রেরণ করা দরকার, এবং এই দুর্নীতি বন্ধের জন্য দরকার গণ আন্দোলন গড়ে তোলা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সম্পর্কে দায়িত্ব নেবেন। **শ্রীবিশ্বনাথ কোলে** বলেন, খারাপ রাস্তার জন্য গ্রন্থযান খারাপ হয়ে পড়ে, এর মেরামতির জন্য চেষ্টা করা দরকার। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি থেকে চাঁদা নেওয়া চলবে না। এবং পুস্তক হারানোর জন্য কোন গ্রন্থাগার কর্মীকে দায়ী করা চলবে না। তিনি বলেন এই সব গ্রন্থযানে পুস্তক তালিকা এবং পাঠকদের খুসীমত পুস্তক নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। **শ্রীশশাঙ্ক শেখর বাগচী** প্রস্তাব করেন যে প্রত্যেক গ্রন্থযানে একজন করে সহকারী গ্রন্থাগারিক থাকা দরকার, পাঠককে সাহায্য করতে। **শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত** বলেন, কর্তৃপক্ষের খুসীমত গাড়ী কেনাতে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তিনি প্রস্তাব করেন জেলা গ্রন্থাগারে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা এক বিভাগ খোলা প্রয়োজন এবং গ্রন্থযানখানি ভাড়ায় খাটিয়ে সেই টাকা দিয়ে গ্রন্থযান মেরামত করা দরকার। এর ফলে গ্রন্থযানের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ হবে। **শ্রীফণিভূষণ রায়** বলেন, প্রতি গ্রন্থযানে জেলার রাস্তার ম্যাপ থাকা প্রয়োজন। আর ঠিক করা দরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান, যেখানে গ্রন্থযানটি নিয়মিত আসবে এবং পাঠকবর্গ সেখান থেকে বই নেবেন। পাঠকদের পুস্তক নির্বাচনের জন্য একটি করে Union Catalogue রাখা দরকার প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারে। জনসাধারণকে সঠিক সেবা করতে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের মূল্যায়ণ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন। পরিশেষে আলোচনার উত্তর দেন প্রবন্ধকার শ্রীসত্যব্রত সেন এবং সভাস্থ প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

প্রতিবেদক : দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী

Proceedings of the 2nd Session

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন ঃ ২৮শে মার্চ ঃ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সুপারিশ সমূহ

(সম্মেলনে আলোচিত তৃতীয় প্রবন্ধ)

প্রবন্ধকার ঃ তুষারকান্তি সান্যাল

অধিবেশন সুরু হয় বিকেল ৩টায়। প্রথমে সম্মেলনের মূল সভাপতির প্রস্তাবক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক **শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু** সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে এই অধিবেশনের আলোচ্য প্রবন্ধ "কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সুপারিশ সমূহ" পাঠ করেন প্রবন্ধের রচয়িতা শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল। সভাপতিমহাশয় এই প্রবন্ধের উপর আলোচনা করবার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দদের আহ্বান জানান।

শ্রীসত্যব্রত সেন, শ্রীবিশ্বনাথ কোলে, শ্রীপ্রবীর দে আলোচ্য প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধকার শ্রীসান্যালকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের আরও সংঘবদ্ধ হতে হবে ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। **শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়** প্রবন্ধটির সমালোচনা করে বলেন প্রবন্ধের মধ্যে গ্রন্থাগারের সেবামূলক দিক আরও বেশী করে আলোচনা করা উচিত ছিল। **শ্রীফণিভূষণ রায়** বলেন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের মূল সমস্যা বর্তমান lecture method of teaching এর জন্য দায়ী। তিনি মনে করেন যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রন্থাগারাভিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রেও উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছেও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও মুল্যায়ণ আরোপিত করা যায় না। **শ্রীঅরুণ রায়** বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে সদস্য হতে হবে। **শশাঙ্কশেখর বাগচী, শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত** ও **শ্রীপ্রবীর দে** কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কমিটি চালু করা ও গ্রন্থাগারিককে এই গ্রন্থাগার কমিটিতে সচিব হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব করেন। এ ছাড়া **শ্রীজ্যোতির্ময় রাহা** ও **শ্রীশুভ্রাংশু মিত্র** আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন সদস্যের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধকার শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে জবাব দেওয়ার পর অধিবেশনের সভাপতি **শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু** তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন গ্রন্থাগার আন্দোলন শুধু গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য নয়। এই আন্দোলন বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীদের। এই গ্রন্থাগার সম্মেলনে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষানুরাগী ও গ্রন্থাগারানুরাগী লোকেরা যোগদান করেন। তাই এই সম্মেলনে

আলোচ্য প্রবন্ধাদি এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত যাতে সর্বস্তরের মানুষ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। তিনি বলেন, আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন দিক আলোচিত হলেও শিক্ষার সাথে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক আলোচিত হয় নি। শিক্ষার সাথে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক জনমানসে এখনও প্রকট নয় বলেই, এখনও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনা পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাচ্ছে, আর গ্রন্থাগার চেতনাসম্পন্ন লোকের অভাবও থেকে যাচ্ছে, এমন কি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদদের মধ্যেও। তিনি মনে করেন গ্রন্থাগারের সুপরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা যেমন দায়ী তেমনি দায়ী গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা ও গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আছেন যাঁরা। কিন্তু গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু না হলে ও গ্রন্থাগার চেতনা জনমানসে বৃদ্ধি না পেলে এঁরা গ্রন্থাগারের সুপরিচালনায় আশানুরূপ সক্ষম হতে পারবেন না বলে তিনি মনে করেন।

ভাষনান্তে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক : সুখেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Proceedings of the 3rd Session

চতুর্থ কার্যকরী অধিবেশন : ২৮শে মার্চ : সন্ধ্যা—৬-৩০মিঃ

বইপত্র হারানোর সমস্যা

(সম্মেলন আলোচিত চতুর্থ প্রবন্ধ)

প্রবন্ধকার : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বইপত্র হারানোর সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধ উত্থাপন করেন শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন : বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে বই চুরি যাওয়ার একটা কারণ পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাল্পতা। পাঠ্যপুস্তকের কপি উপযুক্ত পরিমাণে থাকলে বই চুরি এবং পাতা কাটা অনেক কমে যেতে পারে।

শ্রীসত্য ব্রত সেন বলেন : বই হারানোর ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের যদি কোন গলদ থাকে তাহলে তার বিচার হওয়া উচিত।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :— শুধু আমাদের দেশেই নয় বিদেশেও অনেক বই গ্রন্থাগার থেকে চুরি যায়।

শ্রীশুভ্রাংশু মিত্র বলেন :—বই হারানোর ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের যদি সত্যিই কোন অপরাধ থাকে তাহলে আদালত তার বিচার করবে। আমরা কোনো বিচারের কথা বলতে পারি না।

শ্রীবরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন :—বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ যেভাবে আইন লঙ্ঘন করেন তার ফলে বই হারাতে পারে। সেভাবে হারানো বইয়ের জন্য কি গ্রন্থাগারিককে দায়ী করা উচিত ?

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন :—গ্রন্থাগারিকের ত্রুটির জন্য বই হারালে গ্রন্থাগারিককে দায়ী করা যাবেনা একথা কোনো বিশেষজ্ঞ বলেননি।

শ্রীহরিশ চক্রবর্তী বলেন :—রিপ্রোগ্রাফিক মেশিনের সাহায্যে বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশ কপি করে দেবার ব্যবস্থা করলে মনে হয় বই চুরি বা পাতা কাটা অনেকাংশে কমে যাবে। এছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন **শ্রীঅনিল পাল, শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী** এবং **শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়**। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় আলোচনা থেকে উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব দেন।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীজীবানন্দ সাহা বলেন :—বই হারানো সত্ত্বেও যদি দেখা যায় পাঠকরা গ্রন্থাগার থেকে ভাল সাহায্য পাচ্ছেন তাহলে সেই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে প্রশংসা করা উচিত। অনেক সময় দেখা যায় stock taking-এর জন্য এবং বই হারানো বা চুরি যাওয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মচারী নিয়োগের জন্য যে টাকা খরচ হয় চুরি যাওয়া বইয়ের মোট মূল্যের চেয়ে তা অনেক বেশী। গ্রন্থাগারকে বই হারানো ও চুরি যাবার হাত থেকে রক্ষা করবার বিষয় চিন্তা করতে গিয়ে একথাও বিচার করে দেখতে হবে।

প্রতিবেদক : চঞ্চলকুমার সেন

Proceedings of the 4th Session

জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা গঠন

গত ২৮শে মার্চ রাত্র ৮ ঘটিকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠন ও সংযোগ উপসমিতির ব্যবস্থাক্রমে বাঙলাদেশের প্রতিটি জেলায় পরিষদের শাখা গঠন সম্পর্কে এক আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত (দার্জিলিং জেলা), বিশ্বনাথ কোলে (পুরুলিয়া), মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য (মালদহ) এবং অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। তাঁরা প্রতি জেলায় গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা গঠন করে বাঙলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ করে তোলার জন্য পরিষদের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

২৭—২৯শে মার্চ, ১৯৭০

স্থান : বড় আন্দুলিয়া লোক সেবা শিবির, নদীয়া।

সম্মেলনে প্রস্তাবাবলী :—

(১) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে :—

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক জনশিক্ষার বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। এই সম্মেলন ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই রাজ্যে অবিলম্বে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানাইতেছে।

(২) শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বাজেট বৃদ্ধি সম্পর্কে :—

এই সম্মেলন বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের জন্য অপ্রতুল বরাদ্দ লক্ষ্য করিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। সম্মেলন মনে করে যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য অবিলম্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেটের পরিমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই সম্মেলন তাই মনে করে যে রাজ্য বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত।

সম্মেলন আরও মনে করে যে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেটের যথাক্রমে শতকরা ২.৫ ভাগ ও শতকরা ১.৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হউক।

(৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম প্রবর্তন সম্পর্কে :—

এই সম্মেলন গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিগত ৯/১০ বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় অবস্থিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন না পাওয়ায় আজও তাহা কার্যকর হয় নাই। ইহার ফলে পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে উচ্চতর পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। সম্মেলন আরও দুঃখের সহিত জানিতে পারিয়াছে যে এই অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের এই ন্যায্য দাবী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে বিবেচনা করিতে রাজী নহেন। ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সর্বাধিক সমুন্নত এবং বৃত্তিকুশলী কর্মীদের দ্বারা সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের এই ন্যায্য দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইয়া এই বৎসর হইতে (১৯৭০—৭১) কলিকাতায় অবস্থিত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করিতে এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অনুরোধ জানাইতেছে।

এই সম্মেলন পূর্বাঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী রূপায়নে তৎপর হওয়ার জন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য সরবরাহ সংস্থাকে অনুরোধ জানাইতেছে।

(৪) গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংশোধিত অনুক্রম সম্পর্কে :—

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে গত ১৯২৫, ১৯২৮ ও ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করা হইবে এবং প্রস্তাব করিতেছে যে আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনকে অষ্টাবিংশ সম্মেলনরূপে ঘোষণা করা হউক। এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে, সমস্ত সম্মেলনগুলির এক সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করা হউক।

(৫) গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে :—

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এই সম্মেলন মনে করিতেছে যে, শিক্ষাকে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক করিয়া গড়িয়া তোলার মধ্যেই এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার উপায় রহিয়াছে এবং তদনুযায়ী সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

(৬) বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সম্পর্কে :—

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রাজ্য সরকারের নিকট দাবী করিতেছে যে, রাজ্য বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করার পূর্বে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিগুলির সহিত আলোচনা করা হউক এবং তাঁাদের অভিমত গ্রহণ করা হউক।

সরকার প্রবর্তিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সম্পর্কে :—

(১) অবিলম্বে স্পনসর্ড প্রথা বাতিল করিয়া সমগ্র ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হউক। Library Directorateর অবিলম্বে পত্তন করা হউক।

(২) সমগ্র রাজ্যগ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনসাধারণের সর্বাধিক প্রয়োজনে লাগাইতে এবং সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করিতে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা হউক।

(৩) বর্তমানে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে ঘোষণা করা হউক। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রদেয় সব রকমের ভাতাদি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি এই সব কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হউক।

(৪) রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবিলম্বে রূপায়িত হউক।

(৫) বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা মূল্যায়ণ আশু প্রয়োজন। এই বিষয়ে একটি Review Committee নিয়োগ করিয়া তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হউক।

(৬) গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসিক বেতন অবশ্যই ১লা তারিখে প্রদান করিতে হইবে।

(৭) সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারিককে, গ্রন্থাগার কমিটির Member Secretary করিতে হইবে।

(৮) গ্রন্থাগার আইন প্রচলন সাপেক্ষ সব গ্রন্থাগার কমিটিগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠন। এই কমিটিগুলি হইবে পরামর্শ দানের জন্য (Advisory Type).

(৯) গ্রন্থাগার পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ চাই। রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের কমপক্ষে ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করিতে হইবে।

(১০) স্পনসর্ড প্রথায় নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারী কর্মী ঘোষণা সাপেক্ষ Service Rule অবিলম্বে প্রণয়ন ও কার্যকরী করা হউক।

(১১) জেলা গ্রন্থাগারে একজন করিয়া সহকারী গ্রন্থাগারিক, হিসাব রক্ষক এবং দপ্তরী নিয়োগ করা হউক।

(১২) জেলা গ্রন্থাগারে নিযুক্ত Library Attendent এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারে Cycle-Peon এর পদমর্যাদা পরিবর্তন করিয়া Library Asst (Jr,) করা হউক।

(১৩) গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিকুশলী শিক্ষার অধিকতর সুযোগ ও আয়োজন করিতে হইবে। গ্রন্থাগারে নিযুক্ত মহিলা কর্মীদের জন্য অবিলম্বে এই বিষয়ে সুযোগ করিয়া দেওয়া হউক।

(১৪) গ্রন্থাগার পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করিয়া অবিলম্বে ঐ পদে নিয়োগ করিতে হইবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য Library Cadre তৈরী করে Promotion এর সুযোগ দিতে হইবে।

(১৫) নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথভাবে প্রয়োগ করান হউক।

(১৬) যে কোন গ্রন্থাগার উন্নয়ণ পরিকল্পনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সংগে পরামর্শক্রমে কার্যে রূপায়িত করিতে হইবে।

(১৭) কোন কোন স্থানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক এবং সাইকেল পিওন নিয়োগে দুইবার নির্বাচনী পরীক্ষা (ইন্টারভ্যু) দেওয়ার রীতি রহিয়াছে, অবিলম্বে এই ব্যবস্থার বিলোপ করিয়া একবার মাত্র সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগ করিতে হইবে।

(১৮) এই সম্মেলন আরও প্রস্তাব করিতেছে যে যেসকল গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক রহিয়াছেন সেই সকল গ্রন্থাগারে 'কার্ড ক্যাটালগ' প্রণয়নের

জন্য অবিলম্বে অনুরূপ প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারে এককালীন অনুদান হিসাবে পাঁচশত করিয়া টাকা দেওয়া হউক।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে ঃ—

(১) জনসাধারণকে প্রতি গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করিয়া ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মারফৎ গ্রন্থ পাইবার জন্য জেলা গ্রন্থাগারের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে ; অবশ্য প্রতিটি গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনই হইবে মূল লক্ষ্য।

(২) জেলা স্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত করিতে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে।

(৩) ভ্রাম্যমাণ পুস্তকযান হিসাবে মোটর ও সাইকেল ব্যতীতও রিক্সা, নৌকা, গরুর গাড়ী প্রভৃতির প্রচলন করিতে হইবে।

(৪) পুস্তক ক্রয়ের জন্য জেলা গ্রন্থাগারে অনুদান বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহেও অনুরূপ অনুদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) বার্ষিক চাঁদার প্রথার বিলোপ করিয়া জেলা গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জামিন রাখিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পুস্তক দেওয়ার প্রথার বিলোপ করিতে হইবে। এইজন্য যে অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন তাহা সরকারী বর্ধিত অনুদানের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে।

গ্রন্থাগারের কার্য ব্যতীত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযানকে অন্য কোনও কার্যে ব্যবহার করা চলিবে না।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযানে কর্মরত কোনও কর্মীকে পুস্তক খোয়া যাওয়া বা নষ্ট হইবার ফলে, কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ না থাকিলে, দায়ী করা চলিবে না।

নূতন গ্রন্থাগার সমূহে অনুদান দেওয়ার পূর্বে জেলা গ্রন্থাগারিকের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযান হইতে সরাসরি পাঠক পাঠিকাকে পুস্তক সরবরাহ করিবার প্রথা চালু করিতে হইবে।

এক নির্দিষ্ট সময়ে জেলার গ্রন্থযানটি বিভিন্নস্থানে পুস্তক লইয়া উপস্থিত থাকিবে, অন্যথায় জেলা গ্রন্থাগারিককে সময়মত গ্রন্থযান না যাওয়ার কারণ দর্শাইতে হইবে।

জেলা গ্রন্থাগারের সহিত স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়া ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হইবে।

জ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে ঃ—

সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়

পাঠকসংখ্যার ও ভবিষ্যৎ ২০ বছরের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখিয়া গ্রন্থাগার

কক্ষের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা হউক।

এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব থাকিবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

(৩) নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও প্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হউক।

(৪) কোঠারী কমিশনের সুপারিশমত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও পলিটেকনিক বাজেটের ন্যূনতম ৬.৫% গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা হউক।

(খ) সেবামূলক দিক

শুধুমাত্র পুস্তক লেনদেন নহে, গ্রন্থাগার কর্মীরা যাহাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারিদের উন্নত ধরণের সেবা প্রদান করিতে পারেন, তাহার জন্য যথোপযুক্ত উপকরণ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়

(১) পদমর্যাদা

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কমিটির সদস্য হইবার অধিকার দিতে হইবে। ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিককে College Teachers' Council এর সদস্য হইবার অধিকার দিতে হইবে। এ বিষয়ে College Code এ প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকের কাছ হইতে কোনও রূপ Security Deposit বা Bond রাখা চলিবে না।

(ঘ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে Professor-in-charge প্রথা বিলোপ করিতে হইবে।

(ঙ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে Library Committee গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক হইবেন সদস্য-সম্পাদক (Member Secretary)।

(২) বেতন

(ক) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে UGC বেতনক্রম চালু করিতে হইবে।

(খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ন্যূনতম শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন সকল গ্রন্থাগার কর্মীদেরই এই বেতনক্রমের সুযোগ দিতে হইবে।

(গ) পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও ভাতাদি দিতে হইবে।

(গ) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে কর্মরত অন্যান্য বহুসংখ্যক অবৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সারা পশ্চিমবাঙলায় একই ধরণের উন্নত বেতনক্রমের সুযোগ দিতে হইবে এবং তাঁহাদের সরকারী হারে মহার্ঘভাতা, অন্যান্য ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

বইপত্র হারানোর সমস্যা সম্পর্কে :—

১। এই সম্মেলন মনে করে যে ব্যবহার ও আদান প্রদানের ফলস্বরূপ গ্রন্থাগারে কিছু সংখ্যক গ্রন্থাদির ক্ষয়ক্ষতি অপরিহার্য।

২। এই কারণে গ্রন্থাগারিককে অভিযুক্ত করা অসমীচীন। এই যুক্তিতে গ্রন্থাগারিকদের নিকট হইতে 'সিকিউরিটি ডিপজিট' গ্রহণ অথবা 'বণ্ড' আদায় করার রীতি ন্যায়সঙ্গত নহে।

৩। গ্রন্থাগারের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য যথোচিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বরূপ উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর সংস্থান করা বাঞ্ছনীয়।

৪। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারে লেনদেনকৃত ও ব্যবহৃত যাবতীয় গ্রন্থাদির বৎসরে হাজার প্রতি অনধিক ৪টি খণ্ড পুস্তক হারানোর দরুণ হিসাব হইতে খারিজ করা যাইতে পারে—ইহাই এই সম্মেলনের সুচিন্তিত অভিমত।

Resolutions of the 24th Bengal Library Conference

সংবিধান সংশোধনী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে সদস্যদের মতামত সাদরে বিবেচিত হইবে। যাঁহারা এই সম্পর্কে মতামত জানাইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আগামী ১৫ মে তারিখের মধ্যে তাহা পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

কর্ম-সচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Amendment of the Association Constitution

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ

কলিকাতা

সর্বশ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; অজিত দাস, কলুটোলা লেন ; অবনী দে, বৃটিশ কাউন্সিল ; অমিতা রায়চৌধুরী, শহীদ দীনেশ গুপ্ত রোড ; অমিতাভ বসু, খেলাৎ বাবু লেন ; অরুণকুমার রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ; গীতা মিত্র, কসবা রোড ; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; জীবানন্দ সাহা ; জোসেফ, ব্রিটিশ কাউন্সিল ; তুষারকান্তি সান্যাল, বেহালা ; দিলীপকুমার বসু, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড ; দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড ; দীপ্তিময় রায়, ব্রিটিশ কাউন্সিল ; দেবীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ ; ননীগোপাল বসাক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ; নাড়ুগোপাল দাস, বারিকপাড়া রোড ; নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন ব্যানার্জি রোড ; পূর্ণেন্দু প্রামানিক, মনসাতলা লেন ; প্রণবকুমার শীল, শান্তিবুক ষ্টোর্স ; প্রবীরকুমার দে, পি. কে. গুহ রোড ; প্রবীর রায়চৌধুরী, শহীদ দীনেশ গুপ্ত রোড ; প্রাণগোপাল দত্ত, রসা রোড (সাউথ) ; প্রীতি মিত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; ফণিভূষণ পারিয়াল, সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী ; ফণিভূষণ রায়, মহারাজা নন্দকুমার রোড ; বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, মনোহরপুকুর রোড ; বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ভবানীকুমার ঘোষ, বিধান সরণী ; ভারতী রায়, ইউরোপীয় অ্যাসাইলাম লেন ; মদনগোপাল ঘোষ, রজনী মুখার্জি লেন ; মিনতি চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; রতনকুমার দাস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ; রামকৃষ্ণ সাহা, অখিল মিস্ত্রী লেন ; শশাঙ্ককুমার বাগচী, ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ ; শান্তিপদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; শীলা গুপ্ত, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ ; সর্বানীপদ চক্রবর্তী, এস এন রায় রোড ; সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ ; সুধীর ব্রহ্ম, অক্রুর লেন ; সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাকতলা ; সুনীলচন্দ্র সেন, সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী ; সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ ; স্বর্ণলতা দাস, বারিকপাড়া রোড ; হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, জাতীয় গ্রন্থাগার ; হিরণকুমার দত্ত, রাধানাথ মল্লিক লেন ; হৃষীকেশ গুপ্ত, যোধপুর পার্ক।

চব্বিশ পরগণা

সর্বশ্রী অনিমেশ চক্রবর্তী, জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া ; অমলাংশু সেনগুপ্ত, জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর ; অশোককুমার ব্রহ্ম, যতীনদাস সেবা সমিতি, ইছাপুর ; অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি, এম, ব্যানার্জি রোড ; চঞ্চল কুমার সেন, ঝিলপার লেন, নবব্যারাকপুর ; দীনবন্ধু বেরা, ব্রজবল্লভপুর ; পবিত্র ঘোষ, যতীনদাস সেবা সমিতি, ইছাপুর ; প্রমীলচন্দ্র বসু, মধ্যমগ্রাম ; বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া ; বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরা সুন্দরী রোড,

বোড়াল ; ভোলানাথ কর্মকার, ভাঙড়, পাবলিক লাইব্রেরী ; রাসবিহারী মিত্র, চানবা পাঠাগার, বারাকপুর ; সমীরকুমার বিশ্বাস, দেবালয়, বান্ধব পাঠাগার ; সত্যব্রত সেন, জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া।

দার্জিলিং

সর্বশ্রী কিশোর দেওয়ান রাই, কার্শিয়াং ; জ্যোতির্ময় রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ; জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, শিলিগুড়ি ; টেকবাহাদুর, বিজনবাড়ী, রুর‍্যাল লাইব্রেরী ; ব্যোমবাহাদুর সুব্বা, বিজনবাড়ী ; রণেন্দ্রমোহন মুন্সী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ; সুনীল কুমার ঘোষ, বাগডোগরা ; স্বপনকুমার বাগচী, শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়।

নদীয়া

সর্বশ্রী অজিতকুমার প্রামানিক, অংকুরিকা গ্রন্থাগার, পলাশী ; অনিলকুমার কর, প্রজ্ঞানানন্দ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বড়জাগুলী ; অমরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ; অবনীকুমার মণ্ডল, তরুণসংঘ সাধারণ পাঠাগার, নাতিডাঙ্গা ; কুনাল সিংহ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ; কেশবলাল চক্রবর্তী, কৃত্তিবাস স্মৃতি ভবন, ফুলিয়া বয়রা ; জ্যোতির্ময় রাহা, করিমপুর, পান্নাদেবী কলেজ ; বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, মদনপুর সাধারণ পাঠাগার ; বিশ্বনাথ সিংহ, ঘূর্ণী ; বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল, তরুণসংঘ সাধারণ পাঠাগার, নাতিডাঙ্গা ; ভীমচন্দ্র বিশ্বাস, প্রদ্যোৎ স্মৃতি পাঠাগার, পলাশীপাড়া ; মদনমোহন মল্লিক, জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর ; মোহিত রায়, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী ; সজিতকুমার বিশ্বাস, করিমপুর পাবলিক লাইব্রেরী ; সত্যকুমার চক্রবর্তী, তরুণ পাঠাগার, আসান নগর ; সত্য চট্টোপাধ্যায়, ধর্মদা সেবাব্রতী সংঘ ; সুবলকুমার পাল, মৃণালিনী স্মৃতি গ্রন্থাগার, পাগলা চণ্ডী ; সৌরভ মণ্ডল, চাপড়া সাধারণ পাঠাগার, বাঙ্গালঝি ; স্বপ্নেন্দুনাথ ধর, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী ; হিরন্ময় পাল, বামুনপুকুর সাধারণ পাঠাগার ; এ ছাড়াও চাপড়া ব্লকের বি, ডি, ও, এবং জয়েন্ট বি, ডি, ও, ।

পশ্চিম দিনাজপুর

সর্বশ্রী অজিতকুমার ঘোষ, খাসপুর গৌরচন্দ্র রুর‍্যাল লাইব্রেরী ; অবনীকান্ত তলাপাত্র, জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট ; মদনমোহন চক্রবর্তী, নয়াবাজার পল্লী পাঠাগার ; রমেন্দ্রনাথ দাস, বরাহার রুর‍্যাল লাইব্রেরী, মহিপুর।

পুরুলিয়া

সর্বশ্রী অসিতকুমার দাস, শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া ; প্রণতকুমার মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুর, পাবলিক লাইব্রেরী ; বিশ্বনাথ কোলে, জেলা গ্রন্থাগার ; সুশান্ত হাজরা, জেলা গ্রন্থাগার।

বর্ধমান

সর্বশ্রী অহিভূষণ ভট্টাচার্য, কালনা মহকুমা লাইব্রেরী ; কমললোচন কুণ্ডু, বন-নবগ্রাম, পল্লী মঙ্গল সমিতি পাঠাগার ; গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আকাপুর ; দিলীপকুমার নন্দী, দুর্গাপুর ; নিমাইচরণ রায়, নূতনহাট, মিলন পাঠাগার ; লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, সাটিনন্দী ; শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, অকালপৌষ, নগেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠাগার ; শুকদেব মুখোপাধ্যায়, কুমিরকোলা, প্যারীমোহন গ্রামাঞ্চলিক গ্রন্থাগার, রূপশ্রী ; সমীরকুমার রায়, দুর্গাপুর ; হরিগোপাল সাহা, দুর্গাপুর ; হারাধন বারি, বন-নবগ্রাম পল্লী মঙ্গল সমিতি পাঠাগার।

সর্বশ্রী গোপালচন্দ্র পাল, ধ্রুব সংহতি, বালসী ; হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, নড়ুয়া ; ক্ষৌনীশ বিশ্বাস, জেলা গ্রন্থাগার।

সর্বশ্রী অনাথনাথ সেন, পুরন্দরপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার ; অনাথশরণ মুখোপাধ্যায়, লোকপাড়া রুর‍্যাল লাইব্রেরী ; অবধূতকুমার সরকার, থয়রাশোল মিলন সংঘ, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ; অরুণকুমার দে, দুবরাজপুর পাবলিক লাইব্রেরী ; আদিনাথ পৈততী, গোহালীয়াড়া, উদয়ণ গ্রন্থাগার ; জিতেন্দ্রনাথ সরকার, লাভপুর অতুলশিব পাঠাগার ; তরুণ রায়, বেড়গ্রাম পল্লীসেবা নিকেতন গ্রাম্য গ্রন্থাগার ; নন্দলাল সাহা, সাঁইথিয়া রুর‍্যাল লাইব্রেরী ; নিশীথকুমার চৌধুরী, উচকরণ সাধারণ পাঠাগার ; মহিমাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বালিজুড়ি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ; শান্তিকুমার ঘোষ, চহটা সতীশ স্মৃতি রুর‍্যাল লাইব্রেরী ; শান্তিকুমার রায়, জেলা গ্রন্থাগার, সিউড়ী ; শিশিরকুমার সেন, মাধাইপুর পি, এম রুর‍্যাল গ্রন্থাগার ; সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত, কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি ; সত্যরাম চট্টোপাধ্যায়, বালিজুড়ি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ; সুধাময় দাস, উচকরণ সাধারণ পাঠাগার।

মালদহ

সর্বশ্রী কালাচাঁদ মণ্ডল, সামসী বীণাপানি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ; খগেন্দ্রচন্দ্র দাস, গাজোল সাধারণ গ্রন্থাগার ; মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, জেলা গ্রন্থাগার ; মহঃ আনোয়ার আলী, রতুয়া রবীন্দ্র পাঠাগার।

মুর্শিদাবাদ

সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার ; দীনেশচন্দ্র পাল, জিতপুর

পাবলিক লাইব্রেরী ; ব্রজদুলাল গোস্বামী, নিমতিতা মহেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার ; মাধুরী বরাট, বহরমপুর গার্লস কলেজ ; রমনীমোহন সরকার, নবীপুর, আর এন, ক্লাব লাইব্রেরী ; শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রকুনপুর উচ্চবিদ্যালয় গ্রামীণ গ্রন্থাগার ; শিবানীকুমার রাহা, জেলা গ্রন্থাগার ; সুনীলকুমার ধাড়া, জানাঙ্গী কিশোর সংঘ পাঠাগার ; স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার স্মৃতি পাঠাগার ; হীরেন্দ্রনাথ দাস, গাজিন নেতাজী আশ্রম চরকা সংঘ পাঠাগার ।

মেদিনীপুর

সর্বশ্রী অনিলকুমার দাস, তুষারস্মৃতি গ্রন্থনিকেতন, শ্রীকৃষ্ণপুর ; অহিভূষণ কাঞ্জিলাল, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ; ঘনশ্যাম রায়, তুষারস্মৃতি গ্রন্থনিকেতন, শ্রীকৃষ্ণপুর ; দেবদাস ভট্টাচার্য, বরগোদা তরুণ সংঘ ; নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কোলাঘাট গ্রামীণ গ্রন্থাগার ; প্রভাংশুকুমার দাস, দাঁতন-সোসাল ক্লাব এণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী ; বিশ্বপদ জানা, চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার ; সুকুমার বাগচী, গড়বেতা কলেজ ।

হাওড়া

সর্বশ্রী অনুচরণ ভাণ্ডারী, ওরদিপুর জনশিক্ষা পাঠাগার ; নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির, পেঁড়ো ; বাসুদেব দাস, জগদীশপুর সাধারণ পাঠাগার ; বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, অনন্তরাম মুখার্জি লেন ।

হুগলী

সর্বশ্রী অনিলচন্দ্র পাল, মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার ; আনন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার ; গোপাল নারায়ণ চৌধুরী, জয়গঙ্গা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার ; ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ; নিত্যগোপাল গোস্বামী, আঁইয়া বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার ; নিমাইচন্দ্র মান্না, মোক্ষদাময়ী পাঠাগার, রামপাড়া ; প্রভাতকুমার ঘোষ, ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার ; শুভ্রাংশুকুমার মিত্র, সুভাষ এভিনিউ ; শ্যামলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার ।

বিয়োগ পঞ্জী

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত শনিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ১৮৯২ সালে বীরভূম জেলার হাতিয়ার গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে প্রথম ঈশান বৃত্তি নিয়ে তিনি বি. এ পাস করেন। এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। সুদীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর রাজশাহী কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপাল রূপে যোগদান করেন। ১৯৪১ সালে প্রেসিডন্সী কলেজে ফিরে আসেন এবং সরকারী চাকুরীতে অবসর গ্রহণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি পি. এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বহু জনহিতকর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অধুনালুপ্ত বিধান পরিষদের (১৯৫২-৫৭) তিনি সদস্য ছিলেন। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে বিবিধ রচনার মাধ্যমে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, সমালোচনা সাহিত্য, রবীন্দ্র সৃষ্টির সমীক্ষা কুমুদকাব্য পরিচিত, বাংলা উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা সাহিত্যে বিকাশের ধারা বিংশ শতকের গীতিকাব্য ও সঙ্কলন, সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ইত্যাদি অন্যতম।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

গত ৯ই মার্চ প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরলোক গমন করেছেন। ১৯০০ খৃঃ কুষ্টিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করে তিনি ১৯২৩ খৃঃ ইংরাজীতে ও ১৯৩৪ খৃঃ বাংলায় এম. এ পাস করেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, জয়পুরিয়া কলেজ, উইমেন্স কলেজ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৮ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, ফিল উপাধি পান। ১৯৫৮ খৃঃ বাংলার বাউল ও বাউল গান গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, ভারতের নারী, মানসী পরিক্রমা, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা; রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও উপন্যাস, ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং গ্রন্থাগারিক মহলে সর্ব জনপ্রিয়, ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আর নেই। গত ২৪শে মার্চ বেলা ৪ ঘটিকায় নয়া দিল্লীর উইলিংডন নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পরদিন বেলা ১২-৪৫ মিনিটে বিজয়ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীর প্রায় ৭০।৮০ জন গ্রন্থাগারিক তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে বিজয়ঘাটে সমবেত হয়েছিলেন। সর্বশ্রী বি এস কেশবন, বি ভি রাঘবেন্দ্র রাও ধনপত রাই, বি এল ভরদ্বাজ, পি বি মঙ্গলা, রাজাগোপালন, সুব্রত দত্ত, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দিল্লীর বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকবৃন্দ বিষণ্ণ ও শোকাভিভূতচিত্তে এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন।

গত ২৭শে মার্চ বড় আন্দুলিয়ায় চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনে যখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন তখন সম্মেলন মণ্ডপে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিনিধিগণ নীরবে দুই মিনিট কাল দণ্ডায়মান থেকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভায়ও শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছিলেন তাঁরাই তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের মাধুর্যে বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার দ্বারহাট্টায় অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ঐ সময়ে সম্মেলনে উপস্থিত পরিষদের কর্মীদের সঙ্গে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমস্যা সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন।

নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্ম হয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী –ঢাকা জেলার একটি গ্রামে। তিনি ঢাকা, কলকাতা এবং দিল্লীতে শিক্ষালাভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সুরজাসুন্দরী স্মৃতি বৃত্তি পান। তিনি কলকাতার তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট লাভ করেন। ঐ শিক্ষাক্রমের পরিচালক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লা খানের তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। এছাড়া তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষারও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছিলেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই জনহিতকর কাজে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। পনের বছর বয়সে স্বীয় গ্রামে তিনি হরিজনদের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে "নবীন ব্রতী সংঘ" নামে একটি সঙ্ঘ ও তার লাইব্রেরী গড়ে তোলেন।

দিল্লীতে বাসকালেও তিনি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নয়া দিল্লীর সোসাল সার্ভিস লীগের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯৪৩—) এবং সহঃ সভাপতি।

ভারত সরকারের কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম তাঁর চেষ্টাতেই চালু হয়। তিনি ছিলেন এই শিক্ষাক্রমের অনারারী রেজিষ্টার (১৯৫০-৬০)। পরে অবশ্য এই কোর্স টি বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর চেষ্টাতেই গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীজ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এর সহঃ সভাপতি ছিলেন (১৯৫৬—)। তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (১৯৬০—) এবং ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদেরও (১৯৬১—) সহঃ সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র "আই এল এ বুলেটিন"-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের "বুলেটিন"-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভিজিটিং প্রফেসর ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষকও তিনি হয়েছিলেন।

আই এল এ ও ইয়াসলিক-এর বহু সেমিনার তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দুখানি বইও প্রকাশিত হয়েছে—"Education for Librarianship in India" এবং "Library movement in India" নামে। শেষোক্ত বইখানির জন্য তিনি একটি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের গ্রন্থাগার জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। প্রথম পুত্র গবেষণায় রত আছেন।

কুমারী আত্রেয়ী মণ্ডল

গত ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭০ পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রমের ছাত্রী কুমারী আত্রেয়ী মণ্ডল অকালে পরলোকগমন করেন। জগদীশ বসু জাতীয় মেধা বৃত্তি' প্রাপ্তা আত্রেয়ী মণ্ডলের মৃত্যুতে ঐ শিক্ষাক্রমের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ গত ১৮ই এপ্রিল এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ঐদিনের সমস্ত ক্লাশ স্থগিত রাখা হয়।

Obituaries

ভ্রম সংশোধন

মুদ্রন প্রমাদবশত ৩৬৭—৭৩ পৃষ্ঠায় বইতরণীর স্থানে শিরোনামায় 'বৈতরণী' হওয়ায় দুঃখিত।

গ্রঃ সঃ

পরিষদ কথা (২)

ডঃ জর্জ চ্যাণ্ডলারের বক্তৃতা

গত ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ডঃ জর্জ চ্যাণ্ডলার পরিষদ ভবনে 'গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আলোচনার প্রারম্ভে পরিষদ সভাপতি শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে ডঃ চ্যাণ্ডলারকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। ডঃ চ্যাণ্ডলার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুদৃশ্য গৃহের প্রশংসা করে বলেন এটা গর্বের কথা, যে রাজ্যে আজও গ্রন্থাগার আইন চালু হয়নি সেখানে গ্রন্থাগার পরিষদের এই তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। তিনি International Federation of Library Association এর সঙ্গে এই পরিষদের যোগাযোগ রাখার কথা বলেন। IFLAএর সদস্য হতে কোনও চাঁদার প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁরাই IFLA'র সদস্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন জাপানও এইরূপ এক সংস্থা সংগঠিত করেছে যদিও তা সরকারী উদ্যোগে সংগঠিত হয়নি। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সংস্থা গঠনের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, বাঙলা দেশেই দেখা যায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে কাজ করছে। তাদের মধ্যে কোন সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। 'ইউনেস্কো' প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর সমালোচনা করে ডঃ চ্যাণ্ডলার বলেন, কেবলমাত্র একটি গ্রন্থাগারকে পুষ্ট করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, প্রয়োজন সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি করা। দেশের সরকারের এ সম্পর্কে দায়িত্ব নেওয়া কর্তব্য। যুক্তরাজ্যে সরকার অনেক বেশী দায়িত্ব নেন। জার্মানীতে দেশের গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করেন কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু ভারতে রাজ্য ভিত্তিক আইন প্রণীত হয়—যদিও এ সম্পর্কে খুব সামান্য কাজই হয়েছে। ভারতের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতিতে (Library Advisory Council) সভাপতি থাকেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং অন্য বৃত্তির ব্যক্তিবর্গ কিন্তু ডঃ চ্যাণ্ডলার বলেন এই Council এ ⅓ অংশ অন্য বৃত্তির থাকলেও ⅓ অংশ গ্রন্থাগার বৃত্তির ও বাকী ⅓ অংশ সদস্য পাঠকদের মধ্য থেকে নেওয়া দরকার।

যুক্তরাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগার পরিষদগুলিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারণ সরকারী সাহায্য গ্রহণ করলে অনেক বাধা নিষেধের মধ্যদিয়ে চলতে হয়। সার্বজনীন গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনি বলেন অধিক জনসংখ্যার শহরেই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা গ্রন্থাগারের প্রসারের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সমূহও এক বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, এর দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ বিষয়ের জন্য যে সকল গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে তার সম্বন্ধেও ডঃ চ্যাণ্ডলার অনুরূপ মন্তব্য করেন।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীদেশরাজ কালিয়া বলেন আমাদের উপাদান সামান্য কিন্তু প্রয়োজন অনেকের। তাই তিনি ১৯৬৬ সালে

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রস্তাব করেছিলেন এক আন্তর্জাতিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন করতে। ভারত সরকারকেও গ্রন্থাগার কমিটিতে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ নিয়ে এক কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু কার্যত তা আজও কার্যকরী হয়নি।

অবশেষে পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীফণিভূষণ রায় সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আলোচনা শেষ হয়।

স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণে শোকসভা

গত ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় পরিষদ ভবনে শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সদ্য পরলোকগত নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে দুই মিনিটকাল নীরবে দাঁড়িয়ে সকলে স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীদেশরাজ কালিয়া ৺চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত মধুর চরিত্রের উল্লেখ করে তাঁর কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ৺চক্রবর্তী ছিলেন কর্মযোগী পুরুষ এবং শত দুঃখ কষ্টেও তিনি সদা প্রফুল্ল থাকতেন। ৺চক্রবর্তীর সহজ সরল ও রহস্যপ্রিয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন হাসলা প্রসাদ। দিল্লীতে প্রবাসী বাঙালী প্রত্যেকের সাথেই ৺চক্রবর্তী যোগাযোগ রাখতেন এবং কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে নিজ দায়িত্বে তা সাধ্যমত করতেন বলে জানান শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। শ্রীতুষার সান্যাল বলেন ৺চক্রবর্তীকে কেবলমাত্র বৃত্তির জন্য আমরা স্মরণ করি না, স্মরণ করি তাঁর গ্রন্থাগার বৃত্তিতে অবদানের জন্য। ৺চক্রবর্তীর নিকট আত্মীয় শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী বলেন ৺চক্রবর্তীর জনপ্রিয়তা যে এত বেশী ছিল তা তাঁরাও জানতে পারেননি। তিনি প্রায় সব কিছুই ব্যয় করতেন বিভিন্ন সৎকাজে যাতে মৃত্যুকালে তিনি প্রায় কিছুই রেখে যেতে পারেননি। সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তীর গ্রন্থাগার জগতে যে অবদান আছে তার একটা মূল্যায়ণ হওয়া উচিত। ইয়াসলিক, ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রভৃতিতে ৺চক্রবর্তীর দান অনেক, তাই বৎসরে অন্তত একবার তাঁকে স্মরণ করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।

শোক প্রস্তাব

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পরিষদ ভবনে আয়োজিত শোক সভা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তীর আকস্মিক অকাল বিয়োগে গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছে। এই সভা স্বর্গীয় আত্মার পরম শান্তি লাভের কামনা করিতেছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

সম্পাদকীয়

অগ্রগতির আর এক ধাপ

'গ্রন্থাগারের' চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মুখপত্রের বয়স আরও এক বৎসর বাড়ল। আগামী বৈশাখ সংখ্যাই হবে প্রকাশনার বিংশতি বর্ষের প্রথম পদক্ষেপ। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পত্তনের পর পরিষদের বক্তব্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে এক মুখপত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতি ১৩৫৮ সাল থেকে পরিষদের পক্ষ থেকে এক 'বুলেটিন' প্রকাশ। ক্রমে ক্রমে এই বুলেটিনই ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে আজ 'গ্রন্থাগারে' রূপান্তরিত। পরিষদের বহুমুখী কর্মধারায় যদিও গ্রন্থাগার প্রকাশ এক আংশিক দিকমাত্র তবুও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ এই পত্রিকাই বাঙলা তথা ভারত এমন কি বহির্ভারতের গ্রন্থাগারমনা ও গ্রন্থাগার সচেতন ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির সঙ্গে পরিষদের যোগাযোগের একমাত্র সেতুবন্ধ।

কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযোগ সাধনই নয়, পরিষদের কার্যাবলীর ভবিষ্যৎ রূপায়ণ ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপরেখার এক মুদ্রিত দলিল এই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা। তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে অনেক সময় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়াও দেশের শিক্ষা, কর্মচারীদের বেতন ও পদমর্যাদা, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, এবং বিভিন্ন দাবী আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সুসংবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার অংশ বিশেষ ও পত্রিকার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে কোন কোন সময়। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন ছিল সমাজ-হিতৈষণা-প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ। তখন আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সেবামূলক ও শিক্ষাগত আদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু বর্তমানে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের ধারাও পরিবর্তিত হয়েছে অনেক। কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনাই নয়, রূঢ় বাস্তবের সাথে মোলাকাত করে চলতে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজস্ব দাবীর কথাও এসে পড়ে। এ আলোচনা স্বাভাবিক, এ অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থাগার কর্মীদের চাহিদাও আর সকলের মত, কারণ তাদেরও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। কেবলমাত্র জ্ঞানবৃক্ষের ফলেই তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, প্রয়োজন আরো কিছুর। সেই 'আরো কিছুর' দাবীতেই এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন, যাতে অনাদরে অবহেলায় আর তলিয়ে যেতে না হয়। সুশিক্ষার জন্য আমরা অত্যন্ত সচেতন কিন্তু সেই ঈপ্সিত শিক্ষার যারা ধারক তাদের সম্পর্কে সাধারণের মনে কোন চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বনিয়াদ কাঁচা থাকলে বিরাট ইমারতের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটে, শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের অর্থাৎ এই দব মানুষ গড়ার কারিগরদের উপেক্ষা করলে শিক্ষার ভবিষ্যতও অত্যন্ত নড়বড়েই হবে।

কিন্তু তবুও একথা সঙ্গে সঙ্গেই বলা প্রয়োজন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করে জনসাধারণের কল্যাণের কথা, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির কথাও চিন্তা করে। এক বিদ্বৎ সংস্থার পক্ষে যেমনভাবে শিক্ষার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই সব কিছুকে আলোচনা করে পরিষদ। তাইতো দেখা যায় গ্রন্থাগারের পবিত্রতা যখন কলুষিত হয় পুলিশের দৌরাত্ম্যে তখন পরিষদ এই অন্যায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনা। আবার দ্বিধা করেনা সঙ্কীর্ণ রাজনীতির প্ররোচনায় যারা গ্রন্থাগার সমূহে হামলা করে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রপত্রিকা নির্বিবাদে ধ্বংস করে, তাদের ধিক্কার জানাতে। সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলীর মধ্যে এই দৌরাত্ম্যের বলি হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, গান্ধী সাহিত্যভবন, বিদ্যাসাগর কলেজ, জ্ঞানচন্দ্র পলিটেকনিক প্রভৃতি গ্রন্থাগার সমূহ। ধ্বংস হয়েছে অসংখ্য দুর্লভ পুস্তক ও পত্রপত্রিকা। রাজনীতিতে মতামত, মতানৈক্য ও মতবিরোধ সম্ভব, কিন্তু বিরোধী চিন্তা ধারাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস মধ্যযুগেও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তাই বর্তমানে সে চেষ্টার কোন অর্থই হয় না। যাঁরা এ কাজ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে কেবলমাত্র পুস্তক বা পত্রপত্রিকাতেই ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধ্যান ধারণা নিহিত নেই, তার প্রভাবও নিশ্চয়ই ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের মনে। তাই বইপত্র ধ্বংস করলেই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' হয় না, কারণ 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থবহ, তাতে কোথাও মুদ্রিত বিদ্যার ধ্বংসের কথা লেখা নেই। তা যদি থাকতো তাহলে যারা এই ধ্বংস যজ্ঞের হোতা তাঁরাই আবার তাদের স্মরণীয় বাণী উৎকীর্ণ করতেন না যত্রতত্র। তাই প্রগতির দোহাই দিয়ে আমরা যেন ধ্বংসের কালাপাহাড়কে ডেকে না আনি, কারণ তা সমাজের অগ্রগতি না হয়ে পশ্চাদ্ধাবন হবে। আমাদের এই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমরা যেন 'জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্' বলার আগে 'এসো এসো এসো হে বৈশাখ' বলে নতুন বৎসরের আহ্বান গীতিই আগে গাইতে পারি।

Milestone to Progress—Editorial